শ্রীগোপাল বসু মল্লিক-

ফেলোশিপ-প্রবন্ধ।

তৃতীয় খণ্ড

(হিন্দুদর্শন)

দ্বিতীয়াংশ।

মহামহোপাধ্যায়—

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-

বেদান্তবারিধি-

প্রণীত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

৭৯।১, পদ্মপুকুর রোড্, ভবানীপুর,

কলিকাতা।

সন ১৩৩২—অগ্রহায়ণ।

মূল্য—।৹ আনা মাত্র।

প্রস্তাবনা।

ভগবৎ কৃপায় আজ শ্রীগোপাল বসুমল্লিক ফেলোশিপ্ প্রবন্ধের তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, অবশিষ্ট প্রবন্ধসমূহের মধ্যে কেবল সাংখ্য, পাতঞ্জল ও মীমাংসাদর্শন-সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হইল, আর বেদান্তবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ পরবর্ত্তী চতুর্থখণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

উপরি উক্ত দর্শনত্রয়ের মধ্যে সাংখ্যদর্শন অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক দর্শন। সমস্ত পুরাণশাস্ত্রে ও মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে সাংখ্যসম্মত সিদ্ধান্তের প্রভূত পরিমাণে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, পুরাকালে এদেশে সাংখ্যশাস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তার ও আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে সেই বিশাল সাংখ্যশাস্ত্র শাখা-পল্লবাদিহীন কাণ্ডমাত্রসার বৃক্ষের ন্যায় অতি ক্ষীণ দশায় উপনীত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য দুইখানি মাত্র গ্রন্থ এখনও সাংখ্যশাস্ত্রের স্মৃতিরেখা জাগরিত রাখিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি আচার্য্য ঈশ্বর-কৃষ্ণের কারিকা বা সাংখ্যসপ্ততি, যাহার উপর আচার্য্য গৌড়পাদের ভাষ্য ও মহামতি বাচস্পতিমিশ্রের 'তত্ত্বকৌমুদী' টীকা এখনও বিদ্বৎ-কক্ষে সাংখ্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। অপর গ্রন্থখানি মহর্ষি কপিলের সূত্ররূপে পরিচিত প্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শন, যাহার উপর বিজ্ঞানাচার্য্য পরিজ্ঞভিক্ষুকৃত অতি উপাদেয় ভাষ্যব্যাখ্যা এখনও বিদ্বৎসমাজে অধীত কন্ম সম্পাদিত হইতেছে।

গণ্ডী অতি

সাংখ্যসিদ্ধান্ত জানিবার পক্ষে এখন উক্ত গ্রন্থদ্বয়ই প্রধান অবলম্বন। উভয় গ্রন্থেই সাংখ্যসম্মত সিদ্ধান্তনিচয় অতি উত্তমরূপে বিবৃত ও বিন্যস্ত আছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, উক্ত সাংখ্যদর্শনে পর-পক্ষের বাদ-প্রতিবাদ প্রচুর পরিমাণে বিন্যস্ত আছে, এবং বিবেকজ্ঞানের সহায়করূপে কতকগুলি উপাখ্যানও (গল্পও) স্থান পাইয়াছে, কিন্তু সাংখ্যসপ্ততিতে সে সকল বিষয়ের আদৌ উল্লেখ নাই, কেবল সাংখ্য-সম্মত সিদ্ধান্তসমূহ মাত্রের যথাযথভাবে সন্নিবেশ আছে

আমরা এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ উক্ত সাংখ্যদর্শন হইতেই আবশ্যক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, এবং প্রমাণরূপে মূলের সূত্রসকলও উদ্ধৃত করিয়াছি, এবং আবশ্যক মতে সাংখ্যসপ্ততি প্রভৃতির কথা ও সম্মতি গ্রহণ করিয়াছি।

সাংখ্যদর্শনের বিষয়গুলি বড়ই উপাদেয়, এবং সরস ও চিত্তাকর্ষক। এই জন্য যতদূর সম্ভব, উহার বিষয়সমূহ সংকলন করিতে যত্ন করা হইয়াছে। সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, বন্ধ, মোক্ষ, বিবেক, অবিবেক ও তাহার নিদান এবং আরও যে সমস্ত বিষয় অবশ্য-জ্ঞাতব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সে সমস্ত বিষয়ও প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কেবল জটিল বিচারাংশ ও নীরস উপাখ্যানাংশ মাত্র অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সাংখ্যের পরেই পাতঞ্জল দর্শনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সাংখ্যের সঙ্গে পাতঞ্জল যোগদর্শনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। সাংখ্যোক্ত তত্ত্বসমূহই অপরিবর্ত্তিতভাবে পাতঞ্জলে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে; এই জন্য পাতঞ্জল দর্শন সাধারণতঃ সেশ্বর সাংখ্যদর্শন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; সুতরাং সাখ্যের পর পাতঞ্জলের বিষয়-সন্নিবেশ করা অশোভন হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না।

সাংখ্যের ন্যায় পাতঞ্জল দর্শনেরও প্রধান-প্রতিপাদ্য প্রায় সমস্ত বিষয়ই প্রবন্ধমধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। যোগ, যোগবিভাগ, যোগ-সাধন, যোগাঙ্গ, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বর ও যোগফল—কৈবল্য প্রভৃতি বিষয় সমূহ প্রবন্ধের উপাদানরূপে সংকলিত হইয়াছে, কেবল সুবিস্তৃত যোগ-বিভূতির কথা অতি সংক্ষেপে সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে। সংগৃহীত বিষয় গুলির প্রামাণ্য প্রকাশনার্থ মূলগ্রন্থ হইতে সূত্রসমূহ উদ্ধৃত করিয়া, সে সমস্তের মর্ম্মার্থও বিবৃত করা হইয়াছে। এখানে বলা আবশ্যক যে, পাতঞ্জল-সম্পর্কিত আলোচনায় প্রধানতঃ ব্যাসভাষ্য ও বাচস্পতিমিশ্রের সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি পরিগৃহীতই হইয়াছে।

পাতঞ্জলের পরেই মীমাংসা দর্শনের বিষয় প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। যদিও আপাতজ্ঞানে পাতঞ্জলের সহিত মীমাংসা দর্শনের কোন প্রকার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না, সত্য, তথাপি উভয়কে একবারে সম্বন্ধশূন্য বলিতে পারা যায় না। পাতঞ্জলোক্ত ক্রিয়াযোগের সহিত মীমাংসা দর্শনের ঘনিষ্টতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মরাশিই যদি নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই সমুদয় কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনপূর্ব্বক বিবেক-জ্ঞানোপজননে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে। এই সকল কারণে পাতঞ্জলের পর মীমাংসা দর্শনের বিষয়-সন্নিবেশ করা নিতান্ত অসম্বদ্ধ বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

আলোচ্য মীমাংসাদর্শনের প্রধান উপজীব্য হইতেছে—ধর্ম্মকর্ম্ম। কর্ম্মোপজীব্য বলিয়াই মীমাংসাদর্শন কর্ম্মমীমাংসা নামে পরিচিত হইয়াছে। কর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপণ করা উহার প্রধান লক্ষ্য হইলেও, যে সমুদয় বিষয় পরিজ্ঞাত না থাকিলে, অথবা যে সকল নিয়ম-পদ্ধতি পরিকল্পিত না হইলে কর্ম্ম সম্বন্ধে বিচারই চলিতে পারে না, সে সকল বিষয়ও উহার আলোচনার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেই কারণেই কর্ম্মমীমাংসার

অঙ্গরূপে বহুবিধ নিয়ম-পদ্ধতি প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। সেই সকল নিয়ম-পদ্ধতি 'ন্যায়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রায় সকল আচার্য্যই আবশ্যক মতে তৎপ্রবর্ত্তিত ন্যায়গুলির সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ম্মবিচারের সহিত ঐ সমুদয় নিয়ম-পদ্ধতি সংযোজিত হওয়ায় কেবল যে, গ্রন্থের কলেবরই বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু জটিলতার মাত্রাও সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। বেদবিদ্যা-বিশারদ মহামতি শবরস্বামী ও কুমারিল ভট্ট অতি উৎকৃষ্ট 'ভাষ্য'ও 'বার্ত্তিক' ব্যাখ্যা দ্বারা উহার জটিলতা কিয়ংপরিমাণে লঘু করিয়াছেন, এবং কর্ম্মমীমাংসার মর্ম্ম গ্রহণের পথও অনেকটা নিষ্কণ্টক করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, বিশাল মীমাংসা দর্শনের জটিল বিষয়রাশি সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিবার উপযুক্ত স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই; অধিকন্তু, কর্ম্মবিচার অত্যন্ত নীরস ও জটিল, সহজেই পাঠকবর্গের অরুচিকর হইতে পারে; এইজন্য কর্ম্মবিচারের স্থূল অংশ পরিত্যাগ দার্শনিক করিয়া প্রধানতঃ ভাগ মাত্র সংকলিত ও আলোচিত হইয়াছে, এবং সেই সকল বিষয়ের সমর্থনকল্পে যুক্তির সঙ্গেসঙ্গে মীমাংসাদর্শনের মূল সূত্রসমূহও উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বিধিবিচার, তাহার বিভাগ ও তদনুকূল উদাহরণ যথাসম্ভব সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা সহৃদয় পাঠকবর্গ অল্পমাত্রও তৃপ্তিলাভ করিলে আমাদের পরিশ্রম সফল হইবে।

ভবানীপুর,
ভাগবত চতুষ্পাঠী,
কলিকাতা।
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

বিষয়-সূচী।

(সাংখ্যদর্শন)

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় ... পৃষ্ঠা

(পাতঞ্জল দর্শন।)

(মীমাংসা দর্শন)

সূচী সমাপ্ত।

ফেলোশিপ প্রবন্ধ।

অবতরণিকা।

(হিন্দুদর্শন)

ফেলোশিপ প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের বিষয় সংকলিত ও আলোচিত হইয়াছে; এখন তৃতীয় খণ্ডের প্রারম্ভে সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে আলোচনার অবসর উপস্থিত হইয়াছে; কারণ, আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, দর্শনপর্য্যায়ে সাংখ্যদর্শন তৃতীয় স্থানে অবস্থিত। দর্শনসমূহের বিষয়-সঙ্কলনের ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এবং দর্শনশাস্ত্রগুলির সম্ভাবিত বিরোধ-পরিহার ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলেও ঐরূপ পরিকল্পনাই সমিচীন বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ ন্যায় ও বৈশেষিকের ন্যায় সাংখ্যও জড় জগতের সত্যতা ও পুরুষের বহুত্ব প্রভৃতি অনেক বিষয়েই প্রায় একমতাবলম্বী। ন্যায় ও বৈশেষিক পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করেন, এবং পুরুষের (আত্মার) তাত্ত্বিক ভোগ সমর্থন করেন; সাংখ্য সেস্থলে ত্রিগুণা প্রকৃতির আসন স্থাপন করিয়াছেন, এবং বুদ্ধিকে তাত্ত্বিক ভোগের অধিকার দিয়া পুরুষের বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়াছেন। এই জাতীয় বহুবিষয়ে সৌসাদৃশ্য থাকায় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের আলোচনার পরে সাংখ্যদর্শনের আলোচনাই সঙ্গত ও শোভন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই কারণে, এখন অগ্রে আমরা সাংখ্যদর্শনের কথা বলিব, পরে পাতঞ্জলদর্শনের কথা শেষ করিয়া অপরাপর দর্শনের বিষয় যথাক্রমে আলোচনা করিব।

[সাংখ্যদর্শন ও তাহার বিভাগ।]

আলোচ্য সাংখ্যদর্শন দুইভাগে বিভক্ত—সেশ্বর সাংখ্য ও নিরীশ্বর সাংখ্য। মহর্ষি পতঞ্জলি-প্রণীত পাতঞ্জল দর্শন সেশ্বর সাংখ্য নামে, আর মহামুনি কপিলকৃত সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর সাংখ্য নামে পরিচিত; কারণ, কপিলদেব স্বকৃত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন নাই; বরং সাগ্রহে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; এবং আপনার সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতেও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন (*); আর মহর্ষি পতঞ্জলি সেই স্থলেই ঈশ্বরের

---

* সূত্রকার প্রথম অধ্যায়ের "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" ৯২ সূত্রে স্পষ্টাক্ষরে ঈশ্বর প্রতিষেধ করিলেও, ব্যাখ্যাতৃগণ ইহার উপর অনেক প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে বিরত হন নাই। কেহ বলিয়াছেন—কপিল যে, 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' বলিয়াছেন, এটা প্রৌঢ়িবাদমাত্র; অর্থাৎ পরপক্ষের সহিত তর্কপ্রসঙ্গে আপনার তর্কনৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য ঐরূপ বলিয়াছেন মাত্র, কিন্তু উহা তাঁহার অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত নহে। অপর পক্ষ বলেন—ঈশ্বর কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে,—অনুভবগম্য; এই জন্যই কপিল 'ঈশ্বরাভাবাৎ' না বলিয়া 'অসিদ্ধেঃ' বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন—সর্ব্বশক্তি ঈশ্বরের নিত্য ঐশ্বর্য্য আছে—জানিতে পারিলে, সংসারী লোক জাগতিক ঐশ্বর্য্যেও নিত্যতা ভ্রমে অধিকতর আসক্ত হইতে পারে; তাহার ফলে, ঐশ্বর্য্যের অনিত্যতা জ্ঞানে যে, বৈরাগ্যলাভ, তাহা ব্যাহত হইতে পারে; এই ভয়ে সূত্রকার নিত্যেশ্বরের নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বরপ্রতিষেধ তাঁহার অভিপ্রেত নহে; ইত্যাদি বহু রকম তাৎপর্য্য কল্পনা দ্বারা অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন! কিন্তু সূত্রকার কপিলের যে, মনোগত ভাব কি প্রকার, তাহা তিনি না বলিয়া দিলে এবিষয়ে সংশয়শূন্য হওয়া বড়ই কঠিন মনে হয়।

আসন প্রদান করিয়া যোগমহিমা খ্যাপন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কপিলকৃত ন্যূনতার পরিহারপূর্ব্বক সাংখ্যশাস্ত্রের সমধিক গৌরবও বর্দ্ধিত করিয়াছেন (*)।

আস্তিক দর্শনের মধ্যে সাংখ্যদর্শনই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে। যে সাংখ্যশাস্ত্র এককালে শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরাক্রমে বহু বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, এবং যাহার যুক্তিযুক্ত বচনপরম্পরায় বিমুগ্ধ বিশ্বমানবগণ শতমুখে গৌরব কীর্ত্তন করিত; সেই সাংখ্যশাস্ত্রই আজ দুর্নিবার কালচক্রের অমোঘ নিষ্পেষণে ছিন্নভিন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়া অতি দীনভাবে, যেন শুভ সময়ের প্রতীক্ষায় কোনমতে আত্মরক্ষা করিতেছে মাত্র।

শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ও লোকপ্রসিদ্ধি হইতে জানা যায় যে, কপিলদেবই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রণেতা ও আদি প্রতিষ্ঠাতা। পুরাণ শাস্ত্রে ও ইতিহাসাদি গ্রন্থে কপিলের উজ্জ্বল জ্ঞানমহিমা কীর্ত্তিত আছে; বেদেও কপিলের অসীম জ্ঞানগৌরব উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে।

---

* এখানে বলা আবশ্যক যে, যে কারণেই হউক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও কপিলকে 'নাস্তিক' মনে করা সঙ্গত নহে; কারণ, তিনি জন্মান্তরবাদী, পরলোকেও আত্মার অস্তিত্ব ও সুখদুঃখভোগ স্বীকার করিয়াছেন। যাহারা জন্মান্তর বা পরলোক-সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাহারাই 'আস্তিক', আর যাহারা তাহা স্বীকার করেন না,—এখানেই দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফুরাইয়া যায় বলেন, তাহারাই 'নাস্তিক' পদবাচ্য, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাস্তিত্বের সঙ্গে 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' কথার কোন সম্পর্কই নাই।

কিন্তু সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা কপিল যে, কে, সে সম্বন্ধে বহুদিন হইতেই অনেকে অনেক রকম সংশয় পোষণ করিয়া আসিতেছেন; আচার্য্য শঙ্করস্বামী সেই সংশয়কে আরও উজ্জ্বল অক্ষরে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন (১)।

তাঁহার মতে সাংখ্যদর্শন মূলতঃ নারায়ণাবতার কপিলদেবের প্রণীতই নহে। উহা কপিলনামক অপর কোনও লোকদ্বারা প্রণীত হইয়াছে। কেহ কেহ আবার এ কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া কল্পনা করেন যে, 'তত্ত্বসমাস' নামে যে, দ্বাবিংশতি-সূত্রাত্মক ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে; তাহাই নারায়ণাবতার কপিলের প্রণীত, আর

---

(১) শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা, ন তয়া শ্রুতিবিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যম্। 'কপিলম্' ইতি—শব্দ-সামান্যমাত্রত্বাৎ। অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুঃ বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ।" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১ শাঙ্করভাষ্য)।

অভিপ্রায় এই যে, তোমরা কেবল কপিলের জ্ঞানাতিশয্য প্রতিপাদক শ্রুতি দেখিয়াছ মাত্র, কিন্তু তাহাতেই কাপিল মতের উপর শ্রদ্ধা করা উচিত হয় না; কারণ, উহা বেদবিরুদ্ধ; বিশেষতঃ শ্রুতিতে কেবল 'কপিল' নামের মাত্র উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই কপিলই যে, সাংখ্য-প্রণেতা, তাহা ত নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না; কেন না, আরও একজন কপিলের নাম শোনা যায়, যাঁহার অপর নাম বাসুদেব। তিনি সগর-রাজের পুত্রগণকে ভস্ম করিয়াছিলেন। এই উভয় কপিলই যে, এক, তাহাও বলিবার উপায় নাই; অতএব কপিলের নাম দেখিয়াই সাংখ্য-দর্শনের উপর শ্রদ্ধা করা সঙ্গত হয় না।

বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্যসমন্বিত যে সাংখ্যদর্শন এখন প্রচলিত আছে, তাহা অগ্নি-অবতার কপিলের কৃত, এবং ইহা সেই সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব-সমাসেরই ছায়াবলম্বনে রচিত ও তাহারই বিস্তৃতি মাত্র; এই কারণেই পাতঞ্জল দর্শনের ন্যায় ইহাও 'সাংখ্যপ্রবচন' নামে পরিচিত হইয়াছে। "অগ্নিঃ স কপিলো ভূত্বা সাংখ্যশাস্ত্রং বিনির্ম্মমে" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ স্মৃতিবচনও ঐকথারই অনুমোদন করিতেছে। অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ একথায়ও পরিতুষ্ট না হইয়া কল্পনা করেন যে, 'তত্ত্বসমাস'ই কপিলকৃত সাংখ্যদর্শন; আর প্রচলিত সাংখ্যদর্শনখানা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানভিক্ষুরই কৃতিত্বের ফল। বিজ্ঞানভিক্ষুই স্বকৃত ভাষ্যের গৌরববর্দ্ধনের জন্য স্বকীয় সূত্রগুলিকে কপিলকৃত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; বস্তুতঃ ঐ সমুদয় সূত্র কপিলকৃত নহে। এ কথার অনুকূলে তাহারা তিনটী কারণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন—

১। ষড়্দর্শনের টীকাকার মহামতি বাচস্পতিমিশ্র উহার টীকা করেন নাই। তাঁহার সময়ে যদি প্রচলিত সাংখ্যদর্শন বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই মূল সাংখ্যদর্শন পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকার ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করিতেন না। ২। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে সাংখ্যমতের সমালোচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা উদ্ধৃত করিয়াই বিরত হইয়াছেন, কিন্তু এসকল সূত্রের নাম পর্য্যন্তও করেন নাই। তাঁহার সময়ে ইহার অস্তিত্ব থাকিলে, কারিকামাত্র উদ্ধার করিয়াই সন্তুষ্ট থাকা কখনই তাঁহার পক্ষে শোভন হইত না।

তৃতীয় কারণ—অন্যান্য আর্ষ সূত্রের সহিত এ সকল সূত্রের সাদৃশ্যের অত্যন্তাভাব। ঋষিপ্রণীত অন্যান্য দর্শনের সূত্রসকল যেরূপ স্বল্পাক্ষর ও গূঢ়ার্থব্যঞ্জক, আলোচ্য সাংখ্যদর্শনের সূত্রসমূহ ঠিক তদনুরূপ নহে; ইহার সূত্রগুলি এতই সরল ও স্পষ্টার্থক যে, অনেকস্থলে ব্যাখ্যারই আবশ্যক হয় না। ইহা নিশ্চয়ই আর্ষ-সূত্র-রচনার রীতিবিরুদ্ধ। ইহার পর আরও একটী কারণ আছে, তাহা বিজ্ঞানভিক্ষুর নিজের উক্তি। তিনি ভাষ্যপ্রারম্ভে লিখিয়াছেন—'সাংখ্যশাস্ত্ররূপ জ্ঞান-সুধাকর কালার্কদ্বারাভক্ষিত হইয়া কলামাত্র অবশিষ্ট আছে; আমি স্বীয় বচনামৃত দ্বারা পুনরায় তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিব' (১)।

তাঁহার এ কথা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিজ্ঞানভিক্ষু যেন সাংখ্যদর্শনের সমস্ত অংশ বা সমস্ত সূত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; নিজে বাক্য যোজনা করিয়া সেই সমুদয় অসম্পূর্ণ অংশের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে, আলোচ্য সাংখ্যদর্শনের রচনা সম্বন্ধে উক্ত প্রকার কল্পনা অলৌকিক বা অসঙ্গত হইতে পারে না।

সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু কিন্তু উচ্চকণ্ঠে এসকল কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—দেবহূতির গর্ভজাত নারায়ণাবতার কপিলদেবই এই উভয় গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি প্রথমতঃ 'তত্ত্বসমাসে' যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন, পরে

---

(১) "কালার্ক-ভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞান-সুধাকরম্।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ।" (ভাষ্য-ভূমিকা)

লোকহিতার্থে তাহাই আবার বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতে যাইয়া ষড়ধ্যায়ী বিপুল সাংখ্যদর্শন রচনা করিয়াছেন। এরূপভাবে সংক্ষিপ্তার্থের বিস্তৃতি বিধান সুধীসমাজে সমাদৃত ও সমীচীন বলিয়া পরিগৃহীতও হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বিষ্ণুর অবতার কপিলই যে, সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা কপিল, তাহাও কপিলের উক্তি হইতেই বুঝা যায়—

"এতন্মে জন্ম লোকেঽস্মিন্ মুমুক্ষূণাং দুরাশয়াৎ।
প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্ম-দর্শিনাম্" (ভাগ্য ৩।৭০)

অর্থাৎ আত্মদর্শী পণ্ডিতগণের অভিমত তত্ত্বসমূহ পরিগণনা করিবার উদ্দেশ্যে এবং মুমুক্ষুগণের আগ্রহাতিশয়ের ফলে জগতে আমার এই জন্ম। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, জগতে মুমুক্ষুগণের কল্যাণার্থ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বপ্রচারের উদ্দেশ্যেই দেবহূতির গর্ভে ভগবান্ নারায়ণের কপিলরূপে আবির্ভাব হইয়াছিল। অতএব বিষ্ণুর অবতার কপিলদেবের উপরেই সাংখ্যদর্শন প্রণয়ণের সমস্ত দায়িত্ব সমর্পণকরা সঙ্গততর মনে হয়।

তাহার পর, 'অগ্নিঃ স কপিলো নাম' বাক্যেতে, কপিলরূপী অগ্নিকেই যে, সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা বলা হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু যে ভগবান্ মহাকাল বিশ্বরূপে বিরাজমান, অগ্নি তাঁহারই শক্তিবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভগবান্ নারায়ণ সেই অগ্নি-শক্তিরূপে কপিল নামে প্রাদুর্ভূত হইয়া সাংখ্যশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন; ইহাই ঐ বাক্যের প্রকৃত ও সুসঙ্গত অর্থ, অন্যরূপ অর্থ সঙ্গতই নহে। অতএব বলিতে হইবে যে, দেবহূতির গর্ভজাত

নারায়ণাবতার, যে কপিল 'তত্ত্বসমাস' রচনা করিয়াছিলেন, তিনিই লোকহিতার্থে পুনরায় বিস্তীর্ণ ষড়ধ্যায়পূর্ণ সাংখ্যদর্শন রচনা করিয়াছেন—ইত্যাদি।

সাংখ্যদর্শনের রচনা ও রচয়িতার সম্বন্ধে যে সমুদয় সংশয় ও সমাধানপ্রণালী প্রচলিত আছে, আমরা সংক্ষেপে সে সমুদয় একস্থানে সন্নিবদ্ধ করিয়া দিলাম। সুধী পাঠকবর্গই এ সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত মন্তব্য নির্ণয় করিয়া লইবেন।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, আলোচ্য সাংখ্যশাস্ত্র এক সময় যেমনই উন্নতি ও বিস্তৃতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল, এখন আবার তেমনই অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সেই বিশাল সাংখ্যশাস্ত্রের প্রায় সমস্ত গ্রন্থই অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, কেবল দুই একখানি গ্রন্থমাত্র এখন পর্য্যন্ত কোন মতে আত্মরক্ষা করিয়া অবশিষ্ট গ্রন্থরাশির অতীত স্মৃতি জাগরূক করিয়া রাখিয়াছে। সেই সমস্ত বিলুপ্ত গ্রন্থের পুনরুদ্ধার আর হইবে কি না, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন।

প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণের গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক মহামুনি কপিল সাংখ্যমত প্রচার করেন, এবং সর্ব্বাদৌ প্রিয় শিষ্য আসুরি মুনিকে তাহা প্রদান করেন। আসুরি মুনি আবার গুরুলব্ধ সেই বিদ্যা স্বশিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্যকে সম্প্রদান করেন। পঞ্চশিখাচার্য্যই সুচিন্তিত বহু গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার করিয়া সাংখ্যশাস্ত্রের সমধিক বিস্তৃতি বিধান করিয়াছিলেন (১)।

---

(১) ঈশ্বরকৃষ্ণ স্বকৃত সাংখ্যকারিকার পরিশেষে লিখিয়াছেন—
"এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রম্॥" ৭০॥

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না, এবং ভবিষ্যতে পাইবার আশাও অতি অল্প। ব্যাসভাষ্য প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণিক ব্যাখ্যাগ্রন্থাদিতে পঞ্চশিখের অনেক সূত্র উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে সকল সূত্র-বাক্যের আকর (মূল গ্রন্থ) নির্ণয় করিবার বা বুঝিবার কোনই উপায় নাই।

পঞ্চশিখের শিষ্য ঈশ্বরকৃষ্ণ। তিনি ছন্দোবদ্ধ সত্তরটীমাত্র শ্লোকে সমস্ত সাংখ্যশাস্ত্রের (সাংখ্যদর্শনের) প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি অতি নিপুণতার সহিত সংকলিত করিয়াছেন, এবং নিজেই বলিয়াছেন যে, এই সপ্ততিতে (সত্তরটী শ্লোকে) যে সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইল; বুঝিতে হইবে, ইহাই সমস্ত সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। সাংখ্যশাস্ত্রে তদতিরিক্ত কোন বিষয় প্রতিপাদিত হয় নাই। পার্থক্য এই যে, মূল সাংখ্যদর্শনে কতকগুলি আখ্যায়িকা সন্নিবিষ্ট আছে, ইহাতে সেই আখ্যায়িকাগুলি নাই, এবং পরপক্ষ-খণ্ডনোপযোগী বিচার বিতর্কও স্থান পায় নাই; ইহাই সাখ্যদর্শন হইতে সাংখ্য-সপ্ততির বৈশিষ্ট্য (১)। ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত এই সপ্ততি বা সাংখ্যকারিকা গ্রন্থ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গৌরবে অতি মহান্। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সাংখ্যসিদ্ধান্ত খণ্ডনকালে ইহার বাক্য ধরিয়াই বিচার করিয়াছেন, এবং মহামতি বাচস্পতি মিশ্রও ইহার উপরেই অতি উপাদেয় 'তত্ত্বকৌমুদী' নামক টীকা রচনা করিয়াছেন।

(১) "সপ্তত্যাঃ কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টী-তন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চ ॥" ৭২ ॥

প্রচলিত সাংখ্যদর্শন ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং চারিশত ছাপ্পান্নটী (৪৫৬) সূত্রে সমাপ্ত। ইহার প্রথম অধ্যায়ে প্রধানতঃ চারিটী বিষয় আলোচিত ও নির্ণীত হইয়াছে ;—হেয় ও হেয়-হেতু, এবং হান ও হানোপায় (১)। তন্মধ্যে, হেয় অর্থ—ত্রিবিধ দুঃখ। হেয়হেতু অর্থ—প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক বা আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য-প্রতীতির অভাব। হান অর্থ—উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি। হানোপায়—বিবেক-জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে আত্মার (পুরুষের) পার্থক্যবোধ। এই চারিটী বিষয় লইয়াই প্রথম অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তাহার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথাক্রমে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন—প্রাকৃতিক সূক্ষ্ম কার্য্যপ্রপঞ্চ বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে, যথাক্রমে প্রাকৃতিক স্থূল কার্য্য ও সূক্ষ্ম শরীর নিরূপিত হইয়াছে এবং স্থূল শরীর নিরূপণের পর, পর ও অপর বৈরাগ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শাস্ত্রোপদিষ্ট কয়েকটী উত্তম

---

(১) ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু চিকিৎসাশাস্ত্রের ন্যায় সাংখ্যশাস্ত্রের বিষয়গুলিকেও চারিটী স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে যেরূপ রোগ, রোগের নিদান, আরোগ্য ও তাহার উপায় বর্ণিত আছে সাংখ্য-শাস্ত্রেও তদ্রূপ হেয়—দুঃখ, তন্নিদান—অবিবেক ; হান—দুঃখের ক্ষয়, ও তদুপায়—বিবেকজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে। চিকিৎসার ফল যেমন আরোগ্য, ঠিক সেইরূপ বিবেকজ্ঞানেরও ফল দুঃখহানিরূপ মুক্তি। প্রথমাধ্যায়ের ভাষ্যশেষে বিজ্ঞানভিক্ষু এই কথাই একটী শ্লোকে গ্রথিত করিয়াছেন—

"হেয়-হানে তয়োর্হেতূ ইতি ব্যূহা যথাক্রমম্।
চত্বারঃ শাস্ত্রমুখ্যার্থা অধ্যায়েঽস্মিন্ প্রপঞ্চিতাঃ ॥"

আখ্যায়িকা এবং তদনুসারে বিবেকজ্ঞানলাভের বিভিন্ন উপায় কথিত হইয়াছে। পঞ্চমাধ্যায়ে পরপক্ষ খণ্ডন, অর্থাৎ অপরাপর দার্শনিক কর্তৃক সাংখ্যসিদ্ধান্তের উপর উপস্থাপিত আপত্তির সমাধান, এবং তাহাদের সিদ্ধান্তের উপর দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে শাস্ত্রপ্রতিপাদিত প্রধান প্রধান বিষয়সমূহের উপসংহারচ্ছলে বিশদ ব্যাখ্যাপ্রদর্শিত হইয়াছে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ লইয়া সমগ্র ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যদর্শন সমাপ্ত হইয়াছে। এতদতিরিক্ত আর যাহা কিছু আছে, তাহাও এসমস্ত বিষয়েরই আনুষঙ্গিক—প্রসঙ্গাগতমাত্র।

মহামতি বিজ্ঞানভিক্ষু উক্ত ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যদর্শনের উপর একটা ভাষ্যব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। তিনি ভাষ্যমধ্যে অনেক নূতন তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মমীমাংসার সঙ্গে সাংখ্যশাস্ত্রের একটা আপোষ-মীমাংসা করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন।

অধিকন্তু, ভাষ্যভূমিকায় তিনি যে, আস্তিক ষড় দর্শনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সংস্থাপনের পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছে। তাহার সিদ্ধান্তানুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক দর্শনই এক একটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য লইয়া বিরচিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক দর্শনই সেই উদ্দেশ্য বিষয়ে তৎপর থাকিয়া নিজেদের প্রামাণ্য রক্ষা করিয়াছে। পরমত খণ্ডন বা বিষয়ান্তর বর্ণন, উহাদের প্রকৃত লক্ষ্যের বহির্ভূত—প্রাসঙ্গিকমাত্র। দার্শনিকগণের মধ্যে একমাত্র

বিজ্ঞানভিক্ষু ভিন্ন আর কেহই এরূপ উদার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসার নামে গদ্য-পদ্য-ময় আর একখানা ক্ষুদ্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে তিনি আপনার অভিমত সাংখ্যসিদ্ধান্তসমূহ সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সাংখ্যসারের প্রারম্ভে তিনি 'সাংখ্যকারিকা' রচনা করিয়াছেন, বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু সে গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে (১)। কাপিলসূত্র বলিয়া পরিচিত তত্ত্বসমাসনামক গ্রন্থের উপর বিজ্ঞানভিক্ষুর কোন ব্যাখ্যা নাই; পরন্তু মাধব-পরিব্রাজকনামক একজন সন্ন্যাসী উহার টীকা রচনা করিয়াছেন।

ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকার উপর মহামতি বাচস্পতিমিশ্র যে, টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম—সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। ইহা অতি উপাদেয় ও সারগর্ভ প্রামাণিক টীকা। ইহা ছাড়া গৌড়পাদাচার্য্যকৃত একখানা ভাষ্য ও সাংখ্যচন্দ্রিকানামে আর একখানা টীকাব্যাখ্যা আছে। সে সকল টীকা-ভাষ্য এখনও অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া থাকে। আমরা এস্থানে প্রধানতঃ প্রচলিত সাংখ্যদর্শন হইতেই প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিব।

[সাংখ্যদর্শন]

অপরাপর আস্তিক দর্শনের ন্যায় সাংখ্যদর্শনও দুঃখবাদে আরব্ধ এবং তদুচ্ছেদে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সূত্রকার প্রথম সূত্রেই সে কথা বলিয়া দিয়াছেন—

"ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।" ১।১।

---

(১) "সাংখ্যকারিকয়া লেশাদাত্মতত্ত্বং বিবেচিতম্।"

জগতে তিনপ্রকার দুঃখ লোকের অনুভূত হইয়া থাকে, এক আধ্যাত্মিক, দ্বিতীয় আধিভৌতিক ও তৃতীয় আধিদৈবিক। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি অবাহ্য পদার্থ হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি, তাহা আধ্যাত্মিক। শারীরিক ধাতুবৈষম্যে রোগ হয়, এবং মানসিক বিকার হইতেও কাম ক্রোধাদির আবির্ভাব হয়, ঐ উভয়-বিধ কারণ হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহা আধ্যাত্মিক দুঃখ। শারীরিক ও মানসিকভেদে আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার। উক্ত উভয় দুঃখই আভ্যন্তরীণ উপায়সাধ্য; আর আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই উভয় প্রকার দুঃখই বাহ্যোপায়জাত। তন্মধ্যে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও স্থাবরাদি ভূতবর্গ হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম আধিভৌতিক, আর যক্ষ, রাক্ষস ও বিনায়ক প্রভৃতি দেবতাবিশেষ হইতে যে সমস্ত দুঃখ আবির্ভূত হয়, সে সমুদয় আধিদৈবিক দুঃখ নামে অভিহিত হয়।

উল্লিখিত ত্রিবিধ দুঃখের সহিত সংস্পর্শ নাই, এরূপ লোক জগতে অতীব বিরল—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই উহার সঙ্গে নিত্য পরিচিত। নিত্য পরিচিত হইলেও, দুঃখ কাহারই প্রিয় নহে; অপ্রিয় বলিয়াই দুঃখ-পরিহারের জন্য সকলে সমভাবে যত্ন করিয়া থাকে। ফলকথা, দুঃখমাত্রই যে, অপ্রিয় ও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, এ বিষয়ে চেতনাবান্ কোন লোকেরই মতভেদ নাই; সুতরাং দুঃখনিবৃত্তি যে, সকল পুরুষেরই প্রার্থনীয়—পুরুষার্থ, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিয়ৎ পরিমাণে দুঃখশান্তি করে বলিয়াই ধর্ম্ম, অর্থ,

কামও পুরুষার্থ—পুরুষের প্রার্থনীয় হয় সত্য, কিন্তু উহারা পরম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ নহে; কারণ, ধর্ম্ম, অর্থ বা কাম দ্বারা যে, সুখসম্পদ্ লাভ করা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে দুঃখসম্বন্ধবর্জ্জিত নহে, এবং ঐ সকল উপায়ে যে, দুঃখনিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাও আত্যন্তিক (যেরূপ নিবৃত্তির পর আর দুঃখোদয় না হয়, সেরূপও) নহে; এইজন্য ঐ সকল উপায়কে পরমপুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না, মন্দপুরুষার্থ বলা যায় মাত্র (১)। বিজ্ঞজনেরা সেরূপ দুঃখনিবৃত্তিতে পরিতুষ্ট হন না। তাঁহারা চাহেন—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি; যেরূপ নিবৃত্তির পর আর কস্মিন্ কালেও দুঃখ-সংবন্ধ হইবে না, সেইরূপ দুঃখনিবৃত্তি। এই অভিপ্রায়েই সূত্রকার বলিতেছেন—

"ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিঃ অত্যন্তপুরুষার্থঃ।"

অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিমাত্রই অত্যন্ত পুরুষার্থ নহে, পরন্তু অত্যন্ত নিবৃত্তি; এবং সেই অত্যন্ত নিবৃত্তিরই অপর নাম মোক্ষ বা কৈবল্য। মোক্ষদশায় উপভোগযোগ্য কোনপ্রকার

---

(১) "প্রাত্যহিক ক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বম্।" (সাংখ্যদর্শন ১।৩।

"দৃষ্টসাধনজন্যায়াং দুঃখনিবৃত্তৌ অত্যন্ত-পুরুষার্থত্বমেব নাস্তি; যথা-কথঞ্চিৎ পুরুষার্থত্বং তু অস্ত্যেব" ইতি ভাষ্যম্।

অভিপ্রায় এই যে, লৌকিক উপায়ে যে, দুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহাতে কেবল অত্যন্ত পুরুষার্থত্বই নাই, কিন্তু যথাকথঞ্চিৎ নিকৃষ্ট পুরুষার্থ, তাহাতেও আছে; যেমন, প্রাত্যহিক ক্ষুধা নিবারণের জন্য ভোজন করা পুরুষার্থ, এখানেও তদ্রূপ সামান্য পুরুষার্থত্বমাত্র আছে, বুঝিতে হইবে।

আনন্দের সম্ভাবনা থাকে না। তবে, 'দুঃখাভাবঃ সুখম্'—দুঃখের অভাবই সুখ, এই মতানুসারে তাদৃশ দুঃখনিবৃত্তিকেই সুখ সংজ্ঞা প্রদান করিলে, কাহারও কোনও আপত্তির কারণ দেখা যায় না (১); সে যাহা হউক, তাদৃশ দুঃখনিবৃত্তির বা মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হইতেছে—বিবেকজ্ঞান (আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য বোধ); সুতরাং বিবেকজ্ঞানই মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রধান ও প্রথম লক্ষ্যস্থল। স্বয়ং শ্রুতিও বলিতেছেন—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪।৫।৬)

আত্মাকে দর্শন করিবে—প্রকৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া জানিবে; এবং তদ্বিষয়ে প্রথমে শ্রবণ করিবে; পরে মনন করিবে, শেষে নিদিধ্যাসন করিবে, অর্থাৎ যোগশাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে ধ্যান

---

(১) সাংখ্যশাস্ত্রে আত্মার সৎ-চিৎস্বরূপমাত্র স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু আনন্দ রূপ স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যমতে মোক্ষের অপর নাম কৈবল্য। কৈবল্য অর্থ আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি। সৎ ও চিৎই আত্মার স্বরূপ, আনন্দ নহে; সুতরাং কৈবল্যদশায় আত্মাতে কোন প্রকার আনন্দ সম্বন্ধ থাকে না এবং থাকিতেও পারে না; অথচ কোন কোন প্রামাণিক গ্রন্থে মুক্ত আত্মাতেও আনন্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; এই অসামঞ্জস্য নিবারণার্থ সাংখ্যসম্প্রদায় দুঃখাভাবকেই তৎকালীন সুখ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং তাহা দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত বিরোধেরও মীমাংসা করিয়া থাকেন। মোক্ষাবস্থায় জীবের যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অভাব ঘটে, সেই দুঃখাভাবকেই অপরাপর দার্শনিকগণ সুখ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, ইহাই সাংখ্যাচার্য্যগণের অভিপ্রায়।

করিবে। এখানে আত্মদর্শনের জন্য তিনটী উপায় বিহিত হইয়াছে—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ; সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার (বিবেকজ্ঞান) হইতেছে—লক্ষ্য বা ফল ; আর শ্রবণাদিত্রয় হইতেছে তাহারই উপায়। শাস্ত্রান্তরে শ্রবণাদির পরিচয়প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,—

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥"

প্রথমে শ্রুতি বাক্য হইতে আত্মার স্বরূপাদি বিষয় শ্রবণ করিবে ; শ্রবণের পর, শ্রুতার্থবিষয়ে যে সমুদয় শঙ্কা মনোমধ্যে সমুদিত হয়, তন্নিরাসার্থ শাস্ত্রসম্মত নিয়মানুসারে বিচার করিবে ; বিচার দ্বারা শ্রুতার্থের শঙ্কা তিরোহিত হইলে পর, যোগশাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে সেই অসন্দিগ্ধ বিষয়ে নিরন্তর ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যানের পরিণামে আত্ম-বিষয়ে বিবেকজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। অতএব সাক্ষাৎ ও পরম্পরাক্রমে উক্ত তিনপ্রকার কার্য্যের (শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের) যথাযথভাবে অনুষ্ঠানই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রকৃত উপায়। আলোচ্য সাংখ্যশাস্ত্র সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবেক-জ্ঞান ও তদুপযোগী বিচারপ্রণালী (মননের ক্রম) উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য এই আয়োজন করিয়াছেন।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, দুঃখনিবৃত্তির পক্ষে বিবেকজ্ঞান যেমন একটা উপায়, তেমনই আরও বহুবিধ সহজ উপায় জগতে সুপ্রসিদ্ধ আছে ও থাকিতে পারে। দুঃখনিবৃত্তিরূপ ফল যখন

উভয়েরই তুল্য, তখন স্বল্পকালব্যাপী সহজ-সাধ্য সেই সমুদয় লোকপ্রসিদ্ধ উপায় উপেক্ষা করিয়া, কোন বুদ্ধিমান্ লোক জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী আয়াসবহুল কঠোর-সাধনাসাধ্য সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত বিবেকজ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবে? (১)। লোকে বলে—

"অক্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ"॥

অর্থাৎ ঘরের কোণে যদি মধু মিলে, তবে আর মধুর জন্য পর্ব্বতে কে যায়? বস্তুতও এমন সহজসাধ্য লৌকিক উপায় বিদ্যমান থাকিতে ক্লেশবহুল উক্ত অলৌকিক উপায়ান্বেষণে উন্মত্ত ভিন্ন কাহারও প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। অতএব দুঃখনিবৃত্তির জন্য বিবেক-জ্ঞানোপদেশ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও অনুপযোগী। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

"ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিঃ, নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ"॥ ১।২॥

উপরে যে সমুদয় উপায়ের উল্লেখ করা হইল, এবং তদ্ভিন্ন আরও

---

(১) লোকপ্রসিদ্ধ উপায়ের মধ্যে—চিকিৎসাশাস্ত্রোপদিষ্ট ঔষধাদির দ্বারা ব্যাধিজ শারীরিক দুঃখের প্রতিকার হইতে পারে; মনোজ্ঞ বস্তুর উপভোগে ও প্রিয় বস্তুর লাভে মানসিক দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে; নীতি শাস্ত্রপ্রদর্শিত পথ অবলম্বনে আধিভৌতিক দুঃখের উপশম করিতে পারা যায়, এবং মণি-মন্ত্র-মহৌষধ প্রভৃতির ব্যবহারে আধিদৈবিক দুঃখেরও উচ্ছেদ সাধন করিতে পারা যায়। অথচ এ সমস্ত উপায়ই বিবেক-জ্ঞান অপেক্ষা অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসে আয়ত্ত হইয়া থাকে। অতএব লোকে এই সমুদয় সহজলভ্য উপায় পরিত্যাগ করিয়া কখনই বহুক্লেশসাধ্য বিবেকজ্ঞানের অনুসন্ধানে সাংখ্যশাস্ত্রের আশ্রয় লইবে না; কাজেই শাস্ত্রারম্ভ নিষ্প্রয়োজন ও অনাবশ্যক মনে হইতেছে।

যে সমুদয় উপায় লোকপ্রসিদ্ধ আছে, সে সমুদয় উপায়ে সাময়িক-ভাবে আংশিক দুঃখপ্রতিকার সম্ভবপর হইলেও, বিবেকী জনেরা যে প্রকার দুঃখ-প্রতিকারের জন্য ব্যাকুল হন, ঐ সমুদয় উপায় হইতে সেরূপ প্রতিকার লাভ কখনও সম্ভবপর হয় না ; কারণ, তাঁহারা চাহেন দুঃখের আমূলত উচ্ছেদ, এবং অনুসন্ধান করেন তাহার অমোঘ উপায়। অভিপ্রায় এই যে, যেরূপ উপায়ের প্রয়োগ কখনও বিফল হয় না, এবং যেরূপ নিবৃত্তির পর আর কখনও কোনপ্রকার দুঃখসম্বন্ধের সম্ভাবনা থাকে না, সেই প্রকার দুঃখনিবৃত্তির জন্য সেইপ্রকার উপায়ের অন্বেষণ কার্য্যেই বিবেকী লোকের স্বাভাবিক আগ্রহ হইয়া থাকে। লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত উপায়ই তাঁহাদের অভিপ্রায়ের প্রতিকূল ; কারণ, লোকপ্রসিদ্ধ কোন উপায়ই অব্যর্থ নহে ; এবং তাহার ফলও চিরস্থায়ী নহে। কুইনাইন্ জ্বরনিবৃত্তির উপায় বা ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ ; কিন্তু বহুক্ষেত্রে কুইনাইন্ সেবনেও জ্বরের নিবৃত্তি হয় না, এবং নিবৃত্তি হইলেও চিরদিনের জন্য হয় না ; একই রোগের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব বহুস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় ; কাজেই বুদ্ধিমান্ লোক কখনই এই প্রকার সাময়িক শান্তির জন্য ঐ জাতীয় অনিশ্চিত উপায় অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট বা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ঐ জাতীয় দুঃখ-প্রতিকার অজ্ঞ জনের প্রীতিকর ও প্রার্থনীয় হইলেও, বিজ্ঞজনেরা উহাকে 'মন্দ পুরুষার্থ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কেবল যে, লৌকিক উপায়েই তাদৃশ দুঃখপ্রতিকার সম্ভব হয়

না, তাহা নহে, বেদবিহিত অলৌকিক যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মও তাদৃশ দুঃখ প্রতিকারের প্রকৃষ্ট উপায় নহে। সূত্রকার বলিতেছেন—

"অবিশেষশ্চোভয়োঃ" ॥ ১৬॥

অর্থাৎ লৌকিক উপায়ে যেমন সুনিশ্চিতরূপে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না, বেদবিহিত কর্ম্মরূপ অলৌকিক উপায়েও তেমনই আত্যন্তিক দুঃখপ্রতিকার হয় না, বা হইতে পারে না। ঐ সকল উপায়ও লৌকিক উপায়েরই মত অনিশ্চিত ও আত্যন্তিক দুঃখনিবারণের অনুপায়। বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা সাময়িকভাবে দুঃখনিবৃত্তি ও আনন্দ লাভ হয় সত্য, কিন্তু সে আনন্দের ও দুঃখনিবৃত্তির নিশ্চয়ই অবসান আছে।

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

(ভগবদ্গীতা—৯।২১)

'কর্ম্মফলে যাহারা স্বর্গগত হন, তাঁহারা বিশাল স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ের পর পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন'। প্রভূত স্বর্গসুখ সম্ভোগের পর স্বর্গভ্রষ্ট সেই সকল কর্ম্মী-লোকের মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশে যে অপরিসীম দুঃখ-যাতনা উপস্থিত হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ আরও স্পষ্ট কথায় সকাম কর্ম্মমার্গের হেয়তা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধি-ক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।"

'দৃষ্ট' অর্থ—পূর্ব্বকথিত লৌকিক উপায়সমূহ। আনুশ্রবিক

যে সমুদয় উপায় লোকপ্রসিদ্ধ আছে, সে সমুদয় উপায়ে সাময়িক-ভাবে আংশিক দুঃখপ্রতিকার সম্ভবপর হইলেও, বিবেকী জনেরা যে প্রকার দুঃখ-প্রতিকারের জন্য ব্যাকুল হন, ঐ সমুদয় উপায় হইতে সেরূপ প্রতিকার লাভ কখনও সম্ভবপর হয় না; কারণ, তাঁহারা চাহেন দুঃখের আমূলত উচ্ছেদ, এবং অনুসন্ধান করেন তাহার অমোঘ উপায়। অভিপ্রায় এই যে, যেরূপ উপায়ের প্রয়োগ কখনও বিফল হয় না, এবং যেরূপ নিবৃত্তির পর আর কখনও কোনপ্রকার দুঃখসম্বন্ধের সম্ভাবনা থাকে না, সেই প্রকার দুঃখনিবৃত্তির জন্য সেইপ্রকার উপায়ের অন্বেষণ কার্য্যেই বিবেকী লোকের স্বাভাবিক আগ্রহ হইয়া থাকে। লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত উপায়ই তাঁহাদের অভিপ্রায়ের প্রতিকূল; কারণ, লোকপ্রসিদ্ধ কোন উপায়ই অব্যর্থ নহে; এবং তাহার ফলও চিরস্থায়ী নহে। কুইনাইন্ জ্বরনিবৃত্তির উপায় বা ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু বহুক্ষেত্রে কুইনাইন্ সেবনেও জ্বরের নিবৃত্তি হয় না, এবং নিবৃত্তি হইলেও চিরদিনের জন্য হয় না; একই রোগের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব বহুস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়; কাজেই বুদ্ধিমান্ লোক কখনই এই প্রকার সাময়িক শান্তির জন্য ঐ জাতীয় অনিশ্চিত উপায় অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট বা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ঐ জাতীয় দুঃখ-প্রতিকার অজ্ঞ জনের প্রীতিকর ও প্রার্থনীয় হইলেও, বিজ্ঞজনেরা উহাকে 'মন্দ পুরুষার্থ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কেবল যে, লৌকিক উপায়েই তাদৃশ দুঃখপ্রতিকার সম্ভব হয়

না, তাহা নহে, বেদবিহিত অলৌকিক যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মও তাদৃশ দুঃখ প্রতিকারের প্রকৃষ্ট উপায় নহে। সূত্রকার বলিতেছেন—

"অবিশেষশ্চোভয়োঃ" ॥ ১৬॥

অর্থাৎ লৌকিক উপায়ে যেমন সুনিশ্চিতরূপে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না, বেদবিহিত কর্ম্মরূপ অলৌকিক উপায়েও তেমনই আত্যন্তিক দুঃখপ্রতিকার হয় না, বা হইতে পারে না। ঐ সকল উপায়ও লৌকিক উপায়েরই মত অনিশ্চিত ও আত্যন্তিক দুঃখনিবারণের অনুপায়। বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা সাময়িকভাবে দুঃখনিবৃত্তি ও আনন্দ লাভ হয় সত্য, কিন্তু সে আনন্দের ও দুঃখনিবৃত্তির নিশ্চয়ই অবসান আছে।

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"
(ভগবদ্গীতা—৯।২১)

'কর্ম্মফলে যাহারা স্বর্গগত হন, তাঁহারা বিশাল স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ের পর পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন'। প্রভূত স্বর্গসুখ সম্ভোগের পর স্বর্গভ্রষ্ট সেই সকল কর্ম্মী-লোকের মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশে যে অপরিসীম দুঃখ-যাতনা উপস্থিত হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ আরও স্পষ্ট কথায় সকাম কর্ম্মমার্গের হেয়তা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধি-ক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।"

'দৃষ্ট' অর্থ—পূর্ব্বকথিত লৌকিক উপায়সমূহ। আনুশ্রবিক

অর্থ—বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম (১)। এই আনুশ্রবিক কর্ম্মরাশিও ঠিক দৃষ্ট উপায়েরই অনুরূপ,—দৃষ্ট উপায়ের ন্যায় বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারাও সর্ব্বত্র দুঃখনিবৃত্তি হয় না, এবং হইলেও তাহা আত্যন্তিক বা চিরদিনের জন্য হয় না,—কেবল সাময়িকভাবে নিবৃত্তি হয় মাত্র। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি না হইবার কারণ তিনটী—অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয়।—বেদোক্ত কর্ম্মমাত্রই হিংসাসাপেক্ষ ;—এমন কোন কর্ম্মানুষ্ঠানই নাই, যাহাতে পশু বা বীজাদির হিংসা-সম্পর্ক না আছে ; এবং এমন কোন হিংসাই নাই, যাহা দ্বারা অল্পাধিক পরিমাণে পাপের উদ্ভব না হয় (২)। আবার এমন কোন পাপই নাই, যাহা হইতে কোন প্রকার দুঃখ-যাতনা জন্মে না। এই জন্য বেদবিহিত কর্ম্মকে অবিশুদ্ধ বলা হইয়াছে।

---

(১) "গুরুপাঠাৎ অনুশ্রূয়তে ইতি অনুশ্রবঃ—বেদঃ, শ্রূয়তে এব পরং, ন কেনচিৎ ক্রিয়তে। তত্র ভবঃ—প্রাপ্তঃ – জ্ঞাত ইতি যাবৎ।"

(সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ২)

গুরুমুখে উচ্চারণের পর শ্রুত হয় বলিয়া বেদের নাম অনুশ্রব। সেই বেদে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাই আনুশ্রবিক ; এইরূপ যোগার্থানুসারে বেদোক্ত কর্ম্মরাশিকে আনুশ্রবিক বলা হইয়া থাকে।

(২) সাংখ্যাচার্য্যগণ বৈধ হিংসায়ও পাপোৎপত্তি স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, হিংসামাত্রই পাপজনক। সে হিংসা বৈধই হউক, আর অবৈধই হউক ; কোন হিংসাই অপাপকর হয় না। তবে, বৈধহিংসায় পাপের ভাগ অল্প, আর অবৈধ হিংসায় পাপের ভাগ অধিক, এই মাত্র বিশেষ।

তাহার পর, ঐ সকল কর্ম্মের ফল ক্ষয় ও অতিশয় এই দ্বিবিধ দোষে দুষ্ট। কর্ম্মের ফল যে, ক্ষয়শীল, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; ইহা ছাড়া কর্ম্মফলের যথেষ্ট তারতম্যও আছে;—ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম হইতে বিভিন্নপ্রকার যে সমুদয় ফল উৎপন্ন হয়, সেগুলি স্বভাবতই তারতম্যযুক্ত। সকল কর্ম্মের ফল একই রকম হয় না; আবার একই কর্ম্ম অনুষ্ঠানের দোষগুণে সময়ে বিচিত্র ফল প্রসব করিয়া থাকে। অতএব অনুষ্ঠিত কর্ম্মে পাপ-সম্বন্ধ থাকায় যেমন দুঃখের সম্ভাবনা, তেমনই কর্ম্মফলের তারতম্য নিবন্ধনও অনুষ্ঠাতৃগণের দুঃখ-সম্ভাবনা সমধিক আছে। মহামতি বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—

"পরসম্পদুৎকর্ষো হীনসম্পদং পুরুষং দুঃখাকরোতি।"
(সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।)

অর্থাৎ পরের অধিক সম্পদ্ দর্শনে তদপেক্ষা অল্পসম্পদ্‌যুক্ত লোকের হৃদয়ে স্বতই দুঃখের সঞ্চার হইয়া থাকে। কাজেই বলিতে হয়—কর্ম্ম দ্বারা অপর দুঃখের নিবৃত্তি করা দূরে থাকুক, কর্ম্ম নিজেও নূতন নূতন দুঃখের সমুৎপাদন করিয়া অনুষ্ঠাতৃগণের ভীষণ অশান্তিকর হইয়া থাকে। অতএব কোন বুদ্ধিমান্ লোকই আপাত-মধুর লৌকিক বা বৈদিক উপায়ের উপর নির্ভর করিয়া দুঃখ-শান্তি বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এই জন্য বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে আত্যন্তিক দুঃখ-প্রশমনের জন্য অমোঘ অলৌকিক উপায়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

রোগের নিদান-নির্ণয় ব্যতিরেকে যেমন উপযুক্ত চিকিৎসা বা

প্রতীকারোপায় স্থির করা যায় না, ঠিক তেমনই দুঃখের মূল কারণ নির্দ্ধারণ না হইলে, তৎপ্রতীকারের প্রকৃত উপায়ও অবধারণ করা সম্ভবপর হয় না; এই জন্য দুঃখ-প্রহাণেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বাদৌ দুঃখ, দুঃখ-কারণ, এবং দুঃখের সহিত আত্মার যোগ ও বিয়োগ (বন্ধ ও মোক্ষ), ইত্যাদি বিষয়গুলির বিশেষভাবে বিচার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যথারীতি বিচারই এই বিষম কণ্টকময় মুক্তি পথে উজ্জ্বল আলোক প্রদান করিয়া থাকে (১)।

দুঃখের নিদান-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমেই আত্মার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জানিতে ইচ্ছা হয়, আত্মার যে, বিবিধ দুঃখ-ভোগ, যাহার অপর নাম বন্ধ; সেই বন্ধ কি তাহার বাস্তবিক, না অবাস্তবিক (কাল্পনিক)। যদি বাস্তবিক হয়, তাহা হইলে যুগ-যুগান্তরব্যাপী সহস্র চেষ্টায়ও তাহার ধ্বংস-সাধন করা সম্ভবপর হইবে না; কারণ, বস্তু কখনই স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকে না। পক্ষান্তরে, স্বভাব-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রয় বস্তুর ধ্বংসও

---

(১) চিকিৎসাশাস্ত্রে দুই প্রকার চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট আছে—এক রোগ-প্রত্যনীক, অপর হেতুপ্রত্যনীক। যে চিকিৎসায় রোগের উপস্থিত যাতনা মাত্র নিবারিত হয়, কিন্তু যাতনার ভবিষ্যৎসম্ভাবনা বিদূরিত হয় না, তাহাকে বলে—রোগপ্রত্যনীক চিকিৎসা; আর যে চিকিৎসায় রোগের মূল কারণ পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তাহার নাম—হেতুপ্রত্যনীক চিকিৎসা। বুদ্ধিমান্ লোকেরা যেমন রোগ-প্রশমনের জন্য হেতুপ্রত্যনীক চিকিৎসাই চাহেন, বিবেকী লোকেরাও তেমনই দুঃখ প্রতীকারের জন্য উহার মূলোচ্ছেদকর উপায়েরই অন্বেষণ করেন; কিন্তু দুঃখের মূল-নির্ণয় ব্যতিরেকে তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না।

অবশ্যম্ভাবী। অগ্নি কখনও নিজের স্বাভাবিক উষ্ণতা ও প্রকাশ গুণ পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকে না। অতএব. দুঃখসম্বন্ধরূপ বন্ধও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ হইলে, তন্নিবারণার্থ মোক্ষ ও তদুপায় নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ অনর্থক বাতুলোক্তিতে পরিণত হইত। এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিয়াছেন—

"ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষ-সাধনোপদেশ-বিধিঃ॥" ১।৭॥

"নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ॥" ১।৮॥

অভিপ্রায় এইযে, আত্মার দুঃখভোগরূপ বন্ধন স্বভাবসিদ্ধ হইলে তদুচ্ছেদের (মোক্ষের) জন্য শাস্ত্রে যে সমস্ত সাধনের উপদেশ আছে, সে সমুদয়ের অনুষ্ঠান করা কখনও সম্ভবপর হইতে পারিত না। বিশেষতঃ অসাধ্য বিষয়ের উপদেশই হইতে পারে না; যদি কোথাও সেরূপ উপদেশের ছায়া দৃষ্ট হয়, বুঝিতে হইবে যে, উহা প্রকৃত কর্ত্তব্যোপদেশ নহে; উহা উপদেশের মত কথা মাত্র। এইরূপ দেশ, কাল. ক্রিয়া বা অবস্থা-বিশেষ-নিবন্ধনও নিত্য, সর্ব্বব্যাপী ও অসঙ্গ আত্মার পক্ষে বন্ধন সম্ভবপর হয় না; কারণ, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী সকল আত্মার সহিত যখন তুল্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন একের বন্ধন ও অপরের মুক্তি, এইরূপ বৈষম্য না হইয়া সকল আত্মারই একভাবে থাকা উচিত হইত, এবং ক্রিয়া ও অবস্থাভেদ যখন দেহাশ্রিত ধর্ম্ম, তখন তদুভয়ের দ্বারাও অসঙ্গ—দেহাদির সহিত অসংস্পৃষ্ট আত্মার দুঃখযোগরূপ বন্ধনদশা কখনই সম্ভবপর হইতে পারিত না (১)।

---

(১) তাৎপর্য্য—প্রত্যেক আত্মাই যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন যেরূপ স্থানের

নিম্নলিখিত চারিটী সূত্রে উপরি উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে—

"ন কালযোগতঃ, ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ ॥" ১।১২।

"ন দেশযোগতোঽপ্যস্মাৎ ॥" ১।১৩ ॥

"নাবস্থাতো দেহ-ধর্ম্মত্বাৎ তস্যাঃ ॥" ১ ১৪ ॥

"ন কর্ম্মণা, অন্যধর্ম্মত্বাৎ অতিপ্রসক্তেশ্চ ॥" ১।১৬।

বন্ধন অসম্ভব হইলে তন্নিবৃত্তির (মুক্তির) জন্য উপযুক্ত উপায়ান্বেষণে কাহারই প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, জগতে প্রত্যেক জীবই দুঃসহ দুঃখ জ্বালায় কাতর হইয়া নিরন্তর তদুচ্ছেদের উপায়ান্বেষণে বিব্রত রহিয়াছে, অতএব জীবের দুঃখসম্বন্ধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কেবল অচেতন প্রকৃতির উপরেও আত্মাকে বাঁধিবার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না; কারণ, প্রকৃতি নিজে পরতন্ত্র,—সংযোগের সাহায্য ব্যতীত সে আত্মার বন্ধন সম্পাদন করিতে পারে না। অগ্রে আত্মার (পুরুষের) সহিত প্রকৃতির সংযোগ হইলে, পরে সেই প্রকৃতি দ্বারা আত্মার বন্ধন

সহিত সম্বন্ধ বশতঃ এক আত্মার বন্ধন হইবে, সেইরূপ স্থানের সহিত তুল্য সম্বন্ধ থাকায় অপরাপর আত্মারও নিশ্চয়ই বন্ধন ঘটিবে; সুতরাং মুক্ত আত্মারও পুনরায় বন্ধ ঘটিতে পারে। তাহার পর, কর্ম্ম ও অবস্থা, উভয়ই দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম; অসঙ্গ আত্মাতে উহাদের অস্তিত্ব নাই; সুতরাং কর্ম্ম বা অবস্থা দ্বারাও আত্মার বন্ধন সম্ভব হয় না। অপরের ধর্ম্মদ্বারা অপরের বন্ধন স্বীকার করিলে মুক্ত আত্মারও বন্ধন হইতে পারে, তাহা ত কাহারই অভিপ্রেত নহে।

ঘটিতে পারে ; সুতরাং আত্ম-বন্ধনের জন্য বাধ্য হইয়া প্রকৃতিকে সংযোগের অধীনতা স্বীকার করিতে হয় (১)।

সংযোগের সহায়তা ব্যতীত কেবল প্রকৃতি দ্বারাও যখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মার বন্ধন (দুঃখযোগ) সম্ভবপর হয় না ; তখন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে,—

"ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্‌যোগস্তদ্‌যোগাদৃতে॥" ১।১৯॥

আত্মা যখন নিত্য শুদ্ধ, জ্ঞান ও মুক্তস্বভাব (২); তখন প্রকৃতির সহিত সংযোগ ব্যতীত কখনই তাহার দুঃখ-যোগরূপ বন্ধন-সম্বন্ধ হইতেই পারে না ; অতএব প্রকৃতির সহিত আত্মার যে, এক প্রকার বিজাতীয় সংযোগ, তাহা হইতেই আত্মার বন্ধন বা দুঃখ-সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে (২) ; সুতরাং আত্মার দুঃখ-

---

(১) "প্রকৃতিনিবন্ধনাৎ চেৎ, ন, তস্যা অপি পারতন্ত্র্যম্" ॥ ১।১৮॥

অর্থাৎ প্রকৃতিও যখন সংযোগ ব্যতীত বন্ধন ঘটাইতে অক্ষম—পরতন্ত্র, তখন সাক্ষাৎ প্রকৃতিকেও বন্ধনের কারণ বলিতে পারা যায় না।

(২) নিত্য অর্থ—যাহা কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। নিত্যশুদ্ধ অর্থ—সর্ব্বদা পাপপুণ্যবর্জ্জিত। নিত্যবুদ্ধ অর্থ—যাহার জ্ঞান-প্রকাশ কখনও বিলুপ্ত হয় না। নিত্যমুক্ত অর্থ—যাহা কখনও বাস্তব দুঃখে সংযুক্ত নহে। আত্মা চিরকালই উক্ত প্রকার স্বভাবসম্পন্ন।

(৩) এস্থলে সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনঃ চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥" (সাংখ্যকারিকা ২০)

অর্থাৎ পুরুষের সংযোগ লাভ করিয়া অচেতন বুদ্ধি (লিঙ্গ) চেতনের ন্যায় হয়, আবার প্রকৃতির সংযোগলাভ করিয়া প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম কর্তৃত্ব প্রভৃতি দ্বারা উদাসীন—নিষ্ক্রিয় পুরুষও (আত্মাও) জ্ঞাতা ও কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হয়।

সম্বন্ধরূপ বন্ধ বাস্তবিক নহে, ঔপাধিক—আগন্তুক। বলা আবশ্যক যে, অগ্নি-সংযোগে যেরূপ জলে উষ্ণতার উৎপত্তি হয়, কিংবা সৌরভসংযোগে বায়ুমণ্ডলে যেরূপ গন্ধের আবির্ভাব হয়, আত্মার দুঃখ-সংযোগ সেরূপ নহে ; পরন্তু রক্ত পুষ্পের সন্নিধানে অবস্থিত শুভ্র স্ফটিকে যেরূপ লৌহিত্যের প্রতিবিম্বন হয়, ঠিক সেইরূপ অন্তঃকরণস্থিত দুঃখেরই আত্মাতে প্রতিবিম্বন হয় মাত্র ; বস্তুতঃ সেই দুঃখ দ্বারা আত্মার স্বরূপতঃ কোনপ্রকার বিকার বা বিপর্য্যয় ঘটে না। এই অভিপ্রায়ে সৌরপুরাণ বলিয়াছেন—

"যথা হি কেবলো রক্তঃ স্ফটিকো লক্ষ্যতে জনৈঃ।
রঞ্জকাদ্যুপধানেন তদ্বৎ পরমপুরুষঃ ॥"

কেবল—বিশুদ্ধ স্ফটিক যেমন রঞ্জক জবাকুসুমাদি বস্তুর সহযোগে রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত সংযোগে স্বভাব-শুদ্ধ পুরুষও বুদ্ধিগত সুখ-দুঃখাদিযুক্ত বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে (১)।

উল্লিখিত আলোচনার ফলে প্রমাণিত হয় যে, আত্মা স্বভাবতই শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব ; স্বরূপতঃ তাহাতে সুখ-দুঃখাদির সম্পর্কমাত্রও নাই ; কেবল বুদ্ধির সহিত সংযোগের

(১) এখানে জানা আবশ্যক যে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত পুরুষের যে, নিয়ত সম্বন্ধ আছে, তাহা ধরিয়া এই সংযোগ-ব্যবহার হয় না ; পরন্তু প্রকৃতির পরিণামভূত বুদ্ধিতত্ত্বের সহিত যে, পুরুষের বিজাতীয় সংযোগ ঘটে, তাহাতেই পুরুষের সুখ-দুঃখাদি প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে ; এই জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই বুদ্ধির সহিত পুরুষের যে, সংযোগ, সেই সংযোগকে লক্ষ্য করিয়াই 'প্রকৃতি-পুরুষসংযোগ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দরুণ, দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ববৎ তাহাতেও বুদ্ধি ও বুদ্ধিধর্ম্ম দুঃখ-প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অজ্ঞানান্ধ জীব সেই সমুদয় বুদ্ধিধর্ম্মকেই আত্মাতে প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশমান দর্শন করিয়া অবিবেক বশে (আত্মা ও অনাত্মার বিবেক বা বিভেদ করিতে না পারিয়া) সেই অনাত্মধর্ম্মকেই আত্মধর্ম্ম বলিয়া মনে করে ; এবং তাহার ফলে শোকমোহে অভিভূত হইয়া থাকে। অতএব সুখ-দুঃখাদি-বিহীন আত্মাকে যে, সুখ-দুঃখাদিযুক্ত বলিয়া মনে করা, তাহা ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সেই ভ্রান্তির মূল হইতেছে—অবিবেক, আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য-বোধের অভাব। এই অবিবেকই বুদ্ধি-পুরুষসংযোগের মূল কারণ ; একথা পরবর্ত্তী—

"তদ্‌যোগোঽপ্যবিবেকাৎ" (১।৫৫)

সূত্রে স্বয়ং সূত্রকারই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন (১)।

---

(১) তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা চেতন ও নিত্যশুদ্ধ, আর বুদ্ধি প্রাকৃতিক জড় পদার্থ। প্রাক্তন অদৃষ্টের প্রেরণায় বুদ্ধির সহিত আত্মার সংযোগ ঘটে। তাহার পর, বুদ্ধিগত ধর্ম্মসমূহ সন্নিহিত আত্মায় প্রতিবিম্বিত হয়। তখন চেতনের সান্নিধ্য বশতঃ অচেতন বুদ্ধিও চেতনের মত প্রতীত হয়। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন—আত্মাতে যেমন বুদ্ধির প্রতিবিম্ব পড়ে, বুদ্ধিতেও তেমনই আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে। এইরূপ পরস্পর প্রতিবিম্বপাতের ফলে উভয়েই উভয়াকারে প্রতিভাসমান হয়। সেই কারণে তখন উভয়ের প্রভেদ সহজে বুদ্ধিগম্য হয় না ; পরস্পরেতে পরস্পরের অভেদ-ভ্রম উপস্থিত হয়। জন্মান্তরার্জ্জিত এই অভেদভ্রম বা অবিবেক হইতেই আত্মার সঙ্গে সংস্কারসহিত বুদ্ধির বারংবার সংযোগ ঘটিয়া থাকে।

সুনিশ্চিত ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ; পক্ষান্তরে, জগতে আলোক ভিন্ন এমন কোন বস্তু নাই, যাহা দ্বারা অন্ধকারের সমুচ্ছেদ করা যাইতে পারে; অতএব আলোকই অন্ধকার উচ্ছেদের নিয়ত কারণ। অন্ধকার নিরসনে আলোক যেমন নিয়ত কারণ, অজ্ঞানের বা অবিবেকের নিরসনে জ্ঞানও তেমনই নিয়ত কারণ; জ্ঞান ব্যতীত সহস্র চেষ্টায়ও অজ্ঞানের অপনয়ন করা সম্ভবপর হয় না; হয় না বলিয়াই উহা অজ্ঞান-নিরসনের নিয়ত কারণ। এই জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—অজ্ঞাননাশের নিয়ত কারণ—বিবেক-জ্ঞানের সাহায্যেই সর্ব্বানর্থের নিদানভূত অবিবেকের উচ্ছেদ হইতে পারে; অতএব যাঁহারা দুঃখময় সংসার-বন্ধনের আত্যন্তিক উচ্ছেদ করিতে অভিলাষী—মুমুক্ষু, তাঁহারা অগ্রে দুঃখ-নিদান সেই অবিবেক-ধ্বংসের জন্য বিবেক-জ্ঞানোপযোগী উপায়-লাভে যত্নপর হইবেন (১)।

এখানে জানা আবশ্যক যে, আমাদের জ্ঞান ও অজ্ঞান (ভ্রম), উভয়ই দুইশ্রেণীতে বিভক্ত—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ হইতে কিংবা যুক্তিতর্কাদিসমন্বিত অনুমানের সাহায্যে, অথবা তাদৃশ অন্য কোন উপায়ে আমাদের যে সমুদয় জ্ঞান বা অজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে সমুদয় জ্ঞান ও অজ্ঞান পরোক্ষশ্রেণীভুক্ত; আর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে যে সমুদয় জ্ঞান বা অজ্ঞানের

(১) চিত্ত নির্ম্মল না হইলে বিবেক জ্ঞান জন্মে না; এই জন্য চিত্তশুদ্ধির অনুকূল যে সমুদয় উপায়—নিষ্কাম কর্ম্ম প্রভৃতি বিহিত আছে, মুমুক্ষু ব্যক্তির সর্ব্বদা সেই সমুদয় উপায়ের অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক।

অবিবেকই যে; জীবের দুঃখ-নিদান, এ বিষয়ে গোতম, পতঞ্জলি প্রভৃতি দার্শনিকগণও একবাক্যে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। গোতম মিথ্যাজ্ঞানকে দুঃখ-যোগের নিদান বলিয়াছেন; আর পতঞ্জলি অবিদ্যাকে বুদ্ধিসংযোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। অবিদ্যা ও মিথ্যাজ্ঞান উক্ত অবিবেকেরই নামান্তর মাত্র।

অতঃপর চিন্তনীয় বিষয় হইতেছে এই যে, উক্ত অবিবেক নিবারণের উপায় কি? এমন অব্যর্থ উপায় কি আছে, যাহা দ্বারা সর্ব্বানর্থের নিদান এই অবিবেক-বীজ সমূলে উন্মূলিত করিতে পারা যায়? তদুত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—

"নিয়ত-কারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ ॥" ১।৫৬॥

অভিপ্রায় এই যে, কার্য্যমাত্রই কারণ-সাপেক্ষ; কারণ কিন্তু সেরূপ নহে—সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ (নিয়ত ও অনিয়ত) দুই প্রকারই হইতে পারে। কার্য্যবিশেষের জন্য কতকগুলি কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং সে সকল কারণ সন্নিহিত থাকিলে তদনুরূপ কার্য্যোৎপত্তিও অনিবার্য্য হইয়া থাকে। সেই সমুদয় কারণকে নিয়ত কারণ বলা হয়। অন্ধকার নিরসনের পক্ষে আলোক হইতেছে নিয়ত কারণ; কেন না, অন্ধকার অপনয়নের জন্য আলোক ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, এবং আলোক-সান্নিধানে অন্ধকারের বিনাশও

---

(১) গোতম বলিয়াছেন—"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ ॥" ন্যায়দর্শন ১।১।২।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"তস্য হেতুরবিদ্যা ॥" পাতঞ্জলদর্শন। ২।২৪।

সুনিশ্চিত ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; পক্ষান্তরে, জগতে আলোক ভিন্ন এমন কোন বস্তু নাই, যাহা দ্বারা অন্ধকারের সমুচ্ছেদ করা যাইতে পারে ; অতএব আলোকই অন্ধকার উচ্ছেদের নিয়ত কারণ। অন্ধকার নিরসনে আলোক যেমন নিয়ত কারণ, অজ্ঞানের বা অবিবেকের নিরসনে জ্ঞানও তেমনই নিয়ত কারণ ; জ্ঞান ব্যতীত সহস্র চেষ্টায়ও অজ্ঞানের অপনয়ন করা সম্ভবপর হয় না ; হয় না বলিয়াই উহা অজ্ঞান-নিরসনের নিয়ত কারণ। এই জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—অজ্ঞাননাশের নিয়ত কারণ—বিবেক-জ্ঞানের সাহায্যেই সর্ব্বানর্থের নিদানভূত অবিবেকের উচ্ছেদ হইতে পারে ; অতএব যাঁহারা দুঃখময় সংসার-বন্ধনের আত্যন্তিক উচ্ছেদ করিতে অভিলাষী—মুমুক্ষু, তাঁহারা অগ্রে দুঃখ-নিদান সেই অবিবেক-ধ্বংসের জন্য বিবেক-জ্ঞানোপযোগী উপায়-লাভে যত্নপর হইবেন (১)।

এখানে জানা আবশ্যক যে, আমাদের জ্ঞান ও অজ্ঞান (ভ্রম), উভয়ই দুইশ্রেণীতে বিভক্ত—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ হইতে কিংবা যুক্তিতর্কাদিসমন্বিত অনুমানের সাহায্যে, অথবা তাদৃশ অন্য কোন উপায়ে আমাদের যে সমুদয় জ্ঞান বা অজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে সমুদয় জ্ঞান ও অজ্ঞান পরোক্ষশ্রেণীভুক্ত ; আর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে যে সমুদয় জ্ঞান বা অজ্ঞানের

(১) চিত্ত নির্ম্মল না হইলে বিবেক জ্ঞান জন্মে না ; এই জন্য চিত্তশুদ্ধির অনুকূল যে সমুদয় উপায়—নিষ্কাম কর্ম্ম প্রভৃতি বিহিত আছে, মুমুক্ষু ব্যক্তির সর্ব্বদা সেই সমুদয় উপায়ের অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক।

উৎপত্তি হয়, সে সমুদয় অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষশ্রেণীর অন্তর্গত। তন্মধ্যে যথার্থ প্রত্যক্ষজ্ঞান উপস্থিত হইলে পরোক্ষ, অপরোক্ষ উভয়বিধ অজ্ঞানই বিনষ্ট হয়, কিন্তু পরোক্ষজ্ঞানে কখনই অপরোক্ষ অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না, বা হইতে পারে না ; কারণ, পরোক্ষজ্ঞান অপেক্ষা অপরোক্ষ অজ্ঞান অত্যন্ত বলবান্। দুর্ব্বল কখনই প্রবলের বাধা ঘটাইতে পারে না ; সুতরাং কেবল শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশলব্ধ কিংবা যুক্তিতর্কাদিসম্ভূত পরোক্ষ বিবেকজ্ঞান দ্বারাও আত্ম-বিষয়ক অপরোক্ষ ভ্রম বিদূরিত হয় না। ঐ প্রত্যক্ষাত্মক অবিবেক-ধ্বংসের জন্য আত্মা ও অনাত্মা বিষয়ে প্রত্যক্ষ বিবেকজ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয়। এ কথা সূত্রকার আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—

"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে" ॥ ১।৫৯ ॥

অর্থাৎ এই যে, আত্মা ও অনাত্ম-বিষয়ক অবিবেক বা অজ্ঞান, যাহা হইতে সমস্ত জীবজগৎ নিরন্তর দুঃখসাগরে ভাসিতেছে। যতক্ষণ তদ্বিরুদ্ধে জীবের প্রত্যক্ষানুভূতি না হইবে, ততক্ষণ শত যুক্তিতর্কেও (পরোক্ষ জ্ঞানেও) উহার বাধা বা অপনয়ন সম্ভবপর হইবে না। দিগ্‌ভ্রম ইহার উত্তম উদাহরণ,—দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তিকে শত যুক্তিতর্কে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও, ততক্ষণ সে কিছুতেই সেই প্রকৃত দিক্‌টী উপলব্ধি করিতে পারিবে না, যতক্ষণ সে নিজে উহা প্রত্যক্ষ করিতে না পারে। এই দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় আত্ম-বিষয়ে ভ্রান্ত ব্যক্তিও যে পর্য্যন্ত আত্মা ও অনাত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই

অবিবেক-মোহ বিধ্বস্ত করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে না ; এইজন্য মুমুক্ষু ব্যক্তিকে অপরোক্ষ বিবেকজ্ঞানের সাধনে সতত যত্নপর হইতে হয়।

উক্ত বিবেকজ্ঞান-লাভের পক্ষে একান্ত অপেক্ষিত—পুরুষ, প্রকৃতি ও তদ্বিকার বুদ্ধি প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ও তৎসাধক ত্রিবিধ প্রমাণ এবং তদুপযোগী অন্যান্য বিষয়ও প্রসঙ্গক্রমে সাংখ্য-শাস্ত্রে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে।

[প্রমাণ।]

শাস্ত্রোক্ত বিষয়কে সাধারণতঃ 'প্রমেয়' বলে। প্রমেয়-সিদ্ধি প্রমাণ-সাপেক্ষ। "প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি" প্রমাণ হইতেই প্রমেয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শাস্ত্রোক্ত পদার্থ লৌকিকই হউক, আর অলৌকিকই হউক, যতক্ষণ কোন প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হয়, ততক্ষণ সে পদার্থের অস্তিত্বাদি সম্বন্ধে কেহই নিঃসন্দেহ হয় না ও হইতে পারে না। প্রমাণশূন্য অপ্রামাণিক পদার্থের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব বাতুল ভিন্ন কেহই স্বীকার করিতে পারে না। এই জন্য প্রমেয় নিরূপণের অগ্রে প্রমাণ চিন্তা করা গ্রন্থকারের পক্ষে আবশ্যক হয়।

প্রমাণ অর্থ—প্রমা জ্ঞানের সাধন। প্রমা অর্থ—যথার্থ জ্ঞান। সেই প্রমা জ্ঞান যাহা দ্বারা সুনিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম প্রমাণ। সাংখ্যমতে—প্রমাণ সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, প্রথমতঃ কোন একটী ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন একটী দৃশ্য বিষয়ের সান্নিধ্য উপস্থিত হয় ; পরে, সেই সন্নিহিত বিষয়টী যদি সেই

ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ-যোগ্য হয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ সেই ইন্দ্রিয়টী সেই বিষয়ের সঙ্গে সংযোগলাভ করে। অতঃপর অন্তঃকরণগত তমোগুণ—যাহা দ্বারা সত্ত্বগুণের প্রকাশন-শক্তি আবৃত বা বাধা-প্রাপ্ত ছিল, তাহা আপনা হইতেই ক্ষীণ বা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্বগুণ প্রবল বা উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। তখন সেই শুদ্ধসত্ত্ব অচেতন অন্তঃকরণে সন্নিহিত চিন্ময় পুরুষ (আত্মা) প্রতিবিম্বিত হয় ; তখন আলোক-সন্নিহিত নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় অচেতন অন্তঃকরণও চেতনের ন্যায় উজ্জ্বল ও পরপ্রকাশনে সমর্থ হয়। তাহার পর, তৈজস অন্তঃকরণ সেই ইন্দ্রিয়-গৃহীত বিষয়ে যাইয়া পতিত হয়, এবং তাহার আকারে আকারিত হয়। অন্তঃকরণের যে, এইরূপে বিষয়াকারে পরিণাম ইহারই অপর নাম—বৃত্তি ও অধ্যবসায়। বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ সমুৎপাদন করাই বিষয়াভিমুখে বৃত্তি নির্গমনের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পরই বৃত্তির বিষয়ীভূত সেই বিষয়টী আলোকচিত্রের ন্যায় বুদ্ধি-দর্পণে আসিয়া প্রতিবিম্বিত হয়। তখন অন্তঃকরণ সেই প্রতিফলিত বিষয়ের গুণাদি দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া, সেই বিষয়াকারেই আপনাকে পরিচিত করে, এবং গৃহীত বিষয় ও তদ্বিষয়ক বৃত্তিসহকারে আপনাকেও আবার নিকটস্থ পুরুষে (আত্মাতে) প্রতিবিম্বাকারে প্রতিফলিত করে। ইহাই সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞানোৎপত্তির সাধারণ নিয়ম বা ব্যবস্থা।

ইহার মধ্যে নিত্যশুদ্ধ চেতন আত্মা হইতেছে—প্রমাতা (জ্ঞাতা), অন্তঃকরণের বিষয়াকারে বৃত্তি হইতেছে—প্রমাণ,

আর বিষয়াকারা অন্তঃকরণবৃত্তির যে, চেতন পুরুষে প্রতিবিম্বন, তাহা হইতেছে—প্রমা—প্রমাণের ফল। ইহার অপর নাম বোধ ও অনুব্যবসায় প্রভৃতি (১)।

উপরে যে, জ্ঞানোৎপত্তির প্রণালী প্রদর্শিত হইল, ইহা সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিমত। তিনি বুদ্ধি ও পুরুষের অন্যোন্য প্রতিবিম্বন স্বীকার করেন। পুরুষ যেমন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অচেতন বুদ্ধিকেও চেতনের ন্যায় প্রকাশশীল করে, বুদ্ধিও আবার তেমনই বিষয়াকারা বৃত্তির সহিত পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া সুখদুঃখাদিবিহীন নিষ্ক্রিয় পুরুষকেও সক্রিয় ও সুখদুঃখাদিবিশিষ্টের ন্যায় করিয়া তোলে (২)। ইহার ফলে, জড়স্বভাব

---

(১) বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

"প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ।
প্রমার্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥
প্রতিবিম্বিতবৃত্তীনাং বিষয়ো মেয় উচ্যতে।
সাক্ষাদ্দর্শনরূপং চ সাক্ষিত্বং বক্ষ্যতি স্ফুটম্॥" (ভাষ্য ১৷৮৩)।

আমাদের মতে শুদ্ধচেতন পুরুষই প্রমাতা (জ্ঞাতা), অন্তঃকরণের বৃত্তি হইতেছে প্রমাণ, আর বিষয়াকারে আকারিত অন্তঃকরণের বৃত্তির যে, চেতন আত্মাতে প্রতিবিম্বপাত, তাহার নাম প্রমা—প্রমাণফল জ্ঞান। বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর নাম মেয়। ইহার সাক্ষাৎ দ্রষ্টার নাম সাক্ষী। প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শব্দ—সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানেই এই নিয়ম।

(২) শাস্ত্রান্তরেও পুরুষে এইরূপ প্রতিবিম্বপাত উল্লিখিত আছে।

"গৃহীতানিন্দ্রিয়ৈরর্থান্ আত্মনে যঃ প্রযচ্ছতি।
অন্তঃকরণরূপায় তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥" (ভাষ্যধৃত পুরাণ-বচন।)

বুদ্ধিও বিষয়ের প্রকাশে সমর্থ হয়, আবার নির্ব্বিশেষ পুরুষও সবিশেষ বলিয়া পরিচিত হয়। পুরুষে যে, বিষয়াকারা বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্বন, তাহাই পুরুষের ভোগ। এতদতিরিক্ত কোন প্রকার বাস্তবিক ভোগ পুরুষে সম্ভবপর হয় না। অথচ—

"চিদবসানো ভোগঃ॥" ১।১০৪।

এই সূত্র হইতে জানা যায় যে, ভোগ্য বিষয়ের যে, চিৎস্বরূপ পুরুষে পর্য্যবসান—পরিসমাপ্তি, তাহাই পুরুষের ভোগ। কিন্তু অচেতন ভোগ্যবিষয় কখনই চিৎস্বরূপে পর্য্যবসিত হইতে পারে না; পক্ষান্তরে নির্ব্বিকার পুরুষও কখনই বুদ্ধির ন্যায় বিষয়াকারে পরিণত হইতে পারে না; অথচ জগতে পুরুষের ভোগ অপ্রসিদ্ধও নহে; কাজেই—অগত্যা উক্ত প্রকার প্রতিবিম্ব-সম্বন্ধেই পুরুষের ভোগ স্বীকার করিতে হয়। প্রতিবিম্ব-সংযোগে কোন বস্তুরই স্বরূপহানি ঘটে না; সুতরাং প্রতিবিম্বরূপ ভোগ দ্বারা কূটস্থ পুরুষেরও স্বরূপহানি বা বিকারদোষ সম্ভাবিত হয় না। যেরূপ ভোগের দ্বারা ভোক্তার পরিণাম বা বিকার সংঘটিত হয়, সেরূপ যথার্থ ভোগ বুদ্ধিতেই হয়, পুরুষে হয় না। বুদ্ধিগত সেই ভোগই পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া 'পুরুষের ভোগ' বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই মাঘ কবিও "ফলভাজি সমীক্ষোক্তেবুর্দ্ধের্ভোগ ইবাত্মনি" বলিয়া উপমা দিয়াছেন।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, পরিণামশীলা বুদ্ধিই যখন সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করে, এবং পুরুষ যখন কেবল সাক্ষিরূপে

বুদ্ধিকৃত কর্ম্মরাশি নিরীক্ষণ মাত্র করে; তখন—"ফলং চ কর্ত্তৃ-গামি" অর্থাৎ ক্রিয়ার ফল কর্ত্তাতেই হয়, এই নিয়মানুসারে সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বশালিনী কেবল বুদ্ধিতেই কর্ম্মফলের উপভোগ হইতে পারে, পুরুষে তাহা হয় কি প্রকারে? একের কৃত কর্ম্মের ফল অপরে ভোগ করে, একথা স্বীকার করিলে, জগতে বিষম বিশৃঙ্খলা বা অব্যবস্থা আসিয়া পড়ে। এ কথার উত্তরে সাংখ্যকার বলেন; যদিও অধিকাংশস্থলে, কর্ত্তাকেই স্বসম্পাদিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে দেখা যায় সত্য, তথাপি উহাই জগতে অব্যভিচারী নিয়ম নহে। কেন না,—

"অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদ্যবৎ॥" ১।১০৫॥

অর্থাৎ কর্ত্তাই যে, কেবল স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিবে, অন্যে করিবে না, এরূপ কোনও নিয়ম নাই। অন্যকৃত কর্ম্মফলও অন্যকে ভোগ করিতে দেখা যায়,—পাচক অন্ন পাক করে, অন্যে তাহা ভোজন করে। এখানে পাকক্রিয়া ও ভোজন ক্রিয়ার কর্ত্তা এক নহে, স্বতন্ত্র; সুতরাং কর্ত্তাকেই কেবল স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম সার্ব্বত্রিক নহে—প্রায়িক মাত্র। অতএব পুরুষ (আত্মা) কর্ত্তা না হইয়াও ফলভোগে অধিকারী হইতে পারে; কোন বাধা দেখা যায় না।

এ পর্য্যন্ত প্রমাণ-ব্যবহার সম্বন্ধে যে সমুদয় কথা বলা হইল, সে সমুদয়ই ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর কথা। 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী'কার মহামতি বাচস্পতিমিশ্র এ মতে সম্মত নহেন। তিনি বলেন—

'চিন্ময় পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ প্রাকৃতিক বুদ্ধির পরিণাম হয়—

অচেতন বুদ্ধিও পুরুষের ন্যায় চেতনায়মান হয়। সেই লব্ধচৈতন্যা বুদ্ধিতে আসিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ প্রতিফলিত হয়। উদাসীন বা নিষ্ক্রিয় পুরুষে সে সমুদয়ের কোন প্রকার প্রতিবিম্ব সংস্পর্শ হয় না; পুরুষ যেমন ছিল, তেমনই থাকে। কেবল পৌরুষ চৈতন্য আসিয়া অচেতন জড়স্বভাব বুদ্ধিতে যে সমুদয় বিষয় প্রতিবিম্বিত থাকে, সেই সমুদয় প্রতিবিম্বিত বিষয় ও বুদ্ধি উভয়কেই প্রকাশ করে মাত্র, কিন্তু তাহার কোন অংশ গ্রহণ করে না; সুতরাং পুরুষে প্রতিবিম্বরূপে কিংবা অন্য কোনপ্রকারেও ভোগ-সম্বন্ধ আদৌ ঘটে না। তথাপি বুদ্ধি তখন চেতনবৎ উদ্ভাসিত থাকায়, লোকে বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য বুঝিতে পারে না। এই বুঝিতে না পারারই নাম 'অবিবেক' বা অজ্ঞান। এই অবিবেকের ফলে বুদ্ধিকেই আত্মা মনে করিয়া বুদ্ধির ভোগকেই (বিষয় গ্রহণকেই) আত্মার ভোগ বলিয়া মনে করে। স্বয়ং ভগবান্‌ও নিম্নলিখিত—

> "কার্য্য-কারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
> পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥
> পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।"
> "কারণং গুণসঙ্গোহস্য"— (গীতা ১৩।২০-২১)।

এই শ্লোকে উক্ত অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। সূত্রকার বলিয়াছেন—

> "চেতনোদ্রেকাৎ তৎসিদ্ধেঃ কর্তুঃ ফলাবগমঃ॥" ১।১০৬॥

অর্থাৎ, কর্ত্রীস্বরূপা বুদ্ধিতেই ফল নিষ্পন্ন হয় সত্য, কিন্তু

কেবল অবিবেকবশতঃ (বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদগ্রহণের অভাব নিবন্ধন) অসঙ্গ পুরুষেও সেই ফলের ভোগ প্রতীত হয় মাত্র; বস্তুতঃ তাহাতে কোন প্রকার ভোগ সম্বন্ধই নাই (১)। এই মতে, ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে সত্ত্বসমুদ্রেক বশতঃ বুদ্ধিতে যে, বিষয়াকারা বৃত্তি হয়, তাহারই নাম প্রমাণ। আর অবিবেক বশতঃ পুরুষে যে, তাহার প্রতিভাস হয়, তাহার নাম প্রমা বা প্রমাণফল (২)।

এ নিয়ম প্রত্যক্ষাদি সর্ব্বপ্রমাণ-সাধারণ; কোন স্থানেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না। অতএব প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণ-ক্ষেত্রেই উল্লিখিত নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। অতঃপর প্রমাণ-গত বিভাগ প্রদর্শন করা আবশ্যক হইতেছে। বলা

---

(১) ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে অর্থ এইরূপ—সুখদুঃখ-ভোগাত্মক ফল কর্ত্রীস্বরূপা বুদ্ধিতে জন্মে না; জন্মে পুরুষে। কেবল অবিবেকবশতঃ কর্ত্রীস্বরূপা বুদ্ধিতে ভোগাভিমান হয় মাত্র।

(২) এ বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্রের নিজস্ব উক্তি এই:—

"উপাত্তবিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাং বৃত্তৌ সত্যাং বুদ্ধেস্তমোঽভিভবে সতি, যঃ সত্ত্বসমুদ্রেকঃ, সঃ অধ্যবসায় ইতি, বৃত্তিরিতি, জ্ঞানমিতি চাখ্যায়তে। ইদং তাবৎ প্রমাণম্। অনেন যঃ চেতনাশক্তেরনুগ্রহঃ, তৎ ফলং—প্রমা বোধ ইতি।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। ৫।)

এখানে বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণের যে উদ্রেক বা প্রাধান্য, তাহাই প্রমাণ, এবং তাহা দ্বারা যে, চেতন পুরুষের প্রতি অনুগ্রহ, তাহাই প্রমাণ-ফল। পুরুষ স্বভাবতঃ সুখ-দুঃখাদিবিহীন হইয়াও বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হওয়ায়, বুদ্ধি যে, পুরুষকে আপনার গুণে বিভূষিতপ্রায় করে, ইহাই পুরুষের প্রতি অনুগ্রহ।

বাহুল্য যে, প্রমাণের বিভাগ বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক দর্শনই বিশেষ-ভাবে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছেন। প্রত্যেকেই যেন অপরের অঙ্গীকৃত প্রমাণবিভাগ স্বীকার করিতে সমধিক কুণ্ঠা বোধ করিয়াছেন। তাহার ফলে, প্রমাণসংখ্যা এক হইতে দশ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। ন্যায়দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

[প্রমাণ বিভাগ]

সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। প্রমাণের সংখ্যা এতদপেক্ষা ন্যূনাধিক হইতে পারে না। এই ত্রিবিধ প্রমাণের সাহায্যেই সমস্ত অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং, প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি।"

প্রমেয় বা জ্ঞাতব্য পদার্থ নিরূপণ করাই প্রমাণের একমাত্র উদ্দেশ্য ; সেই উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে তিনপ্রকার প্রমাণই যথেষ্ট ; সুতরাং উক্ত তিনের অধিক বা ন্যূনসংখ্যক প্রমাণ কল্পনা করা সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অনাবশ্যক। সাংখ্যাচার্য্যগণ অন্যান্য দার্শনিকগণের অভিমত উপমান ও অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণ-সমূহকে উক্ত তিনপ্রকার প্রমাণেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন; কাজেই তাঁহারা সে সকল প্রমাণকে পৃথক্ করিয়া গণনা করেন নাই। সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ—

"যৎ সম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং, তৎ প্রত্যক্ষম্" ॥ ১।৮৯ ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বা আন্তর বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে

পর, অন্তঃকরণের (বুদ্ধিতত্ত্বের) যে, সেই সম্বন্ধ বিষয়ের আকারে বৃত্তি বা পরিণতিবিশেষ হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এখানে বলা আবশ্যক যে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের পর অন্তঃকরণের যে, বিষয়ের আকার ধারণ, সেই আকারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে ; পরন্তু সেই আকার যাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই আকারাশ্রয় বৃত্তিরই নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বিজ্ঞানভিক্ষুর মত (১)।

উপরে যে, প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল, ইহা কেবল লৌকিক প্রত্যক্ষের লক্ষণ মাত্র ; কিন্তু যোগ-শক্তি প্রভাবে যোগিজনের যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বস্তু বিষয়ে অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়, ইহা তাহার লক্ষণ নহে ; সুতরাং যোগিজনের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ হইলেও কথিত লক্ষণে কোন দোষ ঘটিতেছে না। এই জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

"যোগিনামবাহ্য-প্রত্যক্ষত্বাৎ ন দোষঃ ॥" ১।৯০ ॥

অভিপ্রায় এই যে, যোগিপুরুষদিগের যে, প্রত্যক্ষ, তাহা বস্তুতঃ বাহ্য প্রত্যক্ষই নয় ; আমাদের কথিত লক্ষণটা বাহ্যপ্রত্যক্ষের (লৌকিক প্রত্যক্ষের) জন্য বিহিত ; সুতরাং ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ যোগিপ্রত্যক্ষ এ লক্ষণের অনন্তর্গত বা অবিষয় হওয়ায় দোষাবহ হইতে পারে না।

---

(১) বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—
"তথাচ স্বার্থসন্নিকর্ষজন্যাকারস্যাশ্রয়ো বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণমিতি নিষ্কর্ষঃ।"
অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষের ফলে যে, অন্তঃকরণের আকারবিশেষ হয়, সেই আকারের আশ্রয়ভূত বুদ্ধিবৃত্তির নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহাই সূত্রের ফলিতার্থ।

উল্লিখিত প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে বস্তুসত্তা প্রমাণিত হয় সত্য, কিন্তু প্রত্যক্ষই বস্তুসত্তা নির্দ্ধারণের একমাত্র মানদণ্ড নহে। সময় ও অবস্থাভেদে প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু বিদ্যমান সত্ত্বেও প্রত্যক্ষের অবিষয় হইয়া থাকে (১)। বিশেষতঃ জগতে প্রত্যক্ষের অযোগ্য —অতীন্দ্রিয় বস্তুও বিস্তর আছে, যেমন, প্রকৃতি, পুরুষ, অদৃষ্ট, সৃষ্টিক্রম ও প্রলয় প্রভৃতি। নির্দ্দোষ অনুমান ও আপ্তবাক্যের সাহায্যে সে সকল পদার্থেরও অস্তিত্ব অবধারণ করিতে হয়। সূত্রকার বলিয়াছেন—

"সামান্যতোদৃষ্টাদুভয়সিদ্ধিঃ"॥ ১।১০৩॥

'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানের সাহায্যে প্রকৃতি ও পুরুষ, এতদুভয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আরও স্পষ্ট কথায় আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্॥"

(সাংখ্যকারিকা—৬)

যে সকল পদার্থ অতীন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সাধারণতঃ 'সামান্যতোদৃষ্ট'নামক অনুমানের দ্বারা সে সকল পদার্থের অস্তিত্ব

---

(১) সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন –

"অতি দূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতাৎ মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥" ৭॥

দৃশ্য বস্তুর অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়দোষ, মনের চাঞ্চল্য, সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অভিভূত থাকা, অপর বস্তুর সহিত মিলিত (একীভূত) হইয়া থাকা—এই সমস্ত কারণে বিদ্যমান বস্তুরও প্রত্যক্ষ হয় না।

জানিতে পারা যায়; আর যে সকল পদার্থ 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানের দ্বারাও জানিতে পারা যায় না, সে সকল পদার্থও আপ্তবাক্য দ্বারা জানিতে পারা যায়। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যক্ষ না হইলেই যে, বস্তুর অভাব কল্পনা করিতে হইবে, ইহা যুক্তি ও ব্যবহারবিরুদ্ধ কথা। কেন না, প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক অতিদূরত্বাদি এমন বহুতর কারণ আছে, যে সকলের দ্বারা অতিপ্রসিদ্ধ বস্তুও লোকের প্রত্যক্ষগোচর হয় না বা হইতে পারে না; সুতরাং যাহারা একমাত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী নাস্তিক (চার্ব্বাক সম্প্রদায়), তাহাদের পক্ষেও অপ্রত্যক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব অপলাপ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভবপর হয় না। তাহাদিগকেও বাধ্য হইয়া অনুমান ও আপ্তবাক্যের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হয় (১)। অতএব প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমান এবং আপ্তবচনেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা দ্বারাও অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতে হয়; নচেৎ জাগতিক সমস্ত ব্যবহারই অচল হইয়া পড়ে। অতঃপর অনুমানের কথা বলা হইতেছে। অনুমান (অনুমিতি) কি?

"প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমনুমানম্॥" ১।১০০॥

---

(১) যাহারা একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী নাস্তিক, তাহারা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বাড়ীর লোকদিগকে নিশ্চয়ই দেখিতে পান না। তখন তাহারা কি গৃহজনের অভাব নিশ্চয় করিয়া থাকেন? এবং শিষ্যকে যখন কোন দুরূহ বিষয় উপদেশ করিতে থাকেন, তখন তাহারা শিষ্যের মনোভাব বুঝিয়াই উপদেশ করেন; নচেৎ শিষ্য তাহার কথা বুঝিবে কেন? তখন তাহারা কি শিষ্যের মনোবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন? এই সমস্ত কারণে অনুমানাদিরও প্রামাণ্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

প্রতিবন্ধ অর্থ—ব্যাপ্তি (ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব)। দৃশ্ অর্থ—জ্ঞান। প্রতিবন্ধ অর্থ—ব্যাপক—সাধ্য। ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে যে, ব্যাপকের জ্ঞান, তাহার নাম অনুমান প্রমাণ। এতাদৃশ অনুমান হইতে যে, অপ্রত্যক্ষ সাধ্য বস্তু বিষয়ে পুরুষের বোধ, তাহার নাম—অনুমিতি। ইহাই অনুমান প্রমাণের ফল—অনুমিতি। সাংখ্যমতে অনুমান বা ব্যাপ্তির লক্ষণ এইরূপ—

"নিয়ত-ধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ ॥" ৫।২৮ ॥

আশ্রিত বস্তুমাত্রই ধর্ম্ম-পদবাচ্য, আর যাহাতে আশ্রিত থাকে, তাহার নাম ধর্ম্মী। তন্মধ্যে ধর্ম্মী পদার্থ হয় সাধ্য, আর ধর্ম্ম হয় তাহার সাধন বা হেতু। উক্ত সাধ্য ও সাধন, এতদুভয়ের যে, নিয়ত (অব্যভিচরিত ভাবে) সাহিত্য—একত্র অবস্থিতি, অথবা উক্ত উভয়ের মধ্যে কেবল সাধনেরই যে, সাধ্যের সহিত নিয়ত সহাবস্থিতি, তাহার নাম ব্যাপ্তি (১)। এই ব্যাপ্তি ও

---

(১) যেখানে দুইটী পদার্থই (সাধ্য ও সাধন) পরস্পরকে ছাড়িয়া পৃথক্ভাবে না থাকে, সেই দুইটী পদার্থকে বলে 'সমনিয়ত-বৃত্তি'। যেমন—গন্ধ ও পৃথিবী, সৌরভ ও চন্দন। ইহাদের একটী থাকিলেই অপরটীও থাকিতে বাধ্য। এই জাতীয় সাধ্য ও সাধন উভয়েরই সাহচর্য্য থাকা স্বাভাবিক। আর যেখানে এরূপ সমনিয়তভাব নাই—একটী ছাড়িয়াও অপরটী থাকিতে পারে। যেমন ধূম ও বহ্নি। ধূমই বহ্নি ছাড়িয়া থাকে না, কিন্তু বহ্নি ধূম ছাড়িয়াও বহুস্থানে থাকে। সেরূপ স্থলে কেবল একটীর—সাধন বস্তুটীর মাত্র সাহিত্য থাকা আবশ্যক হয়। এইরূপ অভিপ্রায়েই সূত্রে 'উভয়োঃ' ও 'একতরস্য বা' বলা হইয়াছে। ন্যায়দর্শনের আলোচনাপ্রসঙ্গে ব্যাপ্তির কথা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে, এখানে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

অনুমান একই অর্থ। ন্যায়াচার্য্যগণ এই অনুমানকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) পূর্ব্ববৎ, (২) শেষবৎ, ও (৩) সামান্যতোদৃষ্ট। সাংখ্যাচার্য্যগণ এরূপ বিভাগ নিজেরা কল্পনা না করিলেও, স্পষ্টাক্ষরে অনুমোদন করিয়াছেন—

"ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতম্" (সাংখ্যকারিকা—৭)।

মহামতি বাচস্পতিমিশ্র উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অনুমান সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। এ বিষয়ে যাহাদের কৌতূহল আছে, তাহারা 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' দেখিলে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন। ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের জন্য সাধ্য ও সাধনের সাহচর্য্য বা সহাবস্থিতি যে, কতবার দেখা আবশ্যক, তাহার নিয়ম নাই। তবে এ কথা সত্য যে,—

"ন সকৃদ্গ্রহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ॥" ৫।২৮।

একবার মাত্র সাহচর্য্য দর্শনেই হেতু-সাধ্যের সাহচর্য্য স্থির হয় না; পরন্তু একাধিকবার দর্শনের আবশ্যক হয়; এবং সেরূপ দর্শনের ফলেই নির্দ্দোষ ব্যাপ্তিরচনা করা সম্ভব হয়। আমরা এখানে আর একটীমাত্র কথা বলিয়াই অনুমানের বিষয় শেষ করিব।

অনুমিতিজ্ঞানে সাধ্য, সাধন ও পক্ষ, এই তিনটী বিষয় জানা থাকা আবশ্যক হয়। যে বিষয়টী প্রমাণ করিতে হয়, তাহা সাধ্য, যাহা দ্বারা প্রমাণ করিতে হয়, তাহা সাধন বা হেতু, আর যে স্থানে বা যাহাতে ঐ সাধ্য পদার্থটী থাকে, তাহার নাম পক্ষ। এই তিনটী বিষয় জানা না থাকিলে অনুমান বা

ব্যাপ্তিরচনা করা সম্ভব হয় না। ব্যাপ্তিরচনার নিয়ম পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ন্যায়দর্শনের প্রস্তাবে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে; এইজন্য এখানে আর অধিক কথা বলা আবশ্যক মনে করি না।

[শব্দ ও অনুমানের সম্বন্ধ।]

অনুমানের সহিত শব্দ-প্রমাণের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। লোকে অনুমানের সাহায্যেই প্রথমে শব্দার্থ-সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে। শব্দার্থ-বোধসম্পন্ন দুই ব্যক্তির শব্দব্যবহার ও তদনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান দর্শন করিয়া সন্নিহিত বালক—যাহার সেই সকল শব্দের অর্থবোধ জন্মে নাই, এমন লোক, যে শব্দের যাহা অর্থ, তাহা অনুমানের দ্বারা স্থির করিয়া লয় (১)। যতক্ষণ—

"বাচ্য-বাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ শব্দার্থয়োঃ ॥" ৫।৩৭।

শব্দ ও অর্থের বাচ্য-বাচকভাব (শব্দ হয় বাচক, আর অর্থ হয়

(১) একজন বৃদ্ধ একটী যুবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'গাং আনয়' (একটী গরু লইয়া এস)। আদেশপ্রাপ্ত লোকটী তৎক্ষণাৎ একটী প্রাণী লইয়া আসিল। ঐ বৃদ্ধ পুনরায় সেই লোকটীকে বলিল—'গাং বধান, অশ্বম্ আনয়' অর্থাৎ গরুটা বাঁধিয়া রাখ; একটী অশ্ব আনয়ন কর। ইহা দেখিয়া নিকটস্থ তৃতীয় লোকটী অনুমান করিল যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন আদেশ প্রাপ্তিমাত্র কার্য্য করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সে ঐ শব্দগুলির অর্থ জানে। এইরূপ শব্দের সংযোজন ও বিযোজনের দ্বারা কোন্ শব্দের কি অর্থ, তাহা সে বুঝিয়া লয়।

বাচ্য, এই) সম্বন্ধ জানিতে না পারা যায়, ততক্ষণ কোন শব্দ হইতেই অর্থবোধ করা কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। শব্দার্থের বাচ্য-বাচকভাব গ্রহণে অনুমানের অপেক্ষা আছে বলিয়াই অনুমানের অনন্তর শব্দপ্রমাণের স্থান। শব্দপ্রমাণ কাহাকে বলে?—

[শব্দ প্রমাণ।]

"আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥" ১।১০১ ॥

যে সমস্ত কারণ বর্ত্তমান থাকিলে শব্দার্থবোধ নিষ্পন্ন হইতে পারে, সেই সমুদয় কারণসহকৃত শব্দ হইতে যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহার নাম শব্দপ্রমাণ। পুরুষগত বোধ ইহার ফল—প্রমা (১)।

শব্দ ও অর্থ—উভয়েতেই এক একপ্রকার শক্তি আছে, তন্মধ্যে শব্দে আছে বাচকতা শক্তি, আর অর্থে আছে বাচ্যতা শক্তি। এই দ্বিবিধ শক্তি দ্বারাই শব্দ ও অর্থ পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ

---

(১) ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"আপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনং তু।" ৫।

ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—'আপ্তা প্রাপ্তা যুক্তেতি যাবৎ। আপ্তা চাসৌ শ্রুতিশ্চ ইতি—আপ্তশ্রুতিঃ। শ্রুতিঃ—বাক্যজনিতং বাক্যার্থজ্ঞানম্; তচ্চ স্বতঃ প্রমাণম্; অপৌরুষেয়-বেদবাক্য-জনিতত্বেন সকলদোষাশঙ্কাবিনির্মুক্তত্বেন যুক্তং ভবতি। এবং বেদমূলক-স্মৃতীতিহাস-পুরাণবাক্য-জনিতমপি জ্ঞানং যুক্তম্।'

তাৎপর্য্য—আপ্ত অর্থ যুক্ত, অর্থাৎ শাব্দবোধের উপযোগী কারণ-সম্পন্ন। তাদৃশ বাক্য জনিত বাক্যার্থ জ্ঞানের নাম—আপ্তবচন। বেদবাক্য স্বভাবতই নির্দ্দোষ; সুতরাং তাহা নিশ্চয়ই যুক্ত, যুক্ত বলিয়াই স্বতঃ প্রমাণ।

হইয়া থাকে। যেখানে শব্দ ও অর্থের মধ্যে উক্ত শক্তি বা বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ নাই, সেখানে কোনরূপ শব্দার্থবোধই জন্মে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার শব্দ-শক্তি জানে না, শব্দও তাহার নিকট কখনই আপনার অর্থ প্রকাশ করে না; এই জন্য শব্দার্থবুভুৎসু ব্যক্তিকে আপ্তোপদেশ, বৃদ্ধব্যবহার ও প্রসিদ্ধ শব্দের সান্নিধ্য প্রভৃতি উপায়ে অগ্রে উক্তপ্রকার শব্দার্থ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। যে ব্যক্তি লৌকিক শব্দ অবলম্বনে উক্তপ্রকার বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ অবগত হয়, বৈদিক শব্দার্থ-বোধও তাহারই নিকট সহজ ও সুখসম্পাদ্য হইয়া থাকে; কারণ, শব্দশক্তি জিনিষটা উভয় স্থলেই সমান বা একরূপ; কেবল ব্যবহারে যাহা কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয় মাত্র।

[বেদ।]

বেদ অপৌরুষেয় ও অলৌকিক অর্থের বোধক; উহার শক্তিও স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ, আধুনিক নহে; সুতরাং বৃদ্ধব্যবহারাদি দ্বারা যদিও উহার শক্তি বা বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ নির্ণয় করা অসম্ভব হউক; তথাপি বেদার্থবোধ অসম্ভব হইতে পারে না; কারণ, বৈদিক শব্দমধ্যেও স্বভাবসিদ্ধ যে শক্তি নিহিত আছে, অভিজ্ঞ পণ্ডিত-গণ প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থ বিশ্লেষণপূর্ব্বক সেই স্বাভাবিক শক্তিকেই সাধারণের বোধগম্য মাত্র করিয়া থাকেন; কিন্তু আধুনিক শব্দের ন্যায় বৈদিক শব্দেরও অর্থবিশেষে কোন প্রকার সঙ্কেত সংস্থাপন করেন না; সুতরাং লৌকিক ও বৈদিক—উভয়বিধ শব্দেই অর্থবোধের জন্য বৃদ্ধব্যবহারাদির যথেষ্ট উপযোগিতা রহিয়াছে।

[পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রমেয়-নির্দ্ধারণ করাই প্রমাণ-নিরূপণের উদ্দেশ্য। সাংখ্যশাস্ত্রও সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই তিনপ্রকার প্রমাণের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রমাণত্রয়ের সাহায্যে যত প্রকার প্রমেয় (পদার্থ) অবধারিত হইতে পারে, সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেব সেই সমস্ত প্রমেয় একটীমাত্র সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন—

"সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্ম্মহান্, মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি, উভয়মিন্দ্রিয়ম্, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ ॥" ১।৬১ ॥

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যে, সাম্যাবস্থা, অর্থাৎ সময় বিশেষে যাহাদের সাম্যাবস্থা ঘটিয়া থাকে, এমন যে গুণত্রয়, সেই গুণত্রয়ের নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহৎ তত্ত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব, অহঙ্কার হইতে পাঁচপ্রকার তন্মাত্র (শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্র), এবং উভয় প্রকার ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়) প্রাদুর্ভূত হয়। উক্ত তন্মাত্র হইতে আবার আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচপ্রকার স্থূল মহাভূত প্রাদুর্ভূত হয়। এতদ-তিরিক্ত একটী তত্ত্ব আছে, তাহার নাম পুরুষ (জীবাত্মা)। এই পঁচিশটী বস্তু সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রমেয় বা প্রতিপাদ্য এবং 'তত্ত্ব' নামে প্রসিদ্ধ। সাংখ্যমতে পদার্থসংখ্যা এতদপেক্ষা অধিক বা ন্যূন সম্ভবপর হয় না।

[তত্ত্বের শ্রেণীভেদ]

সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ উল্লিখিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন (১)। প্রথম কেবলই প্রকৃতি, দ্বিতীয় কেবলই বিকৃতি, তৃতীয় প্রকৃতি-বিকৃতি উভয়রূপ, চতুর্থ অনুভয়রূপ—প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয় (কূটস্থ)। তন্মধ্যে কেবলই প্রকৃতি এক—সাম্যাবস্থাবিশিষ্ট গুণত্রয়, কেবলই বিকৃতি বা কার্য্যাত্মক ষোড়শ—পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়। প্রকৃতি-বিকৃতি সপ্তবিধ—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র। প্রকৃতি অর্থ—অপর তত্ত্বের উপাদান কারণ। বিকৃতি অর্থ—পরিণাম বা কার্য্য। তন্মধ্যে ত্রিগুণাত্মিকা মূলপ্রকৃতি হইতেছে কেবলই প্রকৃতি, কারণ, উহা হইতে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, কিন্তু উহার আর কারণান্তর নাই। পঞ্চ ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয়, অথচ উহারা অপর কোনও তত্ত্বের উপাদান নহে; এইজন্য উক্ত ষোড়শ তত্ত্ব কেবলই বিকৃতিরূপে গণ্য। তাহার পর, মহত্তত্ত্ব মূলপ্রকৃতি হইতে

---

(১) 'তত্ত্ব' শব্দটা পদার্থের মৌলিকতা প্রকাশক। যে সমুদয় পদার্থ বিজাতীয় অন্য পদার্থের উৎপাদক, অথবা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত, সেই সমুদায় পদার্থই এই শাস্ত্রে 'তত্ত্ব' নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে 'তত্ত্ব' অর্থ সত্য—যথার্থ, যাহার অপলাপ করা সম্ভব হয় না। সংকলনের পদ্ধতিভেদে শাস্ত্রে তত্ত্বসংখ্যা অনেকপ্রকার হইয়াছে। কোথাও এক, কোথাও ছয়, কোথাও ষোড়শ, কোথাও বা অন্যপ্রকার লিখিত দেখা যায়। এইজন্য ভাগবতে লিখিত আছে—

"একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।
পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ॥"

উৎপন্ন, অথচ অহঙ্কারতত্ত্বের জনক; এইরূপ অহঙ্কারতত্ত্বও মহত্তত্ত্ব হইতে প্রসূত, অথচ পঞ্চতন্মাত্রের জনক; এইরূপ পঞ্চ-তন্মাত্র যেমন অহঙ্কার হইতে প্রসূত, তেমনি আবার পঞ্চ মহাভূতের প্রসূতি; এইরূপে জন্য-জনকভাবাপন্ন হওয়ায় উক্ত সাতটী তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি উভয়াত্মক বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু নিত্য নির্ব্বিকার উদাসীন পুরুষ অপর কোন তত্ত্ব হইতে উৎপন্নও হয় না, কিংবা অপর কোন তত্ত্ব উৎপাদনও করে না; এই জন্য প্রকৃতি-বিকৃতিভাববর্জ্জিত—অনুভয়রূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে (১)।

[সৎকার্য্যবাদ।]

সৎকার্য্যবাদ সাংখ্যশাস্ত্রের একটী বিশেষ সিদ্ধান্ত এবং এই অংশেই সাংখ্যশাস্ত্রের বিশিষ্টতা। এই সৎকার্য্যবাদের অপর

ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম।
সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্বাদ্ বিদুষাং কিমশোভনম্॥"

(প্রবচনভাষ্য ৬১ সূত্র)।

উল্লিখিত প্রমাণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, যিনি যেরূপ বস্তুসত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি তদনুসারে তত্ত্বসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা কেহই অযৌক্তিক কথা বলেন নাই; কারণ, তাঁহারা সকলেই বিদ্বান্, জ্ঞানী ছিলেন; জ্ঞানীর পক্ষে অযৌক্তিক কথা বলা কখনই সম্ভব হয় না। সাংখ্যমতে গুণ গুণী ও ধর্ম্ম ধর্ম্মী অভিন্ন পদার্থ। আশ্রয়ের অতিরিক্ত আশ্রিত গুণাদির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই; সুতরাং এমতে দর্শনান্তর-সম্মত গুণকর্ম্মাদি পদার্থগুলি উক্ত তত্ত্বসমূহেরই অন্তর্গত।

(১) ঈশ্বরকৃষ্ণের উক্তি এইরূপ—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"

(সাংখ্যকারিকা ৩)

নাম পরিণামবাদ। সাংখ্য সৎকার্য্যবাদী; সুতরাং সাংখ্যমতে কারণের ন্যায় কার্য্যগুলিও সৎ—নিত্য বা চিরন্তন। যাহা অসৎ অবস্তু—আকাশকুসুমতুল্য, শত প্রযত্নেও কস্মিন্‌কালেও তাহার উৎপত্তি বা আবির্ভাব হয় না, বা হইতে পারে না। কপিল বলিয়াছেন—

"নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ" ॥৫।৫২॥

অত্যন্ত অসৎ নৃশৃঙ্গ (মনুষ্যের শৃঙ্গ) যেমন অপ্রসিদ্ধ—কখনও উৎপন্ন হয় না, অন্যত্রও তেমনই অসৎ পদার্থের কখনও উৎপত্তি হয় না। অসতের যেমন উৎপত্তি হয় না, তেমনি সতেরও বিনাশ হয় না। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন—"নাসদুৎপদ্যতে, ন চ সদ্বিনশ্যতি।" বৃহৎ বটবৃক্ষ যেরূপ ক্ষুদ্র বটবীজে সূক্ষ্মরূপে বা বীজভাবে লুক্কায়িত থাকে, দুগ্ধের মধ্যে নবনীত যেরূপ সূক্ষ্ম অব্যক্ত ভাবে নিহিত থাকে, ঠিক সেইরূপ জায়মান কার্য্য-মাত্রই স্ব স্ব কারণের মধ্যে সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকে, অনন্তর যথোপযুক্ত কারণ-সংযোগে ও কারকব্যাপারে সেই সমুদয় অব্যক্ত কার্য্যই স্থূলভাবে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। যাহাতে যাহা নাই, তাহা হইতে সেরূপ পদার্থ কস্মিন্‌কালেও হয় না; হইবে না; এবং অতীতেও তাহার দৃষ্টান্ত মিলে না। ইহাই সৎকার্য্য-বাদের বৈশিষ্ট্য। সাংখ্যমতে পরিগণিত তত্ত্বমাত্রই নিত্য। নিত্য-পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত; এক পরিণামী নিত্য, অপর কূটস্থ নিত্য। তন্মধ্যে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পদার্থসমূহ পরিণামী নিত্য, আর পুরুষ কেবল অপরিণামী কূটস্থ নিত্য। পরিণামী নিত্য

পদার্থগুলি নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল (১), আর কূটস্থ-নিত্য পদার্থ নিত্য নির্ব্বিকার ও অপরিবর্ত্তনস্বভাব।

সাংখ্যোক্ত সৎকার্য্যবাদের বিপক্ষে উল্লেখযোগ্য আরও দুইটী প্রসিদ্ধ মতবাদ আছে। একটী অসৎকার্য্যবাদ, অপরটী বিবর্ত্তবাদ। বৌদ্ধ ও নৈয়ায়িক অসৎকার্য্যবাদী, আর শঙ্কর মতাবলম্বী বৈদান্তিকগণ বিবর্ত্তবাদী। তন্মধ্যে নৈয়ায়িকগণ বলেন, উৎপত্তির পূর্ব্বে কোন জন্য-পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকে না; পূর্ব্ববর্ত্তী সৎ কারণ হইতে অসৎ—অবিদ্যমান কার্য্য উৎপন্ন হয়। পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের নিত্য পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই বিশ্বের নাম-গন্ধও ছিল না; ছিল কেবল কারণভূত পরমাণুপুঞ্জ। ইদানীন্তন ঘটপটাদি জন্য-পদার্থের অবস্থাও এতদনুরূপ। কারণের ন্যায় কার্য্যও সৎপদার্থ হইলে কারণব্যাপারের কোনই সার্থকতা থাকে না। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যকে অসৎ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সেই সৎস্বরূপ কারণ হইতে অসৎ কার্য্যের আরম্ভ বা উৎপত্তি স্বীকার করেন বলিয়াই নৈয়ায়িকের মতকে 'আরম্ভবাদ'ও বলা হয়।

অসৎকার্য্যবাদী বৌদ্ধগণ আবার কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কারণের সত্তাও উড়াইয়া দেন। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যবস্তুটী যেমন

---

(১) মহামতি বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—"পরিণামস্বভাবা হি গুণা না-পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী—১৬)।

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় পরিণামস্বভাব, ক্ষণকালও পরিণাম ছাড়া থাকে না।

অসৎ—অবিদ্যমান, তৎকারণও তেমনই অসৎ—অবিদ্যমান। কেন না, উপাদান কারণের ধ্বংস না হইলে কখনও কোন কার্য্য আত্মলাভ করিতে পারে না। বীজ বিধ্বস্ত না হইলে কখনও অঙ্কুর জন্মে না; দুগ্ধের বিনাশ না হইলে কখনও দধির উদ্ভব হয় না। তেমনই মৃত্তিকার ধ্বংস না হইলে, তাহা হইতেও ঘটের উৎপত্তি হয় না ইত্যাদি। বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকগণের মতে জন্য-পদার্থমাত্রই অসৎ—অবস্তু; ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। কোনদিনই দৃশ্য কার্য্য জগতের সত্তা ছিল না, হইবেও না। এই অসৎ জগৎ নিত্য সৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র, অর্থাৎ নির্ব্বিকার ব্রহ্মে অজ্ঞান বশতঃ এই বিশাল জগৎ প্রকাশ পাইতেছে—আমাদের অজ্ঞানবশে রজ্জুতে যেমন সর্প প্রকাশ পাইয়া থাকে, জগতের প্রকাশও ঠিক তেমনই। বিবর্ত্ত ও পরিণামবাদে প্রভেদ এই যে,—

"সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥"

পরিণামস্থলে কারণবস্তুটী এমনভাবে কার্য্যাকার পরিগ্রহ করে যে, তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্বই থাকে না; কার্য্যাবস্থাই তাহার অবস্থা হইয়া পড়ে; যেমন দুগ্ধের দধিরূপে পরিণাম; দধিভাব প্রাপ্তির পর দুগ্ধের আর কোনরূপ অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু বিবর্ত্তস্থলে তাহা হয় না। বিবর্ত্তকার্য্যটী যাহাকে অবলম্বন করিয়া আত্মলাভ করে, সেই আশ্রয়বস্তুটী অবিকৃত ভাবেই থাকে; তাহার স্বরূপসত্তার অণুমাত্রও অপচয় বা উপচয় ঘটে না; দর্শক স্বীয় অজ্ঞানবশে কেবল তাহাতে অন্য রূপ দর্শন করে মাত্র; যেমন

রজ্জুতে সর্প। সেখানে রজ্জু রজ্জুই থাকে; কেবল অজ্ঞান প্রভাবে দ্রষ্টার নিকট সর্পাকারে প্রকটিত হয়, এবং দ্রষ্টার অজ্ঞান বিদূরিত হইলে পর, সেই রজ্জুই আবার নিজের প্রকৃত-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহার অভয়প্রদ হয়। ইহাই পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য।

সাংখ্যাচার্য্যগণ এ সকল বাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁহারা বলেন, যে বস্তু নিজে অসৎ—আকাশ-কুসুমকল্প, তাহারও যদি উৎপত্তি সম্ভাবিত হয়, তবে বন্ধ্যার পুত্র, কচ্ছপের রোম এবং আকাশের কুসুমও সমুৎপাদন করা নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইত। তাহার পর, বৌদ্ধমতে যে, কারণের অভাব (ধ্বংস) হইতে কার্য্যোৎপত্তি কল্পিত হইয়া থাকে; তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ, অবস্তু অভাব হইতে কখনও কোনও ভাব কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, বা হইতে পারে না। অঙ্কুর কখনও বীজের অভাব হইতে জন্মে না; বিধ্বস্ত বীজাবয়ব হইতেই জন্মে। ধ্বংস বা অভাব কার্য্যোৎপাদক হইলে, কার্য্যোৎপাদনের জন্য কাহাকেও আর চিন্তা করিতে হইত না; কারণ, অভাব সর্ব্বত্রই সুলভ। অতএব উক্ত বৌদ্ধমতটী যুক্তিসহ নহে। আর বিবর্ত্তবাদও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কারণ, এই জগৎ ব্রহ্ম-বিবর্ত্ত হইলে রজ্জু-সর্পের ন্যায় জগতেরও অসত্যতা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; কিন্তু যাহা পুরুষানুক্রমে বিনা বাধায় সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানেও যাহার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় বা অসত্যতা বিষয়ে কোনও বলবৎ প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে না, তখন কি করিয়া জগৎকে ব্রহ্মবিবর্ত্ত—অসত্য বলিয়া

উপেক্ষা করা যাইতে পারে ? এই কারণেই বিবর্ত্তবাদের উপরও বিশ্বাসস্থাপন করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, পরিণামবাদে যখন এসমস্ত দোষের কোনই সম্ভাবনা নাই, তখন তাহাই নির্দ্দোষ ও সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বুঝিতে হইবে, দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই সূক্ষ্ম বীজরূপে প্রকৃতির গর্ভে নিহিত ছিল, পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ তাহাই বিভিন্নপ্রকার আকারে অভিব্যক্ত বা আবির্ভূত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালীন কার্য্য-বস্তুর সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তনীয় বুঝিতে হইবে। কথাপ্রসঙ্গে আমরা অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি; এখন প্রকৃত কথার অবতারণা করা যাউক।

[প্রকৃতি।]

পূর্ব্বে যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রথম তত্ত্বটার নাম প্রকৃতি (১)। প্রকৃতির তিনটী অংশ – সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই অংশত্রয় প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যপদার্থ হইলেও, পুরুষের ভোগসাধন করে বলিয়া, কিংবা রজ্জুর (ত্রিতন্তুর) ন্যায় পরস্পর মিলিতভাবে থাকে বলিয়া, অথবা পুরুষরূপ পশুকে (অজ্ঞ জীবকে) সংসারস্তম্ভে আবদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া, জগতে

---

(১) বিজ্ঞানভিক্ষু প্রকৃতিশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলিয়াছেন --
"প্রকরোতি—ইতি প্রকৃতিঃ, অথবা প্রকৃষ্টা কৃতিরস্যাঃ ইতি প্রকৃতিঃ।"
প্রকৃতির বাচক আরও অনেক শব্দ আছে। যথা—

"ব্রাহ্মীতি বিদ্যাবিদ্যেতি মায়েতি চ তথা পরে।
প্রকৃতিশ্চ পরা চেতি বদন্তি পরমর্ষয়ঃ॥" ইত্যাদি।

'গুণ' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ উহারা বৈশেষিকাভিমত গুণপদার্থ নহে (১)। উক্ত গুণত্রয়ের সমষ্টিই প্রকৃতি। গুণাতিরিক্ত প্রকৃতির সদ্ভাবে কোনও প্রমাণ নাই, এবং গুণে ও প্রকৃতিতে কোন প্রভেদও নাই—যাহা গুণ, তাহাই প্রকৃতি; যাহা প্রকৃতি, তাহাই গুণ; গুণ ও প্রকৃতি বস্তুতঃ এক অভিন্ন পদার্থ (২)। সূত্রকার বলিয়াছেন—

সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ ॥৬।৩৯॥

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটী গুণ প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে; পরন্তু প্রকৃতিরই স্বরূপ। যেমন ঘট একটী স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং তদাশ্রিত রূপ রসাদি ধর্ম্মগুলি ঘট হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, প্রকৃতি ও সত্ত্বাদি গুণ কিন্তু সেরূপ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; অবস্থাভেদে গুণত্রয়ই প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র।

---

(১) বৈশেষিকের মতে গুণ বলিলে দ্রব্যসমবেত ও গুণক্রিয়ারহিত পদার্থ বুঝায়; কিন্তু সাংখ্যের গুণপদার্থ সেরূপ নহে। কারণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অপর কোন দ্রব্যে আশ্রিত নহে, এবং গুণক্রিয়াবর্জ্জিতও নহে। উহারা রূপ-রসাদিগুণসম্পন্ন এবং অন্যত্র অনাশ্রিত স্বতন্ত্র দ্রব্যপদার্থ। উক্ত গুণত্রয়ই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ। গুণত্রয়ের কার্য্যও স্বভাবাদি পরে বিবৃত করা হইবে।

(২) "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ"
"গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।" "প্রকৃতের্গুণাঃ" ইত্যাদি বাক্যে যে, গুণ ও প্রকৃতির পার্থক্য নির্দ্দেশ, তাহা কেবল অনভিজ্ঞ লোকদিগের বোধসৌকর্য্যার্থ অভেদে ভেদ-কল্পনা মাত্র।

প্রকৃতির কথা বলিতে হইলেই, অগ্রে তদীয় গুণত্রয়ের স্বরূপ ও চরিত্রাদি চিন্তা করা আবশ্যক হয়। কারণ, সত্বাদি গুণত্রয়কে বাদ দিলে প্রকৃতির অস্তিত্বই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং গুণত্রয়ের স্বরূপাদি চিন্তা সাংখ্যসিদ্ধান্তে বিশেষ উপযোগী ও অনুপেক্ষণীয়। গুণত্রয়ের স্বরূপ-পরিচয়প্রসঙ্গে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"সত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টমুপষ্টম্ভকং চলং চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ ॥" সাংখ্যকারিকা ১৩ ॥

সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশস্বভাব; রজোগুণ উপষ্টম্ভক ও ক্রিয়া-স্বভাব; তমোগুণ গুরুত্বসম্পন্ন ও আবরণশীল। উপমাচ্ছলে বলিতে হয়—সত্ত্বগুণ তেজের মত—প্রকাশক, রজোগুণ বায়ুর মত—ক্রিয়াত্মক, আর তমোগুণ অন্ধকারের তুল্য—আবরক। ইহা হইতেই উহাদের স্বভাব ও কার্য্যকারিতা বুঝিয়া লইতে হইবে।

উক্ত গুণত্রয়ের স্বভাব বড়ই বিচিত্র; উহারা কখনও পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্‌ভাবে থাকে না, এবং পরস্পরের সহায়তা না লইয়া কেহ কোন কার্য্য করিতেও সমর্থ হয় না, অথচ প্রত্যেকেই অপর দুইটা গুণকে প্রতিনিয়ত পরাজিত করিয়া প্রবল হইবার চেষ্টা করে। এইরূপে পরস্পরকে অভিভব করিবার প্রবৃত্তি উহাদের স্বভাবসিদ্ধ; সে স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া উহারা মুহূর্ত্তমাত্রও থাকে না; অথচ পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব এই গুণত্রয়ই আবার পরস্পরের সহযোগিভাবে প্রত্যেকের কার্য্যে

সহায়তা করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। এইপ্রকার বিচিত্র স্বভাব লইয়াই গুণময়ী প্রকৃতি বিশাল বিশ্বপ্রপঞ্চ রচনা করিয়া থাকেন।

উক্ত গুণত্রয়ের আর একটী স্বভাব—পরিণাম। সে পরিণাম ক্ষণকালের জন্যও বিরত থাকে না (১)। সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে, তমঃ তমোরূপে প্রতিমুহূর্ত্তেই পরিণত হইতেছে। এই জাতীয় পরিণামকে সাংখ্যশাস্ত্রে 'সরূপ পরিণাম' বলে। যতক্ষণ একটী গুণ প্রবল হইয়া অপর দুইটী গুণকে আপনার অধীন করিয়া লইতে না পারে—ত্রিগুণই সমান শক্তিতে ক্রিয়া করিতে থাকে, ততক্ষণ এইরূপ 'সরূপ' পরিণামই চলিতে থাকে।

---

(১) গুণত্রয়ের স্বভাব প্রদর্শনপ্রসঙ্গে পাতঞ্জলভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

"চলং গুণবৃত্তম্" অর্থাৎ ক্রিয়াই গুণের স্বভাব, এবং "পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমপাবতিষ্ঠন্তে।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ১৬) অর্থাৎ পরিণামস্বভাব গুণত্রয় ক্ষণকালও পরিণামশূন্যভাবে থাকে না। আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণও "প্রকৃতি-সরূপং বিরূপং চ" বলিয়া সরূপ-বিরূপভেদে দ্বিবিধ পরিণাম স্বীকার করিয়াছেন। ব্যবহার-জগতেও উক্ত উভয়বিধ পরিণামের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যথা, গাভীর স্তন হইতে দুগ্ধ বহির্গত করা হইল; কিছু সময় পর্য্যন্ত দুগ্ধ ঠিক রহিল; তাহার পরে সেই দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত হইল। এখানে বুঝিতে হইবে যে, দুগ্ধ বহির্গত হইয়াই প্রতিক্ষণে পরিণামান্তর প্রাপ্ত হইতেছিল—দধিভাবের জন্য অগ্রসর হইতেছিল; কিন্তু যতক্ষণ দধিরূপে পরিণত হয় নাই—সরূপ পরিণামে ছিল, ততক্ষণ আমরা সেই দুগ্ধই রহিয়াছে মনে করিয়া থাকি; যেই বিরূপ পরিণাম উপস্থিত হয়, তখনই আমরা উহাকে অন্য জিনিষ—দধি বলিয়া ব্যবহার করি।

যেই মুহূর্ত্তে একটী গুণের দ্বারা অপর গুণদ্বয় পরাভূত হইয়া পড়ে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বিশেষ বিশেষ কার্য্য সৃষ্টি আরব্ধ হইতে থাকে। এই জাতীয় পরিণামকে 'বিরূপ পরিণাম' বলে। গুণত্রয়ের সরূপ পরিণামে হয় প্রলয়, আর বিরূপ পরিণামে হয় সৃষ্টি। ভোক্তা জীবগণের পূর্ব্বতন কর্ম্মজনিত অদৃষ্টই (পুণ্য-পাপই) গুণত্রয়ের উক্তপ্রকার দ্বিবিধ পরিণামকে যথানিয়মে পরিচালিত করিয়া থাকে (১)। প্রত্যেক গুণই অসংখ্য—অনন্ত, এবং প্রত্যেক স্থানেই প্রত্যেক গুণ বিদ্যমান আছে ; কোথাও উহাদের অত্যন্ত অভাব নাই। গুণের মধ্যে অণু বিভু দ্বিবিধ পরিমাণই আছে।

প্রলয় সময়ে গুণত্রয়ই সাম্যাবস্থায় বা অবিকারাবস্থায় থাকে; এইজন্য সাম্যাবস্থাযুক্ত গুণত্রয়কে প্রকৃতি বলা হয়। গুণাতিরিক্ত যে, প্রকৃতি বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

প্রকৃতি সর্ব্ব জগতের উপাদান হইলেও সাম্যাবস্থায় বা প্রলয়-

---

(১) প্রলয় সময়েও গুণত্রয়ের পরিণাম স্থগিত থাকে না ; তখনও গুণত্রয় নির্ব্বিকরূপে পরিণত হইতে থাকে ; জীবগণের ভোগকাল নিকটবর্ত্তী হইলে জীবের অদৃষ্টের প্রেরণায় গুণত্রয়ের মধ্যে এমনই একপ্রকার বিক্ষোভ উপস্থিত হয় ; যাহার ফলে উক্ত গুণত্রয় বিভিন্নাকারে পরিণত হইয়া বিশাল জগদুৎপাদনে সমর্থ হয়। প্রলয় সময়েও যদি গুণের ক্রিয়া (পরিণাম) না থাকে, তবে প্রলয়ের কালসংখ্যা নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কেন না, কালের পরিমাণ ক্রিয়াদ্বারাই সম্পাদিত হয় ; সুতরাং কালের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্যই প্রলয়কালেও গুণগণের পরিণাম বা ক্রিয়া স্বীকার করা আবশ্যক হয়।

কালে তাহাতে কোন প্রকার শব্দস্পর্শাদি গুণসম্বন্ধ থাকে না। পুরাণশাস্ত্রও একথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

"শব্দস্পর্শবিহীনং তদ্রূপাদিভিরসংযুতম্।
ত্রিগুণং তদ্ জগদ্‌যোনিরনাদি-প্রভবাপ্যয়ম্॥"

(১।১২৮ সূত্রের ভাষ্যধৃত বিষ্ণুপুরাণ)

ত্রিগুণাত্মিকা জগদ্যোনি প্রকৃতি যে, শব্দ স্পর্শ, রূপ, রসাদি গুণ বর্জ্জিত, এবং আদি অন্ত ও জন্ম রহিত, এ কথাই উল্লিখিত শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

[প্রকৃতির অপরিচ্ছিন্নত্ব।]

উক্ত প্রকৃতি পরিচ্ছিন্ন, কি অপরিচ্ছিন্ন, এ কথার সমাধান প্রসঙ্গে সূত্রকার বলিয়াছেন—

"পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্॥" ১।৭৬॥
"তদুৎপত্তিশ্রুতেশ্চ॥" ১।৭৭॥

অর্থাৎ সর্ব্বজগতের উপাদানভূত মূল প্রকৃতি কখনই পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ কার্য্য যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেরূপ উপাদান কারণ পরিচ্ছিন্নও হইতে পারে, কিন্তু অসীম জগতের উপাদান বা মূল কারণ প্রকৃতি কখনই সসীম হইতে পারে না; কাজেই জগৎকারণ প্রকৃতিকে পরিচ্ছিন্ন বলিতে পারা যায় না (১)। এ কথার সমর্থন-কল্পে সূত্রকার পুনশ্চ ষষ্ঠাধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাদ্ বিভুত্বম্॥" ৬।৩৬

---

(১) একথার অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতি অর্থই গুণত্রয়। জগতে কোথাও সেই গুণত্রয়ের—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অভাব নাই; অনন্ত

দেশ কালনির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র প্রকৃতির কার্য্যদর্শনে বুঝা যায় যে, প্রকৃতি ব্যাপক পদার্থ—পরিচ্ছিন্ন নহে। বিশেষতঃ প্রকৃতিকে পরিচ্ছিন্ন বলিলে, তাহার উৎপত্তিও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; কারণ, জগতে কোথাও কোন পরিচ্ছিন্ন পদার্থ উৎপত্তিবিহীন (নিত্য), দৃষ্টিগোচর হয় না; কাজেই সে পক্ষে উহার নিত্যতা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর হয় না। তাহার পর, "যদল্পং তৎ মর্ত্ত্যম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও স্পষ্টাক্ষরেই পরিচ্ছিন্ন পদার্থের বিনাশবার্ত্তা কীর্ত্তন করিতেছে। প্রকৃতির উৎপত্তি-বিনাশ স্বীকার করিলে কেবল যে, নিত্যতারই হানি হয়, তাহা নহে; পরন্তু উহার

সত্ত্ব, অনন্ত রজঃ ও অনন্ত তমোগুণে জগৎ পরিব্যাপ্ত আছে। এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

"পরিচ্ছিন্নত্বমত্র—দৈশিকাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বম্, তদভাবশ্চ ব্যাপকত্বম্ (অপরিচ্ছিন্নত্বম্)। তথাচ জগৎকারণত্বস্য দৈশিকাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বমেব—ইতি প্রকৃতের্ব্যাপকত্বমিতি।"

অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন কথার অর্থ না জানিলে অপরিচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ বুঝা যায় না; এইজন্য প্রথমে পরিচ্ছিন্ন কথার অর্থ বলিতেছেন। এখানে পরিচ্ছিন্নত্ব অর্থ—যে বস্তুর কোন স্থানেও অভাব থাকে—যাহা কোথাও অভাবের প্রতিযোগী হয়, তাদৃশ অভাব-প্রতিযোগিতাবিশিষ্ট বস্তুর ধর্ম্ম হইল—পরিচ্ছিন্নত্ব; তদ্বিপরীতত্বই অপরিচ্ছিন্নত্ব। গুণত্রয়ের কোথাও অভাব নাই; এইজন্য গুণত্রয়কে অপরিচ্ছিন্ন বা ব্যাপক বলা হয়। যেমন—সমস্ত দেহেই প্রাণ আছে, কোন দেহেই তাহার অভাব নাই; এইজন্য প্রাণকে প্রাণিদেহের ব্যাপক বলা হয়, ইহাও ঠিক তেমনই।

মূলপ্রকৃতিত্বও ব্যাহত হয়; এবং উহারও উৎপত্তির জন্য অপর প্রকৃতি কল্পনার আবশ্যক হয়. আবার তাহার উৎপত্তির জন্যও অপর প্রকৃতি কল্পনা করিতে হয়. এইরূপে কারণ ধারা কল্পনা করিলে নিশ্চয়ই অপ্রতিবিধেয় 'অনবস্থা' দোষ আসিয়া পড়িবে, যাহা বারণ করিবার জন্য প্রতিবাদীকে বাধ্য হইয়া একস্থানে যাইয়া কালপ্রবাহে কারণ-কল্পনার শেষ করিতেই হইবে;—নিশ্চয়ই কোন একটী বস্তুকে উৎপত্তি-বিনাশবিহীন নিত্য মূল-কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে.—

"পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্।" ১।৬৮।

অর্থাৎ আমাদের পরিকল্পিত প্রকৃতির জন্যও অপর প্রকৃতি (কারণ) কল্পনা করিলে যে, দুর্ব্বার 'অনবস্থা' দোষ সম্ভাবিত হয়, যাহার ফলে কোন কালেই মূলকারণ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় না; সেই দোষ পরিহারের জন্য যদি নিশ্চয়ই একটী মূলকারণ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে কেবল নামভেদ ভিন্ন আর কিছুই লাভ হইল না; অর্থাৎ আমরা যাহাকে 'প্রকৃতি' নামে নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহাকেই তোমরা অপর একটী নূতন নামে অভিহিত করিবে মাত্র; সুতরাং ইহাতে কল্পনার গৌরব ছাড়া আর কিছুমাত্র লাঘব দৃষ্ট হয় না; অতএব—

"মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্।" ১।৬৭।

সূত্রকার বলিয়াছেন, মূলকারণের যখন আর কারণান্তর কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না; তখন মূলকারণটী নিশ্চয়ই অমূলক, অর্থাৎ সকলকার্য্যের মূলকারণ প্রকৃতির আর কারণান্তর নাই। ফলকথা,

যাহাকেই মূলকারণ বলিয়া কল্পনা করিবে, তাহাই আমাদের অভিমত প্রকৃতি। প্রকৃতির পরিচয় প্রদানপ্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্,
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে ;
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥"

এই একই শ্লোকে প্রকৃতির স্বরূপ, সংখ্যা ও কার্য্য প্রভৃতি অতি সংক্ষেপে ও সুস্পষ্ট কথায় বর্ণিত হইয়াছে। 'অজা' ও 'একা' বলায় নিত্যতা ও সংখ্যা জানা গেল ; 'লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং' কথায় যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ বলা হইল ; দ্বিতীয় চরণে প্রকৃতিসৃষ্ট জগতের ত্রিগুণময়ভাব সূচিত হইয়াছে ; আর তৃতীয় চরণে বদ্ধ জীবের ও চতুর্থ চরণে ভোগবিমুখ মুক্ত জীবের কথা উপন্যস্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ সাংখ্যশাস্ত্রে যে কয়টী বিষয় প্রধান বা মুখ্য, এই শ্লোকে সেই কয়টী বিষয়ই অতি সংক্ষেপে উপন্যস্ত হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ আরও বিশদভাবে একটী শ্লোকে প্রকৃতি ও পুরুষের উত্তম ছবি চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার শ্লোকটী এই :—

"ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং, তদ্বিপরীতস্তথাচ পুমান্॥" সাংখ্যকারিকা ১১॥

এখানে ব্যক্ত (প্রকৃতিজাত মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি), অব্যক্ত (প্রধান বা প্রকৃতি) ও পুরুষ এই ত্রিবিধ পদার্থেরই স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রকৃতি ও তৎকার্য্য সমস্তই ত্রিগুণাত্মক, এবং উহারা কখনও ত্রিগুণবিযুক্ত হইয়া থাকে না ; এইজন্য অবিবেকী ; অধিকন্তু সাধারণভাবে ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় বলিয়া 'সামান্য' ও 'বিষয়' পদবাচ্য। তাহার পর, আপনাদের অনুরূপ কার্য্যপ্রপঞ্চ প্রতিনিয়ত প্রসব করে বলিয়া ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই প্রসবধর্ম্মী—কার্য্যোৎপাদন উহাদের স্বভাব। সাংখ্যোক্ত পুরুষ কিন্তু ইহার বিপরীত,—ত্রিগুণত্ব বা অবিবেকাদি ধর্ম্মগুলি কখনও পুরুষে আশ্রয়লাভ করে না। কেন যে, আশ্রয় করিতে পারে না, তাহা পরে বলা হইবে।

[পুরুষ।]

উপরে যে, মূল প্রকৃতির কথা আলোচিত হইল, তাহা হইতেই তদতিরিক্ত ও তদ্বিপরীতস্বভাব পুরুষের অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। ত্রিগুণময়ী অচেতন প্রকৃতিই আপনার উপভোক্তা পুরুষের অস্তিত্ব ও অনুসন্ধান-পথ জানাইয়া দেয়। কেন না, দৃশ্যমান বস্তুনিচয় নিরীক্ষণ করিলে সহজেই জানিতে পারা যায় যে, জাগতিক যে সমুদয় পদার্থ নিজে অচেতন জড়স্বভাব, এবং সংহত অর্থাৎ সাবয়ব বা সম্মিলিতভাবে কার্য্যকরে, সে সমুদয় পদার্থের অস্তিত্ব ও অবস্থিতি উভয়ই পরার্থ,—অপরের উপকার সাধনই উহাদের জন্ম ও স্থিতির একমাত্র উদ্দেশ্য। জড় পদার্থের স্বতন্ত্রভাবে স্বগত কোনও ভোগ সম্ভবপর হয় না, বা হইতে পারে না ; কাজেই পরার্থ-পরতাই উহাদের একমাত্র স্বভাব বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

উল্লিখিত প্রকৃতিও অচেতন জড়পদার্থ; এবং পরস্পরাপেক্ষিতভাবে কার্য্যকারী, গুণত্রয়ের সমষ্টি বলিয়া সংহত; সুতরাং তাদৃশ প্রকৃতিও পরার্থ—পরকীয় ভোগসাধনই যে, উহার মুখ্য বা একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় (১)। পক্ষান্তরে, প্রকৃতি যাহার ভোগ সম্পাদন করে, সে পদার্থটী কিন্তু ইহার বিপরীত। তাহাও যদি ত্রিগুণময় সংহত হইত, তবে তাহাকেও নিশ্চয়ই প্রকৃতির ন্যায় পরার্থপর হইতে হইত; সুতরাং অপরিহার্য্য অনবস্থা দোষ সে পক্ষে উপস্থিত হইত; সেই কারণে প্রথম কথিত 'পর' পদার্থ পুরুষকে ত্রিগুণরহিত অসংহত স্বীকার করিতে হয়। তাহার পর, অচেতন প্রকৃতি ও তৎকার্য্য বস্তুমাত্রই ভোগ্যশ্রেণীর অন্তর্গত; ভোগ্যমাত্রই ভোক্তাকে অপেক্ষা করে; ভোক্তা না থাকিলে ভোগ্যের অবস্থিতি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কারণ, ভোগ্য বস্তু নিজেই নিজের ভোক্তা হইতে পারে না (২)। অধিকন্তু চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত কোন অচেতনই কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না; অচেতন শকট কখনও অশ্বপ্রভৃতি চেতন

---

(১) এস্থলে সূত্রকার বলিয়াছেন—"সংহত-পরার্থত্বাৎ॥" ১।১৪০॥ অর্থাৎ যেহেতু শয্যা, আসন প্রভৃতি সংহত বস্তুমাত্রই অপর লোকের উপকারার্থ রচিত হয়, সেই হেতু সংহতা প্রকৃতিও পরার্থ। প্রকৃতির সেব্য সেই পর বস্তুটীর নাম পুরুষ।

(২) "ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ॥" (১।১৪১) এই সূত্র দ্বারা ত্রিগুণ-রহিত পুরুষকে প্রকৃতিবিপরীত—অসংহত বলা হইয়াছে। পুরুষ ত্রিগুণাত্মক হইলে তাহাকেও পরার্থ হইতে হইত।

লইয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না; অতএব অচেতন প্রকৃতির পরিচালনার্থও একটী চেতন অধিষ্ঠাতার প্রয়োজন হয়। অধিকন্তু, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কৈবল্য (মুক্তি) লাভের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। দুঃখ-নিবৃত্তিই কৈবল্যের প্রকৃত স্বরূপ; কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও তৎকার্য্য বুদ্ধিপ্রভৃতি বস্তুমাত্রই দুঃখের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ যে, উহাদের স্বরূপোচ্ছেদ ব্যতীত দুঃখনিবৃত্তির সম্ভবই হয় না; কারণ, বস্তু কখনই স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বাচিয়া থাকিতে পারে না; যেমন ঔষ্ণ্য-প্রকাশশূন্য অগ্নি। অতি বড় মূর্খলোকও আপনার উচ্ছেদ কামনা করে না; অতএব বিদ্বজ্জনগণের ঐরূপ কৈবল্যলাভের চেষ্টা হইতে অনুমিত হয় যে, সুখ-দুঃখবিনির্ম্মুক্ত এমন কেহ আছে; যাহার পক্ষে ঐরূপ কৈবল্য কামনা করা সম্ভব হয় (১)। অতএব, যেহেতু সংহত পদার্থমাত্রই পরার্থ; যেহেতু সেই 'পর' পদার্থটী ত্রিগুণরহিত অসংহত না হইলে উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না; যেহেতু চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতনের কার্য্যই সম্ভবপর হয় না; যেহেতু ভোক্তার অভাবে

---

(১) "অধিষ্ঠানাৎ॥" ১।১৪২ সূত্র॥

এই সূত্রে অচেতনের অতিরিক্ত চেতন পদার্থের আবশ্যকতা প্রমাণিত হইয়াছে। গাড়ী প্রভৃতি অচেতন পদার্থকে পরিচালিত করিবার জন্য যেমন চেতন অশ্ব প্রভৃতির আবশ্যক হয়, তেমনি অচেতন প্রকৃতির পরিচালনের জন্যও চেতন পুরুষের আবশ্যক হয়। এক অচেতন কখনই অপর অচেতনের প্রেরক হয় না বা হইতে পারে না।

ভোগ্যের অবস্থিতিই সার্থক হইতে পারে না; এবং যেহেতু বিদ্বান্ লোকেও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ কৈবল্য লাভের জন্য কঠোরতর সাধনা-ক্লেশ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন; সেইহেতু স্বীকার করিতে হইবে যে,—

[পুরুষ]

"শরীরাদি-ব্যতিরিক্তঃ পুমান্ [অস্তি] ॥" ১।১৩৯ ॥

স্থুল শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতিপর্য্যন্ত পরিগণিত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত অচেতন-বিলক্ষণ—পুরুষ নামে একটী স্বতন্ত্র চেতন পদার্থ আছে। বলা বাহুল্য যে, সেই পুরুষকেই প্রকৃতির সেব্য, ভোক্তা, অধিষ্ঠাতা, ত্রিগুণরহিত ও মোক্ষভাগী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে (১)।

প্রকৃতির পরিণামভূতা বুদ্ধি নিজে জড় পদার্থ; অগ্রে সে নিজে পুরুষের প্রতিবিম্বে (ছায়ায়) প্রকাশমান হয়, পরে অপর

---

(১) সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ পুরুষের অস্তিত্বসাধনোপযোগী সমস্ত হেতু একটীমাত্র শ্লোকে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্লোকটী এই—

"সংহত-পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥"

(সাংখ্যকারিকা ১৭ ॥)

তাৎপর্য্য—যেহেতু সংহত বা সম্মিলিতভাবে কার্য্যকারী পদার্থমাত্রই পরার্থ; যেহেতু সেই 'পর' পদার্থটী ত্রিগুণাদি-রহিত না হইলে দোষ হয়; যেহেতু চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন প্রকৃতির ক্রিয়া অসম্ভব হয়; যেহেতু ভোগ্য থাকিলেই তাহার ভোক্তা থাকা আবশ্যক হয়; এবং যেহেতু কৈবল্যলাভের জন্য লোকের চেষ্টা দৃষ্ট হয়, সেইহেতু প্রকৃতি ও তৎকার্য্য মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির অতিরিক্ত চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

সকল বস্তুকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু বুদ্ধি যতক্ষণ পুরুষের ছায়াপ্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে বাহ্য বা আন্তর কোন বিষয়ই প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না; এইজন্যই বুদ্ধি স্ববিষয় প্রকাশের জন্য পুরুষের সহায়তা অপেক্ষা করে, কিন্তু পুরুষকে কখনও প্রকাশের জন্য অপরকে অপেক্ষা করিতে হয় না, বা করিবার আবশ্যকও হয় না। তাহার কারণ—

"জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ॥" ১।১৪৫ ॥

পুরুষ স্বয়ং প্রকাশময় চিৎপদার্থ। বুদ্ধির ন্যায় পুরুষও জড় পদার্থ হইলে, অবশ্য তাহা দ্বারা কখনই পরকে প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না। তাহার পর, পুরুষের ঐ যে, চৈতন্য বা জ্ঞানশক্তি, তাহা আগন্তুক গুণবিশেষ নহে; অর্থাৎ ন্যায়মতে যেরূপ অচেতন আত্মাতে মনঃসংযোগ বশতঃ অভিনব জ্ঞান-গুণের আবির্ভাব স্বীকৃত হয়, সাংখ্যমতে পুরুষের জ্ঞানশক্তি সেরূপ আগন্তুক গুণবিশেষ নহে;—কারণ, শ্রুতিতে পুরুষের নির্গুণত্ব কথিত আছে; অতএব—

"নির্গুণত্বাৎ ন চিদ্ধর্ম্মা॥" ১।১৪৬ ॥

চৈতন্য বা জ্ঞানশক্তিকে পুরুষের ধর্ম্ম বা গুণ বলিতে পারা যায় না; পরন্তু চৈতন্যই তাহার স্বরূপ (ক)। কেহ কেহ যে,

(ক) আত্মা যে, জ্ঞানস্বরূপ, তদ্বিষয়ে পুরাণাচার্য্যগণের উক্তি আরও স্পষ্টতর—

"জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্ম্মো ন গুণো বা কথংচন।
জ্ঞানস্বরূপ এবাত্মা নিত্যঃ পূর্ণঃ সদা শিবঃ॥"
(সাংখ্যভাষ্য ১।১৪৬॥)

আত্মাকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের সে কথাও সত্য বা সমীচীন নহে ; কেন না,—

"নৈকস্যানন্দ-চিদ্রূপত্বে, দ্বয়োর্ভেদাৎ ॥" ৫।৬৬ ॥

আনন্দ ও চৈতন্য একই বস্তুর স্বরূপভূত হইতে পারে না ; কারণ, অনুভবে ঐ দুইটী পদার্থের অত্যন্ত বিভিন্নতা প্রমাণিত হয়। তবে যে, "সত্যং জ্ঞানমানন্দম্" শ্রুতিতে পুরুষকে আনন্দ-রূপ বলা হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক আনন্দ নহে ; পরন্তু—

"দুঃখনিবৃত্তের্গৌণঃ ॥ ৫।৬৭ ॥

আত্মা স্বভাবতই নির্গুণ ; তাহার দুঃখ-সম্বন্ধ কস্মিন্ কালে ছিলও না, হইবেও না, এবং বর্ত্তমানেও নাই। নাই বলিয়াই, তাহাকে আনন্দরূপ বলা হইয়াছে ; বস্তুতঃ ঐ কথা 'দুঃখাভাবঃ সুখম্' এই প্রসিদ্ধ প্রবচনেরই অনুবাদ—গৌণার্থবোধক মাত্র (খ)।

উপরে, যে পুরুষের বিষয় আলোচিত হইল, সেই পুরুষই আত্মা। আত্মা চেতন, অসঙ্গ, উদাসীন ও সর্ব্বব্যাপী এবং

(খ) দুঃখের নিবৃত্তিতেও যে, সুখবুদ্ধি হয়, লোকব্যবহারই তাহার প্রমাণ। অত্যধিক ভারবাহী ব্যক্তি সেই ভার ত্যাগ করিয়া সুখ বোধ করে ; উৎকট রোগযন্ত্রণাক্লিষ্ট লোক রোগনিবৃত্তিতে আনন্দ পায়, অথচ উক্ত ভারবাহী বা রোগী ভারত্যাগ ও রোগমুক্তি ছাড়া এমন কোনও ভোগ্য বিষয় পায় না, যাহাতে তাহাদের সুখ বোধ হইতে পারে। অথচ তাহারা যে, সুখবোধ করে, সে বিষয়ে কাহারো মতভেদ নাই। আত্মার সম্বন্ধে প্রতিকথিত আনন্দও ঠিক সেই প্রকার বুঝিতে হইবে।

অনেক—প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন (*)। আত্মা নিষ্ক্রিয় হইয়াও বুদ্ধির ক্রিয়ায় যেন সক্রিয় হয়, এবং সুখ-দুঃখাদিবিহীন হইয়াও বুদ্ধিগত সুখ-দুঃখাদি দ্বারা যেন সুখ-দুঃখাদিসম্পন্ন বলিয়াই ভ্রান্তি হয়। বুদ্ধির সহিত পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য-বোধের অভাবই এই জাতীয় সমস্ত ভ্রান্তির নিদান। এ সকল কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(*) বৈদান্তিকগণ বলেন—সর্ব্বদেহে আত্মা এক; দেহভেদেও আত্মার ভেদ হয় না। এ কথার বিপক্ষে সূত্রকার বলিয়াছেন—

"জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্॥" ১৪৯॥

সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণও আত্মার (পুরুষের) অনেকত্ব সংস্থাপনের অনুকূলে অনেকগুলি হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন—

"জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়াচ্চৈব॥"

(সাংখ্যকারিকা ১৮॥)

তাৎপর্য্য এই যে, জন্ম অর্থ উৎপত্তি—নূতন দেহপ্রাপ্তি; মরণ অর্থ—দেহবিনাশ; করণ অর্থ—ইন্দ্রিয়বর্গ। এ সমস্তই প্রত্যেকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে। একের জন্মে, মরণে বা ইন্দ্রিয়বৈকল্যে যখন অপরের জন্ম, মরণ বা ইন্দ্রিয়-বিঘাত ঘটে না, তখন বুঝা যায় যে, আত্মা বহু—প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন। পক্ষান্তরে, সকলের দেহে যদি একই আত্মা থাকিত, তাহা হইলে একের জন্ম, মরণ বা ইন্দ্রিয়-বৈকল্য ঘটিলে, সকলেই সমানভাবে জন্মমরণাদি অবস্থা অনুভব করিত; তাহা যখন করে না, তখন বুঝিতে হইবে, আত্মা এক নহে—অনেক। সাত্ত্বিকাদি গুণের প্রভেদও পুরুষ-ভেদের দ্যোতক; সর্ব্বদেহে একই পুরুষ থাকিলে, কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজসিক, কেহ বা তামসিক, এই প্রভেদ ঘটিতে পারিত না; অতএব পুরুষ এক নহে—অনেক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি নিজে ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন ও জ্ঞানশক্তিবিহীন ; পুরুষ আবার জ্ঞানশক্তিযুক্ত হইয়াও ক্রিয়া-শক্তিবিহীন ; কাজেই প্রকৃতি বা পুরুষ, কেহই একাকী সৃষ্টি-সাধনে সমর্থ হয় না ; এইজন্য সাংখ্যাচার্য্যগণ একটী সুন্দর উপমার উদ্ভাবন করিয়াছেন, এবং তাহা দ্বারাই সৃষ্টিব্যাপার উপ-পাদন ও সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—

"পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।"

অর্থাৎ একজন ক্রিয়াশক্তিবিহীন পঙ্গু, অপর একজন দৃষ্টিশক্তিবিহীন অন্ধ, ইহারা যেমন একাকী গমনাদি ক্রিয়া করিতে পারে না ; কিন্তু উভয়ে মিলিত হইয়া পারে, অর্থাৎ পঙ্গু ব্যক্তি অন্ধের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক পথনির্দ্দেশ করিয়া দিলে পর, গমনশক্তি-সম্পন্ন অন্ধ যেরূপ তদনুসারে পথ চলিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে ; সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিও চেতন পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে বিচিত্র জগৎপ্রপঞ্চ রচনা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সেইজন্য বলেন, পঙ্গুর সহিত অন্ধের ন্যায় অগ্রে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ ঘটে, পরে সেই সংযোগের (১) ফলে ত্রিগুণা প্রকৃতির অঙ্গে বিক্ষোভ বা স্পন্দন উপস্থিত হয়। ত্রিগুণের মধ্যে রজোগুণই ক্রিয়াশীল বা চলনস্বভাব ; সুতরাং প্রথমে তাহাতেই বিক্ষোভ

(১) জীবের অদৃষ্টই প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ ঘটাইয়া থাকে। সৃষ্টি ও অদৃষ্টপ্রবাহ অনাদি ; সুতরাং কোন কালেই অদৃষ্টের অভাব ছিল না।

উপস্থিত হয়; পরে সেই বিক্ষোভের প্রভাবে অপর গুণদ্বয়েও যথাসম্ভব স্পন্দন দেখা দেয়। তাহার ফলে গুণত্রয়ের মধ্যে একটা বিষম বিমর্দ্দন উপস্থিত হয়,—একে অপরকে পরাভূত করিতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতে থাকে। এই বিমর্দ্দন হইতেই বিশ্বসৃষ্টির সূত্রপাত আরম্ভ হয়। সেই বিষম বিমর্দ্দনের ফলে ত্রিগুণা প্রকৃতি হইতে সর্ব্বপ্রথমে যে তত্ত্বটী প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার নাম বুদ্ধি।

[মহৎ তত্ত্ব]

লিঙ্গপুরাণে উক্ত আছে—

"গুণক্ষোভে জায়মানে মহান্ প্রাদুর্বভূব হ।
মনো মহাংশ্চ বিজ্ঞেয় একং তত্ত্বৃত্তিভেদতঃ ॥" (ভাষ্য ১।৬৪।)

এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক গুণত্রয়ের মধ্যে বিক্ষোভ উপস্থিত হইবার পর, প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহত্তত্ত্বের অভিব্যক্তি হইয়াছে। মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধি, চিত্ত ও অন্তঃকরণ প্রভৃতি। মহত্তত্ত্বই এই বিশাল বিশ্বতরুর সূক্ষ্ম অঙ্কুরাবস্থা। এখান হইতেই সূক্ষ্ম-স্থূলক্রমে জাগতিক সমস্ত বস্তু পর পর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। স্বয়ং সূত্রকারও—

"মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ ॥" ১।৭১ ॥

এই সূত্রে মহত্তত্ত্বকেই প্রকৃতির আদ্য কার্য্য বা প্রথম পরিণাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধিতত্ত্ব। বুদ্ধির কার্য্য বা ব্যাপারকে অধ্যবসায় (অবধারণ করা) বলে। এই অধ্যবসায়ই বুদ্ধিতত্ত্বের পরিচায়ক বা বিশেষ লক্ষণ,—

"অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ ॥" ২।১৩ ॥

অধ্যবসায় অর্থ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। সেই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিই বুদ্ধিতত্ত্বের অসাধারণ ধর্ম্ম; এই অসাধারণ্য জ্ঞাপনের জন্যই সূত্রে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—"অধ্যবসায়ঃ বুদ্ধিঃ"। আমরা চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় বা অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্যে সচরাচর যে সমুদয় বিষয় অনুভব করিয়া থাকি; বুদ্ধিই সেই সমুদয় বিষয় সম্বন্ধে একটা নিশ্চয়াত্মক—'ইহা এই প্রকারই' ইত্যাকার জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে (১)।

উক্ত মহত্তত্ত্ব হইতেই অহঙ্কার প্রভৃতি অবশিষ্ট সমস্ত জড়তত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সূত্রকার বলিয়াছেন—

"আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেঽপ্যণুবৎ॥" ১।৭৪॥

অর্থাৎ উক্ত মহত্তত্ত্বই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কার্য্যসমুৎপাদনের নিদান হইলেও, বস্তুতঃ মূলকারণ প্রকৃতিই পরম্পরাক্রমে সে সমুদয় কার্য্যোৎপাদনের উপাদান কারণ। ন্যায়দর্শনের মতে যেমন পরমাণুজাত দ্ব্যণুক-ত্রসরেণুক্রমে জগতের সৃষ্টি হইলেও, দ্ব্যণুকাদি দ্বারা পরমাণুরই কারণতা স্বীকৃত হয়, এখানেও ঠিক তেমনই মহত্তত্ত্বাকারে পরিণত প্রকৃতিকেই নিখিল জগৎ-সৃষ্টির মূলকারণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, স্বয়ং

---

(১) অতঃপর মনের কথাপ্রসঙ্গে সমস্ত অন্তঃকরণের কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করা হইবে।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মহত্তত্ত্ব তিন প্রকার—

"সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্॥"

(সাংখ্যভাষ্য ২।১৮)

প্রকৃতিই প্রথমে মহত্তত্ত্বের আকার গ্রহণ করিয়া, সেই আকারেই অপরাপর কার্য্যবর্গ সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ পরিকল্পনার ফলে 'প্রকৃতিঃ সর্ব্বকারণম্' ইত্যাদি ঋষিবচনেরও সম্পূর্ণরূপে মর্য্যাদা রক্ষিত হয় (১)।

বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতির সত্ত্বাংশ হইতে সমুৎপন্ন ; এই কারণে,—

"তৎকার্য্যং ধর্ম্মাদি" ॥ ২।১৪ ॥

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, এই সমুদয় কার্য্য-সমুৎপাদন করাই উহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ ; কিন্তু—

"মহদুপরাগাদ্ বিপরীতম্ ॥" ২।১৫ ॥

সেই মহত্তত্ত্বই আবার যখন রজঃ বা তমোগুণে উপরঞ্জিত হয়, অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে পরিচালিত হয়, তখন তাহার আর সে ভাব থাকে না ; তখন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম, জ্ঞানের বিনিময়ে অজ্ঞান, বৈরাগ্যের স্থানে অবৈরাগ্য বা বিষয়ানুরাগ এবং ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে অনৈশ্বর্য্য আসিয়া বুদ্ধিকে কলুষিত করিয়া রাখে। তাহার ফলে, বুদ্ধি তখন অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য বিষয়ে অনুরাগ পোষণ করিতে থাকে।

---

(১) এই সিদ্ধান্ত-সমর্থনের জন্য সূত্রকার ষষ্ঠাধ্যায়ে পুনরায় বলিয়াছেন—

"পারম্পর্য্যেঽপি প্রধানানুবৃত্তিরণুবৎ ॥" ৬।৩৫ ॥

মহত্তত্ত্ব সাধারণতঃ প্রকৃতির সাত্ত্বিকাংশ হইতে সমুৎপন্ন হয় ; এইজন্য মহত্তত্ত্বসমষ্টিদ্বারা উপহিত পুরুষকে 'হিরণ্যগর্ভ' ও 'বিরাট্' পুরুষ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

এইজন্য বিবেকী ব্যক্তিরা আপন আপন বুদ্ধিকে রজঃ ও তমো-গুণের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনাচার ও অসৎসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করেন, এবং সত্ত্বগুণের উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত সদা সদাচার ও সৎসঙ্গের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

[অহঙ্কার-তত্ত্ব।]

উপরি উক্ত সাত্ত্বিক মহত্তত্ত্ব হইতে অন্তঃকরণের আর একটী রূপ অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম অহঙ্কার-তত্ত্ব। স্বয়ং সূত্রকার—

"চরমোঽহঙ্কারঃ ॥" ১।৭২ ॥

এই সূত্রে অহঙ্কার-তত্ত্বকে প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং "অভিমানোঽহঙ্কারঃ।" (২।১৩) এই সূত্রে 'আমি আমার' ইত্যাকার অভিমানকেই অহঙ্কার-তত্ত্বের অসাধারণ কার্য্য ও লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহত্তত্ত্বের ন্যায় অহঙ্কার-তত্ত্বও কেবলই সাত্ত্বিক নহে; উহারও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার অবস্থা বিদ্যমান আছে; তদনুসারে বৈকারিক (বৈকৃত), তৈজস ও ভূতাদি বা তামস, এই ত্রিবিধ পৃথক্ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে এবং একই অহঙ্কার হইতে পর্য্যায়ক্রমে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—ত্রিবিধ কার্য্যই উৎপন্ন হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই-জন্য একই 'অহঙ্কার-তত্ত্ব' হইতে—পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-প্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ, এই একাদশপ্রকার ইন্দ্রিয়, এবং পাঁচ

প্রকার তন্মাত্র, এই ষোড়শ তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে (১)। উক্ত ষোড়শ তত্ত্বের মধ্যে—

"সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ॥" ২।১৬॥

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনই একমাত্র সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন—সাত্ত্বিক : সেই জন্য উহাদের মধ্যে একমাত্র মন ও ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক একাদশ দেবতা সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে, এবং মন ভিন্ন দশবিধ ইন্দ্রিয় রাজসিক অহঙ্কার হইতে, আর 'ভূতাদি'-পদবাচ্য তামসিক অহঙ্কার হইতে তামসিক পঞ্চ তন্মাত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছে (২)। সাংখ্যমতে

---

(১) জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও ঘ্রাণ। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ—বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (মূত্রদ্বার)। তন্মাত্র পাঁচ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ. ইহারা প্রত্যেকেই তন্মাত্র পদবাচ্য।

(২) ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু কয়েকটী পৌরাণিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টী পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়াছেন—

"বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা।
অহংতত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাৎ মনো বৈকারিকাদভূৎ।
বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনং যতঃ।
তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞান-কর্ম্মময়ানি চ।
তামসো ভূতসূক্ষ্মাদির্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ॥" (সাংখ্য ভাষ্য ২।১৮)

এখানে কেবল মনকেই সাত্ত্বিক অহঙ্কারের পরিণাম বলা হইয়াছে, কিন্তু আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ একাদশ ইন্দ্রিয়কেই সাত্ত্বিক অহঙ্কার-প্রসূত বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও সেই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। অধিকন্তু, রাজস অহঙ্কারের পৃথক্ কোন কার্য্য স্বীকার না করিয়া উক্ত দ্বিবিধ কার্য্যেই রাজস অহঙ্কারের আনুকূল্যমাত্র স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তের সিদ্ধান্তও ঠিক এই মতেরই অনেকটা অনুরূপ।

মন অন্তঃকরণ হইয়াও ইন্দ্রিয়শ্রেণীর অন্তর্গত ; কেন না, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মনও সাত্ত্বিক অহঙ্কারসম্ভূত। এই কারণে এবং অন্যান্য কারণেও প্রসিদ্ধ ইন্দ্রিয়গণের সহিত উহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য আছে বলিয়াই সাংখ্যাচার্য্যগণ মনকে ইন্দ্রিয়মধ্যে গণনা করিয়াছেন। মনের বিশেষ কার্য্য হইতেছে—সংকল্প-বিকল্প, অর্থাৎ 'ইহা অমুক, না—অমুক, ইহা শ্বেত, না—পীত' ইত্যাদি প্রকারে সংশয় সমুত্থাপন করা (১)।

বাচস্পতি মিশ্রের মতে মন ও দশবিধ ইন্দ্রিয় উভয়ই সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ; সুতরাং উহারাও সাত্ত্বিক। তন্মধ্যে মন উভয়াত্মক, অর্থাৎ মনঃসংযোগ ব্যতীত যখন জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয়, কেহই কোন কাজ করিতে সমর্থ হয় না, তখন উহা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রেরণাকালে কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপে, আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রেরণাকালে জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপে পরিগণনীয় হয়। মনের যে, এবংবিধ উভয়াত্মকতা, তাহা বিজ্ঞানভিক্ষুরও অনভিমত নহে ; কারণ,

---

(১) ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—

"উভয়াত্মকমত্র মনঃ সংকল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ ॥"

ইহা ছাড়া তিনি একাদশ ইন্দ্রিয়কেই সাত্ত্বিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসঃ, তৈজসাদুভয়ম্ ॥" (সাংখ্যকারিকা ২৪)

এখানে একাদশ ইন্দ্রিয়কে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন বলিয়াছেন, এবং রাজসিক অহঙ্কারের পৃথক্ কার্য্য নিষেধ করিয়াছেন।

স্বয়ং সূত্রকারই "উভয়াত্মকং মনঃ" (২।২৬) সূত্রে মনকে উভয়াত্মক (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ভৌতিক,—বিভিন্ন ভূতের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে সমুৎপন্ন; কোন ইন্দ্রিয়ই আহঙ্কারিক নহে। বিশেষতঃ ন্যায় ও বৈশেষিকমতে অহঙ্কার বলিয়া কোন তত্ত্বই নাই; সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গের আহঙ্কারিকত্ব বিষয়ে আশঙ্কাই হয় না (১)। সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেবের মত স্বতন্ত্র। তিনি বলেন—

"আহঙ্কারিকত্বশ্রুতের্ন ভৌতিকানি॥" ২।২০॥

অর্থাৎ শ্রুতি ও তদনুগত স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে যখন ইন্দ্রিয়গণকে আহঙ্কারিক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন উহারা আহঙ্কারিক ভিন্ন ভৌতিক হইতেই পারে না। অতএব ইন্দ্রিয়গণ যে, অহঙ্কার-তত্ত্বেরই পরিণাম,—কোন ভূতের নহে; ইহাই সাংখ্যের অভিমত সিদ্ধান্ত (২)। ইন্দ্রিয়মাত্রই অতীন্দ্রিয়, অর্থাৎ

(১) ন্যায় ও বৈশেষিকমতে অহঙ্কার কোনও স্বতন্ত্র পদার্থ নহে,—মনেরই বৃত্তিবিশেষ মাত্র। বেদান্তমতে—অহঙ্কার অন্তঃকরণেরই অন্তর্গত একটী পদার্থ সত্য, কিন্তু উহা ভৌতিক—অন্তঃকরণেরই একটী বৃত্তিবিশেষ মাত্র; সুতরাং সেসকল মতে ইন্দ্রিয়গণের ভৌতিকত্ব ছাড়া আহঙ্কারিকত্ব সিদ্ধ হয় না।

(২) ইন্দ্রিয়গণের আহঙ্কারিকত্ব প্রতিপাদক কোন শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয় না; স্মৃতি-পুরাণ-বচনই দৃষ্ট হয় মাত্র; তথাপি ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—"প্রমাণভূতা শ্রুতিঃ কাললুপ্তাপি আচার্য্যবাক্যাৎ, মন্বাদ্যখিলস্মৃতিভ্যশ্চ অনুমীয়তে।" (২।২০)। ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়। যাহা ইন্দ্রিয় বলিয়া প্রত্যক্ষ করা হয়, সেগুলি বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়ের গোলক বা বাসস্থান মাত্র। অজ্ঞ লোকেরা সেগুলিকেই ইন্দ্রিয় বলিয়া ভুল করিয়া থাকে। একথা সূত্রকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন,—

"অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে ॥" ২।২৩॥

ইন্দ্রিয়সমূহের উপাদান ও ক্রিয়াবিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ থাকিলেও ইন্দ্রিয়গণ যে, অতীন্দ্রিয়, এ বিষয়ে সকল দার্শনিকই একমত হইয়াছেন; সুতরাং এবিষয়ে অধিক কথা বলা অনাবশ্যক।

অতঃপর স্বতই জানিতে ইচ্ছা হয় যে, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের উৎপত্তি বিষয়ে যেমন পারম্পর্য্যবোধক শাস্ত্রবচন দৃষ্ট হয়, অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন উক্ত ষোড়শ পদার্থের উৎপত্তিতেও সেরূপ কোনও ক্রমের কথা কোথাও পরিলক্ষিত হয় কি না। একই সময়ে যে, অহঙ্কার হইতে অপর্য্যায়ে ষোড়শ পদার্থের উৎপত্তি, তাহাও যেন যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে সাংখ্যাচার্য্য বলেন— যদিও একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যুক্তিদ্বারা পারম্পর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না সত্য, তথাপি শাস্ত্রান্তরের সাহায্যে উহাদের উৎপত্তিতেও একটা ক্রম বা পারম্পর্য্য নির্দ্ধারণ করা বড় কঠিন হয় না। মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মে কথিত আছে—

"শব্দরাগাৎ শ্রোত্রমস্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ।
রূপরাগাদভূৎ চক্ষুঃ ঘ্রাণো গন্ধ-জিঘৃক্ষয়া"॥ ইত্যাদি।

অর্থাৎ সেই আদি পুরুষের প্রথমে শব্দ শ্রবণের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা হইল; তাহার ফলে শব্দগ্রহণোপযোগী শ্রবণেন্দ্রিয়

প্রাদুর্ভূত হইল। এইরূপ রূপ-দর্শনের অভিলাষে চক্ষুঃ এবং গন্ধ আঘ্রাণের ইচ্ছায় ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রকাশ পাইল; এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভোগের ইচ্ছায় অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলিও প্রাদুর্ভূত হইল।

উল্লিখিত বাক্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, অগ্রে শব্দাদি বিষয়ভোগের অভিলাষ, পশ্চাৎ সেই সেই বিষয়ের গ্রহণোপযোগী ইন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি। অভিলাষ বা অনুরাগ সাধারণতঃ মনের ধর্ম্ম; মনঃ অগ্রে না থাকিলে অনুরাগের কথাই হইতে পারে না; সুতরাং উক্ত বাক্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অহঙ্কার হইতে সর্ব্ব প্রথমে মনের সৃষ্টি; অনন্তর শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি (১)। শ্রোত্রাদি দশবিধ ইন্দ্রিয় ও পাঁচ প্রকার তন্মাত্রের

---

(১) ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু কেবল মন ও ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টিতেই পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিয়াছেন; ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টিতে ক্রম স্বীকার করেন নাই; অথচ সেই সমুদয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয়ের উৎপত্তিতে ক্রমিকতা স্বীকার করিয়াছেন। এতদনুসারে ক্রমোৎপন্ন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়ে ক্রমোৎপন্ন অনুরাগানুসারে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনা ও জিহ্বা, এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়েরও ক্রমোৎপত্তি কল্পনা করা বিশেষ অসঙ্গত মনে হয় না। আরও এক কথা,—ভোগ্য বিষয় বিদ্যমান থাকিলেই তদ্বিষয়ে ভোগের আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। উক্ত ভারতবাক্যেও শব্দাদি বিষয় গ্রহণের জন্যই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-সৃষ্টির কথা লিখিত আছে; অতএব ইন্দ্রিয়-সৃষ্টির অগ্রেই শব্দাদি বিষয়ের সৃষ্টি-কল্পনা যে, কেন অসঙ্গত হইবে, তাহা ভাষ্যকার বুঝাইয়া দেন নাই, অথবা তদ্বিষয়ে কোন আলোচনাও করেন নাই। কাজেই উক্ত সংশয় নিরাসের কোন পথ দেখা যায় না।

সৃষ্টিতে পৌর্ব্বাপর্য্যবোধক কোনও প্রমাণ না থাকায়, উহাদের উৎপত্তিতে কোনপ্রকার ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্য-নিয়ম কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না। তবে তন্মাত্র সৃষ্টির মধ্যে যে, অবশ্যই পৌর্ব্বাপর্য্য বা একটা ক্রম বিদ্যমান আছে, তাহা পৌরাণিক বচন হইতে জানিতে পারা যায়। যথা,—

"ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দমাত্রং সসর্জ্জ হ।
আকাশং সুষিরং তস্মাদুৎপন্নং শব্দলক্ষণম্।
আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ।" ইত্যাদি।

অভিপ্রায় এই যে, তামস (ভূতাদি) অহঙ্কার বিক্ষুব্ধ হইয়া প্রথমে শব্দ-তন্মাত্র সৃষ্টি করিল; সেই শব্দতন্মাত্র হইতে আবার অবকাশাত্মক ভূতাকাশ সমুৎপন্ন হইল। এই আকাশেই শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দ অভিব্যক্ত হইল। পুনশ্চ আকাশেও বিক্ষোভ উপস্থিত হইল; সেই আকাশ-সহযোগে তামস অহঙ্কার—স্পর্শ-তন্মাত্র সৃষ্টি করিল, ইত্যাদি ক্রমে মূল অহঙ্কার হইতেই পর-পর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র প্রকাশ পাইল (১), এবং সেই পঞ্চবিধ তন্মাত্র হইতে পাঁচপ্রকার স্থূলভূতের (আকাশাদির) উৎপত্তি হইল। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব, এখন ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

---

(১) তন্মাত্র অর্থ—শুদ্ধ সেই বস্তুটী। 'শব্দতন্মাত্র' বলিলে বুঝিতে হইবে, শুদ্ধ শব্দমাত্র; উহাতে সুখ, দুঃখ বা মোহের সম্পর্ক নাই; সুতরাং মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য; এইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে উহাদিগকে 'অবিশেষ' বলা হইয়া থাকে। শান্ত, ঘোর ও মোহসম্পন্ন বস্তুই 'বিশেষ', তদ্ভিন্ন সমস্তই 'অবিশেষ'।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, দশপ্রকার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। তন্মধ্যে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও নাসিকা, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে বিষয় হইতেছে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; আর বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (জননেন্দ্রিয়), এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় হইতেছে—যথাক্রমে বচন (শব্দোচ্চারণ), গ্রহণ, বিচরণ, মলাদিত্যাগ ও আনন্দ। বিশেষ এই যে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা কার্য্য হইতেছে ক্রিয়াসম্পাদন, আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইতেছে জ্ঞান-সমুৎপাদন। এ জ্ঞান পরিস্ফুট বা বিশিষ্টতা-বোধ নহে; অপরিস্ফুট—আলোচনা মাত্র। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তাহাদ্বারা কোন বস্তুরই কোন বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় না; কেবল একটা বস্তুমাত্রের স্ফুরণ বা প্রতীতি হয় মাত্র।

[ইন্দ্রিয়বৃত্তির যৌগপদ্য।]

উপরি উক্ত বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও শ্রোত্রাদি পাঁচপ্রকার ইন্দ্রিয়, ইহারা সকলেই যথাযোগ্য জ্ঞানসম্পাদন করিয়া থাকে; জ্ঞানসম্পাদন করাই উহাদের মুখ্য ও প্রধান কর্ম্ম; কিন্তু সেই জ্ঞানোৎপাদন কার্য্য যে, ক্রমেই হইবে, কিংবা অক্রমেই (যুগপৎ) হইবে, তাহার কোনও নিয়ম নিবদ্ধ নাই, এবং থাকিতেও পারে না। সময় ও অবস্থানুসারে একই সময়ে সমস্ত করণবর্গেরই ব্যাপার হইতে পারে, আবার অবস্থাভেদে ক্রমশও হইতে পারে (১)। এইজন্য সূত্রকার বলিয়াছেন—

"ক্রমশোঽক্রমশশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ ॥" ২।৩২॥

(১) নৈয়ায়িকগণ প্রধানতঃ জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার করেন না;

এই অব্যবস্থা যে, কেবল সূত্রের অনুরোধেই মানিয়া লইতে হইবে, তাহা নহে ; পরন্তু লোকব্যবহার দৃষ্টেও একথা স্বীকার করিতে হইবে। দেখা যায়—ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে আকাশ নিবিড় জলদজালে পরিবৃত, এবং নিরন্তর বিদ্যুৎপ্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছে, এমন সময়ে কোন পথিক বনপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ বিদ্যুতের আলোকে সম্মুখে একটা কিছু দেখিতে পাইল ; কিন্তু জিনিষটা যে কি, তাহা বুঝিতে পারিল না ; কেন না, চক্ষুঃ ইহার অধিক আর কিছু বুঝাইতে পারে না ; (ইহাকেই বলে 'আলোচনা')। সেই সময়েই মনঃ যাইয়া সেই দৃষ্ট বস্তুটার সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক আরম্ভ করিল,—ইহা কি মৃত্তিকাস্তূপ ? না, বাঘ ? অথবা আর কিছু ? সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারও সেই দৃশ্য বস্তুটার সহিত আপনার খাদ্য-খাদকভাব সম্পর্ক বুঝাইয়া দিল ; সেই মুহূর্ত্তেই বুদ্ধি বলিয়া দিল যে, ইহা আর কিছু নহে—বাঘ ; এখনই পলায়ন করা আবশ্যক। বুদ্ধির নিকট হইতে এইরূপ কর্ত্তব্যোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া দ্রষ্টা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। এস্থলে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আলোচনা, মনের বিচার করা, অহঙ্কারের অভিমান, এবং বুদ্ধির কর্ত্তব্যোপদেশ, এ সমুদয় একই সময়ে অপর্য্যায়ে উৎপন্ন হইয়াছে। উল্লিখিত কার্য্যগুলি ক্রমশঃ হইতে থাকিলে, ব্যাঘ্রের নিকট হইতে পলায়ন করা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভব হইত না। অক্রমের ন্যায় ক্রমশঃ জ্ঞানোৎপত্তিরও যথেষ্ট উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

তাহারা বলেন—জ্ঞানমাত্রই পর পর বিভিন্ন সময়ে হয়, কেবল ক্ষিপ্রতা-বশতঃ সেই ক্ষণবিভাগটা লোকের অনুভবে আসে না মাত্র ; তাই জ্ঞানের যৌগপদ্য বিষয়ে ভ্রান্তি উপস্থিত হয়।

যেমন—ঈষৎ অন্ধকারের মধ্যে একজন সম্মুখে কি যেন একটা দেখিল; কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। শেষে প্রণিধানপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া বুঝিল যে, সম্মুখস্থ বস্তুটা আর কিছুই নহে, একটা ভীষণ দস্যু,—আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে; এখন আমার পলায়ন করাই আবশ্যক। এইরূপ স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। এখানে চক্ষুর 'আলোচনা', মনের বিচার, অহঙ্কারের অভিমান (আমি ইহার বধ্য, ইত্যাকার চিন্তা) ও বুদ্ধির অধ্যবসায় বা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ, এবং পলায়ন-প্রবৃত্তি, এই সমুদয় ব্যাপার যথাক্রমে পর পর সমুৎপন্ন হইয়াছিল। এই জাতীয় উদাহরণ দৃষ্টে বেশ বুঝা যায় যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি যে, ক্রমেই হইবে, বা অক্রমেই হইবে, তাহার কোনও নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই।

বুদ্ধি, অহঙ্কার, ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ত্রয়োদশটীকে সাংখ্য-শাস্ত্রে 'করণ' বলে। করণ অর্থ এখানে আত্মার ভোগ-সাধন। উক্ত করণবর্গের মধ্যে বুদ্ধির আসন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ,—অপরাপর করণবর্গের ব্যাপারসমূহ বুদ্ধি দ্বারাই সফলতা লাভ করিয়া থাকে; এই কারণে পুরুষ বা আত্মাকে বলা হয় রাজা, বুদ্ধিকে বলা হয় সর্ব্বাধ্যক্ষ বা প্রধান অমাত্য, মনকে বলা হয় দেশাধ্যক্ষ (নায়েব), আর দশ ইন্দ্রিয়কে বলা হয় গ্রামাধ্যক্ষ বা তহসিলদার। ইন্দ্রিয়গণ নানাস্থান হইতে ভোগ্য বিষয়রাশি (শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি) আহরণ করিয়া প্রথমতঃ মনের নিকট অর্পণ করে; মন সেই সকল বিষয় সাধারণভাবে বিচার করিয়া গ্রহণ করে, এবং

সর্ব্বাধ্যক্ষ বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করে, অর্থাৎ বুদ্ধি-গ্রাহ্য করে ; বুদ্ধি তখন প্রাপ্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে যথাযথভাবে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া প্রভুস্থানীয় আত্মার নিকট উপস্থাপিত করে, অর্থাৎ বুদ্ধি-গৃহীত বিষয়সমূহ সন্নিহিত আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এই প্রতিবিম্বই আত্মার ভোগ, তদতিরিক্ত অন্য কোন রকম ভোগ আত্মার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এ সব কথা পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। এখন এই প্রসঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে ; দেখা যাউক সাংখ্যমতে প্রাণের কোনও পৃথক্ সত্তা আছে কি না।

সাংখ্যমতে প্রাণ বলিয়া কোনও বায়ুবিশেষ বা স্বতন্ত্র বস্তু নাই ; পরন্তু উহা ত্রিবিধ অন্তঃকরণেরই (বুদ্ধি, মনঃ ও অহঙ্কারেরই) সাধারণ বৃত্তি বা ব্যাপারবিশেষ মাত্র। সূত্রকার বলিয়াছেন—

"সামান্য-করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥" ২।৩১ ॥

অর্থাৎ জগতে বায়ুবিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ যে, পঞ্চ প্রাণ, তাহা বস্তুতঃ অন্তঃকরণত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি বা ক্রিয়ার ফল মাত্র (১)।

---

(১) সাংখ্যাচার্য্যদিগের অভিপ্রায় এই যে, আমরা অহরহঃ যে, শ্বাস প্রশ্বাসাদি ক্রিয়াদর্শনে প্রাণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুমান করিয়া থাকি, তাহা সত্য নহে। কারণ, প্রাণ নামে স্বতন্ত্র কোনও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না ; 'পঞ্জরচালন' ন্যায়েই শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে। যেমন, একটা পঞ্জরের (খাঁচার) মধ্যে তিনটা পাখী আছে। উহাদের মধ্যে কেহ গান করিতেছে ; কেহ আহার করিতেছে ; কেহ বা গাত্রকণ্ডূয়ন করিতেছে ; এমত অবস্থায় সেই পক্ষিত্রয়ের নিজ নিজ ক্রিয়ার ফলে যেরূপ পঞ্জরটীও আন্দোলিত হইতে থাকে ; অথচ পঞ্জর-চালনের জন্য কোন পাখীই চেষ্টা করে না। প্রাণের অবস্থাও

সাংখ্যমতে প্রাণের স্বতন্ত্রতা প্রত্যাখ্যাত হইলেও, বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্থপাদে—

"ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥" ২।৪।৯ ।

এই সূত্রে প্রাণকে স্বতন্ত্র মৌলিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যও প্রাণের স্বতন্ত্রতাপক্ষই সমর্থন করিয়াছেন (১)।

[সূক্ষ্ম শরীর]

পূর্ব্বকথিতা মহামহিমশালিনী প্রকৃতিদেবী উদাসীন আত্মার (পুরুষের), যে ভোগ-সম্পাদনের জন্য, বিচিত্র সৃষ্টিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; শরীর ব্যতীত সে ভোগ সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় না; এই কারণে ভোগ্যসৃষ্টির পূর্ব্বেই ভোগ-সাধন ও ভোগায়তন শরীর সমুৎপাদন করা আবশ্যক হয়। এই দুই প্রকার শরীরের

ঠিক তদনুরূপ। অন্তঃকরণত্রয় নিজ নিজ ক্রিয়া করে, তাহার ফলে হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাকেই লোকে প্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

(১) সেখানে আচার্য্য শঙ্কর "সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ" এই সাংখ্যবচন উদ্ধৃত করিয়া, সেই মত খণ্ডন করিয়াছেন; এখানে আবার ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু উপরি-উদ্ধৃত বেদান্তের উল্লেখ করিয়া 'বায়ু-ক্রিয়ে' কথা দুইটার অর্থ করিয়াছেন— বায়ু ও বায়ুর ক্রিয়া, অর্থাৎ বায়ুর পরিণাম'; সুতরাং ইহার মতে বুঝিতে হইবে যে, বেদান্তসূত্রে প্রাণকে কেবল বায়ু বা বায়ুর পরিণাম বলিয়া অস্বীকার করা হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহা দ্বারা উহার সামান্যকরণবৃত্তিত্ব খণ্ডিত হয় নাই।

মধ্যে সূক্ষ্ম শরীরকে ভোগসাধন, আর স্থূল শরীরকে ভোগায়তন বলা হয়। ভোগের জন্য স্থূল শরীরের যেরূপ আবশ্যক, সূক্ষ্ম শরীরেরও সেই রূপই অবশ্যক। ভোগায়তন স্থূল শরীরের কথা পরে বলিব, এখন সূক্ষ্ম শরীরের কথা বলিতেছি। সূক্ষ্ম শরীর কিরূপ, এবং কত প্রকার, সে সম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন—

"সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্" ॥ ৩৯ ॥

সূত্রের অর্থ এই যে, বুদ্ধি, মনঃ ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সপ্তদশ পদার্থের সমবায়ে রচিত শরীরের নাম 'লিঙ্গ' শরীর (১) ; ইহারই অপর নাম সূক্ষ্ম শরীর। আদিতে উহা এক—অবিভক্তরূপেই অভিব্যক্ত হয় ; পরে—

"ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ ॥" ৩।১০ ॥

বিভিন্নস্বভাব জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সেই এক অখণ্ড সূক্ষ্ম শরীরই বহুভাগে বিভক্ত হইয়া, জীবগণের বিবিধ বৈচিত্র্যময়

---

(১) কেহ কেহ উল্লিখিত সূত্রের ব্যাখ্যা করেন যে, সপ্তদশ ও এক =অষ্টাদশ। তাহাদের মতে অহঙ্কারতত্ত্বও সূক্ষ্ম শরীরের অংশ বলিয়া গৃহীত হয়। বৈদান্তিকগণও সূক্ষ্ম শরীরের অষ্টাদশ অবয়ব কল্পনা করিয়া থাকেন। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে,—

"কর্ম্মাত্মা পুরুষো যোঽসৌ বন্ধ-মোক্ষৈঃ প্রযুজ্যতে।
স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ ॥"

ইত্যাদি ভারতবচনে যখন 'সপ্তদশক' কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তখন অহঙ্কারতত্ত্বকে বুদ্ধিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সূক্ষ্ম শরীরের সপ্তদশ অবয়বপক্ষই রক্ষা করিতে হইবে।

সর্ব্বপ্রকার ভোগকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠাতা পুরুষের নাম—সূত্রাত্মা ও হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি; আর বিভক্ত এক একটী সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠাতা এক একটী পুরুষের নাম—সুর, নর, কিন্নর প্রভৃতি। এই সূক্ষ্ম শরীর লইয়াই পুরুষের (আত্মার) জন্ম, মরণ ও বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক প্রাণিদেহের অধিষ্ঠাতা প্রত্যেক পুরুষই (আত্মাই) অখণ্ড, অনন্ত, নিত্য, নিরবয়ব ও উদাসীন। সর্ব্বব্যাপী নিত্য আত্মার কোন দেহে প্রবেশ বা দেহ হইতে নিষ্ক্রমণকরা কোন মতেই হইতে পারে না; অথচ জন্ম-মরণাদি অবস্থা শাস্ত্রসিদ্ধ ও লোকপ্রসিদ্ধ। বুঝিতে হইবে যে, উল্লিখিত সূক্ষ্ম শরীরের প্রবেশ ও নির্গমকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে ও ব্যবহারে আত্মার ঐরূপ জন্ম-মরণাদি ভাব কল্পিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম শরীর যেরূপ দেহ গ্রহণ করে, সেই দেহের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর পরিমাণ অনু-সারে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এই জন্যই মহা-ভারতে 'সাবিত্রী-সত্যবানের' প্রস্তাবে যমকর্ত্তৃক সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পুরুষের নিষ্কর্ষণের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় (১)। প্রকৃত পক্ষে, ব্যবহার-জগতে এই সূক্ষ্ম শরীরই সাধা-রণের নিকট—'আত্মা' বলিয়া পরিচিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

(১) মহাভারতের উক্তি এইরূপ—

"অথ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশংগতম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ বলাদ্ যমঃ॥"

[অধিষ্ঠান শরীর।]

চিত্র যেমন কোন আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না, এবং ছায়া যেমন কোন অবলম্বন ছাড়া অবস্থান করিতে পারে না, উল্লিখিত সূক্ষ্ম শরীরও তেমনই বিনা আশ্রয়ে স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না, এবং সূক্ষ্ম তন্মাত্রও উহাকে আশ্রয় দিতে পারে না। উহার আশ্রয়ের জন্য স্থূল বস্তুর আবশ্যক হয়। এইজন্য পূর্ব্বোক্ত—

"অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ" ॥ ৩১ ॥

'অবিশেষ' পঞ্চতন্মাত্র হইতে 'বিশেষে'র (পাঁচ প্রকার স্থূলভূতের) আরম্ভ বা সৃষ্টি হয়। এখানে 'বিশেষ' অর্থ—শান্ত, ঘোর ও মূঢ়স্বভাব বস্তু, আর 'অবিশেষ' অর্থ—তদ্বিপরীত (১)। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে তন্মাত্র পর্য্যন্ত অষ্টাদশ তত্ত্বের কোথাও শান্ত, ঘোর ও মূঢ়ভাব নাই, কিন্তু তদারব্ধ সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীরপ্রভৃতিতে শান্তাদি ভাব প্রকটিত আছে; এই জন্য স্থূল সূক্ষ্ম উভয় শরীরই 'বিশেষ' নামে অভিহিত থাকে।

---

(১) সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষা এই যে, যে সমুদয় বস্তু জীবগণের সুখ, দুঃখ ও মোহ সমুৎপাদনে সমর্থ, সেই সমুদয় বস্তুর নাম 'বিশেষ'। সুখকর বস্তু 'শান্ত', দুঃখজনক বস্তু 'ঘোর', আর মোহসমুৎপাদক বস্তু 'মূঢ়' নামে অভিহিত হয়। তন্মাত্রপর্য্যন্ত তত্ত্বগুলি মনুষ্যগণের উপভোগ্য নহে; সুতরাং সে সমুদয় হইতে সুখ দুঃখ বা মোহের সম্ভাবনাও নাই; এইজন্য উহারা 'অবিশেষ', আর উপভোগযোগ্য স্থূল ভূত হইতে মনুষ্যগণ পর্য্যায়ক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এইজন্য উহারা শান্ত, ঘোর ও মূঢ় সংজ্ঞায় অভিহিত 'বিশেষ' পদবাচ্য; আর তন্মাত্রসমূহ কেবলই দেবভোগ্য সুখময় বলিয়া 'শান্ত' নামে অভিহিত। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ॥" (সাংখ্যকারিকা ৩৮)

সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে তন্মাত্রগত গুণসমূহও উহাদের মধ্যে (মনুষ্যাদির গ্রহণযোগ্য-রূপে) অভিব্যক্ত হয়। তখন আকাশে শব্দ, বায়ুতে স্পর্শ, তেজেতে রূপ, জলেতে রস ও পৃথিবীতে গন্ধ প্রকটিত হয়। এইরূপে মহাভূতারব্ধ অন্যান্য বস্তুতেও স্ব স্ব কারণগত গুণসকল সংক্রামিত হইয়া এই জগৎকে জীবগণের অপূর্ব্ব ভোগভূমি ও প্রমোদকাননে পরিণত করিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পঞ্চ মহাভূতেই সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব-সংখ্যার পরিসমাপ্তি। মহাভূতারব্ধ বস্তুগুলি তত্ত্বৎ মহাভূতেরই অন্তর্গত; উহারা স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত নহে। ইহাই সাংখ্যাচার্য্যগণের অভিমত সিদ্ধান্ত। উপরে যে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে,—

"তস্মাচ্ছরীরস্য" ॥ ৩২ ॥

তাহা হইতেই স্থূল-সূক্ষ্ম নিখিল জীব-শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে সূক্ষ্ম শরীরের স্বরূপ ও উৎপত্তিক্রম পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, এখন স্থূল শরীরের কথা বলা হইতেছে—

[স্থূল শরীর]

স্থূল শরীর দ্বিবিধ, এক সূক্ষ্ম শরীরের আশ্রয়ভূত 'অধিষ্ঠান' শরীর, দ্বিতীয় ঐ অধিষ্ঠান শরীরের আশ্রয়ভূত এই স্থূলতর 'ষাট্‌কৌশিক' শরীর (১)। সাংখ্যাচার্য্য—ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"সূক্ষ্মা মাতা-পিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥" (সাংখ্যকারিকা ৩৯)

---

(১) আমাদের ভোগায়তন এই স্থূল শরীরের লোম, রক্ত ও মাংস এই তিনটী অংশ মাতৃ-শরীর হইতে, আর স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা, এই অংশ-

শান্ত-ঘোর-মূঢ়স্বভাব 'বিশেষ' তিন প্রকার—এক সূক্ষ্ম শরীর, দ্বিতীয় মাতা-পিতৃসংযোগজ স্থূল শরীর, আর পঞ্চমহাভূত। তন্মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী, আর স্থূল শরীর প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল-ভোগাবসানে বিনাশশীল। এই কারিকার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র কেবল স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটী মাত্র শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; আর 'প্রভূতৈঃ' শব্দে পঞ্চ মহাভূতের গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অতিরিক্ত আর একটী তৃতীয় শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; তাহার নাম—অধিষ্ঠান শরীর। এই অধিষ্ঠান শরীরই সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরকে বহন করিয়া বেড়ায়। সূক্ষ্ম শরীরের ন্যায় উক্ত 'অধিষ্ঠান' শরীরও মাতা-পিতৃজ স্থূল শরীরের আশ্রয়ে থাকিয়া কার্য্য চালায়। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে উদ্ধৃত কারিকার 'প্রভূতৈঃ' শব্দে কেবল পঞ্চভূতের উল্লেখ হয় নাই; পরন্তু ঐ অধিষ্ঠান শরীরেরই উপাদান কারণ—মহাভূতসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব সাংখ্যসম্মত জীব-শরীর দুইটী নহে, তিনটী—সূক্ষ্ম, অধিষ্ঠান ও স্থূল। তন্মধ্যে অধিষ্ঠান শরীরটী সূক্ষ্ম শরীর অপেক্ষা স্থূল, আবার স্থূল শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম। অন্যান্য আস্তিক দার্শনিকের ন্যায় কপিল ও দেহের পাঞ্চভৌতিকতা বা চেতনতা স্বীকার করেন নাই, বরং প্রতিপক্ষগণের ঐ জাতীয়

ত্রয় পিতৃ-শরীর হইতে উৎপন্ন হয়। উক্ত ছয়টী বস্তুকে 'কোশ' বলা হয়। সেই ছয় প্রকার কোশের দ্বারা আরব্ধ হয় বলিয়া স্থূল শরীরকে 'ষাট্‌-কৌশিক' নাম দেওয়া হইয়াছে।

বিরুদ্ধ মতবাদ সকল যত্নসহকারে খণ্ডন করিয়া দেহের অচেতনত্ব ও ঐকভৌতিকত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন (১)।

[আলোচনা।]

উক্ত ত্রিবিধ শরীরের মধ্যে যাট্‌কৌশিক স্থূল শরীর অনেক প্রকার। জীব স্বকৃত কর্ম্মানুসারে বিভিন্নপ্রকার ভোগ নিষ্পাদনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকম শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রাক্তন কর্ম্মই বিভিন্নাকার ফলভোগোপযোগী দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য-নারকাদিভেদে বিভিন্ন প্রকার শরীর জীবের সম্মুখে উপস্থাপিত করে; জীবগণও বিনা আপত্তিতে সে সকল শরীর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যতকাল ভোগযোগ্য কর্ম্মফল থাকে, ততকাল সেই দেহও অব্যাহতভাবে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাকে; সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম তাহার প্রিয়ই হউক, আর অপ্রিয়ই হউক, তদ্বিষয়ে কোনও বিচার বিবেচনা করিবার অধিকার নাই। যেই মুহূর্ত্তে সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই দেহের উপযোগিতা ফুরাইয়া যাইবে। জীব তখন এই দেহ

---

(১) দেহ সম্বন্ধে অন্যান্য দার্শনিকগণের বিভিন্নপ্রকার মতবাদসকল ফেলোশিপ প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে; এই কারণে এখানে আর সে সকল কথার সন্নিবেশ করা হইল না। কারণ, ঐ সম্বন্ধে আলোচনা-পদ্ধতি প্রায় সকলেরই একরূপ। কপিল পঞ্চমাধ্যায়ে বিশেষভাবে বলিয়াছেন—"সর্ব্বেষু পৃথিব্যুপাদানমসাধারণ্যাৎ, তদ্ব্যপদেশঃ পূর্ব্ববৎ" ॥ ৫।১১২ ॥

অর্থাৎ পৃথিবীই সকল শরীরের প্রকৃত উপাদান, অন্যান্য ভূতসমূহ কেবল তাহার সহায়তা করে মাত্র। যে শরীরে যে ভূতের প্রাধান্য, তদনুসারে তাহার নাম ব্যবহার হইয়া থাকে।

পরিত্যাগ করিয়া যথাস্থানে চলিয়া যাইবে। এখানে জীব অর্থ সূক্ষ্ম শরীর ; কেন না, সর্ব্বব্যাপী নিত্য আত্মার ত গমনাগমন বা জন্ম-মরণাদি কখনও সম্ভব হয় না। সূক্ষ্ম শরীরই প্রকৃত পক্ষে জীবের ভোগাধিষ্ঠান। জীব যে সময়ে বর্ত্তমান স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া বহির্গত হয়, এবং দ্বিতীয় আর একটী ভোগদেহ প্রাপ্ত না হয়—আতিবাহিক-নামক একটী বায়বীয় দেহ মাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই সময় তাহার কিছুমাত্র ভোগ-শক্তি থাকে না ; তখন—

"সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্'' ॥ (ঈশ্বরকৃষ্ণ)

ধর্ম্মাধর্ম্মকৃত সমস্ত ভোগবাসনা এবং ভোগসাধন সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিদ্যমান থাকে ; থাকে না কেবল ভোগ করিবার ক্ষমতা। সেই জন্য ঐ সময়টা বড়ই দুঃসহ যাতনাময় হইয়া থাকে। সে সময় পুত্রাদিকৃত জলপিণ্ডাদিদানই তাহার একমাত্র তৃপ্তিলাভের উপায় হয়। সাধারণ নিয়মে জীবকে এক বৎসরপর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাকিতে হয়; তাহার পর, কর্ম্মানুসারে পুনশ্চ উত্তমাধম ভোগদেহ লাভ করে—পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্ত হয়। যে পর্য্যন্ত প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান সমুদিত না হয়, ততকাল জীবের এইভাবে ঊর্দ্ধাধোগতি অনিবার্য্য হইয়া থাকে (১) ; কেন না, ইহাই জগৎপ্রকৃতির স্বভাব—

"আ বিবেকাচ্চ প্রবর্ত্তনমবিশেষাণাম্" ॥ ৩।১০ ॥

---

(২৫) সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ ॥ ৫৪ ॥
তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেঃ, তস্মাৎ দুঃখং স্বভাবেন" ॥ ৫৫ ॥

কিন্তু বিবেকজ্ঞান উপস্থিত হইবামাত্র, সৌর-করস্পর্শে নীহার-জালের ন্যায় ঐ সূক্ষ্ম শরীর স্বকীয় উপাদানে বিলীন হইয়া যায়। উক্ত বিবেকজ্ঞান সমুৎপাদনের জন্যই শ্রবণ মননাদি যত কিছু উপায়ের অবতারণা। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের স্বরূপ ও উপযোগিতা প্রথমেই নিরূপিত হইয়াছে, এখন অপরাপর সাধনের কথা সংক্ষেপে বলিতে হইবে। তন্মধ্যে চিত্তবৃত্তির নিরোধাত্মক যোগ বা ধ্যান হইতেছে উহার প্রধান সাধন। ধ্যান কি ?—

"ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ" ॥ ৬।২৫ ॥

এখানে ধ্যান অর্থ যোগ। যোগাঙ্গ ধ্যানের কথা পরে বলা হইবে। মনের যে, বিষয়শূন্যভাব, তাহা বস্তুতঃ বৃত্তিশূন্য অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে ; সুতরাং পাতঞ্জলোক্ত "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ" এই যোগলক্ষণের সহিত এ লক্ষণের অতি অল্পমাত্রও অর্থগত প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। উক্তপ্রকার যোগসংজ্ঞক চিত্তবৃত্তি-নিরোধ সম্পাদনের জন্য যে সমুদয় উপায় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক ; সূত্রকার একটীমাত্র সূত্রে তাহা সংক্ষেপতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ধ্যান-ধারণাভ্যাস-বৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ" ॥ ৬।২৯ ॥

ধ্যান ও ধারণার, পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে ও বিষয়বৈরাগ্যপ্রভৃতি

অর্থাৎ বুদ্ধিগত সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্যে উর্দ্ধাধোগমন হয়। তন্মধ্যে সত্ববাহুল্যে স্বর্গাদিলোকে, রজোবাহুল্যে ভূলোকে, আর তমো-বাহুল্যে পশু-স্থাবরাদিদেহে গতি হয়, এবং যেখানেই গমন হউক, সেখানেই জন্মমরণ ও তজ্জনিত দুঃখভোগ অপরিহার্য্য হইয়া থাকে।

উপায়ের সাহায্যে মানসিক বৃত্তিনিচয় সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ সকল উপায়ের অনুশীলনে যে, কিপ্রকারে মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, সে সম্বন্ধে সূত্রকার নিজের অভিপ্রায় পূর্ব্বাচার্য্যগণের কথায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"লয়-বিক্ষেপয়োর্য্যাবৃত্ত্যা—ইত্যাচার্য্যাঃ" ॥ ৬।৩০ ॥

অর্থাৎ উল্লিখিত ধ্যানাদি কার্য্যের অনুশীলন করিতে করিতে 'লয়' নামক নিদ্রাবৃত্তির ও বিক্ষেপকর প্রমাণাদিবৃত্তির ক্রমশঃ নিবৃত্তি হইতে থাকে; এইভাবে ধ্যানবিরোধী চিত্তবৃত্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিনিবৃত্ত হইলে পর, চিত্তে আর বিষয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হয় না; সুতরাং তখন পুরুষেও প্রতিবিম্ব পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না; কাজেই তদবস্থায় স্বভাবশুদ্ধ পুরুষের সর্ব্বপ্রকার দুঃখসম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। বাহ্য বা আন্তর—অপর কোনও বিষয় বুদ্ধিগত না হওয়ায়, বুদ্ধি তখন বিমল স্ফটিকমণির ন্যায় নিরতিশয় স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়; এবং বিষয়সম্পর্কজনিত বিক্ষোভও তাহার নিরস্ত হয়। তখন—

"তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ" ॥

বিমল সরোবরে যেরূপ তীরস্থ তরুলতা প্রভৃতি যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, জীবের বিমল বুদ্ধি-দর্পণেও সেইরূপ নিখিল বিশ্ববস্তু অবিকলরূপে প্রতিফলিত হয়। বুদ্ধি তখন আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। এইপ্রকার পার্থক্যোপলব্ধিরই নাম—বিবেকজ্ঞান। তাদৃশ বিবেকজ্ঞান

প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র—অরুণোদয়ে অন্ধকারের মত, জীবের পূর্ব্বতন অবিবেক বা দেহাদিগত আত্মভ্রম এবং আত্মগত সুখ-দুঃখাদিভ্রান্তি আপনা হইতেই চলিয়া যায়। তখন এক দিকে পুরুষ যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থান করে, অপর দিকে বুদ্ধিও তেমনই আপনার কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত করিয়া, সেই পুরুষের নিকট হইতে চিরদিনের তরে বিদায় গ্রহণ করে (১)।

[মুক্তি]

উভয়ের এবম্বিধ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন—

"দ্বয়োরেকতরস্য বা ঔদাসীন্যমপবর্গঃ" ॥ ৩।৬৫ ॥

অর্থাৎ পুরুষ ও বুদ্ধি, এতদুভয়ের যে, ঔদাসীন্য—অসম্বন্ধ বা পৃথক্ ভাবে অবস্থান, অর্থাৎ উভয়ের যে, পরস্পর সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ, তাহার নাম অপবর্গ; কিংবা কেবল পুরুষেরই যে, ঔদাসীন্য বা বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ, তাহার নাম অপবর্গ। অপবর্গের অপর নাম মুক্তি ও কৈবল্য প্রভৃতি। এখানেই সেই পুরুষের জন্য প্রকৃতির (বুদ্ধির) করণীয় সমস্ত কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। ইহার পর উভয়েই—বিবিক্তভাবে অবস্থান করে।

---

(১) পুরুষের প্রতি প্রকৃতির দ্বিবিধ কর্ত্তব্য আছে। এক—পুরুষের ভোগ সম্পাদন, দ্বিতীয়—অপবর্গসাধন। প্রকৃতি প্রথমতঃ বুদ্ধিরূপে বিবিধ ভোগ সম্পাদন করে; অবশেষে বিবেকজ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া অপবর্গ সাধন করে। বিবেকজ্ঞান উৎপাদন করিলেই বুদ্ধির কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়। পাতঞ্জলভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, "বিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তং হি চিত্তচেষ্টিতম্।" অর্থাৎ বুদ্ধির চেষ্টার শেষ সীমা হইতেছে—বিবেকজ্ঞান সমুৎপাদন করা; তাহার পরই বুদ্ধির বিশ্রাম। ইহারই নাম মুক্তি।

এই কারণেই মুক্তিলাভের পক্ষে বিবেকজ্ঞানের উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক।

সাংখ্যাচার্য্যগণ মুক্তিলাভের অনুকূল বহুবিধ উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ সাধনরূপে—ধারণা, ধ্যান, সমাধির, বহিরঙ্গ সাধনরূপে—আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির এবং বিভিন্ন আশ্রম-বিহিত কর্ম্মসমূহেরও যথেষ্ট উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু সাধনরাজ্যে জ্ঞানকেই উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সূত্রকার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

"জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ ॥" ৩।২৩ ॥

জ্ঞান হইতেই মুক্তি প্রাদুর্ভূত হয়। এ সিদ্ধান্ত যেমন শাস্ত্র সম্মত, তেমনই যুক্তিদ্বারাও সমর্থিত। কেন না, মুক্তি বলিয়া কোনও অভিনব গুণ বা অবস্থা পুরুষে (আত্মাতে) উপস্থিত হয় না; উহা পুরুষের নিত্যসিদ্ধ বা স্বতঃসিদ্ধ; কেবল অবিবেক-প্রভাবে তাহার প্রকৃত স্বরূপটী প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, এবং অবিবেকই অস্বাভাবিকরূপে সুখদুঃখাদি অনাত্মধর্ম্মসমূহ প্রতিফলিত করিয়া মুক্ত আত্মাকেও যেন বন্ধনদশায় উপনীত করে। জ্ঞানই অজ্ঞান নিবৃত্তির অমোঘ উপায়; কাজেই সূত্রকারের "জ্ঞানাৎ মুক্তি" কথাটী যুক্তিবিরুদ্ধ হইতেছে না, বরং সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসম্মত হইতেছে। সূত্রকার নিজেই প্রথমও ষষ্ঠাধ্যায়ে—

"নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ" ॥ ১।৫৬ ॥

"মুক্তিরন্তরায়ধ্বস্তের্ন পরা ॥" ৬।২০ ॥

এই সূত্রে উপরি উক্ত অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পুরুষের মুক্তি কিছু নূতন নহে; পরন্তু নিত্যসিদ্ধ; কেবল অজ্ঞান বা অবিবেক তাহার মুক্ত স্বরূপটী উপলব্ধি করিতে দিতেছিল না; সুতরাং অবিবেকই প্রকৃতপক্ষে স্বরূপদর্শনের একমাত্র অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক। বিবেকজ্ঞানোদয়ে সেই অন্তরায় বিধ্বস্ত হয়—চলিয়া যায়; তখন আপনা হইতেই স্বরূপদর্শন প্রকটিত হয়; সুতরাং মুক্তিতে অন্তরায়-ধ্বংস ছাড়া নূতন আর কিছু লাভ হয় না। যদিও মুক্তিদশায় জীবের নূতন কিছু লাভ হয় না, সত্য; তথাপি উহা কাহারও উপেক্ষণীয় বা অনাদরের বস্তু নহে। কারণ—

"বিবেকাৎ নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা॥" ৩।৮৪॥

জগতের জীবমাত্রই যাহার ভয়ে কাতর, অপ্রিয়-বোধে যাহার চতুঃসীমায় যাইতে ইচ্ছা করে না, এবং স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট লোকে যাইয়াও যাহার গতি নিরুদ্ধ করিতে পারে না, সেই ত্রিবিধ দুঃখ (—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্লেশ) বিবেকজ্ঞান-প্রভাবে সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। কারণের অভাবে কার্য্যের অভাব অবশ্যম্ভাবী। অবিবেকই সমস্ত দুঃখের নিদান; বিবেকজ্ঞানের প্রভাবে অবিবেক বিনষ্ট হইলে, তজ্জনিত দুঃখও আর থাকিতে পারে না। সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইলেই জীব কৃতার্থতা লাভ করে; ইহার পর তাহার আর এমন কিছুই কর্ত্তব্য বা প্রার্থনীয় থাকে না, যাহার জন্য তাহাকে পুনরায় কর্ম্মময় সংসার-ক্ষেত্রে আসিতে হয় বা জন্ম গ্রহণ করিতে হয়; অতএব বিবেক-জ্ঞানই জীবের শেষ কার্য্য; তাহার পরই কৃতকৃত্যতা সিদ্ধ হয়।

[মুক্তির বিভাগ]

অপরাপর শাস্ত্রের ন্যায় সাংখ্যশাস্ত্রেও মুক্তির দ্বিবিধ বিভাগ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটীর নাম—বিদেহমুক্তি, অপরটীর নাম—জীবন্মুক্তি। বিদেহমুক্তি সম্বন্ধে কাহারো মতভেদ নাই, এবং থাকিতেও পারে না, কিন্তু জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে ব্যক্তিবিশেষের মতভেদ দৃষ্ট হয়। সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু পাতঞ্জল দর্শনের 'বার্ত্তিক' নামক ব্যাখ্যা গ্রন্থে জীবন্মুক্তিকে আপেক্ষিক মুক্তি বলিয়া, উহাকে মুক্তির গৌরবপদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন (১)। সাংখ্যসূত্রকার কপিলদেব কিন্তু সেরূপ কথার উল্লেখ করেন নাই; বরং তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের তিনটী সূত্রে (২) শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তির সাহায্যে

---

(১) তাহার অভিপ্রায় এই যে, মুক্তি অর্থ কৈবল্য—পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতি। সেই অবস্থায় বুদ্ধির প্রতিবিম্বদ্বারা পুরুষ উপরঞ্জিত হয় না; সুতরাং তদবস্থায় পুরুষের কোন প্রকার ভোগ থাকাও সম্ভব হয় না। অথচ জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে রীতিমত সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন; কাজেই সে অবস্থায় পুরুষের কৈবল্য লাভ সম্ভবে না। দেহ-পাতের পরই তাঁহার বুদ্ধি-সম্বন্ধ থাকে না; সুতরাং ভোগ-সম্বন্ধও ঘটে না; অতএব তাহাই যথার্থ মুক্তি বা কৈবল্য। জীবন্মুক্তে সেরূপ অবস্থা ঘটে না বলিয়াই তাঁহার অবস্থাকে আপেক্ষিক অর্থাৎ সাংসারিক অবস্থার তুলনায় মুক্তি বলিয়া ধরা হয় মাত্র, প্রকৃত পক্ষে উহা কৈবল্য নহে।

(২) "জীবন্মুক্তশ্চ" ॥ ৩।৭৮ ॥
"উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ" ॥ ৩।৭৯ ॥
"শ্রুতিশ্চ" ॥ ৩।৮০ ॥

জীবন্মুক্তির সম্ভাব স্বীকার করিয়াছেন (১)। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু সেখানেও আপনার সে মতটী পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি অধিকারীর শক্তিগত তারতম্যানুসারে, অধিকারীর ন্যায় বিবেকজ্ঞানকেও উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে উত্তমাধিকারীর বিবেকজ্ঞান উত্তম (অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি), যাহাদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; আর মধ্যমাধিকারীর বিবেকজ্ঞান মধ্যম; তাহা দ্বারা কেবল দৃশ্য বা ভোগ্যবিষয় সমূহের ভোগ্যতাবুদ্ধিমাত্র বাধিত হয়, কিন্তু প্রারব্ধবশে ভোগ-ব্যবহার অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায়; আর অধম অধিকারীর যে বিবেকজ্ঞান, তাহা অধম শ্রেণীভুক্ত; কেন না, তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, কেবল জন্মান্তরে সাধনানুষ্ঠানের আনুকূল্য হয় মাত্র।

উক্ত ত্রিবিধ বিবেকের মধ্যে প্রথমোক্ত বিবেকজ্ঞান পরিনিষ্পন্ন হইবার পরই দেহপাত ঘটে; সুতরাং তাদৃশ বিবেকীর মুক্তিই

(১) জীবন্মুক্তি-বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতিবচন এই :—

"দীক্ষয়ৈব নরো মুচ্যেৎ তিষ্ঠেৎ মুক্তোঽপি বিগ্রহে।
কুলাল-চক্রমধ্যস্থো বিচ্ছিন্নোঽপি ভ্রমেদ্ ঘটঃ॥"
"পূর্ব্বাভ্যাসবলাৎ কার্য্যং, ন লোকো ন চ বৈদিকঃ।
অপুণ্যপাপঃ সর্ব্বাত্মা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥" (নারদীয় স্মৃতি)

তাৎপর্য্য এই যে, মানুষ বিবেকজ্ঞানরূপ দীক্ষা প্রাপ্ত হইলেই মুক্ত হয়। মুক্ত হইয়াও, কুম্ভকারের চক্র-মধ্যস্থিত ঘট যেমন ভ্রামক দণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও ঘুরিতে থাকে, তেমনই দীক্ষিত ব্যক্তি প্রাক্তনবশে দেহে থাকিয়া কার্য্য করেন; কিন্তু তিনি লৌকিক ও বৈদিক নিয়মের বহির্ভূত।

বিদেহমুক্তি, এবং তাহাই যথার্থ মুক্তিপদ-বাচ্য; আর মধ্যম বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির যে, মুক্তি, তাহাই জীবন্মুক্তি, ঐ অবস্থায় দেহ ও তদুপযুক্ত ভোগ বিদ্যমান থাকে বলিয়া উহা আপেক্ষিক মুক্তিমাত্র, প্রকৃত মুক্তিপদবাচ্য নহে ইত্যাদি। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ কিন্তু এ ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই; বরং তিনি জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্তের মধ্যে কোনপ্রকার প্রভেদ দেখিতে পান নাই; তিনি জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মং ধর্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ" ॥
প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধাননিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি" ॥

(সাংখ্যকারিকা ৬৭—৬৮)।

প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক-সাক্ষাৎকার হইবার পর, ধর্ম্মাধর্ম্মের 'ফল'-প্রসবশক্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন শরীরপাত সম্ভবপর হইলেও, কুম্ভকারের চক্র যেরূপ কার্য্যসমাপ্তির পরও পূর্ব্ব-সংস্কারবশে কিছু সময় ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ তাঁহার শরীরও প্রারব্ধ সংস্কারবশে কিয়ৎকাল অব্যাহতভাবে বিদ্যমান থাকে। অনন্তর প্রারব্ধ-সংস্কার পরিসমাপ্ত হইলে, প্রকৃতির কার্য্য পরিসমাপ্ত হওয়ায় জন্মান্তরলাভের সম্ভাবনাও নিবৃত্ত হইয়া যায়; তখন ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য উপস্থিত হয়; তখন চিরদিনের জন্য সমস্ত দুঃখ সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যায়; এবং তাহাকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

[আলোচনা]

দর্শনমাত্রই তত্ত্বনির্ণয়প্রধান। তত্ত্বনির্ণয় আবার প্রমাণসাপেক্ষ; শাস্ত্রোক্ত পদার্থ যতক্ষণ কোন প্রমাণদ্বারা সমর্থিত ও সুব্যবস্থিত না হয়, ততক্ষণ তাহা তত্ত্ব কি অতত্ত্ব অর্থাৎ সত্য কি মিথ্যা, স্থির করিয়া বলিতে পারা যায় না; সুতরাং তাদৃশ বিষয়ে বিচারপটু পণ্ডিত জনের আদর বা আস্থা কখনই হয় না, বা হইতে পারে না। এইজন্য প্রত্যেক দার্শনিকই নিজের অভিমত পদার্থ নিরূপণের অগ্রে প্রমাণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহা দার্শনিক সমাজে প্রচলিত চিরন্তন পদ্ধতি; কেহই এ পদ্ধতি পরিত্যাগ করেন নাই। বলা বাহুল্য যে, সাংখ্যাচার্য্যগণও এ বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। সাংখ্যাচার্য্যগণ তিন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। এই ত্রিবিধ প্রমাণের সাহায্যেই তাঁহারা নিজেদের অভিমত প্রমেয় সমূহ (প্রতিপাদ্য বিষয় সকল) নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

সাংখ্যমতে প্রমেয়-সংখ্যা (তত্ত্বের সংখ্যা) সমষ্টিতে পঁচিশ। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ঐ পঁচিশটী পদার্থ দুইশ্রেণীতে বিভক্ত, এক—চেতন, অপর—অচেতন। চেতনের নাম পুরুষ বা আত্মা, আর অচেতনের নাম প্রকৃতি। পুরুষ অসংখ্য এবং দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, সকল পুরুষই আকারে প্রকারে ও স্বভাবে একই রকম; সুতরাং উহারা সকলে একই চেতনশ্রেণীর অন্তর্গত। অচেতন প্রকৃতির পরিণাম অনেক (ত্রয়োবিংশতি) হইলেও, বস্তুতঃ সকলেই প্রকৃতির ন্যায় পরিণামী ও জড়-স্বভাব; এই কারণে উহারা

সকলেই অচেতনশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ফলকথা, চেতন ও অচেতন দুই শ্রেণীর পদার্থ লইয়াই সাংখ্যশাস্ত্র পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

অবিবেক প্রভাবে প্রকৃতির সহিত পুরুষের একপ্রকার সংযোগ সম্বন্ধ ঘটে ; সেই সংযোগের ফলে প্রকৃতি হইতে ক্রমশঃ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির সৃষ্টি বা আবির্ভাব সম্পন্ন হয়, এবং ঐ অবিবেকনিবন্ধনই বুদ্ধিগত সুখ, দুঃখ, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি নির্গুণ পুরুষে প্রতিফলিত হইয়া, পুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয়।

পরবর্ত্তী সৃষ্টি আবার দুই ভাগে বিভক্ত ; এক—তন্মাত্রসর্গ, দ্বিতীয়—প্রত্যয়সর্গ। তন্মধ্যে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত ও তদুৎপন্ন সমস্ত ভৌতিক পদার্থ লইয়া তন্মাত্রসর্গ ; আর বুদ্ধি-কৃত সৃষ্টিমাত্রই প্রত্যয়সর্গ। বুদ্ধিগত বিশেষ ধর্ম্ম হইতেছে আট প্রকার—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, আর অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটী ধর্ম্ম সাত্ত্বিক, আর শেষোক্ত চারিটী ধর্ম্ম—তামস।

[প্রত্যয়সর্গ ও তাহার বিভাগ।]

কথিত প্রত্যয়সর্গ প্রকারান্তরে আবার চারিভাগে বিভক্ত—বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত বিপর্য্যয় পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (১)।

(১) অবিদ্যা অর্থ—অনিত্যে নিত্যতাবুদ্ধি, বা অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি। অস্মিতা অর্থ—অনিত্য ও অনাত্ম বস্তুতে নিত্য ও আত্মীয় বোধে অভিমান। রাগ—সুখ ও সুখকর বিষয়ে অভিলাষ। দ্বেষ—ঠিক রাগের বিপরীত ভাব। অভিনিবেশ অর্থ—ভয় বা মরণত্রাস। ইহাদের মধ্যে অবিদ্যা ও অস্মিতা স্বরূপতই বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞানাত্মক ; অবশিষ্ট তিনটী বিপর্য্যয় হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বিপর্য্যয় মধ্যে পরিগণিত।

এই পাঁচটী বুদ্ধিধর্ম্ম যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নামে পরিচিত। অবিদ্যা সাধারণতঃ প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই আটপ্রকার অনাত্মবিষয় অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, এইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে অবিদ্যার আটপ্রকার বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে।

অস্মিতাও বিষয়ভেদে আট ভাগে বিভক্ত। দেবতাগণ অণিমাদি আট প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া, ঐ সমুদয় বিষয়কে নিত্য ও আত্মীয় (আত্ম-তৃপ্তিকর) বলিয়া অভিমান পোষণ করেন; এই কারণে অস্মিতাকে আট প্রকার বলা হইয়া থাকে। তাহার পর, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটীই অনুরাগের সাধারণ বিষয়। সেই বিষয়গুলি দিব্য অদিব্যভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; সুতরাং বিষয়ের বিভাগানুসারে অনুরাগও দশপ্রকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। দ্বেষ অষ্টাদশ প্রকার কথিত হইয়াছে। দিব্যাদিব্যভেদে দশ প্রকার শব্দাদি বিষয়ে প্রবৃত্তির বাধা ঘটিলে যেমন দ্বেষ হয়, তেমনি অণিমাদি অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্যদ্বারাও শব্দাদি ভোগের স্বচ্ছন্দতা সম্পাদিত হয়; এই কারণে সময়বিশেষে উক্ত ঐশ্বর্য্য বিষয়েও দ্বেষ উপস্থিত হইয়া থাকে; এইজন্য দ্বেষকে অষ্টাদশ প্রকার বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রত্যয়সর্গ—অশক্তি। অশক্তি আটাশ প্রকার;—বুদ্ধির সাহায্যকারী একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি (অসামর্থ্য) একাদশ প্রকার; আর বুদ্ধির স্বকীয় অশক্তি হইল সপ্তদশ প্রকার; যথা—নয় প্রকার তুষ্টির বিপর্য্যয়ে অস্মিতা নয় প্রকার;

আর আট প্রকার সিদ্ধির বিপর্য্যয়ে অশক্তি আট প্রকার; সমষ্টিতে অশক্তির বিভাগ অষ্টাবিংশতি প্রকার।

তৃতীয় প্রত্যয় সর্গ—তুষ্টি। তুষ্টি নয়প্রকার—বাহ্য পাঁচ ও আধ্যাত্মিক চারি প্রকার। তন্মধ্যে ভোগবিষয়ে—অর্জ্জন. রক্ষণ, ক্ষয়, ভোগ ও হিংসাদোষ দর্শনে উপজাত বৈরাগ্য হইতে যে, তুষ্টি বা সন্তোষ, তাহা বহির্বিষয় হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বাহ্য, এবং পাঁচ প্রকার কারণ হইতে হয় বলিয়া পাঁচ প্রকার।

আধ্যাত্মিক চারি প্রকার তুষ্টির ক্রমিক নাম—প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য। তন্মধ্যে, 'প্রকৃতি' নামক তুষ্টি এই যে, প্রকৃতিই বিবেক-সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়া থাকে, আমার সম্বন্ধেও প্রকৃতিই তাহা করিবে, তজ্জন্য আমার প্রচেষ্টা অনাবশ্যক, এইরূপ ধারণায় সন্তুষ্ট হইয়া চুপ করিয়া থাকা। সন্ন্যাসগ্রহণের ফলেই কালে মুক্তি হইবে; মুক্তির জন্য আর অধিক ক্লেশ করা অনাবশ্যক; এইরূপে যে, সন্তোষ, তাহা 'উপাদান' নামক তুষ্টি। দীর্ঘকাল ধ্যানাভ্যাসাদি সাধনানুষ্ঠানে যে তুষ্টি, তাহা 'কাল' সংজ্ঞক তুষ্টি। আর সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরমোৎকর্ষ 'ধর্ম্মমেঘ' নামক সমাধিলাভেই যে, পরিতোষ. তাহা 'ভাগ্য' নামক তুষ্টি (১)।

(১) বাচস্পতি মিশ্র বলেন—বিবেক-সাক্ষাৎকার প্রকৃতিরই পরিণাম; প্রকৃতিই তাহা সম্পাদন করিবে, এইরূপ ভ্রান্তিবশে যে, শ্রবণ মননাদি কার্য্য হইতে বিরত থাকা, তাহা 'প্রকৃতি' নামক তুষ্টি। বিবেক-সাক্ষাৎকার প্রকৃতির কার্য্য হইলেও সন্ন্যাসের অপেক্ষা করে; এই বুদ্ধিতে যে, ধ্যানাভ্যাস না করিয়া কেবল সন্ন্যাসমাত্র গ্রহণেই সন্তোষ, তাহার নাম 'উপাদান'

চতুর্থ প্রত্যয়সর্গের নাম সিদ্ধি। সিদ্ধি আট প্রকার। তন্মধ্যে দুঃখ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক; সুতরাং দুঃখনিবৃত্তিরূপ সিদ্ধিও তিন প্রকার। ইহা ছাড়া আরও পাঁচ প্রকার সিদ্ধি আছে; যথা—অধ্যয়ন (গুরুর নিকট হইতে অক্ষর গ্রহণ); তাহার পর ঐ সকল শব্দের অর্থ জানা; অনন্তর সেই শব্দার্থের সত্যতাবধারণের উদ্দেশ্যে উহ অর্থাৎ বিচার; সপ্তম সিদ্ধি সুহৃৎপ্রাপ্তি, অর্থাৎ আপনার অধিগত বিষয়ে লব্ধবিদ্য পণ্ডিতগণের সহিত জিজ্ঞাসুরূপে আলোচনা। অষ্টম সিদ্ধি—দান; ধনাদিদানে বশীকৃত গুরু মন খুলিয়া শিষ্যকে উপদেশ দিয়া থাকেন; সুতরাং তাহাও সিদ্ধিলাভের বিশেষ অনুকূল। উক্ত আট প্রকার সিদ্ধির মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী সিদ্ধিই মুখ্য সিদ্ধি; তদ্ভিন্ন বিষয়গুলি সিদ্ধিলাভের উপায় বা অনুকূল বলিয়া 'সিদ্ধি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র।

এই যে, প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্রসর্গ, উহারা উভয়েই পরস্পর-সাপেক্ষ; কারণ, প্রত্যয়সর্গের অভাবে তন্মাত্রসর্গ—ভূতভৌতিক পদার্থের কোনপ্রকারেই উপযোগিতা নাই; আবার তন্মাত্রসর্গ না থাকিলেও প্রত্যয়-সর্গের কোনপ্রকার প্রয়োজন দেখা যায় না; এইজন্য ঐ দ্বিবিধ সর্গকে পরস্পর সাপেক্ষ বলা হয়।

তুষ্টি। কেবল সন্ন্যাস গ্রহণেও বিবেক-সাক্ষাৎকার হয় না, কালের অপেক্ষা করে; এই ধারণায় যে, চুপ করিয়া থাকা, তাহা 'কাল' নামক তুষ্টি। ভাগ্যে না থাকিলে কিছুতেই বিবেক-সাক্ষাৎকার হয় না, এই বুদ্ধিতে যে, সাধনানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকা, তাহা 'ভাগ্য' নামক তুষ্টি।

[শরীর]

সাংখ্যমতে শরীর তিন প্রকার—এক স্থূল, দ্বিতীয় সূক্ষ্ম, তৃতীয় অধিষ্ঠান বা আতিবাহিক। স্থূল দেহ পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়ভেদে অনেক প্রকার। স্থূলদেহ যেরূপ সূক্ষ্ম দেহের আশ্রয়, তেমনি অধিষ্ঠান দেহও সূক্ষ্ম শরীরের আশ্রয়। সূক্ষ্ম শরীর এই স্থূল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া উক্ত অধিষ্ঠান দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সূক্ষ্ম শরীর কখনও অন্য একটী শরীর অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সূক্ষ্ম দেহটী বিভিন্নপ্রকার স্থূলদেহ গ্রহণ করে, আবার কর্ম্মফলের ভোগশেষে তাহা পরিত্যাগ করে। এইরূপে যে, স্থূল শরীরের গ্রহণ ও পরিত্যাগ, তাহারই নাম—জন্ম ও মরণ। প্রকৃতপক্ষে আত্মার জন্মও নাই, মরণও নাই। দেহাদির জন্ম-মরণই অবিবেকবশতঃ আত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র।

উপরি উক্ত অবিবেকনিবৃত্তির জন্য বিবেকজ্ঞানের আবশ্যক হয়। বিবেকজ্ঞান অর্থ—প্রকৃতি ও তৎকার্য্য বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মপদার্থ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া জানা—প্রত্যক্ষ করা। ইহার জন্য যোগ বা চিত্তবৃত্তি-নিরোধের প্রয়োজন হয়, এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য সাধনেরও আবশ্যক হয়। ফলকথা, বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে সাধকের প্রাক্তন কর্ম্মরাশি দগ্ধ বা নির্ব্বীজ হইয়া যায়; সে সকল কর্ম্ম আর জন্মান্তর সম্পাদনে সমর্থ হয় না; অধিকন্তু অবিবেকক্ষয়ে তন্মূলক দুঃখেরও উপশম হইয়া যায়, কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলমাত্র তখন উপভুক্ত হইতে

থাকে। সেই প্রারব্ধক্ষয়ের পর দেহপাত হইলেই আত্মার কৈবল্য বা মোক্ষ অভিব্যক্ত হয়।

[ঈশ্বর]

সাংখ্যমতে মুক্তি বা সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কোনও আবশ্যকতা স্বীকৃত হয় নাই। মুক্তির জন্য আত্মানাত্ম-বিবেকজ্ঞানই পর্য্যাপ্ত। তাহার জন্য আর ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন হয় না। তাহার পর, সৃষ্টিকার্য্যে প্রকৃতির পরিচালনার্থও ঈশ্বরের আবশ্যক হয় না। কেন না, ঈশ্বর স্বভাবতই রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ; তাঁহা হইতে কখনই সৃষ্টিগত বৈষম্য সমুৎপন্ন হইতে পারে না। বৈষম্যের প্রতি জীবের কর্ম্মই প্রধান কারণ। অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরবাদীকেও জীবকৃত কর্ম্মকেই সৃষ্টিগত বৈষম্যনিষ্পাদনের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে, কর্ম্ম ও ঈশ্বর—দুইটী কারণ কল্পনা না করিয়া সহজতঃ কেবল কর্ম্মকেই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের বিধায়ক প্রধান কারণ কল্পনা করিলে, সকল দিক্‌ই রক্ষা পাইতে পারে; তদতিরিক্ত অপ্রসিদ্ধ —অসৎকল্প ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না; পক্ষান্তরে, তাহাতে কল্পনা-গৌরবও আর একটী দোষ ঘটে। অতএব প্রকৃতির নিয়ন্তা বা শুভাশুভ কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ নাই; উহা যুক্তিবিরুদ্ধ ও অপ্রামাণিক। ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এখানেই সাংখ্যদর্শনের আলোচনা শেষ করা হইল। অতঃপর পাতঞ্জল দর্শনের বিষয় আলোচিত হইবে।

পাতঞ্জল দর্শন।

(অবতরণিকা)

দর্শনপর্য্যায়ে আলোচ্য পাতঞ্জল দর্শন চতুর্থ স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন যে, এরূপ সন্নিবেশ কল্পিত হইয়াছে, তাহা প্রথম খণ্ডের ভূমিকামধ্যেই বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা হইয়াছে; সুতরাং এখানে সে সব কথার পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক ও অতৃপ্তিকর হইবে মনে হয়। এইজন্য, যে অভিপ্রায় প্রচারের উদ্দেশ্যে পাতঞ্জলদর্শন আস্তিক-সমাজে আত্মলাভ করিয়াছে; এবং যে সমুদয় বৈশিষ্ট্য থাকায় উহা সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এখানে কেবল সেই সমুদয় বিষয়েরই অবতারণা ও আলোচনা করা হইবে।

যোগ ও যোগবিদ্যা এদেশের অতি পুরাতন সম্পত্তি। স্মরণাতীত কাল হইতে যে, এদেশে যোগবিদ্যা ও যোগচর্চ্চা সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায়। জগতে যত রকম সাধন-পথ প্রসিদ্ধ বা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে যোগ-পথ সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বিবাদ ও নিষ্কণ্টক। যোগের কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই; অতি বড় নাস্তিকও যোগ-মহিমা অপলাপ করিতে সাহসী হয় না; কারণ, যোগের ফল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এদেশের স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রই যোগকথায় পূর্ণ ও যোগমহিমা প্রচারে ব্যস্ত। অধিক কি, বেদে—উপনিষদেও যোগের কথা প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়—

"তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়-ধারণাম্।" (কঠ ৬।১১)

"বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্" (কঠ ৬।১৮)
"ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে" (শ্বেতাশ্বতর ২।১১)
"সর্ব্বভাব-পরিত্যাগো যোগ ইত্যভিধীয়তে" (মৈত্রী উপঃ ৬।২৫)
"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্" (শ্বেতাশ্বতর ২।৮)
"অথাতো যোগঃ" (মহানারায়ণ ১২।১৪) ইত্যাদি।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহে যোগের ও যোগানুষ্ঠান-প্রণালীর স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, বেদান্তে যে, 'নিদিধ্যাসন' (নিদিধ্যাসিতব্যঃ) বিহিত আছে, তাহাও প্রকৃত পক্ষে চিত্তবৃত্তির নিরোধাত্মক যোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং যোগ ও যোগানুশীলন-পদ্ধতি যে, এদেশের অতি প্রাচীন—স্মরণাতীত কাল হইতে প্রবৃত্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সেই প্রাচীনতম যোগ ও যোগানুশীলন-পদ্ধতিকেই লোকের বোধোপযোগী করিয়া আদি পুরুষ হিরণ্যগর্ভ প্রথমে লোকসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন; এই কারণে তাঁহাকেই যোগবিদ্যার প্রথম উপদেশক আচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহারই উপদিষ্ট যোগ-প্রণালী ও শাসনপদ্ধতি অনুসরণপূর্ব্বক প্রসিদ্ধ যোগদর্শন (পাতঞ্জলদর্শন) প্রণয়ন করিয়াছেন। পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শন যে, হিরণ্যগর্ভোক্ত যোগপদ্ধতিরই ছায়াবলম্বনে বিরচিত, এ কথা স্বয়ং পতঞ্জলিও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যোগদর্শনের প্রারম্ভে "অথ যোগানুশাসনম্" সূত্রে 'অনুশাসন' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'অনু' অর্থ—পশ্চাৎ, 'শাসন' অর্থ—উপদেশ।

সুতরাং অনুশাসন কথার অর্থ হইতেছে—পূর্ব্বোপদিষ্ট বিষয়ের পশ্চাৎ শাসন—উপদেশ। 'অনুশাসন পদের এই প্রকার অর্থ ই যে, সূত্রকারের অভিপ্রেত, তাহা মহামতি বাচস্পতি মিশ্রও স্বকীয় টীকায় বিবৃত করিয়াছেন (১)। তাহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য 'যোগদর্শন' চিরন্তন বা সুপ্রাচীন না হইলেও, তদুপদিষ্ট যোগবিজ্ঞান অতিশয় প্রাচীন ও প্রামাণিক। যোগ-দর্শনকার সেই পুরাতন বিষয়টীকেই সময়োপযোগী ব্যবস্থানুসারে লোকের বোধোপযোগী করিয়া সংকলনপূর্ব্বক সুধীসমাজে সূত্রাকারে প্রচার করিয়াছেন।

যোগবিজ্ঞান সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের অনুমোদিত হইলেও, আলোচ্য যোগদর্শন কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রেরই অন্তর্গত বা অংশবিশেষ বলিয়া পরিগণিত। তাহার কারণ এই যে, যোগবিজ্ঞান

---

(১) পাতঞ্জল দর্শনের টীকাকার মহামতি বাচস্পতি মিশ্র আশঙ্কা-পূর্ব্বক এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন যে,—"নহু 'হিরণ্যগর্ভো যোগস্ত বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ' ইতি যোগিযাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতেঃ কথং পতঞ্জলের্যোগ-শাস্ত্রত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্য সূত্রকারেণ 'অনুশাসনম্' ইত্যুক্তম্। শিষ্টস্ত শাসনম্" (অনুশাসনং) ইতি টীকা (১।১।১৬)।

অর্থাৎ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের বচন হইতে জানা যায় যে, হিরণ্যগর্ভই যোগ-বিদ্যার প্রথম বক্তা বা উপদেষ্টা; সুতরাং পতঞ্জলিকে প্রথম বক্তা বলা যায় কিরূপে? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ স্বয়ং সূত্রকারই সূত্রমধ্যে 'অনুশাসন' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অনুশাসন অর্থ—পূর্ব্বোপদিষ্ট বিষয়ের শাসন বা উপদেশ। হিরণ্যগর্ভ যাহার উপদেশ করিয়াছিলেন, পতঞ্জলি তাহারই উপদেশ করিয়াছেন, নূতন কথা বলেন নাই।

অনুষ্ঠানলভ্য; সে অনুষ্ঠান আবার বিষয়-সাপেক্ষ; যোগ-সাধককে প্রথমতঃ স্থূল-সূক্ষ্মাদি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ন্যায়াদি দর্শনে যে সমুদয় বিষয় বিন্যস্ত ও বিবৃত হইয়াছে, সে সমুদয় বিষয় তর্কের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইলেও, যোগাভ্যাসের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে; পক্ষান্তরে, সাংখ্যসম্মত তত্ত্বসমূহ অভিপ্রেত যোগসাধনার বিশেষ অনুকূল। কারণ, সাংখ্যশাস্ত্রে স্থূল-সূক্ষ্মাদিতারতম্যক্রমে এমন সুন্দরভাবে তত্ত্বসংকলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, সে সকলের অবলম্বনে অতি সহজে যোগসাধনা সুনিষ্পন্ন হইতে পারে (১); এই কারণে যোগদর্শনকার আপনার দর্শনে সাংখ্যোক্ত তত্ত্বসকল গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এবং যোগাভ্যাসের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য সমর্থনপূর্ব্বক তাঁহাকে উচ্চ আসনে সংস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি নিজে কোথাও আপনার যোগদর্শনকে সাংখ্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া

---

(১) অভিপ্রায় এই যে, যোগদর্শনের শেষ উদ্দেশ্য—আত্মদর্শন। সেই আত্মা অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয় সূক্ষ্ম পদার্থ; মনের সাহায্যেই তাহাকে দেখিতে হয়। মন যদি সেই সূক্ষ্ম আত্মার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে ইচ্ছা করে, তবে অগ্রে মনকে সূক্ষ্ম চিন্তায় অভ্যস্ত হইতে হয়। সে পক্ষে পরমাণু পর্য্যন্ত চিন্তাও পর্য্যাপ্ত নহে; কারণ, পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম পদার্থ জড় জগতে আরও আছে। এইজন্য সাংখ্যশাস্ত্র সূক্ষ্মতত্ত্বের সীমারেখা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন—প্রকৃতিতে তাহার শেষ করিয়াছেন। আত্মাকে তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম স্থানে বসাইয়াছেন। কাজেই সাংখ্যোক্ত তত্ত্বসমূহ যোগ-সাধনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছে।

উল্লেখ করেন নাই; অথবা কোথাও সাংখ্যোক্ত তত্ত্বসমূহেরও পরিগণনা করেন নাই; সুতরাং তৎকৃত যোগদর্শন যে, বস্তুতঃ সাংখ্যসিদ্ধান্তেরই অনুবর্ত্তী, কিংবা অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী, তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। যোগশাস্ত্রপ্রবক্তা সুপ্রাচীন বার্ষগণ্য নামক আচার্য্য কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে অদ্বৈতবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্॥" ইতি॥

তাঁহার এই উক্তি আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, দৃশ্যমান জগৎ যে, মায়াময় তুচ্ছ, এ বিষয়ে যোগশাস্ত্র অদ্বৈতবাদী বেদান্তশাস্ত্রের সহিত একমতাবলম্বী। কাজেই, আলোচ্য যোগদর্শন প্রকৃতপক্ষে সাংখ্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কি না, এরূপ সংশয় উপস্থিত হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। অবশ্য, ব্যাখ্যাতারা প্রায় সকলেই উহাকে 'সাংখ্যপ্রবচন' নামে, কেহ কেহ বা সেশ্বর সাংখ্য নামেও বিশেষিত করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতে আমরা এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, বলিয়াছি; অতএব এখানেই একথার শেষ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

[যোগদর্শন]

আলোচ্য যোগদর্শন মহামুনি পতঞ্জলির অপূর্ব্ব কৃতিত্বের ফল; এই জন্য যোগদর্শনের অপর নাম পাতঞ্জল দর্শন। প্রবাদ আছে যে, শেষ নাগ স্বয়ং অনন্তদেব পতঞ্জলি-শরীর পরিগ্রহ

করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হন, এবং যোগদর্শন প্রণয়ন করেন। পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার স্বয়ং ব্যাসদেব ভাষ্যপ্রারম্ভে যে, মঙ্গলাচরণ শ্লোক রচনা করিয়াছেন; তাহাতে 'অহীশের' নামোল্লেখ আছে। যোগদর্শনের প্রণেতা পতঞ্জলি শেষনাগের অবতার না হইলে, গ্রন্থারম্ভে তাঁহার বন্দনা করা সঙ্গত হইত না; কেন না, গ্রন্থারম্ভে ইষ্টদেবতার ও আচার্য্যের বন্দনা করাই সুধীসম্মত পদ্ধতি। এই সকল কারণে পতঞ্জলিকে শেষনাগের অবতার বলা অসঙ্গত মনে হয় না। যোগদর্শনের উপর ধারেশ্বর ভোজরাজ-কৃত একখানা অনতিবিস্তীর্ণ টীকা আছে, তাহাতে মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে ফণিপতি শেষনাগকেই যোগশাস্ত্রপ্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (১)। পতঞ্জলি যে, যোগদর্শনের রচয়িতা, তদ্বিষয়ে কাহারো মতভেদ নাই; কাজেই উভয় কথার মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত বলিতে হয় যে, পতঞ্জলি ও শেষনাগ – এক অভিন্ন ব্যক্তি। শেষ নাগই পতঞ্জলিরূপে অবতীর্ণ হইয়া যোগশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র ও বৈদ্যকশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। পতঞ্জলির রচিত যোগশাস্ত্র—পাতঞ্জল দর্শন, ব্যাকরণ শাস্ত্র—পাণিনিব্যাকরণের মহাভাষ্য, যাহার অপর নাম ফণিভাষ্য; বৈদ্যক গ্রন্থের নাম এখনও অপরিজ্ঞাত।

মহামুনি পতঞ্জলি কোন শুভ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও. তিনি যখন পাণিনীয়

(১) "বাক্‌চেতোবপুষাং মলঃ ফণভৃতাং ভর্ত্রেব যেনোদ্ধৃতঃ"।
এই শ্লোকে শেষ নাগকে ব্যাকরণ, যোগ ও বৈদ্যক শাস্ত্রের রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ব্যাকরণের উপর ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তখন পাণিনির পরবর্ত্তী কোন এক সময়ে যে. তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

এ কথার উপর এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, পাতঞ্জল দর্শনের উপর যে একটী উপাদেয় ভাষ্যগ্রন্থ আছে, ঐ ভাষ্যগ্রন্থের রচয়িতার নাম ব্যাস। সেই ব্যাস স্বয়ং বেদব্যাস কি অপর কেহ, সে কথা কেহ প্রকাশ করিয়া না বলিলেও, ঐ ব্যাস যে, বেদব্যাস ভিন্ন অপর কেহ নহেন, প্রায় সকলেই সমানভাবে সে ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। মহামতি বাচস্পতি মিশ্র সে ধারণাকে আরও অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। তিনি ব্যাসভাষ্যের টীকা করিতে যাইয়া নমস্কার-শ্লোকে বেদব্যাসকেই পাতঞ্জলভাষ্যের রচয়িতা বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। এখন দেখিতে হইবে যে, বেদব্যাস যখন পাণিনিরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং পতঞ্জলি যখন পাণিনিরও পরবর্ত্তী, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী বেদব্যাসদ্বারা বহু পরভবিক যোগদর্শনের ব্যাখ্যা রচনা করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? তাহার পর, এখানে যে বেদব্যাসের কথা হইতেছে, সেই বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শন) রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের রচনা যে, মহাভারতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা ভগবদ্গীতার—

"ব্রহ্মসূত্র-পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ"

---

(১) "নত্বা পতঞ্জলিমৃষিং বেদব্যাসেন ভাষিতে।
সংক্ষিপ্ত-স্পষ্টবহ্বর্থা ভাষ্যে ব্যাখ্যা বিধাস্যতে।"
(বাচস্পতিকৃত ভাষ্যটীকা)

এই 'ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ' কথা হইতে জানিতে পারা যায়। অথচ সেই ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্যমত খণ্ডনের পর "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" সূত্রে বেদব্যাসকে যোগমতও খণ্ডন করিতে দেখা যায়। এই 'যোগ' শব্দে যে, পাতঞ্জলোক্ত যোগমতকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাও আচার্য্যগণের বচনভঙ্গী হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। এখানেও পূর্ব্ববর্ত্তী বেদান্তদর্শনে ভবিষ্যতের গর্ভগত যোগদর্শনের উল্লেখ থাকা বিশেষ বিস্ময়কর মনে হয়। এই সমুদয় অসামঞ্জস্য দর্শনে কেহ কেহ মনে করেন যে, যোগদর্শন-প্রণেতা পতঞ্জলি, আর ব্যাকরণভাষ্য-রচয়িতা পতঞ্জলি একই ব্যক্তি নহেন; উঁহারা বিভিন্ন কালবর্ত্তী পৃথক্ লোক। আর যাহারা একই পতঞ্জলিকে উভয় গ্রন্থের রচয়িতা মনে করেন, তাহারা বলেন,—বেদব্যাস যখন অমর—চিরজীবী, এমন কি, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গেও তাঁহার কথোপকথনের প্রমাণ পাওয়া যায় (১), তখন তাঁহার পক্ষে পাণিনির পরবর্ত্তী পতঞ্জলির যোগদর্শনের উপর ভাষ্যরচনা করা একটা অসম্ভব ঘটনা হইতে পারে না। আর ব্রহ্মসূত্রে যে, যোগমত-খণ্ডনের কথা আছে, তাহাও সেই মূলভূত হিরণ্যগর্ভোক্ত কিংবা ভগবান্ বার্ষগণ্য-প্রোক্ত যোগমতের কথা;

---

(১) এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শঙ্করাচার্য্য যে সময় কাশীধামে অবস্থানপূর্ব্বক বেদান্তদর্শনের ভাষ্য রচনা করেন, সেই সময় একদা বেদব্যাস বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে, তৎকৃত 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' সূত্রের ব্যাখ্যা লইয়া বিচার করেন। সেই বিচারের ফলে, শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রে ভাষ্যের মধ্যে বেদব্যাস-সম্মত ব্যাখ্যাও সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু পতঞ্জলিকৃত যোগের কথা নহে। আমরা এই শেষোক্ত সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই আমাদের বক্তব্য নির্দ্দেশ করিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যোগদর্শন মহামুনি পতঞ্জলির প্রণীত; এবং পতঞ্জলি যে, কে ছিলেন, এবং কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাও এক প্রকার বলাই হইয়াছে। পতঞ্জাল-প্রণীত বলিয়া যোগদর্শনের অপর নাম পাতঞ্জলদর্শন। পাতঞ্জলদর্শন চারি পাদে বিভক্ত এবং ১৯৫টী সূত্রে পরিসমাপ্ত। প্রথম সমাধিপাদ, দ্বিতীয় সাধনপাদ, তৃতীয় বিভূতিপাদ, চতুর্থ কৈবল্যপাদ। পাদগুলির নামকরণ হইতেই তত্তৎপাদের প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিতে পারা যায়। মহামতি বাচস্পতি মিশ্র পাতঞ্জলদর্শনের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রত্যেক পাদের পরিশেষে এক একটী শ্লোকে সেই সেই পাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সঙ্কলন করিয়া অধ্যেতৃবর্গের বিশেষরূপে বোধসৌকর্য্য সাধন করিয়া দিয়াছেন (১)। তদনুসারে বিষয় বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হয়,—

---

(১) বাচস্পতি মিশ্র কৃত শ্লোকগুলি এই—

"যোগস্যোদ্দেশ-নির্দ্দেশৌ তদর্থং বৃত্তিলক্ষণম্।
যোগোপায়াঃ প্রভেদাশ্চ পাদেঽস্মিন্ পবর্ণিতাঃ॥"
"ক্রিয়াযোগং জগৌ ক্লেশান্ বিপাকান কর্ম্মণামিহ।
তদ্দুঃখত্বং তথা ব্যূহান্ পাদে যোগস্য পঞ্চকম্॥"
"অত্রান্তরঙ্গান্যঙ্গানি পরিণামাঃ প্রপঞ্চিতাঃ।
সংযমাদ্ ভূতিসংযোগঃ তাসু জ্ঞানং বিবেকজম্॥"
"মুক্ত্যর্হচিত্তং পরলোকমেয়-স্ত-সিদ্ধয়ো ধর্ম্মঘনঃ সমাধিঃ।
দ্বয়ী চ মুক্তিঃ প্রতিপাদিতাস্মিন্ পাদে প্রসঙ্গাদপি চান্যদুক্তম্॥"

প্রথম পাদের বিষয়—যোগ, যোগলক্ষণ, চিত্তবৃত্তিভেদ ও তাহার লক্ষণ, যোগসিদ্ধির উপায় ও প্রকারভেদ। দ্বিতীয় পাদের বিষয়—ক্রিয়াযোগ, ক্লেশপঞ্চক, কর্ম্মবিপাক (কর্ম্মফল) ও তাহার দুঃখরূপতা, এবং হেয়, হান, হেয়হেতু ও হানোপায়, এই ব্যূহ চতুষ্টয়। তৃতীয় পাদের বিষয়—যোগের অন্তরঙ্গ সাধন, পরিণাম, সংযমের ফল—বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যবিশেষ প্রাপ্তি এবং বিবেকজ্ঞান। চতুর্থ পাদের বিষয়—মুক্তিযোগ্য চিত্ত, পরলোকসত্তা, বাহ্য পদার্থের সত্তাবস্থাপন, চিত্তাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বসাধন, ধর্ম্মমেঘ সমাধি, জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, এবং প্রকৃতির আপূরণাদি কথা। বলা বাহুল্য যে, এতদতিরিক্ত আরও বহুতর বিষয় উক্ত পাদচতুষ্টয়ে অপ্রধান বা গৌণভাবে স্থান লাভ করিয়াছে, সে সব বিষয় আমরা যথাস্থানে ক্রমশঃ বিবৃত করিতে যত্ন করিব।

যোগদর্শনের অনেকগুলি ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে বেদব্যাসের ভাষ্য, বাচস্পতিমিশ্রের টীকা, বিজ্ঞানভিক্ষুর বার্ত্তিক, ভোজরাজকৃত বৃত্তি এবং যোগমণিপ্রভা বিশেষ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত আছে। ইহা ছাড়া, যোগশিখা ও যোগতারাবলী প্রভৃতি আরও অনেকগুলি প্রকরণ গ্রন্থ আছে। এখন যোগবিদ্যা ও যোগিসম্প্রদায় ক্ষীণদশাপ্রাপ্ত হওয়ায়, সে সকল গ্রন্থও ক্রমশঃ বিলোপের দিকে অগ্রসর হইতেছে; কোন কোন গ্রন্থ আবার একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, মূল যোগদর্শন এখনও অক্ষত শরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং উহার ভাষ্য,টীকা

প্রভৃতি এখন পর্য্যন্ত অধীত ও অধ্যাপিত হইতেছে। সূত্রকার পতঞ্জলি—

"অথ যোগানুশাসনম্ ॥" ১।১।

বলিয়া যোগদর্শন আরম্ভ করিয়াছেন; এবং এই সূত্রেই তিনি আপনার অভিপ্রায় ও শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, যোগই যোগদর্শনের মুখ্য বিষয়,—সমস্ত শাস্ত্রটাই যোগ-কথায় পরিপূর্ণ। এ গ্রন্থে এমন কোনও কথা বা প্রসঙ্গ নাই, যাহা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যোগ বা যোগ-সাধনার সহিত সম্বদ্ধ নহে। নিম্নোদ্ধৃত দ্বিতীয় সূত্রে তাঁহার এই অভিপ্রায় আরও অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। যোগ কি?—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥" ১।২।

চিত্তের বৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ। উক্ত সূত্রে চারিটী শব্দ বিন্যস্ত আছে—যোগ, চিত্ত, বৃত্তি ও নিরোধ। সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, অগ্রে ঐ শব্দগুলির অর্থ জানা আবশ্যক হয়; এইজন্য প্রথমে ঐ সকল শব্দের ভাষ্যসম্মত অর্থ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে,—

'যোগ' শব্দটা 'যুজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যুজ্' ধাতু দুইটী আছে; একটীর অর্থ—সংযোগ বা মিলিত হওয়া, অপরটীর অর্থ—সমাধি (চিত্তের এক প্রকার অবস্থা, যে অবস্থায় চিত্তের বৃত্তিসমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া থাকে)। এটী প্রথমোক্ত 'যুজ্' ধাতুর প্রয়োগ নহে; কিন্তু দ্বিতীয় যুজ্ ধাতুরই (যাহার অর্থ—সমাধি, তাহারই) প্রয়োগ; সুতরাং এখানে

'যোগ' অর্থে—সমাধি বুঝিতে হইবে। সূত্রের অপরাপর অংশ ইহারই বিবৃতি বা ব্যাখ্যাস্বরূপ মাত্র। চিত্ত অর্থ—প্রকৃতির সাত্ত্বিক পরিণাম, যাহার অপর নাম বুদ্ধি। সেই বুদ্ধিতে যে, সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় অসংখ্য পরিস্পন্দন বা চিন্তাধারা নিরন্তর উত্থান-পতনলীলা বিস্তার করিতেছে, তাহারই নাম—বৃত্তি। নিরোধ অর্থ—অবস্থাবিশেষ ; অর্থাৎ যেরূপ অবস্থাবিশেষে উল্লিখিত চিত্তবৃত্তিসমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ অবস্থাবিশেষের নাম যোগ। চিত্তের এবংবিধ বৃত্তি-নিরোধ যদিও সকল অবস্থায়ই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে সত্য, তথাপি সে সমস্ত বৃত্তিনিরোধ 'যোগ' সংজ্ঞার অন্তর্ভূত নহে (১) ; কারণ, সেইরূপ বৃত্তিনিরোধই এখানে 'যোগ' কথার অভিপ্রেত অর্থ, যেরূপ নিরোধ নিষ্পন্ন হইলে, অবিদ্যাদি ক্লেশরাশি বিধ্বস্ত হইয়া যায়, বুদ্ধিতে সাত্ত্বিক নির্ম্মল ভাব সমধিক বৃদ্ধিপায়, এবং প্রকৃত নিরোধকে আয়ত্ত করিতে পারাযায়। এই জন্যই

(১) ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"যোগঃ সমাধিঃ। স চ সার্ব্বভৌমঃ চিত্তস্য ধর্ম্মঃ। ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধং চ ইতি চিত্তভূময়ঃ" ইত্যাদি।

অর্থাৎ যোগ অর্থ—সমাধি (চিত্তের নিরোধাবস্থা)। চিত্তের যে, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচপ্রকার ভূমি বা অবস্থা প্রসিদ্ধ আছে ; উহাদের প্রত্যেক অবস্থায়ই অল্পাধিক পরিমাণে বৃত্তিনিরোধ ঘটিয়া থাকে, যেমন—অনুরাগদশায় ক্রোধবৃত্তি নিরুদ্ধ থাকে, আবার ক্রোধকালে অনুরাগবৃত্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, ইত্যাদি। অতএব বৃত্তিনিরোধটা যে, চিত্তের সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সকল অবস্থার বৃত্তিনিরোধকে যোগ বা সমাধি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না।

[যোগ-বিভাগ]

উক্তপ্রকার যোগ বা সমাধি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; এক—সম্প্রজ্ঞাত, অপর—অসম্প্রজ্ঞাত। চিত্তের একাগ্রতাবস্থায় হয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, আর পূর্ণ নিরোধাবস্থায় হয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের নিখিল বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় না; ধ্যেয়রূপে অবলম্বিত বিষয়ে তখনও চিত্তের চিন্তাবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে; আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে তাহাও থাকে না; সমস্ত বৃত্তিই নিরুদ্ধ হইয়া যায়। অসম্প্রজ্ঞাতের কথা পরে বলা হইবে, এখন সম্প্রজ্ঞাতের কথা বলা যাইতেছে। প্রধানতঃ যে সকল বিষয় অবলম্বনে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সাধনা করিতে হয়, এবং সমাধিদশায় চিত্তের যাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হয়, সূত্রকার একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা বুঝাইয়া বলিতেছেন—

"ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণেঃ গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যেষু তৎস্থ-তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ ॥" ১।৪১ ॥

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সাধনার জন্য যোগীকে যথাক্রমে গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা, এই তিনপ্রকার বিষয় অবলম্বন করিতে হয়। তন্মধ্যে গ্রাহ্য (বাহ্য বিষয়) দুই প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম। গ্রহণ অর্থ—ইন্দ্রিয়বর্গ। গ্রহীতা অর্থ—অস্মিতা (বুদ্ধি ও আত্মার অবিবিক্তভাব)। ধানুষ্ক ব্যক্তি যেমন প্রথমে স্থূল, পরে সূক্ষ্ম, অনন্তর সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক লক্ষ্যবেধ অভ্যাস করে,

যোগীও ঠিক তদ্রূপ একাগ্রতা শিক্ষার জন্য প্রথমে স্থূল শব্দাদি বিষয় অবলম্বন করেন; পরে সূক্ষ্মভূত পঞ্চ তন্মাত্র অবলম্বন করেন; অনন্তর গ্রহণ-পদবাচ্য চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় অবলম্বন করেন; অতঃপর গ্রহীতাকে অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ 'অস্মিতা'কে অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা সাধনে অগ্রসর হন। একাগ্রতাকালে চিত্তের অবস্থা ঠিক বিশুদ্ধ স্ফটিকমণির ন্যায় হয়। বিমল স্ফটিক যেরূপ সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া নিজেও যেন তদ্রূপই হইয়া যায়, বিষয়ান্তর-চিন্তাশূন্য নির্ম্মল চিত্তও ঠিক সেইরূপই উল্লিখিত গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতাকে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে তত্তৎ-বিষয়াকার গ্রহণ করত আপনিও যেন তত্তৎস্বরূপই (তন্ময়ই) হইয়া পড়ে, অর্থাৎ তখন ধ্যেয় বিষয় ছাড়া চিত্তের আর কোনরূপ পৃথক্ সত্তা প্রতীত হয় না; চিত্ত তখন বিষয়াকারেই পরিচিত হয়। চিত্তের যে, এইভাবে অবলম্বিত বিষয়াকারে অনুরঞ্জিত হওয়া, যোগশাস্ত্রে তাহা 'সমাপত্তি' নামে অভিহিত। 'সমাপত্তি' কেবল সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিনিষ্ঠ চিত্তেরই স্বাভাবিক অবস্থা বা ধর্ম্ম। উল্লিখিত সমাপত্তির বিভাগানুসারে সূত্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেও চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

"বিতর্ক-বিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥" ১।১৭ ॥

অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারিভাগে বিভক্ত—সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। তন্মধ্যে বহির্জগতের কোন একটা স্থূলবিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যে, চিত্তের একাগ্রতানুশীলন, তাহার নাম সবিতর্ক সমাধি। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম—তন্মাত্র প্রভৃতি

বিষয় অবলম্বনে যে, চিত্তের একাগ্রতা, অর্থাৎ তজ্জনিত সাক্ষাৎকার, তাহার নাম সবিচার সমাধি। তদপেক্ষাও সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়রূপ বিষয় অবলম্বনে যে, চিত্তের একাগ্রতা, তাহার নাম—সানন্দ সমাধি ; আর বুদ্ধির সহিত পুরুষের যে অভিন্নতাভ্রান্তিরূপ অস্মিতা, তদবলম্বনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যে, চিত্তের একাগ্রতা, তাহার নাম -সাস্মিত সমাধি (১)। এই চতুর্ব্বিধ সমাধিতেই অবলম্বনীভূত বস্তুর তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হওয়া আবশ্যক। যতক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্বের প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ তাহা ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী বিষয় অবলম্বন করিতে নাই।

[অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি]

চিত্তের যেরূপ অবস্থায় ধ্যেয় বিষয়টী প্রকৃষ্টরূপে বিজ্ঞাত হয়, সেইরূপ চিত্তাবস্থাই 'সম্প্রজ্ঞাত' শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বিষয়ের প্রাধান্য থাকিলেও, ধ্যান,

---

(১) সবিতর্ক সমাধির অবলম্বন বা ধ্যেয় বিষয়টী স্থূল অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক কোন একটী বস্তু হওয়া আবশ্যক। এইজন্য সবিতর্ক সমাধিকালে যোগিগণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা শিক্ষা করেন। যতক্ষণ সেই ধ্যেয় বস্তুটীর তত্ত্ব যোগীর হৃদয়-দর্পণে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ সবিতর্ক সমাধি নিষ্পন্ন হইল মনে করিতে নাই। প্রথমে ঐ স্থূল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইলে, তাহার পর সবিচারের বিষয় তন্মাত্র অবলম্বন করিবে। তাহা প্রত্যক্ষ হইলে, সানন্দের বিষয়ীভূত ইন্দ্রিয়গণকে অবলম্বন করিবে ; অনন্তর অস্মিতা অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিবে। সর্ব্বত্রই 'একাগ্রতা' শব্দে বস্তুর সাক্ষাৎকার বুঝিতে হইবে।

ধ্যেয় ও ধ্যাতা, এই তিনই চিন্তাপথে পতিত হয়, সুতরাং তদবস্থায় জ্ঞানকে ঠিক তত্ত্বগ্রাহক বলিতে পারা যায় না, এবং তাহা দ্বারা নিরাবিল আত্মতত্ত্ব-প্রত্যক্ষেরও সম্ভাবনা ঘটে না; যোগীকে সাধন-পথে আরও অগ্রসর হইতে হয়, ক্রমে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভের জন্য সচেষ্ট হইতে হয়; অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায়। এইজন্য সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও তদধিগমের উপায় নির্দ্দেশপূর্ব্বক সূত্রকার বলিতেছেন—

"বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ॥" ১।১৮॥

বিরাম অর্থ—সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকালীন চিন্তার পরিত্যাগ, অথবা নিখিল চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব। প্রত্যয় অর্থ—কারণ—পর-বৈরাগ্য। অভ্যাস অর্থ—একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন। পূর্ব্ব অর্থ—পূর্ব্ববর্ত্তী—কারণ। সংস্কারশেষ অর্থ—সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজাত জ্ঞানসংস্কার মাত্র যে অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে সেই অবস্থাবিশেষ। অন্য অর্থ—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এ সকল কথার সম্মিলিত অর্থ এই যে, বিরামের কারণীভূত পর-বৈরাগ্যের অভ্যাস হইতে যাহার জন্ম, এবং যাহাতে কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, কোনরূপ চিত্তবৃত্তিই থাকে না, তাহাই অন্য, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত হইতে ভিন্ন—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

অভিপ্রায় এই যে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যেমন চিত্তমধ্যে ধ্যেয়বিষয়ক বিবিধ বৃত্তি বা চিন্তা বিদ্যমান থাকিয়া, প্রতিনিয়ত অনুরূপ সংস্কার-ধারা সমুৎপাদন করিতে থাকে, অসম্প্রজ্ঞাত

সমাধিতে সে রকম কোন বৃত্তিই থাকে না; হৃদয়মধ্যে পুনঃ পুনঃ 'পর-বৈরাগ্যে'র অনুশীলন করিতে করিতে সমস্ত চিন্তাবৃত্তিই নিরুদ্ধ হইয়া যায়; তখন থাকে কেবল পূর্ব্বতন সংস্কারমাত্র। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কোন প্রকার চিন্তনীয় বিষয় না থাকায় চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়, কেবল পূর্ব্বতন সংস্কার সকল তখনও চিত্তদেশকে অধিকার করিয়া থাকে; কিন্তু সে সকল সংস্কার চিত্তে বর্ত্তমান থাকিয়াও কোন প্রকার স্মৃতি সমুৎপাদন করে না। ক্রমে সেই সমুদয় সংস্কারও দীর্ঘকাল কোন উদ্বোধক (স্মৃতিজনক সামগ্রী) না পাইয়া বিলীন হইয়া যায়। এইজন্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে নিরোধ-সমাধি ও নির্বীজ সমাধি নামে অভিহিত করা হয়।

যোগীর চিত্তগত অবস্থার তারতম্য এবং আলম্বন বিষয়ের উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে উক্ত নিরোধসমাধি আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এক ভবপ্রত্যয়, অপর উপায়প্রত্যয়। তন্মধ্যে, যাহারা প্রকৃতি, মহৎ ও অহঙ্কার প্রভৃতি অনাত্মবস্তুকে আত্মা মনে করিয়া তদ্বিষয়েই নিরোধ সমাধি সাধনা করেন, তাহাদের সমাধিতে অবিদ্যা বা ভ্রান্তিজ্ঞান বিদ্যমান থাকায়, ঐরূপ সমাধিদ্বারা তাহারা কখনও কৈবল্য লাভে সমর্থ হন না, পরন্তু দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া কিংবা প্রকৃতিপ্রভৃতিতে প্রবেশপূর্ব্বক দীর্ঘকাল বিরতব্যাপার হইয়া যেন কৈবল্য পদই অনুভব করিতে থাকেন। নিয়মিত সময় সমাপ্ত হইলে পর তাহারা প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে পুনরায় সংসারে প্রবেশ করেন। তাহাদের সমাধি

অবিদ্যাপূর্ব্বক হওয়ায় 'ভবপ্রত্যয়' নামে অভিহিত হয়; আর যাহারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়ভূত শ্রদ্ধা, বীর্য্য, (উৎসাহ), স্মৃতি ও যোগাঙ্গ সমাধির সাহায্যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ সম্পাদন করেন, তাহাদের সমাধির নাম 'উপায়প্রত্যয়'; কারণ, তাঁহাদের অবলম্বিত সাধনগুলি বস্তুতই যোগসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়।

কথিত সমাধিযোগ ভবপ্রত্যয়ই হউক, আর উপায়-প্রত্যয়ই হউক, সর্ব্বত্রই চিত্তবৃত্তির নিরোধ থাকা আবশ্যক। কারণ, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইহাই সমাধির সাধারণ লক্ষণ। এ লক্ষণের বহির্ভূত কোন 'যোগ' নাই বা থাকিতে পারে না; সুতরাং চিত্তবৃত্তি-নিরোধই সমস্ত যোগের জীবন। দীর্ঘকালব্যাপী দৃঢ়তর অভ্যাস দ্বারা এই বৃত্তিনিরোধ যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়,—চিত্তভূমিতে আর কোন প্রকার বৃত্তি-উদ্ভূত না হয়, পূর্ণ অসম্প্রজ্ঞাতই সমাধির আবির্ভাব হয়,—

" তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ " ১৩ ॥

তখন—সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পূর্ণতাদশায় দ্রষ্টা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকাশক পুরুষ (আত্মা) আপনার স্বরূপে অবস্থান করে, অর্থাৎ তখন কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। আর তদ্ভিন্ন সময়ে—

" বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র।" ১৪ ॥

অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরহিত অবস্থায় পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়াও প্রকাশ পায় না, বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ চিত্তেতে যখন যেরূপ বৃত্তি উপস্থিত হয়, নির্ব্বিকার পুরুষও তখন সুতরাং উহা সকলেরই প্রার্থনীয় অতি রমণীয় অবস্থা। ঐ

সেই সেই বৃত্তির সমান আকারে পরিচিত হয়; তখন তাহার প্রকৃতস্বরূপ আর প্রতীতির বিষয় হয় না; গৃহীত বিষয়ের আকারই প্রধানতঃ প্রতিভাত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, প্রকাশস্বভাব পুরুষ দ্রষ্টা হইয়াও চিত্তবৃত্তি ভিন্ন অপর কোন বস্তুই দর্শন করে না। চিত্তবৃত্তিই তাহার একমাত্র দৃশ্য—বাহ্য বা আন্তর অপর বিষয়রাশি যতক্ষণ চিত্তবৃত্তির বিষয় না হয়, ততক্ষণ কোন মতেই পুরুষ সে সকল বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। চিত্তবৃত্তির বিষয়ীভূত বস্তুগুলি বৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গে সন্নিহিত পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহার ফলে, মুগ্ধ পুরুষ ঐ সমুদয় বৃত্তি হইতে আপনার পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে তন্ময় মনে করে। এই যে, চিত্তবৃত্তির সহিত পুরুষের পার্থক্যপ্রতীতির অভাব, ইহাই প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বৃত্তিসারূপ্যের ফল; এতদ্ব্যতীত নির্ব্বিকার পুরুষের অন্যপ্রকার সারূপ্যলাভ সম্ভবপর হয় না। তাহার পর দীর্ঘকালব্যাপী দৃঢ়তর অভ্যাস বলে যখন চিত্তের সমস্ত বৃত্তি—অধিক কি প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকখ্যাতিও (ভেদসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত) নিরুদ্ধ হইয়া যায়, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্পূর্ণরূপে সুনিষ্পন্ন হয়, তখন কোন প্রকার বৃত্তি না থাকায় পুরুষের আর বৃত্তিসারূপ্য ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং তদবস্থায় চিন্ময় পুরুষ বিমল মণি-দর্পণের ন্যায় আপনার স্বরূপে আপনি অবস্থান করে। এইরূপে স্বরূপাবস্থানেরই নামান্তর—কৈবল্য ও মুক্তি প্রভৃতি।

কৈবল্য-দশায় জীবের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের উপশম হয়;

অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে, অগ্রে সর্ব্বপ্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ করা আবশ্যক হয়; কিন্তু চিত্তবৃত্তির স্বরূপ, সংখ্যা ও স্বভাবাদি বিজ্ঞাত না থাকিলে, তদ্বিষয়ে নিরোধ-চেষ্টা কখনই ফলবতী হইতে পারে না; এই জন্য সূত্রকার পতঞ্জলি ঋষি চিত্তবৃত্তির বিভাগ নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতেছেন—

"বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ" ॥ ১।৫ ॥

"প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ" ॥১।৬॥

সাগরবক্ষে জায়মান তরঙ্গমালার ন্যায় মানবের চিত্তমধ্যে নিরন্তর যে সমুদয় স্পন্দন উপস্থিত হয়, সেই সকল স্পন্দনের সাধারণ নাম বৃত্তি। সেই বৃত্তিধারা অনন্ত—অসংখ্য হইলেও, কার্য্যতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত—প্রথম প্রমাণ, দ্বিতীয় বিপর্য্যয়, তৃতীয় বিকল্প, চতুর্থ নিদ্রা, পঞ্চম স্মৃতি। উক্ত পাঁচপ্রকার বৃত্তির প্রত্যেকেই আবার ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্টরূপে দ্বিবিধ। যে সকল চিত্তবৃত্তি জীবের ক্লেশ সমুৎপাদক, সেই সকল ক্লিষ্ট, আর যে সমুদয় বৃত্তি তদ্বিপরীত, সেইগুলি অক্লিষ্ট। জগতে সে রকম চিত্তবৃত্তি কখনও সম্ভবপর হয় না, যাহার সহিত অতি অল্প পরিমাণেও জীবগণের সুখ-দুঃখসম্বন্ধ বিজড়িত না আছে; কাজেই সূত্রকারের উক্ত 'ক্লিষ্ট' 'অক্লিষ্ট' বিভাগ অসঙ্গত হয় নাই। উল্লিখিত পাঁচপ্রকার বৃত্তির মধ্যে—

"প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি" ॥ ১।৭ ॥

প্রমাণবৃত্তি তিন প্রকার—প্রথম প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয় অনুমান, তৃতীয় আগম বা শব্দ। সাংখ্যের ন্যায় পাতঞ্জলও ঐ তিনের অধিক

প্রমাণসংখ্যা স্বীকার করেন না, এবং আবশ্যকও মনে করেন না। উক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের পরিচয় এইরূপ—(১) প্রত্যেক বস্তুতেই দুই প্রকার ধর্ম্ম আছে। একটী সামান্য ধর্ম্ম, আর একটী বিশেষ ধর্ম্ম—যেমন ঘটের সামান্য ধর্ম্ম—ঘটত্ব, আর বিশেষ ধর্ম্ম—পার্থিবত্ব ও তৈজসত্ব প্রভৃতি। তন্মধ্যে বিশেষ ধর্ম্মটী গ্রহণ করাই যে প্রমাণবৃত্তির প্রধান কার্য্য, তাহার নাম প্রত্যক্ষ। আর অনুমেয় পদার্থের তুল্যজাতীয় পদার্থে বিদ্যমান, অথচ ভিন্নজাতীয় পদার্থে অবিদ্যমান, এরূপ হেতু দ্বারা যে, বস্তুর কেবল সামান্য ধর্ম্মমাত্রের গ্রহণ (চিত্তবৃত্তি), তাহার নাম অনুমান। তাহার পর, ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি দোষরহিত—আপ্ত পুরুষ প্রত্যক্ষ করিয়া, কিংবা তাদৃশ লোকের উক্তি শ্রবণ করিয়া অথবা নিজে অনুমান করিয়া যে বিষয় অবগত হইয়াছেন, সেই বিষয়টী সেই ভাবেই অপরকে বুঝাইবার জন্য, যে শব্দ-প্রয়োগ করেন (উপদেশ করেন), তাদৃশ শব্দশ্রবণজনিত যে বৃত্তি, তাহার নাম আগম (২)। দ্বিতীয় চিত্তবৃত্তির নাম—বিপর্য্যয়। বিপর্য্যয় কি ?

"বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥" ১।৮ ॥

---

(১) প্রমাণ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সাংখ্যদর্শনের আলোচনা স্থলে দ্রষ্টব্য।

(২) যে শব্দের বক্তা বক্তব্য বিষয়টী নিজে প্রত্যক্ষও করে নাই, এবং অনুমান দ্বারাও জানে নাই, সেই বক্তা যদি তাদৃশ বিষয়টী অপরকে বুঝাইবার জন্য শব্দপ্রয়োগ করেন, সেই শব্দ প্রমাণ হইবে না। আর বক্তা বিজ্ঞাতার্থ হইয়াও যদি প্রতারণাভিপ্রায়ে এমনভাবে শব্দপ্রয়োগ করে, যাহাতে শ্রোতা বক্তার মনের ভাব না বুঝিয়া অন্য ভাব বুঝিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সেই শব্দও আগম প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। যেমন—"অশ্বত্থামা হতঃ" এই বাক্য।

বিপর্য্যয় অর্থ—মিথ্যাজ্ঞান,—যাহা বিজ্ঞাত বিষয়ে একরূপে থাকে না। অভিপ্রায় এই যে, প্রথম প্রতীতিকালে যে বস্তু যেরূপ আকারে প্রকাশ পায়, পরিণামে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সেই আকার যদি অন্যপ্রকারে প্রতিপন্ন হয়, সঙ্গে সঙ্গে উক্ত জ্ঞানও যদি বাধিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্য্যয় বা ভ্রম বলা হয়। বিপর্য্যয়ের অপর নাম অবিদ্যা ও অজ্ঞান প্রভৃতি (১)। বিপর্য্যয়ের উদাহরণ—রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ও শুক্তিতে রজতজ্ঞান প্রভৃতি। এ সকল স্থলে প্রথমতঃ সর্পের ও রজতের জ্ঞান হয়, পরে প্রমাণদ্বারা উক্ত বিষয় দুইটী—সর্প ও রজত বাধিত হয়, অর্থাৎ মিথ্যা বা অসত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়; সুতরাং জ্ঞান প্রথমে যে আকার গ্রহণ করিয়াছিল, পরিণামে সে আকার (সর্প ও রজত) স্থির থাকে না; কাজেই ঐ প্রকার জ্ঞানকে বিপর্য্যয় বলা যাইতে পারে। সংশয়াত্মক জ্ঞানও উক্ত বিপর্য্যয়েরই অন্তর্গত; কারণ, সংশয়স্থলেও বিজ্ঞাত বিষয়টীর আকার একপ্রকার থাকে না; এই কারণে সংশয় ও বিপর্য্যয়, উভয়ই অপ্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রকার চিত্তবৃত্তির নাম বিকল্প—

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।" ৯ ॥

---

(১) বিষ্ণুপুরাণে উক্ত অবিদ্যার পাঁচপ্রকার বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। যথা—
"তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো হ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ।"
উক্ত তমঃ প্রভৃতিরও আবার অবান্তর বিভাগ অনেক আছে, সাংখ্য-কারিকায় সে সকল বিভাগের নাম উক্ত আছে।

শব্দানুরূপ পদার্থ না থাকিলেও, কেবল শব্দশ্রবণের পর যে, এক প্রকার প্রতীতি হয়, তাহার নাম বিকল্পবৃত্তি। বিকল্পবৃত্তি স্থলে শব্দমাত্র থাকে, কিন্তু সেই শব্দপ্রতিপাদ্য তাদৃশ কোন অর্থ বা বস্তু থাকে না; অথচ ঐ শব্দ শ্রবণমাত্রেই লোকে তৎকালোচিত একটা কিছু বুঝিয়া থাকে. এবং তদনুরূপ ব্যবহারও করিয়া থাকে। যেমন—'অশ্বডিম্ব' 'আত্মার চৈতন্য' ইত্যাদি। অশ্বডিম্ব জগতে অপ্রসিদ্ধ; কিন্তু ব্যবহারক্ষেত্রে 'ইহা ঘোড়ার ডিম, উহা ঘোড়ার ডিম' এরূপ প্রয়োগ প্রায়ই করা হয়। আর সাংখ্যমতে আত্মা ও চৈতন্যের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই—চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ; অথচ পণ্ডিতগণও 'আত্মার চৈতন্য' বলিয়া আত্মা ও চৈতন্যের মধ্যে ভেদব্যবহার করিয়া থাকেন (১)। যাঁহারা বিকল্পবৃত্তির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যয়বৃত্তির মধ্যেই উহার অন্তর্ভাব করিয়া থাকেন। চতুর্থ আর এক প্রকার বৃত্তি আছে, তাহার নাম নিদ্রা। নিদ্রা বৃত্তি কি?—

"অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা॥" ১।১০॥

চিত্তে তমোগুণ প্রবল হইলে, যথাসম্ভব জাগরণে ইন্দ্রিয়বৃত্তির

---

(১) পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যয়ের সহিত বিকল্পবৃত্তির প্রভেদ এই যে, বিপর্য্যয় যখন ধরা পড়ে, তখনই তাহার ব্যবহার নিবৃত্ত হইয়া যায়; কিন্তু বিকল্পবৃত্তিস্থলে সেরূপ হয় না; যাহারা জানেন, জগতে ঘোড়ার ডিম নাই, এবং আত্মা হইতে চৈতন্য পৃথক্ নহে, তাহারাও স্বচ্ছন্দচিত্তে ঐ সকল শব্দ লইয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং শ্রোতারাও তদনুসারে একটা কিছু বুঝিয়া থাকে।

ও স্বপ্নসময়ে মনোবৃত্তির অভাব ঘটিয়া থাকে; সুতরাং তমোগুণই ঐ উভয়প্রকার চিত্তবৃত্তি-বিলোপের কারণ; সেই তমোগুণকে অবলম্বন করিয়া চিত্তের যে, একপ্রকার বৃত্তি উপস্থিত হয় (সুষুপ্তি অবস্থা হয়), তাহার নাম নিদ্রাবৃত্তি। অভিপ্রায় এই যে, যে অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়ের সমস্ত বৃত্তি এবং পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী সমস্ত মনোবৃত্তি (স্বপ্নবৃত্তি) কিছুই না থাকে, সেই অবস্থা-বিশেষের নাম নিদ্রা। নিদ্রা অর্থ—সুষুপ্তি। সুষুপ্তি সময়েও যে, চিত্তের বৃত্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহা সুপ্তোত্থিত পুরুষের 'আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই' ইত্যাকার স্মৃতি হইতে অনুমিত হয় (১)। পঞ্চম চিত্তবৃত্তির নাম স্মৃতি। তাহার লক্ষণ—

"অনুভূত-বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥" ১।১১ ॥

সাধারণতঃ অনুভবের বিষয় দুই প্রকার—চিত্তবৃত্তি ও বৃত্তি-গৃহীত বিষয় (ঘটপটাদি)। যেরূপ চিত্তবৃত্তিতে ঐ দুইটী বিষয়ের

---

(১) সুষুপ্তি-ভঙ্গের পর যে, 'সুখমহম্ অস্বাপ্সং, ন কিঞ্চিদবেদিষম্' এই প্রকারে সুখানুভূতি ও অজ্ঞানের প্রতীতি হয়, তাহা নিশ্চয়ই স্মৃতি-জ্ঞান। স্মৃতিমাত্রই অনুভবপূর্ব্বক; অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত বিষয়েই স্মরণ হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির যে, ঐ প্রকার সুখানুভূতি ও অজ্ঞানের স্মৃতি, তাহা নিশ্চয়ই অনুভবপূর্ব্বক, অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়ে ঐ উভয় বিষয়ে চিত্তের বৃত্তি হইয়াছিল বলিয়াই এখন তদ্বিষয়ে স্মৃতি হইতেছে। এই জাতীয় স্মরণ হইতেই সুষুপ্তি সময়ে চিত্ত-বৃত্তির অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

অপহরণ বা পরিত্যাগ না হয়, সেইরূপ চিত্তবৃত্তির নাম স্মৃতি। অভিপ্রায় এই যে. পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প ও নিদ্রাবৃত্তি দ্বারা যে সমুদয় বিষয় প্রাকৃত লোকের অনুভবগোচর হয়, পূর্ব্বসংস্কারসম্পন্ন চিত্তে পুনরায় সমুৎপন্ন বৃত্তিসমূহ যদি সেই সমুদয় বিষয়ের অতিরিক্ত কোন বিষয় গ্রহণ না করে, অর্থাৎ যথাসম্ভব সেই সমুদয় বিষয়ই গ্রহণ করে, তাহা হইলে উহাকে স্মৃতি-নামক চিত্তবৃত্তি বলে। সূত্রে 'অসম্প্রমোষ' শব্দপ্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে, পুত্র যেমন নিজ পিতার ধন সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিলে চৌর্য্যদোষে দূষিত হয় না, তেমনি স্মৃতিরূপ চিত্তবৃত্তিও যদি নিজের পিতৃস্থানীয় (জনক) অনুভবের অধিকৃত বিষয়ের সমস্তটা বা অংশবিশেষ গ্রহণ করে, তবে তাহাও তাহার পক্ষে চৌর্য্যবৃত্তি হয় না, অসম্প্রমোষই হয়; পক্ষান্তরে, অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করিলেই চৌর্য্যদোষ ঘটে। ইহা হইতে জানা গেল যে, স্মৃতিতে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অতিরিক্ত কোন বিষয়ই গৃহীত হয় না ও হইতে পারে না (১)।

উপরে, যে পাঁচপ্রকার চিত্তবৃত্তির কথা বলা হইল, পাতঞ্জল-

---

(১) প্রত্যভিজ্ঞা নামে আর একপ্রকার জ্ঞান (চিত্তবৃত্তি) আছে। যেমন—"সোঽয়ং দেবদত্তঃ" অর্থাৎ এই সেই দেবদত্ত নামক ব্যক্তি। এখানে 'অয়ং' অংশে জ্ঞান—প্রত্যক্ষ, আর 'সঃ' অংশে—পরোক্ষ—স্মৃতি। এইজন্য উহা কেবলই প্রত্যক্ষ বা কেবলই অনুভবের অন্তর্গত নহে; পরন্তু উভয়মিশ্রিত; এইজন্যই প্রত্যভিজ্ঞাকে পৃথক্ চিত্তবৃত্তি বলিয়া গণনা করা হইল না।

মতে তদতিরিক্ত আর কোনপ্রকার চিত্তবৃত্তি সম্ভবপর হয় না; সমস্তই এই পাঁচপ্রকারের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত পাঁচপ্রকার বৃত্তিই আবার রাগ, দ্বেষ, মোহানুবিদ্ধ; সুতরাং ক্লেশকর। সুখ ও সুখ-সাধন বস্তুতে রাগ (অনুরাগ), দুঃখ ও দুঃখসাধন বিষয়ে দ্বেষ (অনিষ্টবোধ) হইয়া থাকে; আর মোহ অর্থ—অবিদ্যা। মুমুক্ষু পুরুষকে উল্লিখিত সমস্ত বৃত্তিরই নিরোধ করিতে হইবে। সেই নিরোধের ফলে প্রথমে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, এবং পরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নিষ্পন্ন হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, কথিত চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায় কি? কি উপায় অবলম্বন করিলে চিরাভ্যস্ত দুর্নিবার বৃত্তি-সমূহ নিরুদ্ধ করা যাইতে পারে? তদুত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন—

"অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥" ১।১২ ॥

অভ্যাস অর্থাৎ পৌনঃপুনিক চেষ্টা ও বৈরাগ্য দ্বারা সেই সমুদয় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

অভিপ্রায় এই যে, প্রসিদ্ধ নদীর জলরাশি যেরূপ একই দিকে একই ভাবে প্রবাহিত হয়, চিত্ত-নদীর বৃত্তিস্রোতঃ সেরূপ-ভাবে প্রবাহিত হয় না। উভয়দিকেই সমানভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। উহার একদিকে প্রবৃত্তিমার্গ, অপরদিকে নিবৃত্তিমার্গ। তন্মধ্যে প্রবৃত্তিপথে প্রবর্ত্তমান বৃত্তিস্রোতঃ 'ঘোর'—অকল্যাণকর, আর নিবৃত্তিপথে প্রবর্ত্তমান বৃত্তিস্রোতঃ পরম কল্যাণকর। যোগী পুরুষকে প্রথমতঃ বিষয়বৈরাগ্য দ্বারা প্রবৃত্তিপথে প্রবর্ত্তমান

বৃত্তিস্রোতটী নিরুদ্ধ করিতে হয়, পরে নিরোধের পুনঃপুনঃ অনুশীলনের সাহায্যে নিবৃত্তিপথটী উদ্দীপিত করিতে হয়। এইরূপ চেষ্টার ফলে প্রবৃত্তিস্রোতঃ যতই প্রতিরুদ্ধ হইতে থাকে, দ্বিতীয় স্রোতটী প্রবল হইয়া যোগী পুরুষকে ততই কৈবল্যের দিকে অগ্রসর করিতে থাকে। এখানে চিত্তবৃত্তি নিরোধের পক্ষে অভ্যাস ও বৈরাগ্য, উভয়কেই সম্মিলিতভাবে কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু উভয়ের বিকল্প—হয় অভ্যাস দ্বারা, না হয় বৈরাগ্য দ্বারা, এরূপ বলা হয় নাই। অতএব চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য উভয়কেই তুল্যরূপে গ্রহণ করিতে হয় (১)। তন্মধ্যে—অভ্যাস কাহাকে বলে ?—

"তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥" ১।১৩ ॥

চিত্তের স্থিরতাসম্পাদনার্থ যে, যম নিয়মাদি সাধন সম্পাদন বিষয়ে যত্ন অর্থাৎ পৌনঃপুনিক চেষ্টা, তাহার নাম অভ্যাস। অভিপ্রায় এই যে, চিত্তের রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিপ্রবাহ প্রবল থাকিলে সাত্ত্বিক বৃত্তিগুলি স্বভাবতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; এবং চিত্তমধ্যে মোহ ও বিক্ষেপের প্রাধান্য ঘটিয়া থাকে। যতদিন রাজস ও তামস বৃত্তির প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে, ততদিন

(১) ভগবদ্গীতায়ও উভয়ের সমুচ্চয় কথিত হইয়াছে,—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥"

অর্থাৎ মনঃ স্বভাবতঃ চঞ্চল ও দুর্নিগ্রহ হইলেও অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহার নিগ্রহ করা যাইতে পারে।

চিত্তবৃত্তির নিরোধ করা একেবারেই সম্ভব হয় না; সুতরাং যোগসিদ্ধিরও সম্ভব থাকে না; এইজন্য যোগাভিলাষী পুরুষকে চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনের জন্য (স্থিতৌ) উৎসাহসহকারে দীর্ঘকাল অবিচ্ছেদে বক্ষ্যমাণ যম-নিয়মাদি সাধনসমূহের অনুশীলন করিতে হয়। সেইরূপ নিরন্তর যত্নের ফলে চিত্তের রাজস ও তামস বৃত্তিনিচয় ক্রমশঃ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হয়, এবং সাত্ত্বিক বৃত্তিধারা প্রবাহিত হয়। এই প্রকার প্রযত্নকেই এখানে 'অভ্যাস' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আদর ও উৎকর্ষবুদ্ধিসহকারে দীর্ঘ-কালব্যাপী নিরন্তর আরাধনা করিলে যথোক্ত অভ্যাস দৃঢ়তর হয়, নচেৎ রাজস তামস বৃত্তিদ্বারা অভিভূত হইয়া পূর্ব্বসঞ্চিত সাত্ত্বিক প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যেরও পূর্ণমাত্রায় অনুশীলন করিতে হয়। বিষয়-বৈরাগ্য ব্যতীত শুদ্ধ অভ্যাস কখনও স্থিরপদ হইতে পারে না। এইজন্য অভ্যাসের সঙ্গে বৈরাগ্যের অনুশীলন করিতে হয়। বৈরাগ্য কি ?—

"দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥" ১।১৫ ॥

আমাদের ভোগ্য বিষয় দুই প্রকার। এক দৃষ্ট, অপর আনুশ্রবিক। 'দৃষ্ট' অর্থ—প্রত্যক্ষসিদ্ধ—ঐহিক; আর 'আনু-শ্রবিক' অর্থ—যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কেবল আগমমাত্রগম্য—পারলৌকিক; যেমন স্বর্গাদি বিষয় (১)। উক্ত উভয়বিধ বিষয়ে

(১) স্বর্গ একপ্রকার ভোগস্থান। তাহা কিন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে; তাদৃশ স্বর্গের অস্তিত্ব বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। কেবল শাস্ত্রগম্য

যে, তৃষ্ণার (ভোগাভিলাষের) অভাব, তাহার নাম বৈরাগ্য। কথিত বৈরাগ্যের আর একটী বিশেষ নাম হইতেছে বশীকার-সংজ্ঞা (১)। 'বশীকারসংজ্ঞা' বৈরাগ্য অপর-বৈরাগ্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট ; ইহা দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির জন্য পর-বৈরাগ্যের আবশ্যক হয়। পর-বৈরাগ্য অর্থ--বৈরাগ্যের চরম সীমা, যাহা দ্বারা প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিষয়মাত্রে বৈতৃষ্ণ্য উপস্থিত হয়। সূত্রকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥" ১।১৬ ॥

বলিয়াই স্বর্গ, বিদেহমুক্তি বা প্রকৃতিলয় প্রভৃতি বিষয়গুলি 'আনুশ্রবিক' পদবাচ্য হয়। আনুশ্রবিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও ঐরূপ ; "গুরু-মুখাদনুশ্রূয়তে ইতি অনুশ্রবঃ—বেদঃ ; তত্র প্রাপ্তঃ—জ্ঞাতঃ—আনুশ্রবিকঃ" অর্থাৎ কেবল বেদমাত্রগম্য বিষয়ই আনুশ্রবিক কথার অর্থ।

(১) বৈরাগ্য দুই প্রকার পর-বৈরাগ্য ও অপর-বৈরাগ্য। অপর-বৈরাগ্য আবার চারি প্রকার—প্রথম যতমানসংজ্ঞা, দ্বিতীয় ব্যতিরেক-সংজ্ঞা, তৃতীয় একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা, চতুর্থ বশীকারসংজ্ঞা। সাধারণতঃ অনুরাগ ও বিদ্বেষবশেই ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ভোগে ধাবিত হয়, তন্নিবারণার্থ চেষ্টাকে 'যতমানসংজ্ঞা' বলে। অনন্তর, ইন্দ্রিয়গণ যে সকল বিষয় হইতে বিরক্ত হইয়াছে এবং যে সকল বিষয়ে অনুরক্ত আছে, ঐ উভয় প্রকার বিষয়কে বাছিয়া পৃথক্ করার নাম 'ব্যতিরেক সংজ্ঞা'। তাহার পর, ইন্দ্রিয়গণ নিবৃত্ত হইলেও যে, কেবল মনে মনে বিষয় চিন্তা, তাহার নাম 'একেন্দ্রিয়-সংজ্ঞা'। অতঃপর মানসিক ঔৎসুক্যমাত্রেরও যে, নিবৃত্তি, তাহার নাম 'বশীকার সংজ্ঞা'।

প্রকৃতি ও তৎকার্য্য বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে চিন্ময় পুরুষের পার্থক্য প্রত্যক্ষ করিলে পর, ত্রিগুণাত্মক সমস্ত বিষয় ভোগে যে, চিত্তের তৃষ্ণার আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তাহার নাম পর-বৈরাগ্য।

প্রথমতঃ জাগতিক ভোগ্য বিষয় সমূহের অর্জনে, রক্ষণে, ক্ষয়ে ও ভোগে ক্লেশ দর্শন করিয়া প্রথমে তদ্বিষয়ে তৃষ্ণানিবৃত্তি-রূপ অপর-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তখন মুমুক্ষু পুরুষ শাস্ত্র ও অনুমানাদির সাহায্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হন। অনন্তর দীর্ঘকাল ঐরূপ অভ্যাসের ফলে রাজস ও তামস বৃত্তিসমূহ অভিভূত এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রাদুর্ভূত হইয়া চিত্তকে বিমল মণি-দর্পণের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল প্রকাশসম্পন্ন করিয়া দেয়। তখন স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত পদার্থ ই সেই বিমল চিত্ত-দর্পণে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হওয়ায় সেই সমুদয় বিষয়ের দোষরাশি প্রত্যক্ষ হইতে থাকে; সুতরাং তখন সহজেই দোষাঘ্রাত সেই সমুদয় বিষয়ে, এমন কি, প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকখ্যাতিতেও (ভেদসাক্ষাৎকারেও) তাঁহার অনুরাগ বিলুপ্ত হইয়া যায়; যোগী তখন তাহা নিরুদ্ধ করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভে প্রবৃত্ত হন। এই জন্য পর-বৈরাগ্যকে চিত্তের সত্ত্বোৎকর্ষজাত জ্ঞানপ্রসাদমাত্র বলা হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গেই মুক্তির অবিনাভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ পর-বৈরাগ্যের অভাবে মুক্তির অভাব, পক্ষান্তরে পরবৈরাগ্য সম্ভাবে মুক্তিরও অবশ্যম্ভাব। এই কারণে মোক্ষাভিলাষী পুরুষকে অপর-বৈরাগ্য দ্বারা পর-বৈরাগ্যলাভে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট থাকিতে হয়।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিসম্পাদনের জন্য যে সকল উপায় বলা

হইয়াছে, এবং পরেও বলা হইবে, কর্ত্তার অধিকারগত তারতম্যানুসারে সে সকলের ফলগত যেমন তারতম্য ঘটে, তেমনি কালগত প্রভেদও যথেষ্ট ঘটিয়া থাকে।

এই অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন—

"তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ।" ১।২১ ॥

"মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ।" ১।২২ ॥

অর্থাৎ সমাধিসাধনে যাহাদের তীব্র আগ্রহ থাকে, তাহাদের পক্ষে সমাধিসিদ্ধি ও তৎফললাভ স্বল্প সময়ে নিষ্পন্ন হয়; আর যাহাদের তাদৃশ তীব্র সংবেগ নাই, তাহাদের পক্ষে বিলম্ব ঘটে; কিন্তু উক্ত তীব্রতার মধ্যেও মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্রভেদে তারতম্যের সম্ভাবনা আছে, তদনুসারে ফললাভেও কালগত যথেষ্ট প্রভেদ সম্ভাবিত হইতে পারে; সেই প্রভেদানুসারে যোগশাস্ত্রে যোগীর বিভাগ নয়প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১)।

[ঈশ্বর]

শীঘ্র সমাধিসিদ্ধির পক্ষে পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস-বৈরাগ্য যেমন বিশেষ অনুকূল উপায়, তেমনি আরও একটী সহজ ও সুগম

(১) উপরে লিখিত উপায়ভেদ অনুসারে তদনুশীলনসম্পন্ন যোগীও নয়ভাগে বিভক্ত। তাহার ক্রম এইরূপ:—১। মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র, অধিমাত্রতীব্র; মৃদুমধ্য, মধ্যমধ্য ও অধিমাত্র মধ্য; এইরূপ মৃদুঅধিমাত্র, মধ্য অধিমাত্র ও অধিমাত্র অধিমাত্র। এই নয়প্রকার উপায়ভেদে যোগীরও নয় প্রকার বিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মৃদুতীব্র সংবেগবিশিষ্ট যোগীর সমাধি ও তৎফললাভ (কৈবল্যলাভ) আসন্ন, মধ্যতীব্র সংবেগবিশিষ্ট যোগীর আসন্নতর, এবং অধিমাত্র তীব্র সংবেগবিশিষ্ট যোগীর ফললাভ আসন্নতম হইয়া থাকে।

উপায় আছে; যাহার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিলে, যোগীকে সমাধিসিদ্ধির জন্য আর কাহারো সাহায্য লইতে হয় না, সেই উপায়টী হইতেছে ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ। এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিতেছেন—

"ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা ॥" ১।২৩ ॥

দৃঢ়তর অভ্যাস ও বৈরাগ্য যেরূপ সহজে ও স্বল্পকাল মধ্যে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করে, একমাত্র ঈশ্বর-প্রণিধানও ঠিক সেইরূপেই শীঘ্র শীঘ্র বৃত্তিনিরোধ সুসম্পন্ন করে। ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থ—ভক্তি-সহকারে ঈশ্বরের আরাধনা বা উপাসনা। ভক্তিসহযোগে আরাধনা করিলে ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, এবং অনুগ্রহ করেন—উপাসকের হৃদয়গত সমস্ত পাপমল বিধূত করিয়া যোগ-সিদ্ধির উপযুক্ত অধিকার প্রদান করেন (১)। অতএব যাহারা একান্তচিত্তে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাহারা অতি অল্পকালের মধ্যেই অভীষ্ট যোগফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

---

(১) ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥" ১০।১০ ॥

ভাগবতে কথিত আছে—"হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥" উক্ত উভয়স্থলেই ঈশ্বরপরায়ণতার ফলে ঈশ্বরানুগ্রহলাভ ও জ্ঞানযোগে অধিকার প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে। অতএব মনে হয়, ঈশ্বরারাধনা যে, চিত্তবৃত্তি-নিরোধাত্মক সমাধিসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়, এ বিষয়ে মতভেদ খুব অল্প লোকেরই আছে।

সাংখ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব একপ্রকার অস্বীকারই করিয়াছেন; যোগদর্শন যখন সাংখ্যেরই অনুবর্ত্তী অংশবিশেষ, তখন এখানে ঈশ্বরের কথা অনেকটা বিস্ময়কর হইতে পারে সত্য; কিন্তু যোগদর্শনকার এ বিষয়ে সাংখ্যের সম্মান রক্ষা করেন নাই। তিনি দৃঢ়তাসহকারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাবাদি পরিজ্ঞাত না থাকিলে তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ (উপাসনা) করা সম্ভবপর হইতে পারে না; এইজন্য স্বয়ং সূত্রকারই ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাবাদি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতেছেন—

> "ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ॥" ১২৪॥
> "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞ-বীজম্॥" ১।২৫॥

ক্লেশ পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। কর্ম্ম দুই প্রকার—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। বিপাক—কর্ম্মফল তিন প্রকার—জন্ম, আয়ুঃ ও সুখ-দুঃখাদি ভোগ। আশয়—বাসনা—পূর্ব্বতন সংস্কার।

সাধারণ জীবগণের ন্যায় আলোচ্য ঈশ্বরও পুরুষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সাধারণ জীবপুরুষগণ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের সহিত একেবারে সম্বন্ধ শূন্য নহে; কোন না কোন সময়ে ক্লেশাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকেই, কিন্তু ঈশ্বরপুরুষ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত,—

ঈশ্বরে ক্লেশ ও কর্ম্মাদি-সম্বন্ধ কখনও ছিল না, সুদূর

ভবিষ্যতেও হইবে না, এবং বর্ত্তমানেও নাই। মুক্ত জীবগণের তৎকালে ক্লেশাদি-সম্পর্ক না থাকিলেও পূর্ব্বে ছিল; আর প্রকৃতিলীন জীবগণের ক্লেশাদি-সম্বন্ধ পূর্ব্ব ও পর উভয় কালেই অক্ষুণ্ণ থাকে; ঈশ্বরে কিন্তু কালত্রয়েই তাহার সম্পূর্ণ অভাব। ইহাই সাধারণ জীবপুরুষ অপেক্ষা ঈশ্বরের বিশেষত্ব; এই বৈশিষ্ট্য সূচনার জন্যই সূত্রমধ্যে ঈশ্বরকে শুধু পুরুষ না বলিয়া 'পুরুষবিশেষ' বলা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া অপরিসীম জ্ঞানশক্তিও জীবসাধারণ হইতে ঈশ্বরের বিশিষ্টতা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। ব্যবহার-জগতে জ্ঞানমাত্রেরই ন্যূনাধিকভাব পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞানের সেই ন্যূনাধিকভাব ঈশ্বরে পরিসমাপ্ত হইয়া ন্যূনাধিকভাবের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ অনন্তে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেই অপরিসীম জ্ঞান-প্রভাবেই ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এইজন্য সূত্রকার তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতার বীজভূত জ্ঞানশক্তিকে নিরতিশয় (সর্ব্বাপেক্ষা অধিক) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (১)।

উল্লিখিত সূত্রার্থ হইতে জানা গেল যে, ঈশ্বর স্বরূপতঃ পুরুষ-পদবাচ্য হইলেও, সাধারণ সংসারী বা মুক্তপুরুষ হইতে অত্যন্ত

---

(১) সাধারণ নিয়ম এই যে, যে সকল ধর্ম্ম বা গুণের ন্যূনাধিকভাব দৃষ্ট হয়, নিশ্চয়ই সে সকল ধর্ম্ম বা গুণ কোন একস্থানে নিরতিশয়ভাব (অসীমত্ব) ধারণ করে। যেমন, পরিমাণ একটী ন্যূনাধিকভাবাপন্ন গুণ, আকাশে তাহার নিরতিশয়ভাব দৃষ্ট হয়। ন্যূনাধিকভাবাপন্ন জ্ঞানের সম্বন্ধেও ঐরূপ নিরতিশয়ভাব কল্পনা করা যুক্তিসম্মত হয়; সুতরাং ঈশ্বরীয় জ্ঞানের নিরতিশয়ত্বোক্তি যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

পৃথক্। সাধারণ পুরুষ অবিদ্যাদি ক্লেশের অধীন, শুভাশুভ কর্ম্মজনিত পুণ্য পাপের পরবশ, এবং কর্ম্মানুযায়ী জন্ম, জীবন ও ভোগের ক্রীত দাস, অধিকন্তু পূর্ব্বসঞ্চিত আশয় বা বাসনা দ্বারা নিয়ত পরিচালিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের স্বভাব ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র,—তিনি অনন্ত জ্ঞানের আকর—সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং সেখানে ভ্রান্তিজ্ঞানময় অবিদ্যা ও অবিদ্যামূলক অস্মিতা বা রাগদ্বেষ প্রভৃতি ক্লেশের অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না। এই কারণেই পরবর্ত্তী কর্ম্ম, বিপাক ও তদনুকূল আশয়ও তাঁহাতে স্থান পাইতে পারে না; কারণ, উক্ত ক্লেশ-সম্বন্ধই কর্ম্মাদি সম্বন্ধের মূল কারণ (১)। কাজেই যাহাতে ক্লেশ-সম্বন্ধ নাই, কর্ম্মাদির সম্বন্ধও তাহাতে হয় না ও হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর ও সাধারণ জীব স্বরূপতঃ একজাতীয় পদার্থ (পুরুষ) হইলেও, তিনি নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, এবং চিরকালই জীবসুলভ দোষরাশি দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। এই কারণে সূত্রকর্ত্তা তাঁহাকেই আদিগুরুর পদে অভিষিক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

"স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ॥" ১।২৬॥

অর্থাৎ জগতে ব্রহ্মা প্রভৃতি, যাহারা আদিগুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ,

---

(১) "অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং" ইত্যাদি সূত্রে স্বয়ং সূত্রকারই অবিদ্যাকে অস্মিতাদির উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার পর—"ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট-জন্মবেদনীয়ঃ।" (২।১২) সূত্রে ক্লেশকেই কর্ম্মাশয়োৎপত্তির মূল কারণ বলা হইয়াছে, এবং "সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" (২।১৩) এই সূত্রে আবার মূলীভূত ক্লেশসত্ত্বেই কর্ম্মের বিপাক বা পরিণাম ফল—জাতি, আয়ু ও ভোগের সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন।

ঈশ্বর তাঁহাদেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা, নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরানুগ্রহ প্রভাবেই ব্রহ্মা প্রভৃতি আদি গুরুগণ বিমল দিব্য জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন (১)। শ্রুতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রও এ কথার সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়া থাকে। মুমুক্ষু পুরুষ যোগসিদ্ধির জন্য এবংবিধ ঈশ্বরের আরাধনায় তৎপর হইবেন।

ঈশ্বরের আরাধনা করিতে হইলে তাঁহার নাম-মন্ত্রাদির পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক হয়, তদভাবে উপাসনাই অচল হইয়া পড়ে। বিশেষ এই যে, একই ব্যক্তির একাধিক নাম প্রসিদ্ধ থাকিলেও, সকল নামই তাহার প্রিয় হয় না, কোন একটী নামই যেমন তাহার সমধিকপ্রিয় বা প্রীতিবর্দ্ধক হয়, এবং সেই প্রিয় নামে সম্বোধন করিলেই যেমন তাহার সমধিক প্রীতি বৃদ্ধি পায়, ঈশ্বরের সম্বন্ধেও সেই কথা। ঈশ্বরের নাম অসংখ্য ; সুতরাং যে কোন নামেই তাঁহার আরাধনা চলিতে পারে সত্য ; কিন্তু তাঁহার

---

(১) অভিপ্রায় এই যে, গুরুপদাভিষিক্ত ব্রহ্মা প্রভৃতি আদিপুরুষ হইলেও, অপরাপর জীবের ন্যায় উৎপত্তিশীল—নিত্য নহে ; সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞানসম্পদ্‌ও নিত্য নহে—আগন্তুক। নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন ঈশ্বর হইতেই যে জ্ঞানসম্পদ্‌ আসিয়াছে, বুঝিতে হইবে। শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে এ কথা বলিয়াছেন—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥" ৬।১৮॥

পুরাণশাস্ত্রও এ কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে" এবং "প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী, অজত"—ইত্যাদি (শ্রীমদ্ভাগবত)।

আশু প্রীতিসম্পাদনের জন্য একটা বিশেষ নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই নাম নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে সূত্রকার বলিতেছেন—

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥" ১।২৭ ॥

প্রসিদ্ধ 'প্রণব' পদই তাঁহার বাচক। অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরবাচক অসংখ্য নামই শাস্ত্রমধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, এবং ব্যবহার-জগতেও তাঁহার বহু নাম প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে প্রণবই তাঁহার প্রিয়তম নাম; কারণ, ঈশ্বরের সহিত প্রণবের যে, বাচ্য-বাচক-ভাব সম্বন্ধ, তাহা অনাদিসিদ্ধ; ব্যক্তি বিশেষের সংকেতকৃত নহে; এই বিশিষ্টতাটী অপর কোন নামেই নাই; নাই বলিয়াই প্রণব নাম তাঁহার এত প্রিয়। সেই প্রিয় নামে সম্বোধন করিলে (আরাধনা করিলে) তিনি সহজেই সন্তুষ্ট হন, এবং সন্তুষ্ট হইয়া আরাধকের যোগসিদ্ধির সহায় হন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার সহায়তা লাভ করিলে জগতে কাহাকেও ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। এই জন্যই সূত্রকার যোগসিদ্ধির (চিত্তবৃত্তি-নিরোধের) সহজ উপায়রূপে প্রণবের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যোগসিদ্ধিকামী ব্যক্তিকে—

"তজ্জপস্তদর্থ-ভাবনম্ ॥" ১।২৮ ॥

উক্ত 'প্রণব' মন্ত্রের জপ করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রণবার্থ পরমেশ্বর বিষয়েও চিন্তা করিতে হইবে। এই ভাবে

প্রণবের জপ ও প্রণবার্থ—পরমেশ্বরের ভাবনা করিতে করিতে যোগীর চিত্ত একাগ্রতা-সম্পন্ন হইয়া থাকে (১)। অধিকন্তু—

"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥" ১।২৯ ॥

সেই প্রণব-জপ ও প্রণবার্থ-ভাবনার ফলে যোগীর আত্ম-চৈতন্য প্রত্যক্ষগোচর হয়, এবং যোগসাধনার প্রবল প্রতিপক্ষ চিত্ত-বিক্ষেপকর 'ব্যাধি, স্ত্যান' প্রভৃতি অন্তরায় সমূহও বিধ্বস্ত হয় (২)।

---

(১) অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর-প্রসাদাভিলাষী যোগীকে প্রথমে ঈশ্বরাভিধায়ক শব্দ (প্রিয় নাম) অবগত হইতে হয়। অনন্তর সেই প্রিয় নামটী নিরন্তর জপ করিতে হয়। কেবল জপ করিলেই হয় না; জপের সঙ্গে নামের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরকেও হৃদয়ে চিন্তা করিতে হয়। এই উভয়বিধ কার্য্যদ্বারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ হয়। তাঁহার প্রসাদে যোগীর চিত্ত নির্ম্মল হইয়া বৃত্তিনিরোধের (যোগসিদ্ধির) যোগ্যতা লাভ করে। ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"স্বাধ্যায়াদ্‌ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।
স্বাধ্যায়-যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রসীদতি ॥" (ভাষ্যধৃত বচন)।

অর্থাৎ প্রথমতঃ পাঠ বা জপের সাহায্যে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। যোগানুষ্ঠানের দ্বারা আবার মন্ত্রার্থ ভাবনা করিবে। এই উভয়বিধ উপায়ানুষ্ঠানের দ্বারা পরমাত্মা প্রসন্ন হন, অর্থাৎ তাহার প্রসাদ লাভ করা যায়।

(২) সূত্রে যোগসাধনার অন্তরায়সমূহ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—"ব্যাধি-স্ত্যান-সংশয়-প্রমাদালস্যাবিরতি-ভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাঃ, তেঽন্তরায়াঃ ॥" ১।৩০ ॥

ব্যাধি অর্থ—ধাতু-বৈষম্য। ব্যাধিতে শরীর অপটু হইয়া মনকেও অপটু করিয়া থাকে। স্ত্যান অর্থ—চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা বা একপ্রকার

উক্ত অন্তরায়সমূহ অবিধ্বস্ত অবস্থায় কেবল যে, চিত্তবিক্ষেপ সমুৎপাদন করিয়াই বিরত হয়, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ, মনোগ্লানি, শরীরকম্প এবং শ্বাস ও প্রশ্বাসাদি সমুৎপাদন করিয়াও যোগবিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। অন্তরায় সমূহের ধ্বংস হইলে, যোগীর সে সব বিঘ্নের সম্ভাবনাও দূর হইয়া যায়; তখন তিনি আপনার কর্ত্তব্য পথে অবাধে অগ্রসর হইতে পারেন। পরমেশ্বরপ্রসাদে যেমন চিত্তবৃত্তি-নিরোধের আনুকূল্য হয়, তেমনই অন্তরায়-ধ্বংসেরও সহায়তা হয়; এইজন্য যোগসাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্তরায় নিরাসার্থ পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করা বিশেষ উপযোগী ও আবশ্যক। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, যোগসিদ্ধি ও যোগফল-লাভের পক্ষে চিত্তশুদ্ধির উপযোগিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অবিশুদ্ধচিত্তে যোগ-সাধনার প্রয়াস কেবল পণ্ড পরিশ্রম মাত্র।

চিত্তবিশোধনের জন্য আরও যে সকল উপায় গ্রহণ করিতে

জড়তা। সংশয় অর্থ—উভয় বিষয়াবগাহী জ্ঞান; যেমন, যোগ ও যোগ-সাধন সমূহ সফল কি বিফল ইত্যাদি। প্রমাদ—সমাধিসাধনে অনোযোগ। আলস্য অর্থ—দৈহিক ও মানসিক গুরুত্ব বশতঃ কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তির অভাব। অবিরতি অর্থ—বিষয়ভোগের তৃষ্ণা। ভ্রান্তিদর্শন অর্থ—বিপরীত জ্ঞান। অলব্ধভূমিকত্ব অর্থ—সমাধির অনুকূল চিত্তাবস্থা লাভ করিতে না পারা। আর অনবস্থিতত্ব অর্থ—সমাধির উপযুক্ত ভূমি কথঞ্চিৎ লাভ করিলেও, তাহাতে মনের অস্থিতি। এই অবস্থাগুলি স্বভাবতই চিত্তের স্থিরতা বিনষ্ট করিয়া চিত্তকে নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া 'বিক্ষেপ', আর সমাধির বিঘ্ন ঘটায় বলিয়া 'অন্তরায়' নামে কথিত হয়।

পারা যায়, স্বয়ং সূত্রকার সে সকলেরও নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

" মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখ-দুঃখ-
পুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥" ১৩৩ ॥

সুখ-সম্ভোগপরায়ণ ব্যক্তিতে মৈত্রীভাবনা, দুঃখীর প্রতি করুনা, ধার্ম্মিকে হর্ষ বা সহানুভূতি, আর পাপীর প্রতি উপেক্ষা, অর্থাৎ পাপীর সঙ্গ পরিত্যাগ করা, এই কয়েকটী বিষয় হৃদয়মধ্যে ভাবনা (সংস্কারবদ্ধ) করিতে পারিলে তাহারা সহজেই চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে (১)। ইহা ছাড়া—

" প্রচ্ছর্দ্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।" ১৩৪ ॥

প্রাণবায়ুর যে প্রচ্ছর্দ্দন (যথারীতি বহিষ্করণ) ও বিধারণ অর্থাৎ দেহমধ্যে নিরোধ, তাহা দ্বারাও চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদিত হইতে পারে। এখানে প্রচ্ছর্দ্দন শব্দে প্রাণায়ামোক্ত রেচন, আর বিধারণ শব্দে কুম্ভক বুঝিতে হইবে। সূত্রে 'পূরণের' কোন কথাই

---

(১) অভিপ্রায় এই যে, চিত্ত স্বভাবতই শুদ্ধ—নির্ম্মল ; কেবল রাগ দ্বেষ ও হিংসাদি দোষের সংস্পর্শে মলিন হইয়া থাকে। উল্লিখিত ভাবনার ফলে চিত্তের সেই মলিনতা অপনীত হওয়ায় উহার প্রসন্নতা জন্মে। সুখীতে মৈত্রীভাবনায় দ্বেষ বা পরশ্রীকাতরতা নষ্ট হয়, দুঃখীর প্রতি করুণা ভাবনাদ্বারা হিংসাপ্রবৃত্তি দূর হয়। পুণ্যকর্ম্মে সহানুভূতি ভাবনাদ্বারা মাৎসর্য্য বা অসূয়াবুদ্ধি বিনষ্ট হয়। পাপীকে উপেক্ষা করার দরুণ পাপ-কর্ম্মে আসক্তি তিরোহিত হয়। ঐসকল দোষ বিনষ্ট হইলেই চিত্তের প্রকাশ-শক্তি আপনা হইতেই অভিব্যক্ত হয়।

নাই; কিন্তু পূরণব্যতীত যখন রেচন ও ধারণ (কুম্ভক) হইতে পারে না; তখন সূত্রে উল্লেখ না থাকিলেও পূরণের কর্ত্তব্যতা বুঝিতে হইবে। ফলকথা, প্রথমে বাহ্য বায়ুর দেহাভ্যন্তরে পূরণ, অনন্তর দেহমধ্যেই বিশেষভাবে ধারণ, এবং অবশেষে অন্তর্নিরুদ্ধ সেই বায়ুর প্রচ্ছর্দ্দন করিতে হয় (১)। এইরূপে দীর্ঘকাল প্রাণায়াম করিলে রাজসিক ও তামসিক ভাবগুলি বিদূরিত হইয়া যায়; ক্রমে সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়। তখন চিত্ত স্বচ্ছ ও স্থিরভাবাপন্ন হয়। এতদতিরিক্ত 'বিষয়বতী' প্রবৃত্তি প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার উপায় আছে, সে সকলের সাহায্যেও চিত্তপ্রসাদন করা যাইতে পারে (২)।

চিত্তপ্রসাদনের পক্ষে যতপ্রকার উপায় আছে বা থাকিতে পারে, তন্মধ্যে 'ধ্যানের' আসন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই জন্য সূত্রকার ধ্যানের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"যথাভিমতধ্যানাদ্বা।" ১।৩৯ ॥

চিত্তের স্থিরতা ও প্রসন্নতা সম্পাদনের পক্ষে ধ্যানের আবশ্যকতা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ধ্যানমাত্রই আলম্বন-সাপেক্ষ; বিনা আলম্বনে কখনই ধ্যান হইতে পারে না; অথচ সেই ধ্যানের

(১) তাৎপর্য্য—কেহ কেহ বলেন, যোগাঙ্গ প্রাণায়াম ও কর্ম্মাঙ্গ প্রাণায়াম পরস্পর ভিন্ন। কর্ম্মাঙ্গ প্রাণায়ামে পূরক, কুম্ভক ও রেচক, এই তিনের অপেক্ষা থাকিলেও আলোচ্য যোগাঙ্গ প্রাণায়ামে পূরকের আবশ্যকতা হয় না। উহার প্রণালীও স্বতন্ত্র; প্রথমতঃ কৌষ্ঠ বায়ুর বিরেচন (প্রচ্ছর্দ্দন) করিবে; শেষে বাহঃস্থিত বায়ুকে বাহিরেই স্থির রাখিতে হইবে।

(২) বিষয়বতী প্রবৃত্তির কথা সমাধিপাদের ৩৫ সূত্রে বিবৃত আছে।

আলম্বন বস্তুটী যে, কি, বা কেমন হইবে, তাহাও কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারে না ; স্বয়ং সূত্রকারও বলিতে পারেন নাই। কেবল এই মাত্র বলিয়া তিনি নিরস্ত হইয়াছেন যে, যোগীর যাহা অভিমত—মনঃপ্রিয়—যাহা দেখিলে তাহার চক্ষুঃ ও মনঃ স্বতই বিমুগ্ধ হয়, সেইরূপ কোন একটী বিষয়—বিষ্ণুমূর্ত্তি বা শিবমূর্ত্তি প্রভৃতি লইয়া ধ্যান করিতে হয়। তাহাতেই যোগীর চিত্ত স্থির ও প্রসন্ন হইয়া থাকে। চিত্ত একবার কোন বিষয়ে স্থিরতর হইলে, অন্যত্রও তাহার স্থিরতা লাভ করা দুঃসাধ্য হয় না। যথোক্ত প্রকার উপায় দ্বারা চিত্ত স্থির ও পরিমার্জ্জিত হইলে, যোগী চেষ্টা করিলেই সেই চিত্তদ্বারা অতি সূক্ষ্ম—পরমাণুপর্য্যন্ত এবং অতি বৃহৎ—মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত যে কোন বিষয়ে চিত্তকে স্থির বা একাগ্র করিতে সমর্থ হন। এইরূপে উৎপন্ন একাগ্রতাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির 'সমাপত্তি' শব্দ-বাচ্য।

[সাধনপাদ বা ক্রিয়াযোগ।]

এপর্য্যন্ত যোগ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইল, সে সমস্তই জ্ঞানযোগের কথা। জ্ঞান-সাপেক্ষ বা জ্ঞানাত্মক শ্রদ্ধাদি উপায়ের সাহায্যে অগ্রে চিত্ত স্থির করিতে হয়, পশ্চাৎ যথাবিধি উপায়ে যোগসিদ্ধি লাভ করিতে হয়. কিন্তু যাহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী নহে—ব্যুত্থিতচিত্ত (চঞ্চলচিত্ত), তাহাদের পক্ষে প্রথমেই জ্ঞান-যোগের সাহায্য লাভ করা নিতান্তই অসম্ভব ; সুতরাং তাহাদের পক্ষে ঐ সকল উপায়দ্বারা যোগসিদ্ধি ও যোগফল লাভ করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। তাহাদের পক্ষে ক্রিয়াযোগই যোগ-

সাধনার প্রথম সোপান। তাঁহারা প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগের সাহায্যে আপনার অধিকার অর্জ্জন করিবেন, পরে সোপানারোহণক্রমে অধিকারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরপর উন্নততর সাধনপথ অবলম্বন করিয়া যোগসিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইবেন (১)। এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার প্রথমে জ্ঞানযোগের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া, দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগের উপদেশ দিয়াছেন।—ক্রিয়াযোগ কি ?—

" তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥" ২।১ ॥

তপস্যা (২), স্বাধ্যায় (প্রণব প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রের জপ),

---

(১) সাধারণতঃ চিত্তের জ্ঞানপ্রতিবন্ধক দোষ তিন প্রকার—মল, বিক্ষেপ ও আবরণ। তন্মধ্যে মলদোষ—রাগ দ্বেষ ও তন্মূলক বাসনা ; বিক্ষেপ দোষ—রজোগুণের প্রবলতাজনিত চিত্তের চাঞ্চল্য ; আর আবরণ দোষ—অবিদ্যা বা ভ্রান্তিজ্ঞান। ক্রিয়াযোগদ্বারা মলদোষ, ধ্যানযোগ দ্বারা বিক্ষেপদোষ, আর বিবেকজ্ঞানদ্বারা আবরণদোষ নিবারণ করিতে হয়। মলদোষ নিবারণের জন্য ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করা প্রাথমিক যোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও আবশ্যক।

(২) শাস্ত্রবিহিত ক্লেশকর কর্ম্মের নাম তপঃ। সিদ্ধিলাভের যত রকম উপায় বা সাধন আছে, তন্মধ্যে তপস্যার মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঋষিগণ বলিয়াছেন—"নাসাধ্যং হি তপস্বতঃ," অর্থাৎ তপস্বীর অসাধ্য কিছু নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তপস্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানের পর্য্যন্ত উপায় বলিয়াছেন—" তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব—তপো ব্রহ্ম" অর্থাৎ তপই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকৃষ্ট সাধন ; অতএব তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর ইত্যাদি। ভাষ্যকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

"অনাদি-কর্ম্মক্লেশ-বাসনাচিত্রা প্রত্যুপস্থিত-বিষয়জালা চাশুদ্ধিঃ নান্তরেণ

ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল পরম গুরু পরমেশ্বরে সমর্পণ করা, এই সকল অনুষ্ঠানকে 'ক্রিয়াযোগ' বলা হয়। যোগসিদ্ধির উপায় বলিয়া ঐ সকল ক্রিয়াকেও 'যোগ' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

ক্রিয়াযোগের উদ্দেশ্য দুইটী—এক অভিলষিত সমাধি-সমুৎপাদন, দ্বিতীয় সমাধির প্রবল প্রতিপক্ষ অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশের তনুতা-(ক্ষীণতা-) সম্পাদন। এ কথা স্বয়ং সূত্রকারই পরবর্ত্তী—

"সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ॥" ২।২॥

সূত্রে স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত করিয়াছেন। ক্লেশ কত প্রকার এবং সে সকলের নাম কি? তদুত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—

"অবিদ্যাস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ॥" ২।৩॥

'ক্লেশ' পাঁচপ্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভি-নিবেশ। অবিদ্যা অর্থ—ভ্রান্তিজ্ঞান—অনিত্যে নিত্যতা বুদ্ধি ও অনাত্মায় আত্মতাবুদ্ধি প্রভৃতি। অস্মিতা অর্থ—অহঙ্কার—আত্মা

তপঃ সম্ভেদমাপদ্যতে—ইতি তপস উপাদানম্। তচ্চ চিত্তপ্রসাদনমবাধ-মানমনেনাসেব্যমিতি।"

তাৎপর্য্য এই যে, চিত্তগত যে অশুদ্ধি অনাদিকাল হইতে বিচিত্র কর্ম্ম ও ক্লেশ বাসনার আশ্রয় হইয়া আছে, এবং বিবিধ ভোগ্য বিষয় উপস্থাপন করাই যাহার প্রধান কার্য্য, সেই অবিশুদ্ধি কখনই তপস্যা ব্যতীত বিনষ্ট হইতে পারে না; এই জন্যই তপস্যার প্রয়োজন; অবশ্য, সেই তপস্যাও এমন ভাবে করিতে হইবে, যাহাতে চিত্তগত প্রসন্নতার কোন প্রকার হানি না ঘটে।

ও বুদ্ধিতে অভেদাভিমান। রাগ অর্থ—অনুরাগ, অর্থাৎ সুখ ও সুখসাধন বস্তুবিষয়ে আকাঙ্ক্ষা। দ্বেষ অর্থ—দুঃখ ও দুঃখজনক বস্তুবিষয়ে ক্রোধ বা জিঘাংসাবৃত্তি। সাধারণতঃ অনুরাগে লোকের প্রবৃত্তি ঘটায়, আর দ্বেষে তাহার বিপরীতভাব—নিবৃত্তি জন্মায়। অভিনিবেশ অর্থ—মরণাদিত্রাস; অভিপ্রায় এই যে, প্রাণিমাত্রই জন্মজন্মান্তরে ভীষণ মৃত্যুযাতনা অনুভব করিয়াছে, বর্ত্তমানেও সেই সংস্কার দৃঢ়তরভাবে হৃদয়-পটে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে; এই কারণে প্রাণিমাত্রই তাদৃশ অবস্থার সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত থাকে। এই অবস্থাটা অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলেরই সমান ও অপরিহার্য্য। এই পাঁচ প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিই সামান্যতঃ ক্লেশ-পদবাচ্য।

ক্লেশমাত্রই অপ্রিয় ও উচ্ছেদ্য; কিন্তু অবিদ্যার উচ্ছেদে যত্নপর না হইয়া যাহারা কেবল অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশের উচ্ছেদেই প্রয়াস পান, তাহারা সাময়িকভাবে কতকটা শান্তি পাইলেও পাইতে পারেন, এবং যোগপথেও কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইতে পারেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত শান্তি বা যোগাধিকার লাভ করা তাহাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কেন না, তাহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে,—

"অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ত-তনু-বিচ্ছিন্নোদারাণাম্ ॥" ২।৪ ॥

পূর্ব্বকথিত পাঁচপ্রকার ক্লেশই যথাসম্ভব—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার, এই চারি অবস্থার যে কোন অবস্থায় থাকিতে পারে। এক সময়ে উক্ত অবস্থা-চতুষ্টয় সম্ভবপর হয় না, কিন্তু

পর্য্যায়ক্রমে সকল অবস্থাই সকলের সম্বন্ধে সম্ভবপর হয়। রাগ (অনুরাগ) নামক ক্লেশটী শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ সকলের হৃদয়েই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। বিশেষ এই যে, শিশুর হৃদয়-গত রাগ প্রসুপ্ত অর্থাৎ অনুদ্বুদ্ধ, আর যুবকের হৃদয়ে উহা উদার—লব্ধবৃত্তি অবস্থায় থাকে। রাগান্ধ ব্যক্তিও যদি নিরন্তর রাগ-বিরোধী চিন্তা ও চেষ্টা করে, তবে তাহার হৃদয়গত সেই রাগবৃত্তি ক্রমশঃ তনুতা (ক্ষীণতা) প্রাপ্ত হয়। আবার সেই রাগান্ধ ব্যক্তিই যখন ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়ে, তখন তাহার রাগ-বৃত্তি ক্রোধদ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। আর যখন যে সকল বৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া উপযুক্ত কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়, সে সকল ক্লেশ-বৃত্তিকে উদার কহে। যেমন রাগযুক্ত ব্যক্তির হৃদয়ের অনুরাগ।

উক্ত অস্মিতাদি ক্লেশগুলি উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ অবস্থার যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, অবিদ্যাই উহাদের ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান; অবিদ্যার সদ্ভাবে উহাদের সদ্ভাব, আর অবিদ্যার অভাবে উহাদের অভাব সুনিশ্চিত; সুতরাং উহারা সকলেই অবিদ্যাপ্রসূত—অবিদ্যাত্মক। যোগী প্রথমে ক্রিয়াযোগের সাহায্যে উহাদের ক্ষীণদশা আনয়ন করেন, পরে প্রসংখ্যান বা ধ্যানরূপ অগ্নিদ্বারা উহাদিগকে দগ্ধপ্রায় করিয়া রাখেন; তখন অভীষ্ট সমাধিসাধনা তাঁহার পক্ষে সহজ ও সুগম হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে উক্ত ক্লেশরাশিই জীবগণের সর্ব্ববিধ অনর্থের নিদান। কেন না,—

" ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট-জন্মবেদনীয়ঃ।" ২।১২॥

" সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।" ২।১৩॥

ক্লেশই বস্তুতঃ শুভাশুভ কর্ম্মাশয়ের—ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মূলকারণ (১)। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ হইতেই ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম আরব্ধ হইয়া থাকে. এবং ক্লেশ বিদ্যমান থাকিয়াই ঐ সকল কর্ম্মাশয়ের ফল—জন্ম আয়ু ও ভোগ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। ঐ সকল ফলের মধ্যে কতকগুলি ইহজন্মে অনুভব-যোগ্য, আবার কতকগুলি ফল জন্মান্তরোপভোগ্য হইতে পারে; কিন্তু সমস্ত ফলেরই মূলকারণ সেই অবিদ্যাদি ক্লেশ (২)।

(১) এখানে বলা আবশ্যক যে, ক্লেশমাত্রেরই দুইটী অবস্থা, একটী স্থূল, অপরটী সূক্ষ্ম। স্থূল ক্লেশ বৃত্তিরূপী, আর সূক্ষ্ম ক্লেশ বাসনাস্বরূপ। তন্মধ্যে বৃত্ত্যাত্মক স্থূল ক্লেশগুলিকে প্রথমে ক্রিয়াযোগদ্বারা ক্ষীণ করিয়া শেষে প্রসংখ্যানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ (নির্বীজ) করিতে হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম বাসনারূপী ক্লেশ সম্বন্ধে ব্যবস্থা অন্যপ্রকার। সে গুলির উচ্ছেদ করিবার কোন উপায় নাই। চিত্ত যত দিন থাকিবে, উহারাও ততদিন থাকিবেই। চিত্ত যখন আপনার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া স্বকারণে লয়প্রাপ্ত হইবে, তখনই উহাদের বিলয় হইবে। সূত্রকার এই কথাটী "তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ।" (২।১০) সূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। সূত্রস্থ 'প্রতিপ্রসব' কথার অর্থ লয়। অর্থাৎ চিত্তলয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের বিলয় হয়, তাহার পূর্ব্বে হয় না।

(২) অভিপ্রায় এই যে, যোগীর প্রযত্নগত তীব্রতার তারতম্যানুসারে কর্ম্মাশয়ের ফল ইহজন্মে বা পরজন্মেও অনুভূত হইতে পারে। তন্মধ্যে তীব্র সংবেগে মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধিদ্বারা ঈশ্বর, দেবতা ও মহানুভবগণের

অবিদ্যামূলক বলিয়াই কর্ম্মলব্ধ ফলমাত্রই দুঃখময় বা দুঃখবহুল। অজ্ঞানান্ধ লোকেরা ইহা বুঝিতে না পারিলেও, যাহারা বিবেকী—প্রকৃত ভাল মন্দ বা সুখ দুঃখ বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ, তাঁহারা জাগতিক সর্ব্ববিষয়েই দুঃখবাহুল্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। দুঃখের অব্যাহত অধিকার সার্ব্বত্রিক হইলেও ভোগরাজ্যে উহা আরও স্ফুটতরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কারণ, ভোগ যতই রমণীয় হউক না কেন, পরিণামে অর্থাৎ ভোগাবসানে দুঃখ সমুৎপাদন না করিয়া বিরত হয় না। তাহার পর, পরকে পীড়া না দিয়া, অথবা ভোগে বঞ্চিত না করিয়া কখনও কোনও ভোগ সম্ভবপর হয় না; সুতরাং পরসন্তাপজ ভোগে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ অনুরাগ হইতে, যে ভোগপ্রবৃত্তি জন্মে, সেই ভোগ হইতেও আবার তদনুরূপ সংস্কার উৎপন্ন হয়; সেই সংস্কার জাগরিত হইয়া লোককে পুনরায় ভোগে নিয়োজিত করে। কোন প্রকারে সেই ভোগে বাধা ঘটিলেই দুঃসহ দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়; এইরূপে জগতের সমস্ত বিষয়ই বিবেকীর নিকট দুঃখময় বলিয়া পরিগণিত হয়। অধিকন্তু, সমস্ত জগৎই যখন ত্রিগুণময় সুখ, দুঃখ ও মোহ যখন ত্রিগুণেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তখন জগতে

আরাধনায় বা অবজ্ঞায় যে পুণ্য-পাপময় কর্ম্মাশয় নিষ্পন্ন হয়, তাহার ফল ইহজন্মে—সদ্যঃ সদ্যঃ প্রকটিত হয়, যেমন নন্দীশ্বরের দেবত্ব এবং নহুষের অজগরত্ব প্রাপ্তি। আর যে সকল শুভাশুভ কর্ম্মাশয় তীব্র সংবেগে সম্পাদিত নহে, সে সকলের ফল পরজন্মে প্রকটিত হয়, সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মমাত্রই ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

দুঃখসম্বন্ধরহিত কোন বস্তুই থাকা সম্ভব হয় না; কাজেই জগৎকে দুঃখময় বলা অসঙ্গত হয় নাই বা হইতে পারে না (১)। এই বিষম দুঃখ-বহ্নির তীব্র তাপে কাতর হইয়াই বিবেকী জন—কেবল বিবেকী কেন, জীবমাত্রই উহার আত্যন্তিক উপশম কামনা করিয়া থাকে।

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি যেমন জীবমাত্রেরই অবিসংবাদিত উদ্দেশ্য, তেমনি দুঃখনিবৃত্তির উপায় নির্দ্দেশ করাই আর্য শাস্ত্রের—বিশেষতঃ আস্তিক দর্শনশাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য। আলোচ্য যোগশাস্ত্রও সেই লক্ষ্যপথ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সেই লক্ষ্য-পথ পরিশোধনের মানসে যোগদর্শন চিকিৎসাশাস্ত্রের ন্যায় সমস্ত শাস্ত্রার্থকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—এক 'হেয়', দ্বিতীয় হেয়হেতু, তৃতীয় হান ও চতুর্থ—হানের উপায়। তন্মধ্যে দুঃখ স্বভাবতই অপ্রিয়; সুতরাং সকলেরই বর্জ্জনীয়; এইজন্য 'হেয়' নামে অভিহিত। বিশেষ এই যে, অতীত দুঃখ নিজেই বিনষ্ট, আর উপস্থিত দুঃখ, যাহার ভোগ চলিতেছে, তাহারও নিবারণ করা সম্ভব হয় না; কাজেই বলিতে হইবে যে,—

"হেয়ং দুঃখমনাগতম্॥" ২।১৬॥

---

(১) সর্ব্ববিষয়ের দুঃখময়ত্ব জ্ঞাপনের অভিপ্রায়ে স্বয়ং সূত্রকার বলিয়াছেন—"পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ॥" ২।১৫॥

ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"যথা ঊর্ণাতন্তুঃ অক্ষি-পাত্রে ন্যস্তঃ স্পর্শেন দুঃখয়তি, নান্যেষু গাত্রাবয়বেষু, এবম্ এতানি দুঃখানি অক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনমেব ক্লিশ্নন্তি, নেতরং প্রতিপত্তারম্॥" ইতি।

যাহা অনাগত—এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে, তাদৃশ দুঃখই লোকের পক্ষে হেয়; সুতরাং তদ্বিষয়েই সকলের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

কথিত দুঃখ যতই অপ্রিয় হউক না কেন, এবং তদুচ্ছেদের নিমিত্ত লোকে যতই যত্ন করুক না কেন, যতক্ষণ উহার মূল-কারণ জানিতে পারা না যায়, ততক্ষণ সমধিক ইচ্ছা, ঐকান্তিক আগ্রহ ও তীব্র যত্ন সত্বেও অভিমত দুঃখ নিবৃত্তি কোন মতেই হয় না বা হইতে পারে না। এইজন্য দুঃখহানেচ্ছুর পক্ষে সর্ব্বাদৌ ঐ হেয় দুঃখের নিদান নিরূপণ করা আবশ্যক হয়। সেই আবশ্যকতা বুঝিয়া স্বয়ং সূত্রকার বলিয়াছেন—

"দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥" ২।১৭ ॥

দ্রষ্টা—পুরুষ ও দৃশ্য—বুদ্ধি এবং বুদ্ধিতে প্রতিফলিত বিষয়-সমূহ, এতদুভয়ের যে, সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মানুযায়ী যে ভোগ্য-ভোক্তৃভাব, তাহাই পূর্ব্বোক্ত 'হেয়'-পদবাচ্য দুঃখের নিদান। অভিপ্রায় এই যে, নিত্য চৈতন্যরূপী পুরুষ প্রকাশস্বভাব হইয়াও যা'কে তা'কে দর্শন করে না, একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিগত বিষয় সমূহ ছাড়া অপর কোন বিষয়ই দেখিতে পায় না। এইজন্য বুদ্ধি ও তদারূঢ় বিষয়ই পুরুষের দৃশ্যমধ্যে পরিগণিত। প্রাক্তন কর্ম্মা-নুসারেই পুরুষ বুদ্ধি ও তদারূঢ় বিভিন্ন বিষয়কে আপনার প্রকাশশক্তিদ্বারা উদ্ভাসিত করিয়া থাকে; তাহার ফলে উদাসীন পুরুষ হয় দ্রষ্টা (ভোক্তা), আর জড়স্বভাবা বুদ্ধি ও তাহার বৃত্তি-সমূহ হয় দৃশ্য। এই দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভাবই ভোক্তৃভোগ্যভাব

নামে পরিচিত, এবং 'সংযোগ' নামে অভিহিত। উক্ত সংযোগই পুরুষের ভোক্তৃত্ব ও বুদ্ধিপ্রভৃতির ভোগ্যত্ব প্রকটিত করিয়া থাকে। এই জন্য স্বয়ং সূত্রকারও সংযোগকেই দৃশ্যগত স্বত্ব ও দ্রষ্টৃগত স্বামিত্ব বোধের হেতু বা উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, উপরে সর্ব্বানর্থের নিদানভূত যে সংযোগের কথা বিবৃত করা হইল, সেই সংযোগ কোথা হইতে আইসে? নিত্য সর্ব্বগত আত্মার এই অভিনব স্ব-স্বামিভাবরূপ সংযোগের প্রকৃত কারণ কি? এতদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

"তস্য হেতুরবিদ্যা।" ২।২৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাই সেই সংযোগের হেতু বা প্রবর্ত্তক। জীবগণ অনাদি কাল হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে যে অবিদ্যার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছে, এবং যাহার প্রভাবে জীবগণ অনিত্য, অশুচি ও অনাত্ম বস্তুতে নিত্য শুচি ও আত্মবুদ্ধি পোষণ করিতেছে; সেই মহামহিমশালিনী অবিদ্যারই অনতিক্রমনীয় প্রভাবে অসঙ্গ চৈতন্যরূপী আত্মার সহিত অনাত্মা—দৃশ্য বস্তুর স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়া থাকে; সেই সংযোগই আবার

---

(১) সূত্রকার বলিয়াছেন—

"স্ব-স্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ॥" ২।২৩ ॥

অর্থাৎ দৃশ্যের সহিত দ্রষ্টার সংযোগ হয় বলিয়াই চেতন পুরুষ দৃশ্য জগতের ভোক্তা হয়, আর দৃশ্য জগৎ পুরুষের ভোগ্য হয়। সংযোগ না হইলে বা না থাকিলে পুরুষের স্বামিত্ব, আর দৃশ্যের স্বত্ব (ভোগ্যত্ব) হয় না, এবং থাকে না।

সংসারাসক্ত জীবনিবহের সর্ব্ববিধ দুঃখভোগের প্রবর্ত্তক; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, জীবগণের দুঃখ সংযোগপ্রসূত হইলেও প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যাই উহার মূলকারণ; অতএব যতক্ষণ অবিদ্যা বিধ্বস্ত না হয়, ততক্ষণ কাহার পক্ষেই এই দুঃখধারা সমুচ্ছেদ করা সম্ভবপর হয় না। এই কারণে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য যোগী পুরুষকে সর্ব্বাদৌ অবিদ্যা বিধ্বংসক্ষম বিবেকজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কেন না, বিবেকজ্ঞানই অবিবেক-ধ্বংসের একমাত্র কারণ বা উপায়। স্বয়ং সূত্রকারও এই যুক্তিসিদ্ধ উপদেশ প্রদানচ্ছলে বলিয়াছেন—

"বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।" ২।২৬॥

বিপ্লব-সম্বন্ধ শূন্য বিবেকখ্যাতিই দুঃখহানের উপায়। বিপ্লব অর্থ—বিপর্য্যয় বা ভ্রান্তিজ্ঞান। অবিদ্যানিবৃত্তির জন্য সেই প্রকার বিবেকজ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয়, যাহাতে কোন প্রকার ভ্রমপ্রমাদাদির সম্বন্ধ বা সংস্পর্শ না থাকে। ভ্রান্তিসংকুল বিবেকজ্ঞান বস্তুতঃ বিবেকজ্ঞানই নহে; সুতরাং তাহা দ্বারা অবিদ্যাত্মক অবিবেকের উচ্ছেদ হয় না, বা হইতে পারে না (১)।

---

(১) সাংখ্যকার কপিল বলিয়াছেন—"নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ।" অর্থাৎ অবিদ্যানিবৃত্তির পক্ষে একটীমাত্র কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে; সেই কারণের দ্বারাই অবিদ্যার উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, অন্য উপায়ে নহে। অন্ধকারনিবৃত্তির জন্য যেরূপ আলোক একমাত্র নির্দ্দিষ্ট কারণ, তদ্রূপ অবিদ্যানিবৃত্তির জন্যও বিবেকজ্ঞানই একমাত্র নির্দ্দিষ্ট কারণ, ইত্যাদি।

আলোক সংস্পর্শমাত্র যেমন চিরনিহিত অন্ধকাররাশি বিদূরিত হয়, তেমনি অভ্রান্ত বিশুদ্ধ বিবেকজ্ঞান সমুদিত হইবামাত্র জীবের চিরসঞ্চিত অবিদ্যা বা অবিবেকজ্ঞান বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সূত্রকার বলিতেছেন—

"তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং, তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥" ২।২৫ ॥

অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানোদয়ে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবাত্মক সংযোগের অবসান হয়; তাহার ফলে পূর্ব্বকথিত হেয় দুঃখের বিনাশ ঘটে; সেই দুঃখধ্বংসই যোগশাস্ত্রে 'হান'ব্যূহনামে অভিহিত হইয়াছে। এই যে, সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা হান, তাহাই চৈতন্যরূপী পুরুষের কৈবল্য (কেবলীভাব) বা মুক্তি। এবংবিধ অবস্থাতেই পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ ও স্বস্থ হইয়া থাকে। তখন আর বুদ্ধিগত বিষয়াকার বৃত্তিরাশি প্রতিফলিত হইয়া নির্ম্মল নিষ্ক্রিয় পুরুষকে কলুষিতপ্রায় করিতে পারে না; তখন পুরুষের বৃত্তি-সারূপ্যের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়া যায়, এবং এখানেই জীবের সমস্ত কর্ত্তব্যতা পরিসমাপ্ত হয়। তখন তাঁহার হৃদয়ে নিজের কৃতকৃত্যতাসূচক কেবল এইরূপ প্রতীতি হইতে থাকে যে, আমাকে যাহা ত্যাগ করিতে হইবে, সেই সমুদয় হেয় বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আর কিছুই জানিবার নাই। 'হেয়' দুঃখের সমুৎপাদক 'ক্লেশ'সমূহকে ক্ষয় করিয়াছি; উহাদের সম্বন্ধে ক্ষয় করিবার আর কিছুই নাই। নিরোধ-সমাধির সাহায্যে দুঃখহানিরূপ মুক্তিও প্রত্যক্ষ করিয়াছি; এ সম্বন্ধেও আর কিছু প্রত্যক্ষ করিবার নাই। ইহা ছাড়া, আত্মা ও অনাত্মার

পার্থক্যোপলব্ধিরূপ যে বিবেকখ্যাতির সাহায্যে হেয়-দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করিতে হইবে, সেই বিবেকখ্যাতিকেও হৃদয়মধ্যে স্থিরপদ করিয়াছি। আরও তাঁহার মনে হয়,—এখন আমার বুদ্ধি চরিতার্থ হইয়াছে (কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছে)। বুদ্ধিগত সত্ত্বাদি গুণত্রয় পর্ব্বতশিখরচ্যুত পাষাণখণ্ডের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া নিজ-নিজ কারণে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে ; উহাদের আর পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নাই। এখন আমার আত্মা বৃত্তি-সম্বন্ধ রহিত হইয়া কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্যজ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তখন এই সাত প্রকার প্রতীতি ছাড়া আর কোনও চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। যোগশাস্ত্র এতদবস্থার যোগীকে 'কুশল' নামে বিশেষিত করিয়াছেন।

এ কথা খুবই সত্য যে, যে লোক ঐহিক ও পারলৌকিক বিবিধ ভোগরাজ্য হইতে মনকে বিরত রাখিয়া তীব্র সাধনার সাহায্যে বিমল বিবেকজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বদুঃখের নিদান চিরসঞ্চিত অবিদ্যার উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হইতে পারিয়াছেন—সম্পূর্ণরূপে কৃতকৃত্য হইয়াছেন, তিনি যে, সত্য সত্যই কুশল (কর্ত্তব্য-নিপুণ), সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

[আলোচনা]

এ পর্য্যন্ত যোগ, যোগলক্ষণ, যোগবিভাগ এবং যোগ-সিদ্ধির উপায়-পদ্ধতি সংক্ষেপে বিবৃত করা হইয়াছে ; এবং সেই প্রসঙ্গে চিত্তের বৃত্তিবিভাগ, প্রমাণাদির ভেদ ও অভ্যাস-বৈরাগ্য প্রভৃতির কথাও আবশ্যকমতে কথিত হইয়াছে। ইহার

পর রাজযোগে অনধিকারী লোকদিগের পক্ষে অবশ্য করণীয় ক্রিয়াযোগ, তদ্ভেদ ও তদনুষ্ঠানের উপযোগিতা প্রভৃতিও সাধারণভাবে দেখান হইয়াছে। অনন্তর যোগশাস্ত্রোক্ত হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়, এই চতুর্বিধ ব্যূহের সম্বন্ধেও যথাসম্ভব সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ব্যূহচতুষ্টয়ের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখজনক পদার্থমাত্রই জীবগণের প্রধানতঃ হেয়। অবিদ্যা বা বিপর্য্যয়জ্ঞান আবার সেই হেয় পদার্থগুলিকে জীবের সম্মুখে আনয়ন করে; এইজন্য অবিদ্যাই প্রকৃতপক্ষে হেয়ের হেতু। হেয় দুঃখের নিবারণ করিতে হইলে, অগ্রেই হেয়-হেতু অবিদ্যার উচ্ছেদ করা আবশ্যক হয়। বিদ্যা বা বিবেকজ্ঞান ব্যতীত অবিদ্যার উচ্ছেদ কখনই সম্ভবপর হয় না; এই কারণে বিবেকজ্ঞানই হেয়-হানের (দুঃখনিবৃত্তির) একমাত্র উপায়। সেই বিবেকজ্ঞান—আত্মা ও অনাত্মার (বুদ্ধির) পার্থক্যানুভূতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বানর্থের নিদানভূত অবিদ্যার উচ্ছেদসাধন করে; এইজন্য বিবেকজ্ঞানকেই হানোপায় বলা হইয়া থাকে। এই হেয়-হানই (দুঃখনিবৃত্তিই) সর্ব্বজীবের একমাত্র লক্ষ্য; এবং যোগ-সাধনার চরম ফল। এবংবিধ অবস্থায় বুদ্ধির প্রতিবিম্ব পতিত না হওয়ায় পুরুষ তখন আপনার স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়; তজ্জন্য এই অবস্থার নাম হইতেছে—কৈবল্য। কৈবল্য আর মোক্ষ একই পদার্থ। এখানেই সেই পুরুষের প্রতি প্রকৃতির (বুদ্ধির) কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হয়; তখন উভয়েই উভয়ের সম্বন্ধ ভুলিয়া যাইয়া চিরদিনের জন্য শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করে।

[যোগাঙ্গ-সাধনা]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মানবের মন স্বভাবতই মলদোষে দূষিত—অতি মলিন। সেই মলদোষ অপনীত না হইলে মনের বিশুদ্ধি অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বচ্ছতা কখনই আবির্ভূত হয় না। অবিশুদ্ধ মনে তত্ত্বদর্শন বা বিবেকখ্যাতি কখনই প্রকাশিত হয় না, ও হইতে পারে না; অথচ বিবেকখ্যাতি ব্যতীত দুঃখনিবৃত্তিরও আর দ্বিতীয় উপায় নাই। এইজন্য যোগী পুরুষকে প্রথমেই চিত্তবিশোধনে যত্নপর হইতে হয়—যত্নসহকারে যোগাঙ্গসমূহের অনুষ্ঠান করিতে হয়। কারণ,—

"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদবিশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরা বিবেকখ্যাতেঃ ॥" ২।২৮।

যোগাঙ্গের স্বরূপ ও সংখ্যা পরে বলা হইবে। চিত্তবিশোধনের জন্য নিরন্তর যোগাঙ্গানুষ্ঠান করিতে করিতে মনের সমস্ত মল অপনীত হয়, মন বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও প্রকাশময় হয়। তখন মানসিক জ্ঞানদীপ্তি এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত তাহার অনায়াস-সাধ্য হইয়া পড়ে। বিবেকখ্যাতি সমুৎপাদন করাই চিত্ত-বিশোধনের মুখ্য ফল; তদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু হয়, সে সমস্তই উহার গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফলমাত্র (১)। যোগী পুরুষ

---

(১) অভিপ্রায় এই যে, "আম্রে ফলার্থে রোপিতে ছায়া-গন্ধাবনুৎপদ্যেতে" অর্থাৎ ফলের জন্য আম্রবৃক্ষ রোপণ করিলেও, তাহার ছায়া ও গন্ধলাভ যেমন আনুষঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়, ঠিক তেমনই বিবেকখ্যাতির উদ্দেশে চিত্তশোধন করিলেও অন্যান্য বিভূতিসকল উহার আনুষঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়।

ঐ সকল আনুষঙ্গিক ফলে আসক্ত না হইয়া মুখ্য ফল বিবেকখ্যাতি লাভেই সমুৎসুক হইবেন। যোগাঙ্গ প্রধানতঃ কি কি, এবং কত্র প্রকার, তাহা বলা হইতেছে—

"যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥" ২।২৯ ॥

যোগাঙ্গ অর্থাৎ যোগসিদ্ধির বিশিষ্ট উপায় আটপ্রকার,—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। তন্মধ্যে যম অর্থ—বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া ও বৃত্তির সংকোচসাধন; অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্যকে সুপথে পরিচালিত করা। উক্ত যম ধর্ম্মটী পাঁচভাগে বিভক্ত,—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্য্যাভাব), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (পরের প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ না করা)। হৃদয়ের মধ্যে অহিংসাবৃত্তি সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, কেবল যে, তাঁহারই হৃদয় হইতে হিংসাবৃত্তি চলিয়া যায়, তাহা নহে, পরন্তু,—

"অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥" ২।৩৫ ॥

(অহিংসাবৃত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে,) তাহার সন্নিহিত প্রাণীদিগের হৃদয় হইতেও বৈরবুদ্ধি চলিয়া যায়; তাহারাও কাহাকে হিংসা করে না (১)। সংযমের দ্বিতীয় স্তর—সত্য:

---

(১) তাৎপর্য্য—প্রাণিমাত্রই অল্পাধিক পরিমাণে হিংসাবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে, এবং হিংসামাত্রই হৃদয়ে রজঃ ও তমোগুণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে; এই জন্য মনুষ্যমাত্রেরই হিংসা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। কেহ কেহ জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের সীমায় আবদ্ধ করিয়া

নিষ্ঠা। অসত্যই পাপের প্রধান কারণ। যেখানে পাপ, সেখানেই অসত্যের তাণ্ডবলীলা। পাপী কখনই অসত্যের আশ্রয় না লইয়া স্থির থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে, সত্যবাদী কখনও পাপকার্য্য করিতে পারে না। সত্য কথা বলিলে পাপীর পাপ-কার্য্য অচল হইয়া পড়ে। এই কারণে, পাপপ্রবৃত্তি নিরোধের জন্য প্রথমেই সত্যনিষ্ঠা অবলম্বন করিতে হয়; কিন্তু সত্যের ভান করিয়া অসত্য বলিলে, তাহাতে চিত্তশুদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নাই। এই কারণে চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রকৃত সত্য ব্যবহার করিতে হয়,—কপট সত্য নহে।

স্তেয় অর্থ—চৌর্য্য। পরকীয় বস্তুতে উৎকট অভিলাষ না থাকিলে চৌর্য্যপ্রবৃত্তি জন্মে না। পক্ষান্তরে, চৌর্য্য দ্বারাও ঐরূপ অভিলাষ ও অসদ্‌বৃত্তি সমধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইজন্য চিত্তশুদ্ধিকামী পুরুষকে অস্তেয় ভাবনা করিতে হয়। চতুর্থ সংযম—ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যের সাধারণ অর্থ—ইন্দ্রিয়সংযম, আর বিশেষার্থ—গুপ্তেন্দ্রিয়-সংযম বা বীর্য্যরক্ষা। বীর্য্যহীন লোক

অহিংসাব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে। যেমন মৎস্যজীবীর পক্ষে মৎস্য ভিন্ন প্রাণীর হিংসা না করা। তীর্থক্ষেত্রে হিংসা না করা, তিথিবিশেষে বা সংক্রান্তি প্রভৃতি সময়ে হিংসা ত্যাগ করা, এবং কোন ব্রাহ্মণ বা শরণাগত ব্যক্তির জন্য কেবল হিংসা করা, তদ্ভিন্ন স্থলে হিংসা না করা। এ সকলও অহিংসা ব্রত সত্য, কিন্তু যে লোক কোন দেশে, কোন কালে বা কোন অবস্থায়ই হিংসা না করে, তাহার সেই অহিংসা 'মহাব্রত' নামে পরিচিত, এবং তাহাকেই 'অহিংসাপ্রতিষ্ঠা' বলা হয়। তাঁহারই নিকটস্থ প্রাণীর বৈরবুদ্ধি বিলোপ পায়।

সহজেই উৎসাহ-বর্জ্জিত হইয়া থাকে; সুতরাং সেরূপ লোকের দ্বারা ক্লেশসাধ্য যোগসাধনা কখনই সম্ভবপর হয় না, বা হইতে পারে না। অতঃপর সংযমের পঞ্চম বিভাগ হইতেছে—অপরিগ্রহ,—পরের প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ না করা। ইহাদ্বারা মনের ভোগপিপাসা প্রশমিত হইয়া থাকে। যাহার ভোগাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার পরদ্রব্য গ্রহণ করিবার আবশ্যকতাও নাই, বা থাকে না। ভোগের জন্যই পরদ্রব্য গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়। ভোগের ফল ইন্দ্রিয়গণের ভোগ-লালসা বর্দ্ধিত করা; যতই অধিক পরিমাণে বিষয়-ভোগ করা যায়; ভোগবিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের লালসাও ততই বৃদ্ধি পায়; তাহাতে বৈরাগ্যের সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব বৈরাগ্যাভিলাষী ব্যক্তি ভ্রমেও পরদ্রব্য গ্রহণে মনোনিবেশ করিবে না। এই প্রকারে হিংসাদি বৃত্তিগুলি পরিত্যাগ করিলে যোগীর যোগসাধনা সহজ ও সুগম হইয়া থাকে।

উল্লিখিত হিংসাদি কার্য্যগুলি সাধারণতঃ তিনভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। প্রথমতঃ নিজে করা, দ্বিতীয়তঃ অপরকে দিয়া করান, তৃতীয়তঃ অপরের তথাবিধ কার্য্যে অনুমোদন করা। যেমন কোন লোক ধার্ম্মিকতার ভান করিয়া বাহ্য সাধুতা প্রদর্শন করত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাণিহিংসা করে না, মিথ্যাকথা বলে না, এবং পরের দ্রব্যও চুরি করে না সত্য; কিন্তু অপরকে ঐ সমুদয় কার্য্যে নিয়োজিত করে, অথবা পরকৃত ঐ সকল কার্য্যে অনুমোদন বা উৎসাহ-প্রদান করে। বুঝিতে হইবে যে, ঐ প্রকার কপটাচারে

তাহাদের চিত্তশুদ্ধি না করিয়া বরং পাপের পথই সমধিক প্রশস্ত করিয়া দেয়।

যোগশাস্ত্রে উক্ত সংযমের বিপরীত ক্রিয়াগুলিকে—হিংসা, অসত্য (মিথ্যা কথা বলা), স্তেয় (চৌর্য্য), বীর্য্যক্ষয় ও পরিগ্রহকে 'বিতর্ক' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই বিতর্ক স্বয়ংকৃতই হউক, অথবা অপরের দ্বারাই সম্পাদিত হউক, কিংবা অনুমোদিতই হউক, এ সকলের ফল—অনন্ত দুঃখ ও অজ্ঞান; এইজন্য যোগিজনের পক্ষে এ সকল অবশ্য বর্জ্জনীয়। চিরাভ্যস্ত এ সকল বৃত্তি ইচ্ছামাত্রেই পরিত্যাগ করা যায় না। এই জন্য মনে মনে ইহাদের অনিষ্টকারিতা সর্ব্বদা ভাবনা করিতে হয়। সেই দৃঢ়তর ভাবনার ফলে এ সকলের নিবৃত্তি সহজ ও সুখসাধ্য হয়। উল্লিখিত সংযম সম্পাদনের পর দ্বিতীয় যোগাঙ্গ 'নিয়মে'র অনুষ্ঠান করিতে হয়। নিয়ম কি? এবং কত প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন—

"শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥" ২।৩২ ॥

শৌচ অর্থ বিশুদ্ধি। তাহা দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। তন্মধ্যে জল ও মৃত্তিকাদি দ্বারা প্রক্ষালন এবং পবিত্র আহার্য্য গ্রহণ প্রভৃতি বাহ্য শৌচ, আর চিত্তগত বাসনামল ক্ষালনের নাম আভ্যন্তর শৌচ। সন্তোষ অর্থ—অবলম্বিত সাধনে সিদ্ধিলাভ না করা পর্য্যন্ত তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা, অর্থাৎ তাহা ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্টবোধে পরবর্ত্তী সাধন গ্রহণে আগ্রহ না করা। তপঃ অর্থ—শাস্ত্রের বিধান অনুসারে ক্লেশ সহ্য করা। শীতোষ্ণাদি

দ্বন্দ্বসহন, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদি ব্রতানুষ্ঠান, এবং এই জাতীয় আরও অনেক আছে, যে সকল অনুষ্ঠান 'তপস্যা' মধ্যে গণ্য। স্বাধ্যায় অর্থ—মোক্ষপ্রতিপাদক অধ্যাত্মশাস্ত্রের পাঠ ও প্রণবাদি-জপ। ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থ—সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করা। উল্লিখিত যোগাঙ্গ সমূহের মধ্যে কতকগুলি বহিঃশুদ্ধির কারণ, আর কতকগুলি অন্তঃশুদ্ধির কারণ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্তঃশুদ্ধির জন্যই বহিঃশুদ্ধির আবশ্যক; এবং প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকখ্যাতি সম্পাদনেই অন্তঃশুদ্ধির সফলতা। যাহারা অন্তঃশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল বহিঃশুদ্ধিতেই মনোনিবেশ করেন, অথবা বিবেকখ্যাতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল অন্তঃশুদ্ধি-সমুৎপাদনেই পরিশ্রম করেন, তাহাদের সে পরিশ্রমকে লক্ষ্যচ্যুত পণ্ড পরিশ্রমমাত্র বলিতে পারা যায়। অতএব যোগসাধককে সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, আমার অবলম্বিত বহিঃশুদ্ধি আমাকে কি পরিমাণে অন্তঃশুদ্ধির দিকে অগ্রসর করিতেছে; এবং অন্তঃশুদ্ধিইবা কি পরিমাণে বিবেকখ্যাতিলাভে আমার যোগ্যতা সম্পাদন করিতেছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়া চলিলে সাধককে নিশ্চয়ই বিফল-মনোরথ হইতে হয়।

চিত্তমল নিরসনপূর্ব্বক বিবেকখ্যাতি সমুৎপাদন করাই সমস্ত যোগাঙ্গানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং উক্ত যম-নিয়মেরও তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য বা ফল; কিন্তু ফলের জন্য বৃক্ষ রোপণ করিলেও যেরূপ তাহার ছায়া ও গন্ধ আনুষঙ্গিক ফলরূপে অপ্রার্থিতভাবে উপস্থিত হয়, ঠিক তদ্রূপ যম-নিয়মানুষ্ঠানেরও

কতকগুলি আনুষঙ্গিক ফল আপনা হইতেই যোগীর নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রকৃত মুমুক্ষু যোগী সেই সকল আপাতরমণীয় ফলে মুগ্ধ হন না; যাহারা সে সকল আগন্তুক ফলের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করেন, তাহারা নিশ্চয়ই অবলম্বিত যোগপথ হইতে ভ্রষ্ট হন, এবং লৌকিক প্রতিষ্ঠালাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। এইজন্য প্রকৃত মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে সে সকল ফলে প্রলুব্ধ বা বিমুগ্ধ হওয়া কখনও উচিত নহে (১)।

অষ্টবিধ যোগাঙ্গের মধ্যে আসনও একপ্রকার যোগাঙ্গ। যোগ-সাধনায় আসনের উপযোগিতা সামান্য নহে। আসন অর্থ

---

(১) যোগাঙ্গ যম-নিয়ম সাধনার কয়েকটী আনুষঙ্গিক ফল উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে, পাঠকগণ তাহা হইতেই অন্যান্য ফলগুলিও বুঝিতে পারিবেন। যেমন—"অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।" (২।৩৫) অর্থাৎ অহিংসাবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত (স্থিরতর) হইলে, তাহার নিকট সকলের বৈরবুদ্ধি লোপ পায়। "সত্য-প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।" (২।৩৬)। অর্থাৎ সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, ক্রিয়া না করিয়াও ইচ্ছামাত্রে ক্রিয়া-ফল লাভ করা যায়। "অস্তেয়-প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।" (২।৩৭) অর্থাৎ অস্তেয়বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার নিকট সমস্ত রত্ন উপস্থিত হয়। "অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্ম-কথন্তা-সংবোধঃ॥" (২।৩৯) পরিগ্রহনিবৃত্তি স্থিরতর হইলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মের বিবরণ জানিতে পারা যায়। "সন্তোষাদনুত্তম-সুখলাভঃ।" (২।৪২)। সন্তোষ নিষ্পন্ন হইলে অলৌকিক সুখলাভ হয়। এবং "স্বাধ্যায়াদিষ্ট-দেবতা-সম্প্রয়োগঃ।"(২।৪৪) স্বাধ্যায় ভাবনার ফলে অভীষ্ট দেবতার প্রত্যক্ষ হয়, ইত্যাদি।

হস্তপদাদির সন্নিবেশবিশেষ। সেই আসন আয়ত্ত না হইলে, স্থিরভাবে বসিয়া মনঃস্থির করা কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। আসন কি ?—

"স্থির-সুখমাসনম্ ॥" ২।৪৬ ॥

আসন অনেক প্রকার—পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন ও স্বস্তিকাসন প্রভৃতি (১)। তন্মধ্যে যাহা স্থির এবং সুখকর হয়, তাহাই যোগসাধনার প্রকৃত অনুকূল আসন। অভিপ্রায় এই যে, যোগী পরিগণিত আসনের মধ্যে, যে আসনটী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই আসনটী তাহাকে অনায়াস-সাধ্য করিতে হইবে, এবং আসনবন্ধের পরও যাহাতে শরীরে কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয়, এরূপ অভ্যাস করিতে হইবে। তবেই সেই আসন তাহার পক্ষে হিতকর হইবে; নচেৎ আসন রচনা করিতে যদি সমধিক যত্ন করিতে হয়, এবং যত্নপূর্ব্বক আসন রচনা করিলেও যদি শরীরে উদ্বেগ বা কম্পাদি উপস্থিত হয়, তবে সেরূপ আসনে তাহার কোন ফলোদয় হয় না ও হইতে পারে না। আসন-রচনার নিয়ম ও ফল যোগশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে বিবৃত আছে। এই আসনসিদ্ধির পরে চতুর্থ যোগাঙ্গ প্রাণায়ামে অধিকার জন্মে। প্রাণায়াম কি ? না—

"শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥" ২।৪৯ ॥

---

(১) উপরিলিখিত আসনগুলির রচনাপ্রণালী বিভিন্ন যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে; কিন্তু উপদেশ ব্যতীত কেবল বচনের সাহায্যে আসন রচনা করা প্রায়ই সম্ভবপর হয় না; এইজন্য সেই সকল প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করা হইল না।

শ্বাস ও প্রশ্বাসের যে, গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ গতিরোধ, তাহার নাম প্রাণায়াম। বাহিরের বায়ুকে দেহমধ্যে আকর্ষণের নাম শ্বাস, আর আভ্যন্তরিণ বা কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুকে যে, বাহির করা, তাহার নাম প্রশ্বাস। প্রথমতঃ বাহিরের বায়ুকে অন্তরে আকর্ষণ (পূরক) করিবে, পরে অন্তরে আকৃষ্ট বায়ুকে নিরুদ্ধ করিয়া কুম্ভক করিবে; অবশেষে সেই নিরুদ্ধ বায়ুকে মাত্রাক্রমে বাহির করিবে, অর্থাৎ রেচক করিবে। এইরূপে প্রাণের ক্রিয়াকে সঙ্কোচিত করাই প্রাণায়ামের প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণ স্থির রাখিয়া প্রাণায়াম বহুভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

প্রাণায়ামের অভ্যাসে প্রথমতঃ প্রাণের চাঞ্চল্য প্রশমিত হয়। প্রাণের চাঞ্চল্য প্রশমিত হইলে মনের চাঞ্চল্যও নিবারিত হয়। তখন ইন্দ্রিয়-সংযম করা তাহার পক্ষে অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। এই জন্যই প্রণায়ামসিদ্ধির পর প্রত্যাহারের ব্যবস্থা। প্রত্যাহার কাহাকে বলে?—

"স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥"
২।৫৪ ॥

শব্দাদি বহির্বিষয় হইতে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইয়া অন্তর্মুখ করিতে হয়; তখন বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-গণের আর কোন সম্পর্ক থাকে না; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তখন সম্পূর্ণরূপে চিত্তের অনুকরণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ চিত্তনিরোধের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণ নিরুদ্ধব্যাপার হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের এবংবিধ অবস্থারই নাম প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ বশ্যতা-

সম্পাদনই প্রত্যাহারের প্রধান উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইলে পর 'ধারণা' নামক যোগাঙ্গানুষ্ঠানেও যোগী অধিকার প্রাপ্ত হন। ধারণার কথা পরে বলা হইবে।

[আলোচনা।]

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, বিবেকখ্যাতির জন্য চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন, এবং চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যোগাঙ্গানুষ্ঠানের আবশ্যক। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট যম-নিয়মাদি সাধনগুলিই যোগাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং যোগসাধনার পক্ষে ঐ সকল সাধনের উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক; কিন্তু অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ ভেদে ঐসকল সাধনের মধ্যেও যথেষ্ট তারতম্য বা গৌণ-মুখ্যভাব রহিয়াছে। এই তারতম্য বিজ্ঞাপিত করিবার অভিপ্রায়েই যোগসূত্রকার দ্বিতীয় সাধনপাদে অন্তরঙ্গ সাধনের কথা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কেবল বহিরঙ্গ পাঁচটী মাত্র সাধনের পরিচয় ও ফলাদি নির্দ্দেশ করিয়াই দ্বিতীয় পাদ পরিসমাপ্ত করিয়াছেন (১); এবং তৃতীয় পাদের

---

(১) সাধন সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক অন্তরঙ্গ, দ্বিতীয় বহিরঙ্গ। যে সকল সাধন সাক্ষাৎসম্বন্ধে কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল হয়, সেই সকল সাধনকে অন্তরঙ্গ, আর যে সকল সাধন পরম্পরাক্রমে কার্য্যসিদ্ধির আনুকূল্য করে, সেই সকল সাধনকে বহিরঙ্গ সাধন বলে। পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার যোগাঙ্গের মধ্যেও প্রথমোক্ত পাঁচটী অঙ্গ বহিরঙ্গ সাধন; কারণ, উহারা দেহেন্দ্রিয়াদিসংশোধন-ক্রমে চিত্তশুদ্ধির আনুকূল্য করিয়া থাকে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে করে না, কিন্তু ধারণা, ধ্যান ও সমাধি তাহা করে; এতজ্জন্য এই তিনটী অঙ্গ যোগের অন্তরঙ্গ সাধন। এই জন্যই দ্বিতীয় পাদে বহিরঙ্গ পাঁচটী যোগাঙ্গের কথা পরিসমাপ্ত করিয়া তৃতীয় পাদের প্রারম্ভেই অন্তরঙ্গ সাধনত্রয়ের স্বরূপ ও কার্য্যাদি পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথমেই অবশিষ্ট অন্তরঙ্গ সাধনত্রয়ের (ধারণা, ধ্যান ও সমাধির) অবতারণা করিয়া অন্তরঙ্গ সাধনত্রয়ের উৎকর্ষগৌরব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

[তৃতীয়—বিভূতিপাদ।]

চিত্তশুদ্ধির জন্য যে আটপ্রকার যোগাঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বহিরঙ্গ পাঁচটী সাধনের বিষয় দ্বিতীয় পাদে কথিত হইয়াছে, এখন অবশিষ্ট অন্তরঙ্গ সাধনত্রয়ের কথা বলিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথমেই 'ধারণা' নামক যোগাঙ্গের লক্ষণ বলিতেছেন। ধারণা কি ?—

"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥" ৩১ ॥

চিত্তকে যে, অভিমত স্থানবিশেষে (শিব ও নারায়ণ-মূর্ত্তি প্রভৃতিতে) বাঁধিয়া রাখা, তাহার নাম 'ধারণা'।

অভিপ্রায় এই যে, যোগের পরিসমাপ্তি হইতেছে চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধে। একাগ্রতা ব্যতীত সেই নিরোধ সম্ভবপর হয় না; এইজন্য নিরোধের পূর্ব্বে একাগ্রতা অভ্যাস করা আবশ্যক হয়। স্বভাবচঞ্চল চিত্তে একাগ্রতা আনয়ন করা কখনই সম্ভব হয় না ও হইতে পারে না। এইহেতু চঞ্চল চিত্তের স্থিরতার জন্য অর্থাৎ একবিষয়ে অভিনিবেশ-যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে, মনকে বলপূর্ব্বক কোন একটী অভিমত বিষয়ে স্থাপন করিয়া রাখিতে হয়। মনকে এইরূপে দেশবিশেষে স্থাপন করিয়া রাখিতে পারাই 'ধারণা' কথার

প্রকৃত অর্থ (১)। মন যতক্ষণ একটী বিষয়ে স্থির থাকিতে অভ্যস্ত না হয়, ততক্ষণ 'ধারণা' সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে নাই। পক্ষান্তরে, ধারণা সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী যোগাঙ্গ— ধ্যানাভ্যাসেও প্রবৃত্ত হইতে নাই; কেন না, ধারণায় অকৃতকার্য্য মন কখনই ধ্যানাভ্যাসে সমর্থ হয় না বা হইতে পারে না। ধারণারই পরিপাকাবস্থায় ধ্যানের আবির্ভাব হয়। ধ্যান কি ?—

"তত্রপ্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥" ৩।২ ॥

যে বিষয়ে 'ধারণা' অভ্যাস করা হয়, সেই বিষয়েই যে, প্রত্যয়ৈকতানতা অর্থাৎ একাকার চিন্তাধারা, তাহার নাম ধ্যান (২)।

---

(১) ভাষ্যকার উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"নাভিচক্রে, হৃদয়-পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধজ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে ইত্যেবমাদিষু দেশেষু, বাহ্যে বা বিষয়ে চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণা"। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ নাভিচক্র, হৃৎপদ্ম, মস্তকস্থ জ্যোতিঃ, নাসিকার অগ্রভাগ ও জিহ্বার অগ্রভাগ এই সকল আভ্যন্তরিক স্থানে, কিংবা বহির্গতের কোন একটী বিষয়ে বৃত্তিসমুৎপাদনের দ্বারা যে, চিত্তের বন্ধ, তাহার নাম 'ধারণা'। উক্ত উভয়প্রকার বিষয়ের মধ্যে বাহ্য বিষয় অপেক্ষা আভ্যন্তর বিষয়ে 'ধারণা' অভ্যাস করা সমাধিসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়া থাকে।

(২) ধ্যান সম্বন্ধে কাহারো আপত্তি নাই, সকলেই সমভাবে উহার অস্তিত্ব ও উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। ধ্যান সাধারণতঃ সগুণ বস্তুবিষয়েই প্রযোজ্য; নির্গুণ বিষয়ে ধ্যান হয় না। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—ধ্যান যদিও মানসিক ব্যাপার—চিন্তাবিশেষ হউক, তথাপি উহা ক্রিয়াত্মক, শুদ্ধ জ্ঞান নহে। ক্রিয়াত্মক বলিয়াই উহা সম্পূর্ণরূপে

প্রথমতঃ বিভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বলপূর্ব্বক কোন একটা বিষয়ে স্থাপন করিতে হয়, কিয়ৎক্ষণের জন্য সেই বিষয়ে চিত্তকে স্থির করিয়া রাখিতে হয় ('ধারণা' করিতে হয়), পরে কথঞ্চিৎ স্থিরতাপ্রাপ্ত সেই চিত্তদ্বারা 'ধারণা'র বিষয়কেই নিরন্তর চিন্তা করিতে হয়। অবশ্য, এ চিন্তা (ধ্যান) দীর্ঘকালব্যাপী হইতে পারে না; কিন্তু তথাপি যতক্ষণ এই চিন্তা চলিবে, ততক্ষণ অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা মনোমধ্যে স্থান পাইবে না। এইজন্য রামানুজস্বামী অবিচ্ছিন্নভাবে পতনশীল তৈলধারার সহিত ধ্যানের তুলনা করিয়াছেন (১)। উক্ত ধ্যানই সম্যক্রূপে পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইলে সমাধিরূপে পরিণত হয়। বস্তুতঃ

কর্ত্তার অধীন—ধ্যানকর্ত্তা আপনার ইচ্ছানুসারে একপ্রকার বস্তুকেও অন্যপ্রকারে চিন্তা (ধ্যান) করিতে পারেন; কিন্তু বিশুদ্ধজ্ঞান কখনই কর্ত্তার অধীনতা স্বীকার করে না; উহা সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞেয় বস্তুর অধীনভাবে আত্মলাভ করিয়া থাকে, ইহাই জ্ঞানে ও ধ্যানে পার্থক্য। সম্মুখে যে বস্তু যেরূপ থাকে, কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে সেই বস্তুতে সেইরূপ জ্ঞান হওয়াই স্বাভাবিক, এবং হইয়াও থাকে সেই প্রকার।

(১) ধ্যানের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে রামানুজ বলিয়াছেন—"ধ্যানং নাম তৈলধারাবদ্ অবিচ্ছিন্নপ্রবৃত্তঃ প্রত্যয়-প্রবাহঃ।" (শ্রীভাষ্য ১ম সূত্র) অর্থাৎ তৈলের ধারা পতনের সময় যেরূপ অবিচ্ছিন্ন ধারায় পতিত হয়, তদ্রূপ ধ্যেয় বিষয়ে যে, অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তাপ্রবৃত্তি, তাহার নাম ধ্যান। কপিল বলিয়াছেন—"ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ।" অর্থাৎ ধ্যেয়াতিরিক্ত বিষয় হইতে যে, মনের নিবৃত্তি, তাহার নাম ধ্যান। ইহা দ্বারাও অবিচ্ছিন্নভাবে এক বিষয়ে প্রবৃত্ত চিন্তাবৃত্তিই যে, ধ্যানের স্বরূপ, সে কথা সমর্থিত হইল।

ধ্যান-সিদ্ধ চিত্তে সমাধি লাভ করা অতি সহজসাধ্য হইয়া থাকে; এইজন্য ধ্যানের পরই সমাধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সূত্রকারও এইরূপ অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥" ৩।৩ ॥

অর্থাৎ সেই ধ্যানই যখন অভ্যাসবশে যেন আপনার অস্তিত্ব-শূন্য হইয়া কেবল ধ্যেয় বিষয়াকারে প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন 'সমাধি' পদবাচ্য হয়। অভিপ্রায় এই যে, ধ্যানের স্থলে ধ্যেয়-বিষয় ও তৎসম্পর্কিত ধ্যান বা চিন্তা উভয়ই স্বপ্রধানভাবে প্রকটিত থাকে; কিন্তু সমাধিসময়ে ধ্যানের আর পৃথক্ অস্তিত্ব প্রতীতিগোচর হয় না; চিত্ত যেন তখন আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া বিষয়াকারেই প্রকাশ পাইতে থাকে, অর্থাৎ তখন আর চিত্তের চিন্তাবৃত্তি আছে বলিয়া কর্ত্তার মনে হয় না। সূত্রস্থ 'স্বরূপশূন্যমিব' কথাটার তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিলেই উক্ত সমাধির প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইতে পারে।

এখানে যে, সমাধির লক্ষণ বলা হইল, এবং পূর্ব্বে যে, সমাধির উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সমাধি হইতেছে ফল, আর শেষোক্ত সমাধি হইতেছে তাহার সাধন। চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদক এই সাধনরূপী সমাধি দ্বারা চিত্তের বৃত্তি-নিরোধাত্মক সেই প্রথমোক্ত সমাধিযোগ সম্পাদন করিতে হয়। এইপ্রকার কার্য্য-কারণভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সূত্রকার ধ্যানের পরিণতিভূত সমাধিকে যোগাঙ্গ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন।

উক্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যথাসম্ভব একই বিষয়ে হওয়া আবশ্যক ; অর্থাৎ যে বিষয় অবলম্বনে প্রথমে ধারণা করা হয়, সেই বিষয়েই যথাক্রমে ধ্যান ও সমাধি সম্পাদন করিতে হয়। তাহা হইলেই অভীষ্ট যোগসিদ্ধি সহজ ও সুগম হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই সূত্রকার একবিষয়াবলম্বী উক্ত সাধনত্রয়কে একটী বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন,—

"ত্রয়মেকত্র সংযমঃ" ॥ ৩।৪ ॥

অর্থাৎ একই বিষয়ে প্রবর্ত্তমান ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই সাধনত্রয়কে 'সংযম' নামে অভিহিত করা হয় (১)। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিভিন্ন অবস্থায় বিনিয়োগেই ইহার সাফল্য বা সম্পূর্ণ উপযোগিতা; এই জন্য বলিয়াছেন—

"তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ" ॥ ৩।৫৬ ॥

অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির আলম্বনরূপে স্থূল সূক্ষ্মাদিক্রমে যে সকল ভূমি বা অবস্থাবিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে, পরপর সেই সকল ভূমিতে উক্ত সংযমের বিনিয়োগ করিতে হয়, অর্থাৎ অবলম্বিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থাগুলি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইয়াছে—বুঝিয়া

---

(১) উক্ত সাধনত্রয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে, অর্থাৎ এক বিষয়ে ধ্যান, অন্য বিষয়ে ধারণা, অপর বিষয়ে সমাধির অনুশীলন করিলে কেবল যে, "সংযম" সংজ্ঞালাভেই বঞ্চিত হইবে, তাহা নহে, পরন্তু যোগসিদ্ধির পক্ষে অনুকূলও হইবে না। যোগশাস্ত্রে "সংযম" বলিলে একবিষয়ে বিনিযুক্ত এই তিনটীকেই বুঝিতে হইবে। যেমন, "পরিণামত্রয়সংযমাৎ অতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥" (৩।১৬) ইত্যাদি।

পরবর্ত্তী অবস্থাসমূহে সংযমের বিনিয়োগ করিতে হয়, কিন্তু পূর্ব্ব অবস্থা আয়ত্ত না করিয়াই যাহারা আবেগবশে পরবর্ত্তী অবস্থাসমূহে সংযম করিতে প্রয়াসী হন, তাহাদের সে প্রয়াস কখনই সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না; এইজন্য যোগীকে খুব সাবধানভাবে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থা গ্রহণ করিতে হয় (১)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে অষ্টবিধ যোগাঙ্গের মধ্যে এই শেষোক্ত যোগাঙ্গত্রয় (ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) যোগের অন্তরঙ্গ সাধন, আর প্রথমোক্ত পাঁচপ্রকার যোগাঙ্গ বহিরঙ্গ সাধন; এ ব্যবস্থা কেবল সম্প্রজ্ঞাতসমাধি বা সবীজ সমাধির পক্ষেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বীজ সমাধির পক্ষে এই শেষোক্ত সাধনত্রয়ও বহিরঙ্গ সাধন মধ্যে পরিগণনীয়; কারণ, উক্ত সাধনত্রয়ের নিবৃত্তি বা অভাবদশায়ই যথার্থ নির্ব্বীজ সমাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে; কাজেই ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে নির্ব্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ (ব্যবহিত) সাধন বলিতে হয় (২)।

---

(১) কোন ভূমির পর কোন ভূমি গ্রহণ করিতে বা না করিতে হইবে, এ বিষয়ে প্রধানতঃ যোগই আচার্য্যের কার্য্য (উপদেশ) করিয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে,—

"যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যঃ যোগো যোগাৎ প্রবর্ত্ততে।
যোঽপ্রমত্তস্তু যোগেন স যোগে রমতে চিরম্ ॥" (ভাষ্যধৃত বচন)।

এখানে, অবলম্বিত যোগকেই অবলম্বনীয় যোগপথের প্রদর্শক বলা হইয়াছে।

(২) "তদপি বহিরঙ্গং নির্ব্বীজস্য" (৩৮) সূত্রে এ কথা বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যবহার-জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিই দর্শন-শ্রবণাদি দ্বারা বিভিন্ন বিষয় অনুভব করিয়া থাকে; এবং প্রত্যেক অনুভবেই চিত্তমধ্যে এক একটী নূতন সংস্কার সমুৎপন্ন করিয়া থাকে। অনুভব বিনষ্ট হইয়া গেলেও সেই সংস্কারগুলি থাকিয়া যায়; এবং তাহারা প্রতিনিয়ত অনুরূপ স্মৃতি সমুৎপাদন করিয়া মনের বিক্ষেপ বা চঞ্চলভাব অধিকপরিমাণে বৰ্দ্ধিত করিয়া থাকে। এই জন্য যোগীকে ঐ সকল ব্যুত্থানজ সংস্কারের ক্ষয়সাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্নপর হইতে হয়; এবং সম্পূর্ণরূপে নিরোধসংস্কারের সমধিক উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়।

অভিপ্রায় এই যে, ব্যুত্থানকালীন ব্যবহারিক জ্ঞান হইতে যেমন সংস্কার জন্মে, সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিকালীন চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হইতেও তেমনই সংস্কার জন্মে। এই উভয়বিধ সংস্কারই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ ব্যুত্থান-সংস্কারসমূহ নিরোধজ সংস্কাররাশিকে, আবার নিরোধজ সংস্কার-রাশিও ঐ সকল ব্যুত্থানজ সংস্কারকে পরাভূত করিতে সতত চেষ্টা করে। তন্মধ্যে যে পক্ষ প্রবল হয়, সেই পক্ষেরই সর্ব্বতোভাবে জয় হইয়া থাকে। যোগীর নিরোধজ সংস্কার যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করে, ব্যুত্থানজ সংস্কাররাশির সেই পরিমাণে অভিভব বা অবনতি ঘটিয়া থাকে; সুতরাং তদবস্থায় ব্যুত্থানজ সংস্কারসমূহ বিদ্যমান থাকিয়াও চিত্তবৃত্তি-নিরোধের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটাইতে সমর্থ হয় না। তাহার ফলে, তখন যোগীর চিত্তে প্রজ্ঞালোক (জ্ঞানজ্যোতিঃ) অতিমাত্র প্রকটিত

হইয়া বিক্ষেপ দোষ বিনষ্ট করে, এবং নিরোধের পথ নিষ্কণ্টক করে। যোগশাস্ত্রে এই অবস্থাকে 'নিরোধ-পরিণাম' বলা হয় (১)।

সূত্রোপদিষ্ট 'নিরোধ-পরিণাম' প্রভৃতি পরিণামে অথবা সূত্রলিখিত কতিপয় বিষয়ে চিত্তসংযম করিলে যোগিগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নানাপ্রকার লৌকিক ও অলৌকিক বিভূতি ও শক্তি লাভ করিতে পারেন; এবং দেবতাগণের নিকট হইতেও বহুবিধ লোভনীয় উপহার পাইতে পারেন; কিন্তু মোক্ষার্থী যোগীরা সে দিকে দৃক্‌পাত করিবেন না; কারণ, সে সমুদয় বিভূতি ব্যবহার-জগতে খুব প্রলোভনীয় হইলেও, প্রকৃত সমাধির পক্ষে প্রবল অন্তরায়। ঐ সকল বিভূতিতে বিমুগ্ধ যোগীরা কঠোর ক্লেশলভ্য সমাধিপথে আর অগ্রসর হইতে পারেন না; কেবল লোক-প্রতিষ্ঠালাভেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। সেই জন্য সূত্রকার উপদেশ দিয়াছেন—

"তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ॥" ৩।৩৭॥

"স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গ-স্ময়াকরণং পুনরনিষ্ট-প্রসঙ্গাৎ॥" ৩।৫১॥

অর্থাৎ সংযমলব্ধ ঐ সকল বিভূতিলাভ ব্যবহার-জগতে সিদ্ধি

---

(১) সূত্রকার বলিয়াছেন—"ব্যুত্থান-নিরোধসংস্কারয়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ, নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ।" (৩।৯)।

সূত্রকার এই প্রসঙ্গে 'সমাধি-পরিণাম' ও 'একাগ্রতা-পরিণাম' প্রভৃতি আরও কয়েকটী পরিণামের কথা বলিয়াছেন। তৃতীয় পাদের ১১—১৫ সূত্র দ্রষ্টব্য। পরিণাম কাহাকে বলে, এবং কিরূপে সংঘটিত হয়; সে সমস্ত কথাও ঐ সকল সূত্রে বর্ণিত আছে।

নামে পরিচিত হইলেও প্রকৃত সমাধির পক্ষে বিঘ্ন উপসর্গ বা অন্তরায় বুঝিতে হইবে, এবং স্বর্গাদি লোকের অধিপতিগণ আসিয়া সেই সকল স্থানে ভোগের জন্য আহ্বান করিলেও যোগী সে সকল ভোগবিষয়ে অনুরাগী হইবে না, এবং ঐ সকল লোকাধিপতির আহ্বানে আপনার যোগসাধনার গুরুত্ব মনে করিয়া বিস্মিতও হইবেন না ; কারণ, শাস্ত্র বলিয়াছেন—"যোগঃ ক্ষরতি বিস্ময়াৎ।" অর্থাৎ অবলম্বিত যোগ-মহিমায় আশ্চর্য্যবোধ করিলেই গর্ব্ব আসিয়া যোগীর যোগশক্তিকে ক্ষয় করিয়া দেয়। অতএব কোন যোগীই বিভূতিলাভে আকৃষ্ট হইবেন না, এবং নিজের অলৌকিক প্রভাব দর্শনেও বিস্মিত হইবেন না (১)। এই সমুদয় বিষয় লইয়াই তৃতীয়—বিভূতিপাদ পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

---

(১) যোগশাস্ত্রে ঐ সকল যোগবিভূতি নির্দ্দেশের অভিপ্রায় এই যে, যোগানুষ্ঠান অত্যন্ত ক্লেশকর এবং উহার ফলসিদ্ধিও সুদীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ। অতএব যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্যক্তির কিয়ৎকাল পরে আশঙ্কা হইতে পারে যে, এতদিন যোগানুষ্ঠান করিলাম ; এখনও ত সিদ্ধিলাভের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে না ; অতএব শাস্ত্রে যে, যোগফলের উপদেশ আছে, তাহা সত্য কি না ? বাস্তবিকই যোগানুষ্ঠানে মুক্তিলাভ হয় কি না ? এবং যোগের সফলতা সম্বন্ধে প্রমাণই বা কি আছে ? ইত্যাদি। সেই সমুদয় সম্ভাব্যমান সংশয় দূরীকরণের জন্য—যোগের সফলতা প্রত্যক্ষ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে যোগশাস্ত্রে ঐ সকল বিভূতির কথা ও তাহার উপায়-পথ উপদিষ্ট হইয়াছে। যদি কাহারো যোগফলে সংশয় হয়, সেই লোক যোগোক্ত সংযমানুষ্ঠান দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ জাতীয় নানাবিধ বিভূতি দর্শনে নিশ্চয়ই যোগফলে বিশ্বস্ত ও দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিবে, এবং যোগের প্রকৃত

[চতুর্থ—কৈবল্যপাদ।]

প্রথম পাদে প্রধানতঃ সমাধি ও সমাধিভেদ, দ্বিতীয় পাদে সমাধিসিদ্ধির উপায় বা সাধনসমূহ, তৃতীয় পাদে সিদ্ধির বিষয়—বিভূতি প্রভৃতি যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে; অতঃপর (চতুর্থ পাদে) সমাধির চরম ফল কৈবল্যের স্বরূপ নিরূপিত হইবে। কিন্তু বুদ্ধি-বিজ্ঞানের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপ-পরিচয় এবং প্রসংখ্যান-সাধনের চরম অবস্থা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় না বলিলে মুক্তির (কৈবল্যের) প্রকৃত তত্ত্ব বুঝান সম্ভবপর হয় না; এইজন্য অগ্রে সাধারণভাবে সিদ্ধির স্বরূপগত ও উৎপত্তিগত প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে।

সাধনমাত্রেরই উদ্দেশ্য—সিদ্ধিলাভ। সিদ্ধিলাভের উপায় একপ্রকার নহে; সুতরাং সাধনের প্রভেদানুসারে সিদ্ধির আকারও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে প্রকার সিদ্ধিলাভ হইলে যোগীর চিত্ত কৈবল্যলাভের যোগ্যতা বা অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য সূত্রকার সর্ব্বপ্রথমে পাঁচপ্রকার সিদ্ধির উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"জন্মৌষধি-মন্ত্র-তপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ" ॥ ৪।১ ॥

অর্থাৎ জন্মসিদ্ধি, ওষধিসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি, তপঃসিদ্ধি ও সমাধি-

---

ফল মুক্তিলাভের জন্য কঠোর ক্লেশকেও আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে বরণ করিতে পারিবে। এই অভিপ্রায়েই যোগশাস্ত্রে বিভূতির উল্লেখ, কিন্তু উহাতে লোককে আসক্ত বা অনুরক্ত করিবার জন্য নহে।

সিদ্ধিভেদে সিদ্ধি পাঁচ প্রকার (১)। তন্মধ্যে একমাত্র সমাধিজ সিদ্ধি ভিন্ন যত প্রকার সিদ্ধি আছে, সে সকল সিদ্ধি লোকপ্রতিষ্ঠার সাধক হইলেও, অভীষ্ট যোগসিদ্ধির অনুকূল হয় না; বরং প্রতিকূলভাব প্রাপ্ত হয়; এই কারণে যোগীর অন্যান্য সিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করিতে নাই। উক্ত সিদ্ধির প্রভেদানুসারে সিদ্ধ চিত্তও পাঁচপ্রকার। তন্মধ্যে—

"ধ্যানজমনাশয়ম্" ॥ ৪।৬ ॥

একমাত্র ধ্যানজ অর্থাৎ সমাধিসংস্কারসম্পন্ন চিত্তই অনাশয় হয়। আশয় অর্থ স্বকৃত কর্ম্মের সংস্কার (ধর্ম্মাধর্ম্ম) এবং অবিদ্যাদি ক্লেশ-জনিত সংস্কার। সমাধিসম্পন্ন চিত্তে ঐ উভয়প্রকার সংস্কারের কোন সংস্কারই (বাসনাই) থাকে না।

অভিপ্রায় এই যে, চিত্ত যতকাল রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী থাকে, ততকালই লোকের ফলভোগে আসক্তি থাকে, এবং অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির জন্য বিভিন্নপ্রকার সকাম কর্ম্মেও প্রবৃত্তি জন্মে। সেই সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার যথাসম্ভব পাপ-পুণ্যলাভ অপরিহার্য্য হইয়া থাকে; কিন্তু সমাধিসম্পন্ন যোগীর সে ভয় থাকে না; তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে রাগদ্বেষ রহিত; সুতরাং ফলের প্রত্যাশায় তাহার কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে পারে না; তাহার

(১) একজন্মে কৃত সাধনার ফল যদি পরজন্মে জন্মমাত্রই প্রকাশ পায়, তবে তাহাকে জন্মসিদ্ধি বলে। রসায়নাদি পানে যে, সিদ্ধি, তাহাকে ওষধিসিদ্ধি বলে। মন্ত্রবলে যে, আকাশগমনাদির শক্তিলাভ, তাহাকে মন্ত্রসিদ্ধি বলে। তপস্যা দ্বারা সংকল্পসিদ্ধি হয়, যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই সম্পন্ন হয়। সমাধিসিদ্ধি—চিত্তের একাগ্রতা প্রভৃতি।

পর, প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত যে সমুদয় কর্ম্ম পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে উপার্জ্জিত হইয়াছিল, সেই সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ-প্রায় হওয়ায় তাহারাও আর ভোগবিষয়ে প্রেরণা জন্মায় না; কাজেই তাদৃশ যোগীর চিত্তে কোন প্রকার বাসনা স্থানপ্রাপ্ত হয় না; এইজন্যই তাহার চিত্ত 'অনাশয়' (বাসনাশূন্য); কিন্তু যাহাদের চিত্ত তাদৃশ নহে, তাহাদের চিত্ত ঐহিক ও জন্মান্তর-সঞ্চিত বাসনাজালে বেষ্টিত থাকে। সেই সমুদয় বাসনার প্রেরণায় চিত্ত স্বতই শুভাশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বাধ্য হয়, এবং তদনুসারে যথাসম্ভব পুণ্য ও পাপ সঞ্চয় করিয়া তদুপযুক্ত ভোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়,—পরবর্ত্তী যে কোন জন্মে সেই কর্ম্ম-ফল ভোগের উপযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হয়; এবং দেহপ্রাপ্তিমাত্র তদুপ-যোগী ভোগবাসনাসমূহ তাহার হৃদয়ে অভিব্যক্ত হয়। এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিয়াছেন—

"ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্" ॥ ৪।৮ ॥

অর্থাৎ যে সকল বাসনা (প্রাক্তন সংস্কার) অভিব্যক্ত হইলে উপস্থিত কর্ম্মবিপাক অর্থাৎ কর্ম্মারব্ধ জন্ম আয়ুঃ প্রভৃতি সাফল্য লাভ করিতে পারে, কেবল সেই সকল বাসনারই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; অপর বাসনা সকল তখন অভিভূত অবস্থায় থাকে (১),

(১) অভিপ্রায় এই যে, যখন মানুষ মরিয়া পরজন্মে পশু হইল, অথবা পশু মরিয়া মানুষ হইল, তখন সে অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মের সংস্কার লাভ করে কি না? যদি তাহা লাভ করিত, তবে নিশ্চয়ই পশুর মানুষো-চিত প্রবৃত্তি এবং মানুষেরও পশু প্রবৃত্তি প্রকটিত হইত; কিন্তু কখনও তাহা হয় না। সে যখন যেরূপ দেহপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে তদনুরূপ কার্য্যেই

কিন্তু বিনষ্ট হয় না। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই বাসনার উচ্ছেদ হইতে পারে।

সমাধিসম্পন্ন যোগী কখন কখন আপনার অবস্থা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তিনি যদি বুঝেন যে, আমার সাধনা এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, এবং প্রারব্ধ ভোগ শেষ করিতেও যথেষ্ট বিলম্ব আছে; অথচ এতটা কাল-বিলম্ব করা সহনীয় নহে; তাহা হইলে তিনি স্বল্পকালে সেই সমুদয় কর্ত্তব্য শেষ করিবার অভিপ্রায়ে কায়ব্যূহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন (১)। যতগুলি শরীর হইলে অল্প সময়ের

প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়; সুতরাং বলিতে হইবে যে, অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মের সংস্কারই যে, পরজন্মে অভিব্যক্ত হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই; পরন্তু ইতঃপূর্ব্বে যে কোন কালে ও যে কোন জন্মে অনুরূপ দেহলব্ধ সংস্কারেরই অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, জীবগণ অনাদি কাল হইতে জন্ম-মৃত্যু প্রবাহে পতিত হইয়া প্রত্যেকেই পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং সেই সমুদয় দেহে তাহারা যে সমুদয় ব্যবহার করিয়াছে, সে সমুদয়ের সংস্কারও মনোমধ্যে নিহিত আছে; যখনই আপনার কার্য্য সাধনের উপযোগী যেরূপ দেহ উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে সেই সমুদয় সংস্কার জাগরিত হইয়া অনুরূপ কার্য্যপদ্ধতি স্মরণ করাইয়া দেয়। মনে করুন,—একজন বহুকাল পূর্ব্বে কোন এক অবিজ্ঞাত দেশে মনুষ্যদেহ পাইয়া উপযুক্ত বিষয় ভোগ করিয়াছিল। মধ্যে বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন প্রকার ভোগ ও ভোগ-সংস্কার অর্জ্জন করিয়া পুনর্বায় যখন মনুষ্যদেহ লাভ করিল, তখন তাহার বহু পূর্ব্বকালীন মনুষ্যদেহকৃত সংস্কারগুলিই কেবল অভিব্যক্ত হইবে, অন্য সংস্কারগুলি নিরুদ্ধ থাকিবে।

(১) বিষ্ণুপুরাণে কায়ব্যূহের বিষয় এইভাবে বর্ণিত আছে—

"আত্মনো বৈ শরীরাণি বহূনি ভরতর্ষভ।
যোগী কুর্য্যাদ্বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্মহীং চরেৎ॥
প্রাপ্নুযাদ্ বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ।
সংহরেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব" ইত্যাদি॥

মধ্যে তাহার অবশিষ্ট সাধনা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে, এবং প্রারব্ধভোগও পরিসমাপ্ত হইতে পারে, তিনি স্বীয় যোগশক্তি প্রভাবে ততগুলি শরীর নির্ম্মাণ করেন, এবং প্রত্যেক শরীরের জন্য স্বতন্ত্রভাবে এক একটী চিত্তের সৃষ্টি করেন। ঐ সকল চিত্ত তাঁহার অস্মিতা বা অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে উপাদান গ্রহণ করে এবং মূলীভূত সেই প্রধান চিত্তেরই অনুগতভাবে কার্য্য করিয়া থাকে (১)।

যোগী পুরুষ আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে পর ঐ সমুদয় দেহ ও চিত্তকে উপসংহৃত করিয়া প্রকৃতপথে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাহার ফলে যোগীর হৃদয়ে আত্মার সম্বন্ধে বিশেষ বিজ্ঞান উপস্থিত হয়, অর্থাৎ আত্মা যে, বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। তখন—

"বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনানিবৃত্তিঃ॥" ৪।২৫॥

সেই বিশেষদর্শী যোগীর আত্মভাব ভাবনা অর্থাৎ 'আমি কে? আমি পূর্ব্বে কি ছিলাম, কেমন ছিলাম" ইত্যাদি চিন্তা সকল চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। এবং—

"তদা বিবেক-নিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং চিত্তম॥" ৪।২৬॥

তখন যোগীর চিত্ত স্বতই বিবেকপ্রবণ হইয়া কৈবল্যাভিমুখে ধাবিত হয়, এবং পূর্ব্বে, যে বিবেকখ্যাতিলাভের জন্য এত প্রয়াস

---

(১) সূত্রকার বলিয়াছেন—

"নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ" ॥ ৪।৪ ॥

"প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্॥" ৪।৫ ॥

পাইতে হইয়াছিল, এবং এত ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তখন সেই বিবেকখ্যাতির লোভনীয়তাও চলিয়া যায়, এবং বিবেকখ্যাতি হইতেও লাভযোগ্য কিছু দেখিতে পায় না; সুতরাং তাহাতেও তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তাঁহার চিত্তে তখন 'ধর্ম্মমেঘ' নামক এক উৎকৃষ্ট সমাধির অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় (১)। সেই সমাধি কেবল নিরবচ্ছিন্ন তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ ধর্ম্ম-মেঘই বর্ষণ (প্রসব) করিতে থাকে; বিক্ষেপ আসিয়া আর হৃদয়কে চঞ্চল করিতে পারে না। অধিকন্তু—

"ততঃ ক্লেশ-কর্ম্মনিবৃত্তিঃ॥" ৪।৩০॥

সেই ধর্ম্মমেঘ সমাধির প্রভাবে সমস্ত ক্লেশ (অবিদ্যা ও অস্মিতা প্রভৃতি) এবং সমস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মজনিত পুণ্য ও পাপ সমূলে বিধ্বস্ত হয়। তখন তাহার অবিদ্যাদি ক্লেশের ভয় ও পাপ পুণ্য ভোগের ত্রাস একেবারে চলিয়া যায়; তাঁহার জীবন্মুক্তি অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়।

"তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পং ভবতি।" ৪।৩১॥

তখন তাঁহার জ্ঞান সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যা-আবরণ রহিত হইয়া

---

(১) "প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ॥ ৪।২৯॥

প্রসংখ্যান অর্থ—প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক-সাক্ষাৎকার। অকুসীদ অর্থ—লাভপ্রার্থী নয়। যে যোগী লাভের আশায় বিবেকখ্যাতিকেও আদর করে না, তাহার বিবেকখ্যাতির চরম উৎকর্ষ সিদ্ধ হওয়ায় নিরন্তর আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, এই অবস্থার নাম 'ধর্ম্মমেঘ' সমাধি।

অনন্তে পরিণত হয়; এবং জ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞেয় বস্তু অল্প হয়; সুতরাং তখন তাঁহার অবিজ্ঞাত কিছু কোথাও থাকে না। তদবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃতির যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল (ভোগ ও অপবর্গ সাধনের ভার ছিল), তাহা সম্পূর্ণ হওয়ায়, প্রকৃতি তখন অবসর গ্রহণে উদ্যত হয়। তখন—

> "পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি॥ ৪।৩৪॥

পুরুষের প্রতি সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্য-পরিশূন্য গুণত্রয়ের অর্থাৎ গুণপরিণাম বুদ্ধি প্রভৃতির যে, প্রতিপ্রসব অর্থাৎ স্বীয় কারণে বিলয়, অথবা চিতিশক্তির যে, স্বরূপে অবস্থান—বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রমণের অভাব, তাহার নাম কৈবল্য বা মুক্তি।

অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক পুরুষের জন্য ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির দ্বিবিধ কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে,—এক ভোগ, অপর মুক্তি। বদ্ধাবস্থায় পুরুষের ভোগ-সম্পাদনের জন্য বৈচিত্র্যময় নানাবিধ আকারে পরিণত হয়, এবং মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক পুরুষকে তাহাদের কর্ম্মানুযায়ী বিবিধ ভোগ প্রদান করে (১)। সেই

---

(১) পুরুষার্থ অর্থ—আত্মার প্রয়োজন—ভোগ ও মোক্ষ। পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনে যদিও প্রকৃতিই বাধ্য; তথাপি প্রকৃতি দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ উভয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না; প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিদ্বারাই প্রধানতঃ ঐ উভয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে; এইজন্য সূত্রস্থ 'গুণানাং' পদে গুণপরিণাম বুদ্ধি প্রভৃতিই বুঝিতে হইবে। উহাদের 'প্রতিপ্রসব' অর্থ—কার্য্যাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক কারণাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া।

প্রকৃতিই আবার ভোগ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নিরাবিল শান্তিময় মুক্তি-সুধার পবিত্র রসাস্বাদদানে প্রযত্ন করে। নিরন্তর এইরূপ প্রযত্নের ফলে যাহার বুদ্ধিগত রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত হয়, এবং সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়, তাহার ভাগ্যে যথোক্ত যোগসাধনার ফলে নির্ম্মল বিবেক-বিজ্ঞান সমুদিত হয়, অজ্ঞান মোহ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ-গোচর হয়। তখন সেই বিবেকবহ্নির সংস্পর্শে তাহার চিরসঞ্চিত কর্ম্মরাশি দগ্ধবীজের ন্যায় অসার হইয়া সুখ-দুঃখময় ফলোৎপাদনে অসমর্থ হয়; পুরুষ তখন আপনার স্বরূপে অবস্থান করিতে থাকে। পুরুষের প্রতি করণীয় উভয়বিধ কার্য্য (ভোগ ও মোক্ষ) পরিনিষ্পন্ন হওয়ায় প্রকৃতি তখন কৃতকৃত্যতা লাভ করে; এবং প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধি প্রভৃতি তখন চরিতার্থ হইয়া নিজ নিজ উপাদান কারণে বিলয় প্রাপ্ত হয় (১); সুতরাং তখন আর কোন প্রকার দুঃখভোগের

---

(১) পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনের জন্য প্রকৃতি যেমন এক একটা স্থূল শরীর নির্ম্মাণ করে, ঠিক তেমনই এক একটা সূক্ষ্ম শরীরও সৃষ্টি করে। ভোগ-মোক্ষ সূক্ষ্ম শরীরেরই হয়, স্থূল শরীর কেবল তাহার আশ্রয় মাত্র। স্থূল শরীর প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরটী সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন হইয়া মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকে। সূক্ষ্ম শরীরের অবয়ব সতেরটী—একাদশ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র। ইহার মধ্যে বুদ্ধিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পুরুষের প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে। বুদ্ধির কর্ত্তব্যানুরোধেই সূক্ষ্ম শরীর অক্ষুণ্ণ থাকে। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সম্পাদন দ্বারা বুদ্ধি যখন বিশ্রাম লাভ করিবার অধিকার পায়, তখন সূক্ষ্ম শরীরের অপরাপর অংশও বিরতব্যাপার হইয়া পড়ে; এই কারণেই তত্ত্বদর্শীর স্থূল শরীরের পতন হইলে পর সমস্তটা সূক্ষ্ম শরীরই নিজ নিজ উপাদানে লয় পায়, আর ফিরিয়া আইসে না।

সম্ভাবনা না থাকায় ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ কৈবল্যলাভ পুরুষের সিদ্ধ হয়; এইজন্য গুণত্রয়ের প্রতি-প্রসবকে 'কৈবল্য' নাম দেওয়া অসঙ্গত হয় নাই। এ মতে বন্ধ মোক্ষ উভয়ই প্রকৃতির ধর্ম্ম। পুরুষের প্রতি কর্ত্তব্যতায় আবদ্ধ থাকাই ফলতঃ প্রকৃতির বন্ধ, আর সেই কর্ত্তব্যতার সমাপ্তিই তাহার মোক্ষ। পুরুষ যেমন ছিল, তেমনই আছে, তেমন ভাবেই চিরকাল থাকিবে; বন্ধ-মোক্ষের সহিত তাহার বাস্তব সম্বন্ধ কোন কালেই ছিল না, নাই এবং হইবেও না (১)। যাহারা এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইয়া পুরুষেরই বন্ধ-মোক্ষ বলিতে চাহেন, তাহাদের জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন—"স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেঃ"।

অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব—সাক্ষাৎকারের পর বুদ্ধির আর কিছু কর্ত্তব্য থাকে না; তখন বুদ্ধিতে বৃত্তি-উদ্ভবেরও কোন প্রয়োজন থাকে না; সুতরাং বৃত্তিসম্পাতের ফলে যে, পুরুষের বৃত্তিসারূপ্য (বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদ ভ্রান্তি) ছিল, তৎকালে তাহাও আর থাকে না; কাজেই চিতিশক্তি পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরুষের এই যে, বৃত্তি-সারূপ্যের নিবৃত্তিতে আপনার স্বাভাবিক চৈতন্যরূপে প্রকাশ, তাহার নাম কৈবল্য। কৈবল্য শব্দের সাহজিক অর্থ হইতেছে—কেবলভাব অর্থাৎ অপর কাহারো সঙ্গে অবিমিশ্রিত ভাব। এই কৈবল্য সংঘটন করানই যোগ-সাধনার

---

(১) ভাগবত পুরাণে কথিত আছে—"বদ্ধো মোক্ষ ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ। গুণস্য মায়ামূলত্বাৎ ন মে বন্ধো ন মোক্ষণম্॥"

চরম উদ্দেশ্য। মহামুনি পতঞ্জলি সেই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া যোগ, যোগবিভাগ, যোগসাধনের অষ্টবিধ অঙ্গ এবং আনুষঙ্গিক ফলরূপে যোগ-বিভূতি প্রভৃতি গৌণ ও মুখ্য বিষয় সমূহ প্রতিপাদনের ব্যপদেশে এই উপাদেয় যোগদর্শন প্রণয়ন করিয়া মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিবর্গের পবিত্র হৃদয়ে আপনার উচ্চ আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং জগতে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

[উপসংহার।]

মহামুনি পতঞ্জলি-প্রণীত পাতঞ্জল দর্শন সর্ব্ববাদিসম্মত অতি উপাদেয় গ্রন্থ। অন্যান্য দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু যোগদর্শনের প্রধান বিষয় যোগ সম্বন্ধে অতি বড় নাস্তিকেরও বিসংবাদ আছে বলিয়া মনে হয় না।

যোগদর্শন সাধারণতঃ সেশ্বর সাংখ্য নামে পরিচিত; কারণ, কপিলকৃত সাংখ্যে ঈশ্বর অসিদ্ধ বা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন; কিন্তু পতঞ্জলির যোগদর্শনে তিনি অতি গৌরবময় উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন। বোধ হয়, এই হেতুতেই সাংখ্যদর্শন সেশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদ লইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে, পাতঞ্জল দর্শন কেন যে, সাংখ্যশাস্ত্রের অংশ বা ভাগ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার অবিসংবাদিত সদুত্তর পাওয়া বড় কঠিন। সূত্রকার পতঞ্জলি গ্রন্থমধ্যে কোথাও আপনার গ্রন্থকে 'সাংখ্য' নামে নির্দ্দেশ করেন নাই; কেবল সাংখ্যসম্মত পদার্থগুলি তিনি আবশ্যকমত স্থানে স্থানে গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র; সুতরাং সাংখ্যসম্মত তত্ত্বগুলিই

তাঁহার অভিমত পদার্থ কি না, তাহা নিঃসংশয়চিত্তে বলিতে পারা যায় না। যোগতত্ত্ব নিরূপণ করাই পতঞ্জলির আন্তরিক অভিলাষ; সেই অভিলষিত তত্ত্ব নিরূপণের পক্ষে যখন যাহা সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তখন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। এই কারণেই তিনি, সাংখ্যসিদ্ধান্তের নিতান্ত প্রতিকূল হইলেও ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই প্রকার যোগতত্ত্ব-প্রজ্ঞাপনের অনুকূল বলিয়াই যে, তিনি সাংখ্যসম্মত তত্ত্বগুলিও যথাযথভাবে গ্রহণ করেন নাই, তাহা কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ তিনি তত্ত্ব-সংকলনের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন নাই। পদার্থসংকলন অভিমত হইলে তাহাও তাঁহার কর্ত্তব্যমধ্যে অবশ্যই স্থান পাইত, অথচ তাহা কোথাও স্থান পায় নাই। পক্ষান্তরে, সাংখ্যসম্মত ত্রিবিধ প্রমাণের পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সে সকলের কিঞ্চিৎ পরিচয়ও প্রদান করিয়াছেন। এই সকল কারণে স্বতই সংশয় হয় যে, পাতঞ্জল দর্শন সাংখ্যশাস্ত্রেরই একটা পৃথক্ বিভাগ? অথবা স্বতন্ত্র একটা শাস্ত্রবিশেষ।

সাংখ্যের ন্যায় পাতঞ্জলের মতেও পুরুষ বহু এবং অখণ্ড অনন্ত ও নিত্য চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষমাত্রই সুখ-দুঃখাদির সম্বন্ধবর্জিত নিত্য মুক্ত; কেবল বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সহিত অবিবেক বশতঃ বন্ধন ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। আত্মা ও অনাত্মার বিবেকসাক্ষাৎকারে সেই ভ্রান্তির অবসান হয়। উক্ত বিবেকসাক্ষাৎকারের জন্য যোগের প্রয়োজন; যোগ অর্থই চিত্তবৃত্তির নিরোধ। সেই নিরোধ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই পুরুষের আর বৃত্তি-সম্পাত ঘটে না,

কাজেই তখন পুরুষের বৃত্তি-সারূপ্যকৃত ভ্রান্তি বা অবিবেকও আর থাকে না।

এই প্রসঙ্গে চিত্তের পাঁচ প্রকার বৃত্তি ও তাহার ক্লিষ্টাক্লিষ্ট বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য—যোগাভিলাষী পুরুষ অক্লিষ্ট বৃত্তিগুলি রক্ষা করিয়া ক্লিষ্ট বৃত্তিগুলির নিরোধে সতত যত্নপর হইবেন। এই নিরোধেরই নামান্তর যোগ। যোগ দুই প্রকার—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। সবিকল্পের অপর নাম সবীজ যোগ, আর নির্ব্বিকল্পের অপর নাম নির্ব্বীজ যোগ। সবিকল্প যোগে ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা, এই তিনেরই প্রতীতি অব্যাহত থাকে, আর নির্ব্বিকল্প যোগে উক্তপ্রকার বিভেদের প্রতীতি থাকে না ; তখন একমাত্র ধ্যেয় বস্তুর আকারই প্রতি-ভাসমান হইতে থাকে। সোহাগা যেমন স্বর্ণের মল বিদূরিত করিয়া আপনিও বিলয়প্রাপ্ত হয়, এবং অগ্নি যেরূপ অবলম্বিত কাষ্ঠখণ্ড দগ্ধ করিয়া নিজেও নির্ব্বাণ লাভ করে, ঠিক তদ্রূপ সমাধি-সময়ে অন্তঃকরণে প্রাদুর্ভূত যথোক্ত বৃত্তিনিচয় নিখিল চিত্তমল বিধ্বস্ত করিয়া এবং অবিবেক নিরস্ত করিয়া অন্তঃকরণের সহিত নিজেরাও বিলীন হইয়া যায়।

উপরি উক্ত চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপায় অনেক প্রকার। প্রথমতঃ অভ্যাস, বৈরাগ্য ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই বৃত্তিনিরোধের প্রকৃষ্ট উপায়। অভ্যাস অর্থ—একই ধ্যেয় বস্তুর পুনঃ পুনঃ অনুধ্যান। বৈরাগ্য অর্থ—ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়-ভোগে অস্পৃহা। ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থ—ঈশ্বরে নির্ভরশীলতা—সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল

তাঁহাতে সমর্পণ করা। যাহারা এবংবিধ উপায় গ্রহণে অসমর্থ—নিতান্ত অসংযত-চিত্ত, তাহারা প্রথমে ক্রিয়াযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ক্রিয়াযোগের সাহায্যে এবং যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গের অনুশীলনে চিত্ত সুস্থির করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানযোগের দিকে অগ্রসর হইবে।

যোগের প্রকৃত ফল কৈবল্যলাভ দীর্ঘকালব্যাপী নিরতিশয় আয়াসসাধ্য; সুতরাং যোগপ্রবৃত্ত ব্যক্তির মনে সহজেই যোগ-ফলের অবশ্যম্ভাবিতাবিষয়ে সংশয় সমুত্থিত হইতে পারে। সেই সংশয় দূরীকরণার্থ এবং যোগফলে দৃঢ়তর বিশ্বাস সমুৎপাদনার্থ কতকগুলি বিভূতির অর্থাৎ যোগের আপাতলভ্য ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য—যোগপ্রবৃত্ত ব্যক্তি সেই সকল যোগ-ফল (বিভূতি) দর্শনে প্রকৃত যোগফলেও বিশ্বাসবান্ হইতে পারিবেন। সূত্রকার বিভূতি নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই যোগীকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, ঐ সকল ফল ব্যবহারক্ষেত্রে লোভনীয় সিদ্ধিরূপে পরিগণনীয় হইলেও, বস্তুতঃ সমাধির পক্ষে বিষম বিঘ্নকর; অতএব যোগী কখনও সে সকল ফলে আসক্ত হইবেন না, এবং আপনার যোগমহিমায়ও বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না; কারণ, তাহাতে যোগীর যোগশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যোগী এইজাতীয় বহুবিধ প্রলোভনে পতিত হইয়াও যদি বিচলিত না হন, চিত্তবৃত্তিনিরোধে অবহিত থাকিতে পারেন, তাহা হইলেই, যোগফল—কৈবল্যলাভ তাঁহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হয়। ইহ জন্মেই হউক, আর জন্মান্তরেই হউক, তাঁহার মুক্তিলাভ

ধ্রুব—সুনিশ্চিত (১)। ইহাকেই বলে সর্বদুঃখের অবসানভূমি ও পরমানন্দঘন নিত্য নিরাময় পরমা শান্তি।

মহামতি বাচস্পতিমিশ্র টীকাশেষে একটীমাত্র শ্লোকে সমস্ত যোগদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টভাবে সন্নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে সেই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া যোগদর্শনের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি—

"নিদানং তাপানামুদিতমথ তাপাশ্চ কথিতাঃ,
সহাঙ্গৈরষ্টাভির্দ্বিবিধমিহ যোগদ্বয়মপি।
কৃতো মুক্তেরধ্বা গুণ-পুরুষভেদঃ স্ফুটতরঃ,
বিবিক্তং কৈবল্যং পরিগলিততাপা চিতিরসৌ॥"

অর্থাৎ এই পাতঞ্জল দর্শনে ত্রিবিধ তাপ, ত্রিতাপের (ত্রিবিধ দুঃখের) মূল কারণ—প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ, আটপ্রকার যোগাঙ্গ, দ্বিবিধ যোগ (সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি), প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকরূপ মুক্তি-পথ এবং ত্রিতাপবিরহিত শুদ্ধ চিৎস্বরূপ কৈবল্য বা মুক্তি, এ সমস্ত বিষয় অতি বিস্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে। প্রধানতঃ এই কয়েকটী বিষয় লইয়াই আলোচ্য যোগদর্শন পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর আমরা জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

---

(১) যোগী অবস্থাবিশেষে উপস্থিত হইলে দেবতাগণ তাহার বৈরাগ্য পরীক্ষার্থ অনেকপ্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করেন। ইহাকে 'স্থান্যুপনিমন্ত্রণ' বলে। সূত্রকার বলিয়াছেন—"স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গ-স্ময়াকরণং পুনরনিষ্ট-প্রসঙ্গাৎ।" যোগী সেই সকল প্রলোভনে আসক্ত হইবেন না, এবং যোগ-প্রভাব দেখিয়াও বিস্মিত হইবেন না। তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে।

মীমাংসাদর্শন।

[ভূমিকা]

দর্শনপর্য্যায়ে জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শন পঞ্চম স্থানে অধিষ্ঠিত, এবং পূর্ব্বমীমাংসা নামে পরিচিত। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণরূপে বিভক্ত বেদশাস্ত্রের পূর্ব্বভাগ—যাহা সংহিতা ও কর্ম্মকাণ্ডরূপে পরিচিত, তদবলম্বনে বিরচিত বলিয়া ইহা পূর্ব্বমীমাংসা নামে অভিহিত (১)। মহর্ষি বেদব্যাস বেদবিভাগ সম্পূর্ণ করিয়া যে কয়েকজন শিষ্যকে বেদবিদ্যা দান করিয়াছিলেন, মহামুনি জৈমিনি তাঁহাদের অন্যতম। বেদব্যাসের আদেশানুসারে জৈমিনি মুনি বেদের কর্ম্মকাণ্ড সংহিতা-ভাগের তাৎপর্য্য নির্ণয়ার্থ মীমাংসাদর্শন রচনা করেন। এই দর্শনে প্রধানতঃ বেদার্থ নিরূপণের ব্যবস্থা ও তদুপযোগী নানাবিধ নিয়ম-পদ্ধতি সংকলিত ও বিচারিত হইয়াছে।

আস্তিক-দর্শনের মধ্যে আলোচ্য মীমাংসাদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সমধিক জটিল। জটিলতার কারণ দুইটী—প্রথম কারণ —ইহা সম্পূর্ণরূপে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত; কর্ম্ম-কাণ্ডই ইহার ভিত্তি; সেই কর্ম্মকাণ্ডে সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলে ইহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করা কাহারো পক্ষেই সহজ হয় না। দ্বিতীয়

---

(১) মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।" মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয় ভাগের সম্মিলিত নাম বেদ। মন্ত্রভাগ সাধারণতঃ সংহিতা ও কর্ম্মকাণ্ড নামে প্রসিদ্ধ, আর ব্রাহ্মণভাগ সাধারণতঃ উপনিষদ্ ও আরণ্যক প্রভৃতি নানাভাগে বিভক্ত।

কারণ, ইহার বিচার-প্রণালীগত বৈশিষ্ট্য। ন্যায়াদি দর্শনগুলি অত্যন্ত জটিল হইলেও, উহাদের বিচারপদ্ধতি কতিপয় লৌকিক নিয়মে নিবদ্ধ থাকায় প্রতিভাবান্ মেধাবী পুরুষের পক্ষে নিতান্ত দুগ্রহ নহে; কিন্তু ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ও যেমন গভীর ও অ-লোকপ্রসিদ্ধ, বিচারের নিয়মপ্রণালীও আবার তেমনই বিস্তৃত; কাজেই ইহার সর্ব্বাংশ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা মেধাবী লোকের পক্ষেও অনায়াসসাধ্য বা অল্পসময়সম্পাদ্য হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এদেশে একসময় এরূপ বিশাল জটিল শাস্ত্রেরও যথেষ্ট প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল।

দেখা যায়, বৌদ্ধবিপ্লবের শেষ সময়েই ইহার অত্যধিক অভ্যুদয় হইয়াছিল। ঘাতের পর প্রতিঘাত হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ যখন বিদ্যা, বুদ্ধি ও সহায়সম্পদে বলীয়ান্ হইয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের বিপক্ষে নিজ নিজ শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, এবং বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারপূর্ব্বক সনাতন নিয়ম-সেতু বিধ্বস্তপ্রায় করিয়াছিলেন, সেই অতি ভীষণ বিপ্লসঙ্কুল সময়ে ভগবদিচ্ছায় কয়েকজন ক্ষণজন্মা পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহার প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবং বিবিধ যুক্তিতর্ক-সংবলিত অতি উপাদেয় বহুতর বিচার-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মীমাংসা শাস্ত্রের সমধিক পুষ্টি ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভট্ট কুমারিল, প্রভাকর, আপোদেব, লৌগাক্ষি ভাস্কর, মাধবাচার্য্য ও পার্থসারথি প্রভৃতি কৃতিগণের পবিত্র নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা প্রত্যেকেই মীমাংসাদর্শন বা তাহার

তাৎপর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অত্যুৎকৃষ্ট বহুতর ব্যাখ্যা ও 'প্রকরণ'(১) গ্রন্থ রচনা করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, এবং মীমাংসা শাস্ত্রের সমধিক প্রচার ও প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন।

উক্ত মীমাংসাদর্শন দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ই অনেকগুলি পাদের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, এবং প্রত্যেক পাদই আবার বহুতর সূত্রে সংগ্রথিত। কোন অধ্যায়েই চারের কম ও আটের অধিক পাদ-সংখ্যা নাই, এবং কোন পাদেই কুড়ির কম ও অষ্টাশীর অধিক সূত্র-সংখ্যা নাই। এইভাবে দুই হাজার, সাত শত, চুয়াল্লিশটী সূত্রে পরিচ্ছিন্ন ষাট্ পাদে মীমাংসাদর্শনের দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এত অধিক অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা অপর কোন দর্শনেই দৃষ্ট হয় না। এত বড় বিশাল গ্রন্থের প্রত্যেক পাদগত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক প্রদর্শন করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং পাঠকবর্গেরও সুখবোধ্য হইবে না; এই কারণে আমরা এখানে কেবল অধ্যায়গত স্থূল বিষয়গুলিই যথাসম্ভব অল্পকথায় প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। আশা করি, উৎসাহশীল, অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ আবশ্যক হইলে, মূল গ্রন্থ আলোচনা করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিবেন।

মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্মের লক্ষণ ও প্রকারভেদ এবং বিধিবাক্যাদির প্রামাণ্য নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়

---

(১) প্রকরণের লক্ষণ—"শাস্ত্রৈকদেশসম্বন্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্।
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ ॥"

অধ্যায়ে বিধিবোধিত কর্ম্ম ও তাহার বিভাগ প্রভৃতি বিচারিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে, বিহিত যাগাদি কর্ম্মের শেষ-শেষিভাব (অঙ্গাঙ্গিভাব) আলোচিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে যাগের ও পুরুষের (যজমানের) উপকারার্থ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মগুলির স্বরূপাদি নিরূপিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে, অনুষ্ঠানার্থ বিহিত যাগাদি বিষয়গুলির অনুষ্ঠানক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কর্ম্মফলভোক্তার (আত্মার) স্বরূপ ও অধিকারাদি বিষয় বিবেচিত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে, প্রকৃতিযাগে উপদিষ্ট অঙ্গসমূহের বিকৃতিযাগে সামান্যতঃ অতিদেশাদির কথা নিরূপিত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষ বিশেষ অতিদেশের কথা বর্ণিত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ে বিকৃতিযাগে প্রকৃতিযাগাঙ্গ মন্ত্র ও কর্ম্মসংস্কার প্রভৃতির অতিদেশপ্রসঙ্গে, দেবতাভেদের স্থলে উহের (অধ্যাহারের) নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে বিকৃতি-যাগে প্রকৃতি-যাগাঙ্গ বিশেষ বিশেষ পদার্থের অতিদেশে বাধা প্রদর্শিত হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে, অনেকগুলি প্রধান কর্ম্মের বিধায়ক বাক্যে বহুতর অঙ্গের বিধি থাকিলে, সেই সকল অঙ্গের একবারমাত্র অনুষ্ঠানেই প্রধান কর্ম্মগুলির ফলনিষ্পত্তি-সাধক তন্ত্রতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে, স্থানবিশেষে একটীমাত্র প্রধান কর্ম্ম-সম্পর্কিত অঙ্গবিশেষের অনুষ্ঠানেই অপর সমস্ত প্রধান কর্ম্মেরও ফলসিদ্ধি নিরূপিত হইয়াছে। এতদতিরিক্ত আরও অনেক বিষয় অনুক্ত রহিল, সে সমুদয় বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে হৃদয়বান্ পাঠকবর্গ নিজেরাই মূল গ্রন্থে অনুসন্ধান করিবেন।

মীমাংসাদর্শনের উপর মহামতি শবরস্বামী একখানা উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যাগ্রন্থ ভাষ্যনামে পরিচিত, এবং সুধীসমাজে বিশেষ প্রামাণিকরূপে সমাদৃত। অদ্যাপি উহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যথারীতি চলিতেছে; তবে কর্ম্ম-কাণ্ডের ও অধ্যাপকমণ্ডলীর দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রচারও কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার পর ভট্ট কুমারিল মীমাংসাদর্শনের উপর অপর দুইখানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তৎকৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থদ্বয়ের নাম বার্ত্তিক (১) ও টুপ্‌টীকা। বার্ত্তিক ব্যাখ্যা অতিশয় বৃহৎ ও সারবান্। বার্ত্তিক দুইভাগে বিভক্ত— এক তন্ত্রবার্ত্তিক, অপর শ্লোকবার্ত্তিক। উভয় ভাগই বিবিধ বিচার-বিতর্কে পরিপূর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত ও বিচারসহ। উল্লিখিত ভাষ্য ও বার্ত্তিক গ্রন্থই মীমাংসাদর্শনের মর্ম্মগ্রহণোপযোগী প্রশস্ত

---

(১) ভাষ্য ও বার্ত্তিক একপ্রকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ভাষ্যের লক্ষণ এইরূপ—

"সূত্রস্থং পদমাদায় পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ ॥"

অর্থাৎ ব্যাখ্যাকার প্রথমে সূত্রের কথা ধরিয়া ব্যাখ্যা করিবেন, এবং ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এমন শব্দ ব্যবহার করিবেন যে, তাহাও সূত্রেরই মত স্বল্পাক্ষর হইবে। শেষে সেই নিজের কথাটীরও ব্যাখ্যা করিবেন। তাহা হইলে সেই ব্যাখ্যার নাম হইবে 'ভাষ্য'। বার্ত্তিকের পরিচয় এইরূপ—

"উক্তানুক্ত-দুরুক্তার্থব্যক্তকারি তু বার্ত্তিকম্ ॥"

অর্থাৎ মূলে যে সকল বিষয় উক্ত আছে, অথবা যে সকল আবশ্যক বিষয়ও বলা হয় নাই, কিংবা যে সকল বিষয় বলা হইয়া থাকিলেও ঠিকমত বলা হয় নাই, সেই সকল বিষয় যে ব্যাখ্যাতে পরিস্ফুট করা হয়, তাহার নাম বার্ত্তিক।

পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। এতদুভয়ের সাহায্য না পাইলে সূত্রগুলির রহস্য-রত্ন বোধ হয়, চিরকালই নিবিড় তিমিরজালে প্রচ্ছন্ন থাকিত।

এস্থলে মহামতি মাধবাচার্য্যকৃত ন্যায়মালাবিস্তারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশাল মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ধারণাপথে রক্ষা করা অনেকের পক্ষেই সমধিক ক্লেশ-কর। সেই ক্লেশ-লাঘবের উদ্দেশ্যে মহামতি মাধবাচার্য্য প্রত্যেক অধিকরণের বিষয়গুলি (পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও তাহার বিচার), শ্লোকে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন (১)। প্রায় সর্ব্বত্রই দুইটীমাত্র শ্লোকে সমস্ত বিষয় সংগ্রথিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকে পূর্ব্বপক্ষ বা আপত্তি ও তদনুকূল যুক্তি, আর দ্বিতীয় শ্লোকে সিদ্ধান্ত ও তদনুকূল যুক্তিসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। মীমাংসা-দর্শনের উপর মাধবাচার্য্যের যে কি পরিমাণ অধিকার ছিল, তাহা তাঁহার 'ন্যায়মালা বিস্তার' গ্রন্থে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার পর মীমাংসাশাস্ত্রে পারদর্শী মহামতি পার্থসারথি মিশ্র মীমাংসাদর্শন অবলম্বনে দুইখানা পরম উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সে দুই গ্রন্থের নাম—শাস্ত্রদীপিকা, ও ন্যায়রত্ন-মালা। তন্মধ্যে শাস্ত্রদীপিকা বড়ই পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং বিদ্বৎসমাজে

---

(১) 'অধিকরণ' কথাটী মীমাংসাশাস্ত্রের বিশেষ পরিভাষা। এক একটি বিচার্য্য বিষয় লইয়া পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষরূপে যতগুলি সূত্র রচিত হইয়াছে, সেই সূত্র-সমষ্টিকে একটী 'অধিকরণ' বলে। অধিকরণের বিষয় পাঁচটী—(১) বিচার্য্য বিষয়। (২) সংশয়। (৩) পূর্ব্বপক্ষ। (৪) উত্তর বা সিদ্ধান্তপক্ষ। (৫) নির্ণয় বা সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদন।

সুপরিচিত ও প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সমাদৃত। ঐ গ্রন্থও মীমাংসা-দর্শনের অলঙ্কাররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া মহামতি আপোদেবকৃত 'ন্যায়প্রকাশ' (আপোদেবী), লৌগাক্ষি-ভাস্কর রচিত 'অর্থসংগ্রহ', কৃষ্ণযজ্ব-প্রণীত 'মীমাংসাপরিভাষা' এবং তদতিরিক্ত আরও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট প্রকরণ গ্রন্থ এই মীমাংসা-দর্শন অবলম্বনে আত্মলাভ করিয়াছে। ঐ সকল প্রকরণ গ্রন্থে মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য প্রধান প্রধান বিষয়সমূহ অপেক্ষাকৃত সহজভাবে ও সরল ভাষায় বিবৃত করা হইয়াছে। ঐ সমুদয় গ্রন্থ পাঠ করিলে সাধারণভাবে মীমাংসাদর্শনের উদ্দেশ্য, বিচার্য্য বিষয় ও বিচারপ্রণালী প্রায় সমস্তই জানিতে পারা যায়। এই কারণে উল্লিখিত প্রকরণগ্রন্থগুলি বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করিয়াছে (১)।

---

(১) এতদতিরিক্ত আরও যে সকল অভিজ্ঞ পণ্ডিত বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মীমাংসাশাস্ত্রের পুষ্টি ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাদের ও তৎকৃত গ্রন্থসমূহের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। অভিজ্ঞ পাঠকগণ ইহা হইতেই উহার প্রচার-বাহুল্য বুঝিতে পারিবেন।

বুক্কণমহারাজামাত্যকৃত জৈমিনীয় ন্যায়মালা। রামেশ্বরসূরিকৃত জৈমিনিসূত্রবৃত্তি। বল্লভাচার্য্যবিরচিত তত্ত্বপ্রদীপ ও তত্ত্ববার্ত্তিক। ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যকৃত ন্যায়বিন্দুটীকা। সোমেশ্বরভট্টপ্রণীত ন্যায়সুধা। শ্রীখণ্ডদেবকৃত পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন। শালিকনাথকৃত প্রকরণপঞ্জিকা ও ভট্টচিন্তামণি। জানকীনাথভট্টরচিত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী। নারায়ণতীর্থ-মুনিবিরচিত ভট্টদীপিকা ও মান-মেয়োদয়। শ্রীশঙ্করভট্টকৃত মীমাংসা-সারসংগ্রহ। অপ্পয়দীক্ষিতপ্রণীত বিধিরসায়ন। উৎপলাচার্য্যকৃত স্পন্দদীপিকা। কৃষ্ণাচার্য্যবিরচিত বিবাদসুধাকর। বাসুদেবদীক্ষিতবিরচিত অধ্বরমীমাংসা ইত্যাদি। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এখনও অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বমীমাংসামতে ঈশ্বরের কোন স্থান বা উপযোগিতা নাই। কর্ম্মজন্য অপূর্ব্বই জীবগণকে কর্ম্মানুযায়ী শুভাশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে; তজ্জন্য আর ঈশ্বরের কোন আবশ্যক হয় না; সুতরাং তাঁহার মতে নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে কোন প্রয়োজন নাই ও থাকিতে পারে না। মন্ত্রই দেবতার স্বরূপ; মন্ত্রাতিরিক্ত শরীরধারী দেবতার অস্তিত্বেও কোন প্রমাণ বা প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, এবং সেরূপ শরীর থাকা সম্ভবও হয় না (১)।

মীমাংসাদর্শনের মতে বর্ণ ও বর্ণময় শব্দমাত্রই নিত্য; প্রত্যেক বর্ণই উৎপত্তি-বিনাশবিহীন, কণ্ঠতালুপ্রভৃতি স্থান-বিশেষের সংযোগ-বিয়োগানুসারে উহাদের অভিব্যক্তি ও অনভি-ব্যক্তি ঘটিয়া থাকে মাত্র; এবং তন্নিবন্ধনই নিত্য শব্দেও লোকের অনিত্যতাভ্রান্তি (উৎপত্তি-বিনাশ ভ্রান্তি) উপস্থিত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ বর্ণমাত্রই উৎপত্তি-বিনাশবিহীন নিত্য। এবিষয়ে আমরা

---

(১) প্রবাদ আছে যে, জৈমিনিমুনি মীমাংসাদর্শনের এই দ্বাদশ অধ্যায় ছাড়া আরও চারি অধ্যায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই চারি অধ্যায়ের নাম সংকর্ষণ কাণ্ড। তাহাতে নাকি তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত সে গ্রন্থ লোক-লোচনের গোচর হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই; আর জানা যাইবে কি না, তাহাও অন্তর্যামী ভিন্ন কেহ বলিতে পারেন না। মীমাংসকগণ বলেন—দেবতা-গণের স্থূল শরীর থাকিলে, যজ্ঞাদি কার্য্যে আহ্বানের পর আগত দেবতা-মূর্ত্তি লোকের প্রত্যক্ষগোচর হইত, কিন্তু তাহা কোথাও হয় না; অধিকন্তু আবাহনের ফলে আগত ঐরাবত-গজারূঢ় ইন্দ্রদেব ক্ষুদ্রঘটে অধিষ্ঠিত হইলে নিশ্চয়ই সে ঘট চূর্ণীকৃত হইত। অতএব দেবতার শরীর থাকা সম্ভবপর হয় না।

ফেলোশিপ-প্রবন্ধের প্রথম ভাগে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি; এখানে তাহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

বর্ণময় শব্দ যেমন নিত্য; বর্ণময় শব্দসমষ্টিরূপ বেদও তেমনই নিত্য এবং অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত। বেদ কোনও পুরুষবিশেষের বুদ্ধি-পরিকল্পিত নহে, এবং ঈশ্বরকৃতও নহে; কেন না, মীমাংসা-দর্শনে ঈশ্বরের প্রভাব বা মহিমা অস্বীকৃত হইয়াছে। জীবের সুখ-দুঃখ-প্রবর্ত্তক শুভাশুভ কর্ম্মরাশিই তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বৈদিক ঋষিগণ মন্ত্রসমূহের দ্রষ্টামাত্র, রচয়িতা নহেন। "ঋষি-দর্শনাৎ" অর্থাৎ যিনি যে মন্ত্রের দ্রষ্টা, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষিনামে উক্ত হইয়াছেন। কাজেই বেদকে অপৌরুষেয় বলিতে হয়।

বেদ অপৌরুষেয় বলিয়াই ভ্রম-প্রমাদপ্রভৃতি পুরুষ-সুলভ দোষে অসংস্পৃষ্ট; সুতরাং স্বতঃ প্রমাণ; উহার প্রামাণ্য নির্দ্ধারণের জন্য আর প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না।

সেই স্বতঃপ্রমাণ বেদই জীবগণের হিতপ্রাপ্তি ও অহিতপরিহারের উপায় উপদেশ করিয়াছেন। সেই হিতাহিত-প্রাপ্তি-পরিহারোপযোগী ক্রিয়াপ্রতিপাদানই সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে সকল বাক্যে তাদৃশ কোন ক্রিয়ার উপদেশ নাই—কেবল বস্তুমাত্রের নির্দ্দেশ আছে, সে সকল বাক্য নিরর্থক। তাঁহারা বলেন—

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্, তস্মাদনিত্যমুচ্যতে" ॥১।২।১॥

অর্থাৎ ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই বেদের উদ্দেশ্য; অতএব অক্রিয়ার্থক বাক্যসমূহ অনর্থক অর্থাৎ শব্দার্থে তাৎপর্য্যবিহীন।

এই কারণে সেই সকল বাক্যকে অনিত্য বলা হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসরে "সোঽরোদীৎ" [দেবগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া] সেই অগ্নি রোদন করিয়াছিলেন। এবং "অগ্নিঃ হিমস্য ভেষজম্" অগ্নি হইতেছে হিমের ঔষধ অর্থাৎ শীতনিবারক, ইত্যাদি বাক্য-রাশি লোকের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির উপদেশক নয় বলিয়া অপ্রমাণ। যদি এইজাতীয় বাক্যসমূহেরও আনর্থক্য নিবারণ ও সার্থকতা সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হইলেও,—

"তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ" ॥ ১।১।২৫ ॥
"বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" ॥ ১।২।৭ ॥

এই কারণেই প্রসিদ্ধ বা বিদ্যমান বস্তুর বোধক অক্রিয়ার্থক পদগুলিকে ক্রিয়াবোধক পদসমূহের সঙ্গে মিলিত করিয়া পাঠ করিতে হয়; কেন না, ঐ উদ্দেশ্যেই সেই সকল (ভূতার্থবোধক) বাক্যের উল্লেখ। পর সূত্রে একথা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে—ভূতার্থবাদী (অক্রিয়াবোধক) বাক্যগুলি বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা প্রাপ্ত হইয়া সেই সকল বিধিরই প্রশংসা বুঝাইয়া থাকে। ঐরূপ প্রশংসার্থেই ঐ সকল বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

উল্লিখিত নিয়মানুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক উপনিষদ্ শাস্ত্রে যে, "সত্যং জ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি ব্রহ্মোপদেশপর বাক্য আছে, সে সমস্ত বাক্যই নিরর্থক; পক্ষান্তরে, কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়াবিধির সহিত কিংবা উপনিষদ্গত উপাসনাবিধির সহিত মিলিত হইয়া

সার্থক হইলেও হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা বা ব্রহ্ম ভূত বস্তু, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ; সুতরাং নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য; কাজেই তদ্বোধক শব্দসমূহ কখনই অজ্ঞাত-জ্ঞাপক নহে, প্রসিদ্ধার্থের অনুবাদক মাত্র; এইজন্য ঐ সকল বাক্য প্রমাণরূপে সার্থক হইতে পারে না। উহাদের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইলেই ক্রিয়া-সম্বন্ধ ঘটাইতে হইবে; সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডে বিহিত যাগাদিক্রিয়ার জন্য যে অধিকারী—আত্মার উল্লেখ আছে, উপনিষদুক্ত বাক্যসমূহ সেই আত্মারই দেহাদি-ব্যতিরিক্তভাব ও নিত্য-স্বরূপতাপ্রভৃতি নিরূপণ করিয়াছে। আর যদি কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়াবিধির অপেক্ষিত কর্ত্তার কথা জ্ঞানকাণ্ডে (উপনিষদে) থাকা অসঙ্গতই মনে হয়, তাহা হইলেও ক্রিয়াসম্বন্ধের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না; কারণ, উপনিষদের মধ্যে যে, "আত্মা ইত্যেবোপাসীত" "ব্রহ্মোপাসীত" ইত্যাদি উপাসনাক্রিয়ার বিধি দৃষ্ট হয়, সেই সকল উপাসনায় কর্ম্মস্বরূপে অপেক্ষিত আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা বিধিসম্বন্ধবর্জ্জিত হইতেছে না। এইভাবেই উপনিষদ্শাস্ত্রের পরম রহস্য ব্রহ্মোপদেশক বাক্য-সমূহেরও সার্থকতা রক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে। অতএব কেবলই বস্তুমাত্রবোধক অ-ক্রিয়াপর বাক্যসমূহের স্বতন্ত্র-ভাবে সার্থকতা স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

মীমাংসামাত্রই সংশয়-সাপেক্ষ। যেখানে সংশয়, সেই খানেই মীমাংসার প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে যেখানে সংশয় নাই, সেখানে মীমাংসারও আবশ্যক নাই। আলোচ্য মীমাংসাদর্শনের

নামকরণ হইতেই বুঝা যায় যে, কর্ম্মকাণ্ডে সম্ভাব্যমান সংশয় নিরাসার্থই ইহার আবির্ভাব। কোথায় কোন শব্দের কিরূপ অর্থ করিতে হইবে, কোন বাক্যের কিরূপ তাৎপর্য্য কল্পনা করিতে হইবে, অথবা কোথায় কোন মন্ত্রের বা কোন দ্রব্যের কি প্রকারে বিনিয়োগ করিতে হইবে, ইত্যাদি সংশয়সঙ্কুল বিষয়ে সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিবার অনুকূল নিয়ম-প্রণালীসমূহ এগ্রন্থে অতি উত্তমরূপে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার উদাহরণরূপে নিম্নলিখিত সূত্রটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে—

"শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং পারদৌর্ব্বল্যম্
অর্থবিপ্রকর্ষাৎ" ॥ ৩।৩।১৪ ॥

কোথাও মন্ত্রাদির বিনিয়োগ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, যথাসম্ভব শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—এই ষড়্‌বিধ হেতুদ্বারা বিনিয়োগ নির্ণয় করিতে হয় (১)। সন্দিগ্ধস্থলে বিনিয়োগ স্থির করিবার পক্ষে উপরি উক্ত শ্রুতি-লিঙ্গাদি হেতু-

(১) শ্রুতি অর্থ—দ্বিতীয়াদি কারক-বিভক্তিযুক্ত পদ, ফল কথা—"নিরপেক্ষো রবঃ শ্রুতিঃ" অর্থাৎ যাহার অর্থ প্রতীতির জন্য অপরকে অপেক্ষা করিতে হয় না, সেইরূপ শব্দই 'শ্রুতি' নামে অভিহিত। 'লিঙ্গ' অর্থ—বিশেষার্থবোধনে সামর্থ্য। 'বাক্য' অর্থ—পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট পদ-সমষ্টি। 'প্রকরণ' অর্থ—প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ। 'স্থান' অর্থ—নির্দ্দেশের ক্রম অর্থাৎ পারম্পর্য্য। 'সমাখ্যা' অর্থ নাম বা যোগার্থ অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়লব্ধ অর্থ। এই ছয়টীই মন্ত্রাদির বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক অর্থাৎ কোথায় কাহার কিরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া দেয়। তন্মধ্যে কোথাও যদি একাধিক হেতুর সম্ভাবনা ঘটে, এবং তাহাতে যদি নির্ণয়ে বাধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উপরি লিখিত হেতুগণের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হেতুদ্বারাই বিনিয়োগ স্থির করিতে হয়।

গুলিই প্রধান সহায়-সত্য ; কিন্তু কোনস্থলে যদি একাধিক হেতু বিদ্যমান থাকে, এবং উহারা প্রত্যেকেই যদি বিচার্য্য বিষয়টাকে বিভিন্নপথে আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহা হইলে বিনিয়োগ নিরূপণের কোন উপায় আছে কি ? হাঁ আছে ; তাদৃশ স্থলে সম্ভাবিত হেতুগুলির বলাবল বিচারই একতর পক্ষনির্ণয়ের উপায়। উক্ত ষড়্‌বিধ হেতুর মধ্যে প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী হেতুটী পরবর্ত্তী হেতু অপেক্ষা বলবান্। যেমন, 'সমাখ্যা' অপেক্ষা 'স্থান' বলবান্ ; স্থান অপেক্ষা প্রকরণ বলবান্ ; প্রকরণ হইতে বাক্য বলবান্ ; বাক্য অপেক্ষা 'লিঙ্গ' এবং লিঙ্গ অপেক্ষাও 'শ্রুতির' বলবত্তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; সুতরাং শ্রুতির বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশক অপর সমস্ত হেতুই দুর্ব্বলতা নিবন্ধন উপেক্ষণীয়। অতএব কোনস্থানে যদি বিনিয়োগ-বোধক সাক্ষাৎ শ্রুতিবাক্য বর্ত্তমান থাকে, আর তদ্বিরুদ্ধে যদি লিঙ্গ ও বাক্য প্রভৃতি হেতু বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, অপরাপর হেতুগুলিকে বাধা দিয়া শ্রুতি নিজেই মন্ত্রাদির বিনিয়োগ ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ দ্বিতীয় হেতু 'লিঙ্গ'ও আবার তৃতীয় হেতু বাক্যকে বাধা দিবে। অন্যান্য সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এইরূপ বাধ্য-বাধকভাব বা বলাবলের কারণ এই যে, সমাখ্যা অনুসারে অর্থ নির্ণয় করিতে যত সময় লাগে, তাহার পূর্ব্বেই 'স্থান'রূপ হেতুদ্বারা অর্থ নির্ণয় হইয়া যায়। আবার স্থানের দ্বারা অর্থ নির্ণয় করিতে যতটা বিলম্ব ঘটে, তদপেক্ষা অল্প সময়ে 'প্রকরণ' দ্বারা অর্থ নির্ণয় হইতে পারে, প্রকরণ অপেক্ষাও অল্প সময়ে 'বাক্য' অনুসারে অর্থ নির্ণয় হইতে পারে। বাক্য

অপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে 'লিঙ্গ' অর্থাৎ কথিত সমর্থক হেতুদ্বারা প্রকৃতার্থ নির্ণয় হইয়া থাকে। লিঙ্গ অপেক্ষাও অল্প সময়ে 'শ্রুতি' দ্বারা অর্থ নির্ণয় করা সহজ হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, যেখানে শ্রুতি দ্বারা অর্থ নির্ণয় সম্ভবপর হয় না, সেখানেই অর্থ-নির্ণায়ক লিঙ্গের কার্য্যকারিতা। এইরূপ লিঙ্গের অভাবে বাক্য, বাক্যের অভাবে প্রকরণ, প্রকরণের অভাবে স্থান, এবং স্থানের অভাবে সমাখ্যা বা যোগার্থ দ্বারা সন্দিগ্ধ মন্ত্রাদির বিনিয়োগ প্রভৃতি স্থির করিতে হয় (১)।

আলোচ্য মীমাংসা-শাস্ত্র উপরিউক্ত নিয়মানুসারেই সমস্ত সন্দিগ্ধ বিষয়ে মীমাংসা সংস্থাপন করিয়া থাকে। মীমাংসাশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী স্মৃতিসংহিতাগুলিও উক্ত নিয়মকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে, এবং সর্ব্বত্র এই নিয়মানুসারেই আপনাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছে। উপরি লিখিত নিয়মের বিরুদ্ধ কোন সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণযোগ্য হয় না। এ ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে, এবং সুদূর ভবিষ্যতেও যুক্তিযুক্ত এই ব্যবস্থার অন্যথা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

মীমাংসক-মতে কর্ম্মাধিকারী আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—নিত্য চৈতন্যবান্ ও অনেক—দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক আত্মাই স্বকৃত কর্ম্মানুসারে উত্তমাধম ফল-

(১) মীমাংসকগণ একটীমাত্র শ্লোকে শ্রুতি লিঙ্গাদি কথার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্লোকটী এই :—

"শ্রুতির্দ্বিতীয়া ক্ষমতা চ লিঙ্গং বাক্যং পদান্যেব তু সংহতানি।
সা প্রক্রিয়া যা কথমিত্যপেক্ষা স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যা॥" ইতি

বিশেষ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; এবং সেই ভোগের অনুরোধেই বিভিন্নপ্রকার দেবাসুরাদি শরীর পরিগ্রহ করে; এই কারণেই প্রবল সুখাভিলাষ সত্ত্বেও সংসারী জীবগণের পক্ষে কর্ম্মানুরূপ দুঃখভোগ অপরিহার্য্য হইয়া থাকে। এইরূপে দীর্ঘকাল দুঃখধারা ভোগ করিতে করিতে জীবগণ যখন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে, তখন স্বতই ঐহিক ভোগসুখে বীতরাগ হয় এবং দুঃখ-সম্পর্করহিত নিরাময় সুখানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু মানব নিজে তাহার প্রকৃত পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। মীমাংসাদর্শনের নিকট তাহারা সে পথের শুভ সমাচার প্রাপ্ত হয়, মীমাংসাশাস্ত্রই বলিয়া দেয় যে, হে মোহমুগ্ধ মানবগণ, তোমরা যাহা পাইতে চাও, যাহার জন্য এত ব্যাকুল, তোমাদের অভিলষিত সেই অক্ষয় সুখ 'স্বর্গ' নামে পরিচিত,—

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতং যৎ তৎ সুখং স্বঃ-পদাস্পদম্॥"

অর্থাৎ যাহা কোন সময়ই দুঃখমিশ্রিত হয় নাই, ভবিষ্যতেও দুঃখাক্রান্ত হইবে না, এবং সকলেরই প্রার্থনালব্ধ, এমন দুঃখবিরোধী সুখবিশেষের নাম স্বর্গ। জগতে ইন্দ্রিয়ের অগোচর (অতীন্দ্রিয়) কোন সুখ নাই, থাকিতেও পারে না। স্বর্গসুখই সুখের সার—পরমোৎকৃষ্ট। তাদৃশ স্বর্গসুখলাভই জীবের চরম লক্ষ্য মোক্ষ নামে পরিচিত। এতদপেক্ষা অধিকতর প্রার্থনীয় বিষয় জগতে নাই, এবং থাকাও সম্ভব নহে। সেই স্বর্গসুখলাভের একমাত্র উপায় হইতেছে—বেদবিহিত কর্ম্ম। "স্বর্গ-

কামোঽশ্বমেধেন যজেত" স্বর্গাভিলাষী লোক অশ্বমেধ যাগ করিবে। এবং "অক্ষয্যং হবৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" অর্থাৎ যে ব্যক্তি চাতুর্মাস্য যাগ করেন, তাহার অক্ষয় পুণ্য (পুণ্যফল—সুখ) হইয়া থাকে, ইত্যাদি বেদ-বচন হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্ম-কর্ম্মই তাদৃশ স্বর্গসুখপ্রাপ্তির এক মাত্র উপায়। সেই উপায়ভূত ধর্ম্মের স্বরূপ ও অনুষ্ঠানাদিক্রম নিরূপণের নিমিত্ত মহামুনি জৈমিনি এই বিশাল মীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন।

[বিষয়]

মহামুনি জৈমিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই আপনার সেই আন্তরিক অভিপ্রায় বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিতেছেন—

"অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" ॥ ১।১।১ ॥

'অথ' অর্থ—অনন্তর। 'অতঃ' অর্থ—এইহেতু। 'ধর্ম্ম' অর্থ—পরে যাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইবে। 'জিজ্ঞাসা' অর্থ—জানিতে ইচ্ছা, অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে বিচার করিতে ইচ্ছা। সম্মিলিত অর্থ এই যে, বেদাধ্যয়নের অনন্তর এইহেতু (যেহেতু বেদে ধর্ম্মের মহিমা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সেই হেতু) ধর্ম্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে, অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার জন্য বিচার করিবে।

অভিপ্রায় এই যে, মানব উপনয়নের পরই বেদাধ্যয়ন করিবে; কারণ, বেদ সেই প্রকারই আদেশ করিয়াছেন (১)।

---

(১) বেদ নিজেই আদেশ করিয়াছেন যে, "তং উপনয়ীত, বেদমধ্যাপয়ীত" অর্থাৎ সেই বালককে উপনীত করিবে, এবং তাহাকে বেদ

বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত ব্যক্তি বেদের সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের মহিমা ও অভীষ্টার্থ-সাধন-যোগ্যতা জানিতে পারে; কাজেই বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি যখন গৃহাশ্রমে প্রবেশ করেন, তখন তাহার হৃদয়ে আপনা হইতেই ধর্ম্মতত্ত্ব—ধর্ম্ম কি, তাহার লক্ষণ বা পরিচয় কিরূপ, কোনগুলি ধর্ম্মের প্রকৃত সাধন, আর কোনগুলি সাধনাভাস (অপ্রকৃত সাধন), এবং কিপ্রকার লোক সেই ধর্ম্মসাধনার অধিকারী, ইত্যাদি বিষয়সমূহ জানিবার জন্য উৎকট আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া থাকে; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা বা তদ্বিষয়ক বিচার তাহার পক্ষে অবশ্য-করণীয় কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হয়। এইজন্য সূত্রকার বেদাধ্যয়নের অনন্তর ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অবশ্যম্ভাবিত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এখন কথা হইতেছে যে, আলোচ্য ধর্ম্মপদার্থ স্বরূপতঃ প্রসিদ্ধ, কি অপ্রসিদ্ধ? যদি প্রসিদ্ধ হয়, তবে ত উহা জ্ঞাতই আছে; তদ্বিষয়ে আর জিজ্ঞাসার আবশ্যকই হয় না; কেন না, বিজ্ঞাত বিষয়ে প্রশ্ন করা ঠিক কাক-দন্ত-পরীক্ষার ন্যায় অসার ও নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, ধর্ম্মতত্ত্ব যদি আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিতান্ত অসৎ বা অপ্রসিদ্ধই হয়, তাহা হইলেও তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা আসিতে পারে না; কারণ, অপ্রসিদ্ধ বা অলীক বিষয়ে উন্মত্ত ভিন্ন কেহ প্রশ্ন করে না এবং করিতেও পারে না। অতএব ধর্ম্মতত্ত্ব প্রসিদ্ধই

অধ্যয়ন করাইবে, এবং "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বেদ অধ্যয়ন করিবে। স্মৃতিশাস্ত্রও বলিয়াছেন—"উপনীয় দদদ্বেদ আচার্য্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" অর্থাৎ উপনয়ন দিয়া যিনি বেদ শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য, ইত্যাদি।

হউক, আর অপ্রসিদ্ধই হউক, কোন মতেই তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইতে পারে না। এতদুত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে, ধর্ম্মতত্ত্ব কখনই আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিতান্ত অলীক বা অপ্রসিদ্ধ নহে; বরং জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। জগতে এমন কোনও দেশ বা জাতি নাই, যাহাদের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা ধারণা না আছে; কাজেই ধর্ম্মকে একান্ত অপ্রসিদ্ধ বলিতে পারা যায় না। তথাপি বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ধর্ম্মপদার্থ নামতঃ সুপ্রসিদ্ধ হইলেও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। জগতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসকল ধর্ম্মের ছবি বিভিন্ন আকারে অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। অতএব সুপ্রসিদ্ধ হইলেও, ধর্ম্মের স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ বিদ্যমান থাকায় সহজেই উহার স্বরূপ-সম্বন্ধে সংশয় সমুপস্থিত হইয়া থাকে। সংশয় থাকিলেই মীমাংসার প্রয়োজন হয়। এই জন্য জৈমিনি মুনি জিজ্ঞাসা-সূত্রের পরই ধর্ম্মের স্বরূপ-নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন, ধর্ম্ম কি? না,—

"চোদনালক্ষণোঽর্থঃ—ধর্ম্মঃ" ॥ ১।১।২ ॥

'চোদনা' অর্থ—ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্য। যেমন 'কর' 'করিবে' ইত্যাদি(১)। 'লক্ষণ' অর্থ—চিহ্ন, জ্ঞাপক বা পরিচায়ক।

---

(১) ক্রিয়া বিষয়ে প্রবৃত্তিবোধক 'কর, করিবে' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায়, 'করিও না, করিতে নাই' ইত্যাদি নিবর্ত্তক বাক্যও 'চোদনা' শব্দে গ্রহণ করিতে হইবে। বিধি ও নিষেধরূপে পরিচিত প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক উভয়-প্রকার বাক্যই সূত্রস্থ 'চোদনা' শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে।

'অর্থ' অর্থ—পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয়। তাদৃশ (ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক) বাক্যদ্বারা যে বিষয়টী বিজ্ঞাপিত হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম।

তাৎপর্য্য এই যে, জগতে যাহা কোন প্রমাণগম্য নহে, তাহার অস্তিত্বও স্বীকারযোগ্য নহে। কোন একটী বিষয় যতক্ষণ কোনও প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ সে বিষয়ের সম্ভাব-সম্বন্ধে কেহই সংশয়শূন্য হইতে পারে না, এবং কেহ তাহা গ্রহণ করিতেও সম্মত হয় না; এই জন্য, কোনও অবিজ্ঞাত বিষয় বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলে, অগ্রেই প্রমাণানুসন্ধান করা আবশ্যক হয়; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্বনিরূপণেও সেরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করা অর্থাৎ ধর্ম্মের অস্তিত্ব ও স্বরূপ-বিজ্ঞানবিষয়ে প্রমাণানুসন্ধান করা অসঙ্গত বা অনুপযোগী নহে।

সূত্রকার জৈমিনির মতে আলোচ্য ধর্ম্মতত্ত্ব একমাত্র শব্দ-প্রমাণগম্য। শব্দাতিরিক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি প্রভৃতি অপর যে সকল প্রমাণ বিভিন্ন দার্শনিকের মতে প্রসিদ্ধ আছে, সে সকল প্রমাণ বিষয়ান্তরে সমর্থ হইলেও ধর্ম্মবিষয়ে প্রমিতি বা যথার্থ জ্ঞান সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না। কারণ, যে সকল উপকরণ বিদ্যমান থাকিলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সমূহ কার্য্যকারী হয়, ধর্ম্মে সে সকল উপকরণের অত্যন্ত অভাব। ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া ধর্ম্ম বস্তুটী প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না; এবং উপযুক্ত হেতু বিদ্যমান না থাকায় অনুমানেরও বিষয় হয় না। অনুমানের অবিষয় বলিয়াই অবশিষ্ট উপমানাদি প্রমাণেরও

বিষয়ীভূত হয় না (১); কিন্তু প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের অবিষয় বলিয়াই যে, উহা অপ্রামাণিক বা অসৎকল্প, একথা বলিতে পারা যায় না। কেন না, শব্দ-প্রমাণ (বেদ) দ্বারা উহার স্বরূপ ও সম্ভাব প্রমাণিত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, অপৌরুষেয় বেদ 'কুর্য্যাৎ' 'কর্ত্তব্যম্' ইত্যাদি প্রকারে যাহার কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়াছেন, এবং যাহার অনুষ্ঠানে কোন প্রকার লৌকিক ফল পরিদৃষ্ট হয় না, তাহাই ধর্ম্ম, আর যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই অধর্ম্ম (২)। ইহাই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সর্ব্বসম্মত সাধারণ লক্ষণ (৩)।

---

(১) অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্যে ধর্ম্মের অস্তিত্বমাত্র সম্ভাবিত হইতে পারে; কিন্তু উহার স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে না। শব্দই উহার স্বরূপ-নিরূপণের একমাত্র প্রমাণ। শব্দই ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া দিতে পারে। গঙ্গাস্নান যে, ধর্ম্মজনক পুণ্য কর্ম্ম, ইহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদি দ্বারা জানিতে পারা যায় না; শব্দ (শাস্ত্র) হইতেই জানিতে পারা যায়। শাস্ত্র বলিয়াছে বলিয়াই জানিতে পারা যায় যে, গঙ্গাস্নানে পুণ্য হয়।

(২) মীমাংসকগণ ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক বিধিবাক্য বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—

"কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্।
এতৎ স্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্ ॥"

অর্থাৎ বিধিবাক্য চিনিবার উপায় এই পাঁচটী—কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত, কর্ত্তব্যং, ভবেৎ ও স্যাৎ। ইহা ছাড়াও বিধির পরিচায়ক অনেক বাক্য আছে।

(৩) ভাগবত বলিয়াছেন—"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।" ইত্যাদি। বেদে বৃষ্টির জন্য 'কারীর' যাগের এবং পুত্রপ্রাপ্তির জন্য 'পুত্রেষ্টি' নামক যাগের বিধান দৃষ্ট হয় সত্য, বস্তুতঃ লৌকিক ফলসাধক সেই সকল কার্য্য ফল-লাভের উপায়মাত্র, প্রকৃত ধর্ম্ম-পদবাচ্য নহে। শব্দের নিত্যতা ও বেদের অপৌরুষেয়তাবিষয়ে বক্তব্য সমস্ত কথা প্রথম খণ্ডে উক্ত হইয়াছে।

সূত্রকারও এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—"চোদনা-লক্ষণঃ অর্থঃ—ধর্ম্মঃ" অর্থাৎ নিয়োগবোধক 'কুরু' 'কুর্য্যাৎ' ইত্যাদি প্রবর্ত্তক বাক্যদ্বারাই ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে ঐ প্রকার বেদবাক্য বিদ্যমান আছে, তাহাই 'ধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণীয়। ঐজাতীয় বেদবাক্য ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। বেদশব্দই এবিষয়ে নিরঙ্কুশ প্রমাণ।

[বিধি ও তাহার বিভাগ।]

ক্রিয়াবিষয়ে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবোধক বাক্যকে বিধি বলে। প্রবর্ত্তক বাক্য যেরূপ লোককে হিতসাধনে প্রবর্ত্তিত করে, নিবর্ত্তক বাক্যও সেইরূপই লোককে অনিষ্টসাধন ক্রিয়াপথ হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া থাকে, এইজন্য নিষেধক বাক্যগুলিও 'নিষেধ-বিধি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ফল কথা, আরোগ্যকামী ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ পথ্য-সেবন ও অপথ্য-বর্জ্জন উভয়ই আবশ্যক, সেইরূপ শ্রেয়স্কামী পুরুষের পক্ষেও সৎকার্য্য গ্রহণ ও অসৎ কার্য্য পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক। আবশ্যক বলিয়াই বেদশাস্ত্র পুরুষের হিতসাধন ও অহিত পরিবর্জ্জনের জন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই উপদেশ করিয়াছেন। এবংবিধ উপদেশেই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও সার্থকতা, তদতিরিক্ত অন্যান্য বিষয়ের উপদেশ-সকল উহারই আনুষঙ্গিক—প্রসঙ্গাগতমাত্র; সুতরাং সে সকল উপদেশক বাক্যের সার্থকতা ও সফলতা সম্পূর্ণরূপে বিধিবাক্যের সহিত

একবাক্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এখন বিধি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

বেদের ব্রাহ্মণভাগ সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—বিধি, অর্থবাদ ও তদুভয়বিলক্ষণ। তন্মধ্যে বিধির স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাইয়া আচার্য্যগণ বিভিন্নপ্রকার মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন। বার্ত্তিককার মহামতি কুমারিল ভট্টের মতানুযায়ীরা বলেন—বিধি অর্থ শাব্দী ভাবনা—শব্দনিষ্ঠ একপ্রকার শক্তি; যাহার প্রেরণাবশে মানবগণ অদৃষ্টোৎপাদক ধর্ম্ম-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাদৃশ ব্যাপারবিশেষ। প্রভাকরের মতানুযায়ী আর এক শ্রেণীর মীমাংসকগণ বলেন—'কুরু' (কর) ইত্যাদিপ্রকার নিয়োগই যথার্থ বিধি। তার্কিকগণ আবার এ কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া বলেন যে, বিধি অর্থ—ইষ্টসাধনতা। "অশ্বমেধেন যজেত" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকে বুঝিয়া থাকে যে, এই অশ্বমেধ যজ্ঞ আমার অভীষ্ট স্বর্গ-সুখপ্রাপ্তির সাধন বা উপায়। এইরূপ জ্ঞান হয় বলিয়াই লোকে ঐ অশ্বমেধ যাগে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যে কার্য্যে ঐ প্রকার ইষ্টসাধনতা-বোধ না হয়, সে কার্য্যে কেহই প্রবৃত্ত হয় না ইত্যাদি। যাহা হউক, বিধি সম্বন্ধে এবংবিধ আরও যথেষ্ট বিপ্রতিপত্তি বিদ্যমান আছে সত্য, কিন্তু—"অজ্ঞাত-জ্ঞাপকো বিধিঃ" এ সিদ্ধান্তে কাহারো আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিধির স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও উহার বিভাগ বিষয়ে মতভেদ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকলের মতেই বিধি

সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত—এক উৎপত্তিবিধি, দ্বিতীয় অধিকারবিধি, তৃতীয় বিনিয়োগবিধি, চতুর্থ প্রয়োগবিধি (১)। তন্মধ্যে যে বিধি কেবলই কর্ম্ম ও কর্ম্মাঙ্গ দেবতার স্বরূপমাত্র প্রতিপাদন করে, তাহার নাম উৎপত্তিবিধি। যেমন "আগ্নেয়ঃ অষ্টাকপালো ভবতি।" এবাক্যে 'আগ্নেয়' (অগ্নিদৈবতক) যাগের স্বরূপটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং ইহা উৎপত্তিবিধিরূপে পরিগণিত হইল। আর যে বিধি কেবল ইষ্টসিদ্ধির উপায়ভূত (করণ) যাগাদি কর্ম্মের ইতিকর্ত্তব্যতা (পূর্ব্বাপর করণীয় ব্যাপার সমূহ) ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মফল প্রাপ্তির সাধক অধিকার সম্বন্ধ প্রতিপাদন করে, সেই বিধিকে অধিকারবিধি বলে। যেমন—"দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত", অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ 'দর্শপূর্ণমাস' নামক যাগ করিবে। এখানে কেবল যাগেরই কথা বলা হয় নাই, পরন্তু দর্শে (অমাবস্যায়) ও পূর্ণিমায় করণীয় ইতিকর্ত্তব্যতার কথা বলা হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে যাগ-লভ্য স্বর্গফলেরও কথা বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা জ্ঞাপন করা হইল যে, যে লোক স্বর্গলাভে ইচ্ছুক, সেই লোকই উক্ত 'দর্শ-পূর্ণমাস' যাগের অধিকারী। এইরূপে কর্ম্মাধিকার প্রতিপাদন করে বলিয়া উল্লিখিত বিধিকে 'অধিকারবিধি' বলা হয়। যজ্ঞাদি কার্য্যে যেমন অধিকারি-বিজ্ঞান আবশ্যক, তেমনই যজ্ঞাঙ্গ উপচার-

---

(১) নিয়মবিধি, অপূর্ব্ববিধি ও পরিসংখ্যাবিধি প্রভৃতি বিধিভেদগুলিও উক্ত বিভাগেরই অন্তর্গত; সুতরাং সেগুলির পৃথক্ গণনা অনাবশ্যক। পরে আমরা এবিষয়ের আলোচনা করিব।

দ্রব্যাদির সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও নিতান্ত আবশ্যক। কোন্ যজ্ঞে কোন্ দ্রব্যদ্বারা কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে কি প্রকারে আহুতি প্রদান করিতে হয়, তাহা জানা না থাকিলে যজ্ঞ-সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় না; এইজন্য বিনিয়োগবিধিরও আবশ্যক হয়। যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্যাদি-প্রতিপাদক বিধির নাম বিনিয়োগবিধি। যেমন, "ব্রীহিভির্যজেত্", ব্রীহি (হৈমন্তিক ধান্য) দ্বারা যাগ করিবে। এবং "সমিধো যজতি" অর্থাৎ—দর্শ-পূর্ণমাসযাগের অঙ্গস্বরূপ 'সমিধ্' নামক যাগ করিবে ইত্যাদি। ইহার পরেও, যাগাদির অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও পারম্পর্য্যাদিক্রম প্রভৃতি জানিবার আবশ্যক হয়, যতক্ষণ এ সমস্ত বিষয় জানিতে পারা না যায়, ততক্ষণ কোন কর্ম্মই যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, এই কারণে 'প্রয়োগবিধি'র নিরূপণ করা আবশ্যক হয়। প্রয়োগবিধি কিরূপ? যে বিধিদ্বারা অঙ্গাঙ্গিভাবাপন্ন কর্ম্ম ও তদুপযোগী দ্রব্যাদির পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে প্রয়োগ-পদ্ধতি প্রতিপাদিত হয়, সেই বিধির নাম প্রয়োগবিধি। যেমন—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি, যবাগূং পচতি" অর্থাৎ অগ্রে যবাগূ (যাউ) পাক করিবে, পশ্চাৎ অগ্নিহোত্র হোম করিবে। এখানে পূর্ব্বপশ্চাৎ-কর্ত্তব্য যবাগূপাক ও অগ্নিহোত্র-হোম, উভয়ই তুল্যরূপে বিহিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা প্রয়োগ-বিধির উদাহরণস্থল (১)।

---

(১) এই বিধি সম্বন্ধে মীমাংসক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন—স্বয়ং শ্রুতিই যাগাদির প্রয়োগ-ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং উহা শ্রৌত, আবার অন্য সম্প্রদায় বলেন—না—যাগাদির প্রয়োগ-

[নিয়ম ও পরিসংখ্যা বিধি।]

বিধির আরও দুইটী প্রকারভেদ আছে। একটীর নাম নিয়মবিধি, অপরটীর নাম পরিসংখ্যাবিধি। বস্তুতঃ এ দুইটীর স্বতন্ত্রতা না থাকিলেও সর্ব্বত্র পৃথক্ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়; সুতরাং তদুভয়েরও স্বরূপ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। যেখানে কর্ত্তার স্বাভাবিক অনুরাগবশে প্রবৃত্তির সম্ভাবনা আছে; অথচ সে কার্য্য করা বা না করা তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, সেখানে প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা অর্থাৎ কার্য্যবিশেষের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা জ্ঞাপন করাই নিয়মবিধির বিষয়;—"নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।" যেমন, "ঋতৌ ভার্য্যাম্ উপেয়াৎ।" ঋতুকালে ভার্য্যাতে উপগত হইবে। এস্থলে দেখিতে হইবে যে, মানুষ স্বাভাবিক অনুরাগের বশে স্বতই ভার্য্যাতে উপগত হইয়া থাকে, তাহার জন্য আর শাস্ত্রোপদেশ আবশ্যক হয় না; কিন্তু ঋতুকালে উপগত হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণরূপে তাহার ইচ্ছাধীন—সে ইচ্ছা করিলে উপগত হইতেও পারে, না হইতেও পারে; এইরূপ পাক্ষিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা স্থলে শাস্ত্রবিধির দ্বারা ঐ প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া দিলেন—'উপেয়াদেব' ঋতুকালে অবশ্যই উপগত হইবে। আর একটী উদাহরণ এই যে, "শ্রাদ্ধশেষং ভুঞ্জীত" অর্থাৎ

ব্যবস্থা সাক্ষাৎ শ্রুতিবিহিত নহে, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে বিধি-শ্রুতি কল্পনা করিয়া লইতে হয়; সুতরাং উহা কল্প্য অর্থাৎ কল্পনা করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু উহা স্থলবিশেষে শ্রৌতও হইতে পারে, আবার স্থলবিশেষে স্মার্ত্তও হইতে পারে।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের অবশিষ্ট অংশ ভোজন করিবে। এস্থলেও বুঝিতে হইবে যে, লোকের ভোজনে প্রবৃত্তি স্বাভাবিক অনুরাগসিদ্ধ, তজ্জন্য শাস্ত্রোপদেশ অনাবশ্যক। কিন্তু শ্রাদ্ধশেষ-ভোজনে লোকের প্রবৃত্তি হইতেও পারে, পক্ষান্তরে না হইতেও পারে, কারণ, প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি, উভয়ই ইচ্ছাধীন। এমত অবস্থায় বিধিশাস্ত্র লোক-প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—"ভুঞ্জীতৈব" শ্রাদ্ধশেষ অবশ্যই ভোজন করিবে। এই-জাতীয় স্থানগুলি নিয়মবিধির বিষয়। পরিসংখ্যার স্বরূপ ও প্রয়োজন ইহা হইতে অন্য প্রকার। যে বিষয়ে লোকের স্বাভাবিক অনুরাগ আছে, এবং অনুরাগবশে উচ্ছৃঙ্খলভাবে যথেচ্ছ প্রবৃত্তির সম্ভাবনাও রহিয়াছে, সে বিষয়ে যথেচ্ছ প্রবৃত্তির সংকোচ সাধন করাই পরিসংখ্যার প্রয়োজন। যেমন—"পঞ্চ পঞ্চনখান্ ভুঞ্জীত" অর্থাৎ পঞ্চনখবিশিষ্ট পাঁচটীমাত্র প্রাণীকে ভোজন করিবে। ভোজন বিষয়ে লোকের অনুরাগ স্বভাবসিদ্ধ। সেই অনুরাগের বশে যে কোন প্রাণীর মাংস-ভক্ষণে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারিত—পঞ্চনখবিশিষ্ট এবং তদ্ভিন্ন প্রাণীরও মাংস-ভক্ষণে প্রবৃত্তির সম্ভাবনা ছিল, সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির সংকোচ সাধনের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র আদেশ করিলেন—"পঞ্চ পঞ্চনখান্ ভুঞ্জীত" অর্থাৎ যদি মাংস ভক্ষণ করিতেই হয়, তবে পঞ্চনখবিশিষ্ট পাঁচটীমাত্র প্রাণীর মাংসই ভক্ষণ করিবে; অন্য প্রাণীর নহে। আর একটী উদাহরণ এই—"প্রোক্ষিতং ভুঞ্জীত" প্রোক্ষিত অর্থাৎ মন্ত্রসংস্কৃত মাংস ভক্ষণ করিবে। এস্থলেও প্রোক্ষিত ও অপ্রোক্ষিত উভয়বিধ

মাংস-ভক্ষণেরই সম্ভাবনা ছিল, তন্মধ্যে অপ্রোক্ষিত মাংস-ভক্ষণের নিবৃত্তিব্যপদেশে শাস্ত্র বলিলেন যে, যদি মাংস-ভক্ষণ কর, তবে প্রোক্ষিত মাংসই ভক্ষণ করিবে, অপ্রোক্ষিত ভক্ষণ করিবে না। উক্ত উভয় উদাহরণেই ভক্ষণের অনুজ্ঞায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, পরন্তু তদ্ভিন্ন ভক্ষণের নিবৃত্তিতে তাৎপর্য্য।

এখানে বলা আবশ্যক যে, নিয়ম ও পরিসংখ্যা, ইহার কোনটাই যথার্থ বিধি নহে। কারণ, অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাপিত করাই বিধির মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু নিয়ম বা পরিসংখ্যা কখনও অবিজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাপিত করে না, পরন্তু লোকে যাহা জানে, এবং আন্তরিক অনুরাগের প্রেরণাবশে যাহা করে বা করিতে পারে, তাদৃশ বিষয়েই উহারা অনিয়মিত প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করে, এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে সংকোচিত করে মাত্র; কাজেই নিয়ম ও পরিসংখ্যা, কোনটাই বিধিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। তথাপি, প্রবৃত্তির পরিপন্থী নিবর্ত্তক বাক্য যেভাবে নিষেধ-বিধি নামে পরিচিত হয়, প্রবৃত্তির নিয়ামক ও সংকোচ-সাধক বাক্যগুলিও সেই ভাবেই নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে (১)।

---

(১) মীমাংসকগণ বলেন—

"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥"

অর্থাৎ অন্য কোন প্রমাণে অপ্রাপ্ত বিষয়ে (অজ্ঞাতজ্ঞাপক) হয়—বিধি। পাক্ষিক প্রাপ্ত বিষয়ে হয় নিয়ম। অভিপ্রেত বিষয়ে এবং তদ্ভিন্ন বিষয়েও প্রাপ্তির সম্ভাবনাস্থলে হয় পরিসংখ্যা।

ইহা ছাড়া আরও কয়েক প্রকার বিধির বিভাগ আছে—যেমন, অঙ্গবিধি, গুণবিধি ও বিশিষ্টবিধি প্রভৃতি। তন্মধ্যে, যাহা দ্বারা কোন একটী প্রধান কর্ম্মের উপকারার্থ অঙ্গবিশেষের বিধান করা হয়, তাহার নাম অঙ্গবিধি। যেমন দর্শ-পূর্ণমাসযাগে সমিধাদি যাগের বিধি—"সমিধো যজতি" ইত্যাদি। অঙ্গ সাধারণতঃ দুই প্রকার। এক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রধানের উপকারক বা স্বরূপনির্ব্বাহক, অপর পরম্পরাসম্বন্ধে প্রধানের উপকারক। যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব। অশ্বটী অঙ্গ হইলেও, যজ্ঞের স্বরূপ-নির্ব্বাহক; কারণ, অশ্বের অভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। আর যজ্ঞে ব্রীহিপ্রোক্ষণাদি কার্য্যগুলি যজ্ঞের অঙ্গ হইলেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যজ্ঞোপকারক নহে, পরন্তু যজ্ঞজনিত প্রধান অপূর্ব্বের সঙ্গে মিলিত হইয়া যজ্ঞফলের উৎকর্ষ সম্পাদক হয় মাত্র।

যেখানে যজ্ঞের উপকরণরূপে বিহিত বস্তুতে কোন প্রকার গুণবিশেষের মাত্র বিধান করা হয়, সেখানে হয় গুণবিধি। যেমন যজ্ঞে আহুতি প্রদানের জন্য একপ্রকার পাত্র বিহিত আছে। তাহার নাম 'জুহু'। জুহু পাত্রটী সাধারণতঃ কাষ্ঠময়ই হইয়া থাকে, সেস্থলে গুণবিধি হইল—"যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি, ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি" অর্থাৎ যে যজমানের সেই হোমপাত্র জুহূটী পত্রনির্ম্মিত হয়, সে কখনও পাপ কথা শ্রবণ করে না। এস্থলে জুহূর পর্ণময়ত্ব গুণ বিহিত হওয়ায় ইহা 'গুণবিধি' নামে অভিহিত হইল।

যেখানে যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্যাদি-সহকারে যজ্ঞের বিধান করা হয়, সেখানকার বিধিকে 'বিশিষ্ট বিধি' বলা হয়। যেমন "সোমেন যজেত স্বর্গকামঃ" অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ সোমযাগ করিবেন। এস্থলে যেমন যজ্ঞের বিধান হইল, সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞোপকরণ সোমেরও বিধান করা হইল। এইজাতীয় অঙ্গসহকৃত বিধিকে বিশিষ্ট বিধি কহে।

[অঙ্গ ও প্রধান কর্ম্ম।]

বিধিবোধিত কর্ম্ম প্রধানতঃ দ্বিবিধ—প্রধান কর্ম্ম ও অঙ্গ কর্ম্ম। যাহা অন্যের প্রকরণে পঠিত নহে, এবং যাহার অনুষ্ঠানে ফলবিশেষ অভিহিত আছে, তাহা প্রধান কর্ম্ম। আর যাহা অন্যের প্রকরণে পঠিত, এবং যাহার অনুষ্ঠানে স্বতন্ত্রভাবে কোনরূপ ফলবিশেষের উল্লেখ নাই, তাহা অঙ্গ কর্ম্ম—"ফলবৎ-সন্নিধাবফলং তদঙ্গম্।" [৪।৪।১৯] ফলবিশিষ্ট কর্ম্মবিধির সন্নিধানে পঠিত ফল-রহিত কর্ম্ম সাধারণতঃ সেই সন্নিহিত সফল কর্ম্মেরই অঙ্গরূপে পরিগণিত। যেমন, 'দর্শ-পূর্ণমাস' নামে একটী যাগ বিহিত আছে, সেই প্রকরণে, সমিধাদি যাগও বিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দর্শ-পূর্ণমাস যাগটী অন্যের প্রকরণে পঠিত নহে, স্বপ্রকরণস্থ, এবং উহার অনুষ্ঠানে স্বর্গ ফলেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু সমিধাদি যাগগুলি প্রথমতঃ স্বপ্রকরণস্থ নহে—দর্শ-পূর্ণমাস যাগের প্রকরণস্থিত, অধিকন্তু উহাদের অনুষ্ঠানে কোনপ্রকার ফলশ্রুতিও উপস্থিত নাই; সুতরাং ঐ যাগগুলি সন্নিহিত দর্শ-পূর্ণমাস যাগেরই অঙ্গ, কিন্তু স্বপ্রধান কর্ম্মান্তর নহে।

[উৎপত্তিবিধির প্রভেদ।]

পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তিবিধি সম্বন্ধে আর একটা বক্তব্য বিষয় এই যে, প্রমাণান্তরে বা প্রকারান্তরে অপ্রাপ্ত বা অবিজ্ঞাত বিষয়কে বিজ্ঞাপিত করাই সাধারণতঃ উৎপত্তিবিধির স্বভাব বা কার্য্য। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" এইরূপ বিধি না থাকিলে কেহ জানিত না যে, 'অগ্নিহোত্র' হোমদ্বারা স্বর্গলাভ করিতে পারা যায়। উল্লিখিত বিধি হইতেই লোকে অগ্নিহোত্র কর্ম্ম ও তাহার স্বর্গ-সাধনতা জানিতে পারে; সুতরাং উক্ত বিধিটী কর্ম্মমাত্র-বিধায়ক উৎপত্তিবিধিরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু যেখানে প্রকারান্তরপ্রাপ্ত কর্ম্ম সম্বন্ধেও কোনরূপ বিধি দৃষ্ট হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে, ঐ বিধিটী কর্ম্মের স্বরূপ জ্ঞাপন করিতেছে না, কিন্তু ঐ কর্ম্ম সম্বন্ধে কোনপ্রকার গুণের (কর্ম্মোপযোগী দ্রব্যাদির) বিধানমাত্র করিতেছে, (কারণ, ঐ কর্ম্ম প্রকারান্তরেই প্রাপ্ত আছে)। যেমন অগ্নিহোত্রনামক যাগের প্রকরণে—"দধ্না জুহুয়াৎ" স্থলে হোমের বিধি। অগ্নিহোত্র যাগেই হোমের বিধি পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং এখানে তাহার উপদেশ অজ্ঞাত-জ্ঞাপক—বিধি হইতে পারে না; কাজেই পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত কেবল দধিরূপ গুণমাত্রের বিধান করা হইয়াছে। এইজাতীয় বিধিকে গুণবিধি বলা হয়, আর যেখানে কর্ম্ম ও তাহার গুণ—উভয়ই অপ্রাপ্ত থাকে, সেখানকার বিধি, কর্ম্ম ও গুণ—উভয়ই প্রতিপাদন করে বলিয়া বিশিষ্টবিধি নামে কথিত হয়। যেমন, "সোমেন যজেত"। এস্থলে যাগও অপ্রাপ্ত, এবং তদুপকরণ সোম দ্রব্যও অপ্রাপ্ত;

এইজন্য উক্ত বিধি সোমবিশিষ্ট যাগের বিধান করিতেছে, বুঝিতে হইবে। ফলিতার্থ এই যে, অবিজ্ঞাত কর্ম্মমাত্রের প্রতিপাদক হইবে সামান্যতঃ 'উৎপত্তিবিধি,' আর বিজ্ঞাত কর্ম্মের গুণমাত্র-বোধক হইবে 'গুণবিধি', এবং গুণ ও কর্ম্ম উভয়ই অবিজ্ঞাত থাকিলে, তদুভয়ের প্রতিপাদক বিধি হইবে বিশিষ্টবিধি। এ নিয়ম বিধিকাণ্ডের সর্ব্বত্র আদৃত ও অনুসৃত হইয়া থাকে।

লোক-ব্যবহারে যেরূপ একজন আর একজনকে আদেশাদি দ্বারা বিভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়, এবং আদেশবাক্য শ্রবণের পর শ্রোতাও বুঝিতে পারে যে, এ ব্যক্তি আমাকে অমুক কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছে। অপৌরুষেয় বেদে যদিও সেরূপ আদেশ-কারী কোন লোক নাই সত্য, তথাপি আদেশকের অভাব ঘটে নাই, 'লিঙ্' প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয়গুলিই সে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। ঐ সকল বিধিপ্রত্যয়ই লোকদিগকে হিতাহিত প্রাপ্তি-পরিহারের জন্য আদেশ করিয়া থাকে। লোক সকলও ঐরূপ বিধিশ্রবণে বুঝিয়া থাকে যে, বেদ আমাদিগকে স্বর্গাদিফলোৎপাদনার্থ অমুক কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছেন। এই যে, নিয়োজন-ব্যাপার, ইহাকেই মীমাংসাশাস্ত্রে 'ভাবনা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহারও আবার 'শাব্দী' ও 'আর্থী' ভেদে দুইটী বিভাগ আছে। তাহার ব্যাখ্যা পরে বলিব। সহজ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে 'ভাবনা' অর্থ—উৎপাদনা। এই উৎপাদনার কথা শ্রবণ-মাত্রেই শ্রোতার তিনটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়—"কিম্? কেন? ও কথম্?" অর্থাৎ কি ভাবনা করিতে হইবে? কিসের

দ্বারা ভাবনা করিতে হইবে? এবং কি প্রকারে করিতে হইবে? এইরূপে সাধ্য, সাধন ও তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে (পূর্ব্বাপর করণীয় অনুষ্ঠান প্রণালী সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। সেই জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্য বিধির সঙ্গে ঐ তিনটী বিষয়ও উপদিষ্ট হয়। যেমন "স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত।" এস্থলে স্বর্গ হইতেছে—সাধ্য (কিম্), অশ্বমেধ যাগ হইতেছে তাহার সাধন বা উপায় (কেন), আর ঐ প্রকরণে অভিহিত কর্ত্তব্য-প্রণালী হইতেছে ইতিকর্ত্তব্যতা (কথম্)। বিধির প্রশংসাপর অর্থবাদ বাক্য হইতেও অনেক স্থলে 'ইতিকর্ত্তব্যতা' অবগত হওয়া যায়।

এস্থলে আর একটী বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, যেখানে 'ভাবনা'র বিষয়ীভূত সাধ্য বিষয়ের (ফলের) স্পষ্ট উল্লেখ না থাকে, সেখানে সাধারণতঃ—

"স স্বর্গঃ স্যাৎ, সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষাৎ।" ৪।৩।১৫।

এই সূত্রানুসারে স্বর্গকেই সাধ্য ফলরূপে গ্রহণ করিতে হয়। কেন না, ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে স্বর্গসুখ সকলেরই প্রিয়। এইরূপে সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতা পরিজ্ঞানের পর অধিকারী পুরুষ বিধিনির্দ্দিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

[মন্ত্র]

বেদবিহিত যাগাদি কর্ম্মের স্বরূপ দ্বিবিধ—দ্রব্য ও দেবতা। এই দ্রব্য ও দেবতা লইয়াই যাগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত উভয় অংশের মধ্যে দ্রব্যরাশি হয় যাগনির্ব্বাহক সাধন, আর দেবতা হয় তাহার উদ্দেশ্য। কর্ম্মোপযুক্ত মন্ত্রসমূহ সেই যাগ-

সম্পর্কিত দ্রব্যাদি-বিষয়কে স্মরণ করাইয়া দেয়। অভিপ্রায় এই যে, যে দেবতার উদ্দেশ্যে যে দ্রব্য যেভাবে সমর্পণ করিতে হইবে, মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল বিষয় সহজেই ঋত্বিকের হৃদয়ে জাগরিত (স্মরণের বিষয়) হয়। "মন্ত্রৈরেব হি স্মর্ত্তব্যম্" এই আদেশানুসারে মন্ত্রভিন্ন অন্য উপায়ে সে সকল বিষয়ের স্মরণ করা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং যাগোপযোগী দ্রব্যাদি-স্মরণের জন্য মন্ত্রেরই সাহায্য লইতে হয়; এইজন্যই মন্ত্রসমূহকে স্মারক বলা হইয়া থাকে। মীমাংসকমতে এই স্মৃতিসম্পাদকরূপেই মন্ত্রসমূহ কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ; এবং কর্ম্ম-সম্বন্ধ বলিয়াই উহারাও কোনরূপে নিজের সার্থকতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সূত্রকার বলিয়াছেন—

"তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ ॥ ১।২।২৫ ॥

অর্থাৎ অক্রিয়াপর সিদ্ধার্থ-বোধক বাক্যসমূহও ক্রিয়াবিধায়ক বাক্যের সহিত মিলিত হইয়া সার্থকতা লাভ করে; নচেৎ সমস্ত মন্ত্রই অনর্থক ও অপ্রমাণরূপে উপেক্ষণীয় হইতে পারে।

প্রকৃত পক্ষে মন্ত্রের স্বরূপ ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কাহারো মতে মন্ত্র সকল দৃষ্টার্থক—কর্ত্তব্য কর্ম্মোপযোগী পদার্থরাশি স্মরণ করাইয়া দেওয়াই উহাদের কার্য্য বা উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন অদৃষ্ট সমুৎপাদন বা অলৌকিক ফল-সম্পাদন করা উহাদের উদ্দেশ্য নহে। এইমতে অশরীর দেবতার মন্ত্রময়ত্ব কথা সঙ্গত হয় না। কেন না, মন্ত্র ও দেবতা এক হইলে—মন্ত্র-সমূহ দ্বারা যজ্ঞীয় দেবতার স্মরণ করা কখনই সম্ভবপর হইতে

পারে না, অধিকন্তু বেদোক্ত মন্ত্রগুলি কেবলই স্মরণকার্য্যে পর্য্যবসিত হইলে অলৌকিক মন্ত্রশক্তি স্বীকার করিবার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন বা অবসর থাকে না। পক্ষান্তরে, যাহারা মন্ত্রের চেতনাশক্তি ও অলৌলিকার্থ সাধনসামর্থ্য স্বীকার করেন, তাহাদের মতে মন্ত্রের মহিমা এবং 'মন্ত্রেরেব স্মর্ত্তব্যম্' এ কথারও সার্থকতা রক্ষিত হইতে পারে, এবং পূর্ব্বপ্রদর্শিত আপত্তিও খণ্ডিত হইতে পারে। এ বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসার ভার সহৃদয় পাঠকবর্গের উপরই ন্যস্ত রহিল। অতঃপর অর্থবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

[অর্থবাদ]

আমরা বিধির কথা বলিতে বলিতে প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রের সম্বন্ধেও কয়েকটী কথা বলিলাম। পূর্ব্বনির্দ্দেশক্রমে এখন অর্থবাদের কথা বলা আবশ্যক; অতএব তাহাই বলা হইতেছে। অর্থবাদ কি?—

প্রাশস্ত্য-নিন্দান্ততরপরবাক্যম্ অর্থবাদঃ॥" (অর্থসংগ্রহ ৬৫)।

প্রশংসা ও নিন্দা, এতদন্যতর-বোধনে তাৎপর্য্যবিশিষ্ট বাক্যের নাম—'অর্থবাদ'। বিধিস্থলে বিধেয় বিষয়ের প্রশংসা দ্বারা, আর নিষেধের স্থলে নিষেধ্য বিষয়ের নিন্দা দ্বারা যে বাক্য সার্থকতা লাভ করে, যথাশ্রুত বাক্যার্থে তাৎপর্য্য পোষণ করে না, সেই সকল বাক্যই অর্থবাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ক্রিয়াপ্রতিপাদনেই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য, তদ্বিপরীত বাক্যমাত্রই নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক; সুতরাং অপ্রমাণ। তদনুসারে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির অনুপদেশক "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদি, এবং "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদি বাক্যগুলি

নিরর্থক—অপ্রমাণরূপে উপেক্ষিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় স্বয়ং সূত্রকার বলিয়াছেন—ঐ সকল বাক্য সাক্ষাৎ ক্রিয়া-প্রতিপাদক না হইলেও নিরর্থক নহে; পরন্তু—

"বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ ॥" (১।২।৭)

বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়া অর্থাৎ বিধিবোধিত কর্ম্মের সহিত কোনরূপ তাৎপর্য্য-সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া বিধিরই স্তাবকরূপে সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। এখানে স্তুতি অর্থে প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, লোকদিগকে শুভ-কার্য্যে প্রবৃত্ত ও অশুভ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই বেদশাস্ত্র বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু ঐ বিধি ও নিষেধের এতটা প্রভাব নাই যে, রাজাজ্ঞার ন্যায় বলপূর্ব্বক লোকদিগকে নিজের আদেশপালনে বাধ্য করিতে পারে। এজন্য বিধিশক্তি পদে পদে প্রতিহত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। সেই অবসাদ অপনয়নপূর্ব্বক বিধিশক্তির বল-বৃদ্ধির জন্য 'অর্থবাদ' বাক্যের আবশ্যক হয়। অর্থবাদ বাক্যগুলি বিধেয় কর্ম্মের প্রশংসা বা উৎকর্ষ কীর্ত্তন দ্বারা বিধির, আর নিষিদ্ধ কর্ম্মের নিন্দা দ্বারা নিষেধের শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া তদ্বিষয়ে লোকদিগের শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা সমুৎপাদন করে; এইজন্য 'অর্থবাদ' বাক্যকে বিধি-নিষেধের সমানার্থক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। উক্ত 'অর্থবাদ' বাক্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। তন্মধ্যে—

"বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাবর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ ॥"

যেখানে প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ কথা উক্ত হয়, সেখানে হয় 'গুণবাদ।' যেমন "আদিত্যো যূপঃ।" (যূপকাষ্ঠটা আদিত্য।) যূপকাষ্ঠকে যে, আদিত্য বলা হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ; সুতরাং যূপ স্বরূপতঃ আদিত্য না হইলেও, উহাকে আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল—প্রকাশসম্পন্ন বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে, এইরূপে যূপের গুণোৎকর্ষ কথিত হইয়াছে। প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়ের প্রতিপাদক অর্থবাদ বাক্যকে বলা হয় 'অনুবাদ।' যেমন—"অগ্নিঃ হিমস্য ভেষজম্" (অগ্নি হইতেছে হিমের ঔষধ)। অগ্নি যে হিমের নিবারক (ঔষধ), তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; কাজেই তদ্বোধক উক্ত বাক্যকে অনুবাদ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। আর যে বাক্যে, প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধ নহে এবং প্রমাণান্তর-সিদ্ধও নহে, এমন বিষয় প্রতিপাদিত হয়, সেই বাক্য হয়—ভূতার্থবাদ। যেমন—"ইন্দ্রঃ বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ" (ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উদ্দেশ্যে বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন)। এ কথা কোন প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, অথবা প্রমাণান্তরসিদ্ধ কথার পুনরাবৃত্তিও নহে; সুতরাং ইহা 'ভূতার্থবাদ' নামে পরিগণনীয়।

মীমাংসা-পরিভাষার মতে অর্থবাদের বিভাগ অন্যপ্রকার। সে মতে অর্থবাদ চারিভাগে বিভক্ত—নিন্দা, প্রশংসা, পরকৃতি ও পুরাকল্প। তন্মধ্যে "অশ্রুজং হি রজতং যো বর্হিষি দদাতি পুরাস্য সংবৎসরাদ্ রুদন্তি," অর্থাৎ অগ্নির অশ্রুজাত রজতকে যিনি অগ্নির উদ্দেশ্যে দান করেন, সংবৎসরের মধ্যে তাহার গৃহে রোদন উপস্থিত হয়। ইহা "বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্" এই রজতদান নিষেধের

নিন্দার্থবাদ। "শোভতে হাস্য মুখং, য এবং বেদ" যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহার মুখ সুশোভিত হয়। ইহা প্রশংসার্থবাদ। কর্ম্মে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে যেখানে কর্ম্মটীকে কোন মহাত্মার অনুষ্ঠিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়, সেই অর্থবাদ পরকৃতি নামে অভিহিত হয়। যেমন "অগ্নির্বৈ অকাময়ত।" অগ্নি কামনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এই যাগটী অগ্নিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; সুতরাং এই যাগ খুব প্রশস্ত। আর যে অর্থবাদে কেবল অপর বক্তার উপদিষ্ট কার্য্যাদি মাত্র প্রতিপাদিত হয়, তাহার নাম 'পুরাকল্প'। যেমন "তমশপৎ ধিয়া ধিয়া" তাহাকে মনে মনে অভিসম্পাৎ করিয়াছিল। এখানকার অর্থবাদে অপর বক্তার অভিসম্পাতের কথামাত্র বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা 'পুরাকল্প' মধ্যে গণনীয়।

ন্যায়প্রকাশকার আপোদেব কিন্তু এরূপ বিভাগে পরিতুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি অর্থবাদের সহজতঃ দুই প্রকার বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, এক বিধিশেষ, অপর নিষেধশেষ। যেখানে বিধেয় বিষয়ের প্রশংসার জন্য অর্থবাদ কল্পিত হয়, সেখানকার অর্থ-বাদকে বলে বিধিশেষ; যেমন "বায়ব্যং শ্বেতং (ছাগলং) আলভেত" এই বিধির বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া বায়ুদেবের প্রশংসাপর "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদি বাক্য হইতেছে 'বিধিশেষ' নামক অর্থবাদ। আর নিষেধকে লক্ষ্য করিয়া নিষেধের নিন্দাপ্রকাশক বাক্যকে বলে 'নিষেধশেষ'। যেমন—"বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্" এই নিষেধের দ্বারা যজ্ঞে প্রতিষিদ্ধ অগ্নি দক্ষিণার নিন্দার্থ কল্পিত

"সোঽরোদীৎ" ইত্যাদি বাক্য হইতেছে 'নিষেধশেষ' অর্থবাদ। অন্যান্য সম্প্রদায়ের পরিকল্পিত অপরাপর অর্থবাদগুলিকে উক্ত দ্বিবিধ অর্থবাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে।

[বেদান্ত]

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, বেদের ব্রাহ্মণভাগ ত্রিধা বিভক্ত —বিধি, অর্থবাদ ও উভয়-বিলক্ষণ। উভয়-বিলক্ষণ অর্থ—যাহা বিধিস্বরূপও নহে, এবং স্বার্থে প্রামাণ্যবিহীন (অপ্রমাণ) অর্থবাদও নহে, এমন একটা ভাগ। সেই উভয়-বিলক্ষণ ভাগটার নাম বেদান্ত, উপনিষদ্ ও আরণ্যক প্রভৃতি।

উপনিষদে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয়েরই কথা আছে। উভয়ের কথা থাকিলেও ব্রহ্ম-নিরূপণেই উহার মুখ্য তাৎপর্য্য, কর্ম্মপ্রসঙ্গ উহার আনুষঙ্গিক—গৌণ বিষয়মাত্র। ইহা বেদান্তাচার্য্যগণের অভিমত সিদ্ধান্ত। কিন্তু মীমাংসকগণ এ সিদ্ধান্তে সম্মতিদান করেন না। তাঁহারা বলেন,—কর্ম্ম-প্রতিপাদনই যখন বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তখন উপনিষদের উদ্দেশ্যও কখনই অন্য প্রকার হইতে পারে না; হইলে উপনিষদের প্রামাণ্যই রক্ষা পাইতে পারে না। অতএব উপনিষদ্ও কর্ম্ম-কাণ্ডোক্ত বিধেয় কর্ম্মের সহিত সম্মিলিত হইয়াই যখন প্রামাণ্য লাভ করে. তখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে না হউক, অন্ততঃ পরোক্ষভাবেও কর্ম্মপ্রতিপাদনেই বেদান্তের (উপনিষদের) তাৎপর্য্য কল্পনা করিতে হইবে। পূর্ব্বেই এ বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে. এখানে আর বিস্তৃতি বিধানের আবশ্যকতা নাই।

এখানে বলা আবশ্যক যে, উপরে যে তিনপ্রকার বিভাগ

প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সম্প্রদায়বিশেষের অনুমোদিত কেবল ব্রাহ্মণভাগের বিভাগমাত্র; কিন্তু ঐ বিভাগ সমস্ত বেদসম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। আচার্য্যগণ বেদের বিভাগ পাঁচপ্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদ। উক্ত বিভাগের অন্তর্গত বিধি, মন্ত্র, নিষেধ ও অর্থবাদের কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে; সুতরাং সে সকলের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'নামধেয়ের' কথা পূর্ব্বে বলা হয় নাই, এখন কেবল তৎসম্বন্ধে যাহা বলা আবশ্যক, তাহাই বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

'নামধেয়' অর্থ—নাম। ব্যবহারের সৌকর্য্য-সম্পাদনই নামধেয়ের উদ্দেশ্য। নামধেয়ের সাহায্যেই অনুষ্ঠেয় যাগাদি কর্ম্মের প্রকাশ ও যথাযথ স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সুবিধা হয়। নচেৎ সেই সকল কর্ম্মবাচক শব্দের যৌগিকার্থ ধরিয়া বিকৃতার্থ গ্রহণ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হইত। উদাহরণ—যেমন "উদ্ভিদা যজেত" ইত্যাদি। 'উদ্ভিদ্' শব্দটী একটী যাগের নামধেয়। এইরূপ নামধেয় না থাকিলে, লোকে সহজেই মনে করিতে পারিত যে, যে যাগে বৃক্ষ লতা প্রভৃতির বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেইরূপ কোন একটী যাগ। তাহা হইলে, 'উদ্ভিদা' পদে উদ্ভিদ্-সাপেক্ষ বহু যাগই ধরা যাইত, তাহার ফলে শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ (যাগবিশেষ) পরিত্যাগপূর্ব্বক অপ্রকৃতার্থ গ্রহণ করায় অনুষ্ঠাতৃবর্গ নিশ্চয়ই ইষ্টলাভে বঞ্চিত থাকিত। সেই প্রমাদ নিরসনের জন্য নামধেয়ের ব্যবস্থা। এইরূপ "চিত্রয়া যজেত"

বাক্যে 'চিত্রা' পদটী যাগবিশেষের নামধেয়। 'চিত্রা' পদটী 'নামধেয়' না হইলে, 'চিত্রা' শব্দের সহজতঃ অনেক যাগের অঙ্গ-সংবলিত একটী মিশ্র যাগমাত্র, এরূপ অর্থই লোকে বুঝিত। তাহা হইলে শ্রুতির অভিপ্রায় যে, নিশ্চয়ই পরাহত হইত, একথা না বলিলেও চলে। কাজেই উক্ত নামধেয় স্বয়ং বিধি বা ক্রিয়াপর না হইয়াও বিধেয়ের স্বরূপনিরূপণ দ্বারা নিশ্চয়ই বিধির উপকার সম্পাদন করে, এবং এইরূপেই নিজে সার্থকতাও লাভ করে।

[আলোচনা]

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, মীমাংসাদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জটিল। ইহার সকল বিষয় বিশ্লেষণপূর্ব্বক আলোচনা করা অতি বৃহৎ ব্যাপার। সেরূপ আলোচনার উপযুক্ত স্থান এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। সেইজন্য প্রবন্ধমধ্যে উহার কতকগুলি দার্শনিক বিষয়ের স্থূল মর্ম্মমাত্র সন্নিবেশিত করিয়াই বক্তব্য পরিসমাপ্ত করিতে হইল। এখন উপসংহারে আরও কয়েকটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য দর্শনের ন্যায় আলোচ্য মীমাংসা-দর্শনেরও চরম লক্ষ্য বা মুখ্য উদ্দেশ্য—জীবের মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স। কিন্তু সে মুক্তি বৈশেষিকোক্ত আত্মগত বিশেষগুণের উচ্ছেদ, বা সাংখ্যসম্মত আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, অথবা অদ্বৈতবাদ-কল্পিত জীব-ব্রহ্মের-একত্বপ্রাপ্তিও নহে, পরন্তু পরমানন্দঘন স্বর্গসুখ-প্রাপ্তি। ইহাতেই জীবের চিরবিশ্রাম ও পরম শান্তি। জীবের

সম্বন্ধে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শান্তির স্থান আর নাই, থাকাও সম্ভবপর নয়। উক্ত স্বর্গসুখপ্রাপ্তির উপায়—ষট্-পদার্থ বা ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নহে; পুরুষ-প্রকৃতির বা আত্মা-অনাত্মার বিবেক সাক্ষাৎকারও নহে; অথবা জীব-ব্রহ্মের অভেদ-সাক্ষাৎকারও নহে; তাহার একমাত্র উপায় হইতেছে বেদবিহিত কর্ম্ম। অধিকারী পুরুষ যথাযথভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, তাহা হইতে যে, একপ্রকার 'অপূর্ব্ব' (অদৃষ্ট) উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে অভীষ্ট স্বর্গসুখ অনুষ্ঠাতার ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়। উল্লিখিত ধর্ম্মবিষয়ে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। তদ্ভিন্ন কোন প্রমাণই ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ হয় না। সূত্রকার বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশব্দমনপেক্ষং স্যাৎ।" ১।৪।১ ॥

শব্দই অর্থাৎ বেদই ধর্ম্মের মূল—স্বরূপনির্দ্দেশক। যাহা বেদ-বোধিত নহে, তাহা দেশবিশেষে বা সম্প্রদায়বিশেষে ধর্ম্মনামে পরিচিত হইলেও ধার্ম্মিকগণের আদরণীয় নহে (১)।

ধর্ম্ম অর্থ—যাগাদি ক্রিয়া। তাদৃশ ক্রিয়া প্রতিপাদনেই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য। মানবকে শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত ও অশুভ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই বেদের আবির্ভাব। যাহা ক্রিয়া-বিধায়ক নয়, কিংবা ক্রিয়াবিধির সহিত কোনরূপেও সংসৃষ্ট নয়,

(১) যেমন বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে—"চৈত্যং বন্দেত" অর্থাৎ বৌদ্ধবিহার দর্শন করিলেই প্রণাম করিবে। চৈত্যবন্দনা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে ধর্ম্মরূপে পরিচিত থাকিলেও, উহা আমাদের নিকট ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য নহে ইত্যাদি।

এরূপ বেদভাগ যদি থাকে, (বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ বেদভাগ নাই), তবে তাহা কখনই প্রমাণরূপে পরিগণিত হইবে না।

ধর্ম্মবিষয়ে বেদ যেমন প্রমাণ, বেদানুগত স্মৃতিশাস্ত্রও ঠিক তেমনই প্রমাণ, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্র যদি কোথাও বেদবিরুদ্ধ কোন বিষয়ে বিধি-নিষেধের উপদেশ করেন, তাহা হইলে সেই সমুদয় বিধি ও নিষেধ সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষণীয় বুঝিতে হইবে। স্বয়ং সূত্রকার বলিয়াছেন—

"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্।" ১।৪।৩।

অর্থাৎ বেদবাক্যের সহিত বিরোধ না ঘটিলেই স্মৃতিবাক্য প্রমাণরূপে আদরণীয়, কিন্তু বিরোধ ঘটিলে সর্ব্বথা উপেক্ষণীয়। অতএব ধর্ম্মবিষয়ে বেদ যাহা বলেন, তাহাই প্রমাণ, তদ্বিরুদ্ধার্থবাদী কোন শাস্ত্রই প্রমাণ নহে ; বেদবাক্য অনুসারেই ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইবে। আর যেখানে বেদবাক্যেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়ে সংশয় উপস্থিত হয়, সেরূপ স্থলে সূত্রকার বলিতেছেন—

"সন্দিগ্ধেষু বাক্যশেষাৎ।" ১।৪।২৯।

সন্দিগ্ধ স্থলে তৎসংসৃষ্ট পরবর্ত্তী বাক্যের সাহায্যে প্রকৃতার্থ নিরূপণ করিতে হইবে। কোথাও যদি একইবিষয়ে একাধিক বাক্য বিদ্যমান থাকে, অথচ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অর্থ করিলেও, বাক্যগুলির আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত না হয়, অপরের সঙ্গে মিলিত না হইলে বাক্যার্থই পূর্ণতা লাভ না করে, সেই সকল বাক্যের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিতেছেন—

"অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষং চেদ্বিভাগে স্যাৎ।" ২।১।৪৬।

অর্থাৎ সেরূপস্থলে একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া বাক্যগুলির

অঙ্গাঙ্গিভাবে একার্থে পর্য্যবসান করিতে হইবে, অর্থাৎ সেই সকল বাক্যের মধ্যে একটীকে প্রধান করিয়া অপর সকলকে তাহারই উপকারে বিনিযোজিত করিতে হইবে। তাহা হইলে সমস্ত বাক্যেরই আকাঙ্ক্ষা পরিসমাপ্ত হইতে পারে এবং সার্থকতাও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। আর যেখানে দেখা যায় যে, প্রত্যেক বাক্যেরই অর্থ ও প্রয়োজন প্রভৃতি সমস্তই স্বতন্ত্র, পরস্পরের মধ্যে কোনপ্রকার আকাঙ্ক্ষা নাই, সেরূপ স্থলকে লক্ষ্য করিয়া সূত্রকার বাক্যভেদের ব্যবস্থা দিয়াছেন,—

"সমেষু বাক্যভেদঃ স্যাৎ।" ১।৪।২৯॥

অতএব একার্থে বা এক প্রয়োজনে বিনিযুক্ত বাক্যসমূহের মধ্যে যথাসম্ভব অঙ্গাঙ্গিভাবে একবাক্যতার ব্যবস্থা করিতে হয়। বিধেয় কর্ম্মসমূহের মধ্যে কোনটী অঙ্গ, আর কোনটী অঙ্গী বা প্রধান, তাহা জানিবার বা নিরূপণ করিবার সহজ উপায় এই যে,—

"ফলবৎ-সন্নিধাবফলং তদঙ্গম্।"

অর্থাৎ যে কর্ম্মে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ফলোল্লেখ আছে, তাহার সন্নিহিত কর্ম্মে যদি কোনপ্রকার ফলের উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, যাহার অনুষ্ঠানে কোন ফল-সম্বন্ধের কথা নাই, সেই কর্ম্মটী অঙ্গ, আর তৎসন্নিহিত সফল কর্ম্মটী অঙ্গী। অঙ্গ কর্ম্মগুলি সাধারণতঃ প্রধানভূত অঙ্গী কর্ম্মেরই ফলগত উৎকর্ষমাত্র সম্পাদন করে, কিন্তু নিজের স্বতন্ত্রভাবে কোন ফল জন্মায় না।

বিহিত কর্ম্মমাত্রই সফল; বিফল কর্ম্মের বিধি নাই, থাকাও সম্ভব হয় না। এই জন্যই অঙ্গ কর্ম্মগুলির সফলতা রক্ষার জন্য

ফলপ্রদ প্রধান কর্ম্মগুলির সহিত সংযোজিত করিতে হয়। কিন্তু কোথাও যদি প্রধান কর্ম্মেও ফল-সম্বন্ধ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলেও, ঐ কর্ম্মকে বিফল মনে করিতে হইবে না; উহারও নিশ্চয়ই সফলতা কল্পনা করিতে হইবে। সূত্রকার বলিতেছেন—

"স স্বর্গঃ স্যাৎ, সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষাৎ" ॥ ৪।৩।১৫ ॥

অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মে প্রত্যক্ষতঃ ফলোল্লেখ না থাকিলেও সামান্যতঃ স্বর্গফল কল্পনা করিতে হয়; কারণ, স্বর্গফল সকলের পক্ষেই লোভনীয়; সুতরাং সকলেরই সমানভাবে প্রার্থনীয়। এই কারণেই "বিশ্বজিতা যজেত।" 'বিশ্বজিৎ' নামক যাগ করিবে। এস্থলে কোন ফলবিশেষের উল্লেখ না থাকিলেও সামান্যতঃ স্বর্গ-ফলের কল্পনা করা হইয়া থাকে। এই প্রকার আরও যে সকল কর্ম্মে ফল-সম্বন্ধ উক্ত না থাকে, সেই সকল কর্ম্মেরও ফল স্বর্গ লাভ, ইহা বুঝিতে হইবে।

বেদার্থ নির্ণয়ের সহায়তাকল্পে এইজাতীয় বহুতর নিয়মপদ্ধতি কল্পিত হইয়াছে, সেই সমুদয় নিয়ম-পদ্ধতিই আলোচ্য মীমাংসা শাস্ত্রের উপজীব্য। জৈমিনি মুনি ঐ সকল নিয়মের অনুসরণ-পূর্ব্বকই বেদার্থ-মীমাংসার প্রণালী স্থির করিয়াছেন।

মীমাংসাদর্শনের মতে ক্রিয়া (যজ্ঞাদি কর্ম্ম) প্রতিপাদনেই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য। তদ্ভিন্ন অর্থাৎ ক্রিয়া বা ক্রিয়ার সহিত সম্পূর্ণ-রূপে সম্পর্কশূন্য বাক্য সমুদয় নিরর্থক, মানুষের অনুপযোগী। বিহিত যাগাদি ক্রিয়াই যথার্থ ধর্ম্ম। ধর্ম্ম নিজে আশুবিনাশী হইলেও কর্ম্মানুরূপ ফলোৎপাদনের জন্য অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব (পুণ্য)

রাখিয়া বিনষ্ট হয়। ঐ অদৃষ্টই যথাকালে কর্ম্মকর্ত্তাকে বিভিন্ন প্রকার ভোগভূমিতে বিভিন্ন প্রকার ভোগ সমর্পণ করিয়া থাকে। মীমাংসকমতে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি কর্ম্ম-দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্র সাপেক্ষ হইলেও, কর্ম্মই প্রধান, দেবতা তাহার গৌণ অঙ্গমাত্র। কেহ কেহ মনে করেন, গৃহস্থ যেরূপ অতিথির জন্য অন্ন পান প্রদান করে, সেই রূপ লোকে দেবতার প্রীত্যর্থেই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। এ কথা মীমাংসকগণ স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন—

"অপি বা শব্দপূর্ব্বত্বাৎ যজ্ঞকর্ম্ম প্রধানং স্যাৎ, গুণত্বে দেবতাশ্রুতিঃ"॥৯।১৯

এ সূত্রে স্পষ্টাক্ষরেই যজ্ঞের প্রাধান্য ও দেবতার অপ্রাধান্য বলা হইয়াছে। ভাষ্যকারও ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তস্মাৎ দেবতা ন প্রযোজিকা," বলিয়া উক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ অন্যান্য সম্প্রদায়ের অভিমত দৈবত মহিমা মীমাংসকমতে অচিন্ত্য মন্ত্রশক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং অনাবশ্যকবোধে ঈশ্বর বা ব্রহ্মও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। সুতরাং মুক্তিলাভের জন্য ব্রহ্ম-জ্ঞান বা তদাশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি পরাভিমত উপায় সকলও সম্পূর্ণ-রূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। কর্ম্মই জীবের ভোগ-মোক্ষের উপায়। শান্তিকামী জীবগণ সর্ব্বতোভাবে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিবে, এবং তাহাদ্বারাই নিজ নিজ অভীষ্ট ফল—অক্ষয় স্বর্গসুখ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কর্ম্মই জীবের ইহ-পরকালের বন্ধু; কর্ম্মের উপরে আর কেহ নাই। শিহ্লনমিশ্রের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

"নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥"

॥০॥ শিবমস্তু ॥০॥

শ্রীগোপাল বসু-মল্লিক

ফেলোশিপ-প্রবন্ধ।

চতুর্থ খণ্ড

(হিন্দুদর্শন—তৃতীয় অংশ)

মহামহোপাধ্যায়—

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-
বেদান্তবারিধি-
প্রণীত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৭।১, পদ্মপুকুর রোড্, ভবানীপুর,
কলিকাতা।

সন ১৩৩৩—চৈত্র।

মূল্য—১৷৽ আনা মাত্র

প্রস্তাবনা।

ভগবৎকৃপায় আজ শ্রীগোপাল বসু-মল্লিক ফেলোশিপ-প্রবন্ধের চতুর্থ খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এই খণ্ড প্রধানতঃ বেদান্তবিষয়ক আলোচনায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ বেদব্যাস-প্রণীত বেদান্তদর্শনই এ খণ্ডের প্রধান উপজীব্য। বেদান্ত-দর্শনের চারি অধ্যায়ের ষোলটী পাদে যে সমুদয় বিষয় আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে, প্রবন্ধে পর্য্যায়ক্রমে সেই সমস্ত বিষয়ই সন্নিবেশিত হইয়াছে। সন্নিবেশিত বিষয়গুলির দৃঢ়তা ও প্রামাণ্য সংপাদনার্থ উপযোগীমত—প্রায় সমস্ত সূত্রই প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, এবং বিশদ ব্যাখ্যাদ্বারা সূত্রগুলি সাধারণের বোধগম্যও করা হইয়াছে। দর্শনের যে সকল অংশ নিতান্ত কঠোর তর্কজালে জড়িত, অথবা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য—দুরূহতত্ত্বে পরিপূর্ণ, কেবল সেই সকল অংশই পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু অংশগুলি পরিত্যক্ত হইলেও সে সকলের স্থূল তাৎপর্য্য বা সার-মর্ম্ম কোথাও উপেক্ষিত হয় নাই।

প্রবন্ধমধ্যে প্রধানতঃ আচার্য্য শঙ্করের অভিমত—বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ-সম্মত বেদান্তব্যাখ্যাই সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়াছে। আবশ্যকমতে অন্যান্য দার্শনিকগণের মতবাদও স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত ও আলোচিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের অভিমত অদ্বৈতবাদ প্রধানতঃ মায়াবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাঙ্কর দর্শন হইতে মায়াবাদ উঠাইয়া লইলে শঙ্করের অভিপ্রেত অদ্বৈতবাদই চলিয়া যায়। সেই জন্যই আচার্য্য শঙ্কর মায়ার উপরে

বিশেষ নির্ভর করিয়াছেন। অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়ার সহায়তা লইয়াই তিনি একদিকে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয়ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং অপর দিকে জীব ও জগৎপ্রপঞ্চের ভেদও রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাজেই বলিতে হয় যে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ মায়াবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আচার্য্য শঙ্কর, যে মায়ার সহায়তায় আপনার অভিমত সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মায়ার মূল কোথায়? তিনি কোথা হইতে এই মায়ার সন্ধান পাইলেন, তাহা জানিবার জন্য বোধ হয়, অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে। যুক্তির সাহায্যে মায়ার প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা বড় সহজ হয় না। পরিমার্জ্জিত তর্কদ্বারা ঐরূপ একটা কিছু থাকা অনুমিত হইলেও উহা সম্পূর্ণরূপে সংশয়শূন্য হয় না। বিশেষতঃ আচার্য্যসম্প্রদায় মায়ার যেরূপ ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তর্ক ও অনুমানের অধিকারবহির্ভূত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এই কারণেই রামানুজপ্রভৃতি আচার্য্যগণ শঙ্কর-সম্মত মায়াবাদের বিরুদ্ধে বহুপ্রকার তর্কযুক্তির অবতারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতএব কেবল যুক্তিতর্কের সাহায্যে মায়ার স্বরূপ ও সদ্ভাব নির্ণয় করা নিরাপদ নহে। শাস্ত্রের দিক্ দিয়া মায়ার মূলানুসন্ধান করিতে গেলে, উপনিষদের মধ্যে আমরা প্রথমে মায়ার উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রামাণিক উপনিষদের মধ্যে বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই আমরা প্রথমে মায়ার সঙ্গে পরিচিত হই। বৃহদারণ্যকে আছে—

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"

অর্থাৎ ইন্দ্র-শব্দবাচ্য পরমেশ্বর মায়াদ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পান। শ্বেতাশ্বতরে আছে—

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্"।

অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, আর মায়াবিশিষ্টকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে। আরও আছে—

"তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ"।

অর্থাৎ অজ্ঞ জীব মায়াদ্বারা সংসারে আবদ্ধ হয়। এইরূপ আরও বহুস্থানে মায়াশব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে স্বপ্নদৃশ্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে একটীমাত্র সূত্রে "মায়া" শব্দের বিস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"মায়ামাত্রং তু কাৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ"।

কিন্তু এ সকলের মধ্যে কোথাও "মায়া"র স্বরূপ বা পরিচয় বিবৃত করা হয় নাই, কেবল ভাবে ভঙ্গীতে মাত্র উহার ব্যবহারিক অর্থ কতকটা উদ্ঘাটিত করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মায়ার স্বরূপ আচার্য্যগণ যেভাবে বিবৃত করিয়াছেন, মনে হয়, প্রধানতঃ পুরাণ ও ইতিহাস শাস্ত্র হইতেই তাহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। কারণ, পুরাণ শাস্ত্রই নানাস্থানে মায়াশক্তির ঐরূপ মহিমা তারস্বরে ঘোষণা করিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব ও ভগবৎ-তত্ত্ব বুঝাইতে সমধিক প্রয়াস পাইয়াছেন। মনে হয়, আচার্য্য শঙ্কর পুরাণাদিপ্রসিদ্ধ সেই মায়াবাদকেই অবলম্বন করিয়াছেন, এবং তাহার সাহায্যেই আপনার অভীষ্ট অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন; সুতরাং শঙ্করকে মায়াবাদের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কিংবা তাঁহাকে মায়াবাদী বলিয়া যাহারা উপহাস করেন, তাঁহারা আপনাদেরই অনভিজ্ঞতার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। আচার্য্য শঙ্কর এই মায়াবাদের সাহায্যে যে উদারমত (অদ্বৈতবাদ) প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় রহস্য হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলে, সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ তিরোহিত হইয়া যায়, এবং শান্তির সহচর সমদর্শনের দ্বার খুলিয়া যায়। এই জন্য আমরা প্রবন্ধমধ্যে প্রধানতঃ শঙ্কর-মতেরই

অনুসরণ করিয়াছি, এবং পরিশেষে উপসংহারপ্রসঙ্গে বেদান্তানুগত অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের সম্মত মুক্তির কথাও আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করা হইয়াছে।

প্রবন্ধে স্থূলতঃ বেদান্তের সমস্ত বিষয় সন্নিবেশিত হইলেও প্রবন্ধের আয়তনবৃদ্ধির ভয়ে সকল বিষয় বিশ্লেষণপূর্ব্বক ইচ্ছামত আলোচনা করিবার সুযোগ ঘটে নাই। এই জন্য ইহারই পরিশিষ্টরূপে 'বেদান্ত-প্রবন্ধ' নামে আর একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা আছে; এবং তাহার মুদ্রণকার্য্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে বেদান্ত-বিষয়ে কোন কথাই অবিজ্ঞাত থাকিবে না। আশা করি, শীঘ্রই ঐ খণ্ড পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইব। ইতি—সন ১৩৩৩, চৈত্র।

ভবানীপুর—
ভাগবত চতুষ্পাঠী
সন ১৩৩৩, চৈত্র } শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা

বেদান্ত-প্রবন্ধ নামে যে, আর একটী খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে, তাহাতে কেবল শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদমাত্র থাকিবে না। বেদান্ত-দর্শন অবলম্বনে যত প্রকার দার্শনিক সম্প্রদায় আছে, সেই সকল সম্প্রদায়ের মতবাদও সেই খণ্ডে বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ফল কথা, এই পুস্তকখানি বেদান্তের সর্ব্বাবয়বপূর্ণ পুস্তক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বিষয়-সূচী।

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

ফেলোশিপপ্রবন্ধ।

হিন্দুদর্শন।

(অবতরণিকা)

"আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং
নয়েদ্বেদান্ত-চিন্তয়া।"

সর্ব্বচিন্তার অবসানভূমি নিদ্রাসমাগমের পূর্ব্বপর্য্যন্ত এবং সর্ব্বসংহারক মৃত্যুর করালকবলে পতিত হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত কেবল বেদান্ত-চিন্তায় সময়াতিপাত করিবে, অর্থাৎ মানুষ যতকাল বাঁচিয়া থাকিবে এবং যতক্ষণ জাগরিত থাকিবে, তাবৎকাল নিরন্তর বেদান্ত-চিন্তায় মনোনিবেশ করিবে, অন্য চিন্তা করিবে না। এ নিয়ম আমরণ প্রতিপালন করিবে।

এই অমূল্য উপদেশবাণী একদা এদেশের আদর্শভূত শান্তি ও সংযমের একনিষ্ঠ উপাসক, ত্যাগব্রতের পরম সাধক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অকৃত্রিম সেবক এবং সত্য-সন্তোষের নিত্যসহচর শ্রদ্ধাপূত ত্যাগী সন্ন্যাসীর পূত কণ্ঠ হইতে শোক-সন্তাপদগ্ধ বিশ্ব-মানবের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হইয়াছিল, এবং দেশে দেশে বেদান্ত-বিদ্যার উজ্জ্বল মহিমা উদ্ঘোষিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। এই উপদেশবাণী হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে,

তৎকালে এদেশে বেদান্তবিদ্যার প্রভাব, প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয়তা কি পরিমাণে অনুভূত হইয়াছিল এবং কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

যাহারা বেদান্তের অলৌকিক রহস্য-রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনাকে গৌরবমণ্ডিত মনে করেন, তাহাদের মুখে বেদান্তের গুণকীর্ত্তন কিছুমাত্র বিস্ময়কর না হইতে পারে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহারা আংশিকভাবেও বেদান্তের মর্ম্ম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত অবসর লাভ করে নাই, এবং সাধারণভাবেও উহার সহিত আপনাকে পরিচিত করিবার সুযোগ পান নাই, তাহারাও বেদান্তের নামোচ্চারণে ও বিষয়শ্রবণে সমধিক আদর, আগ্রহ ও আনন্দ পোষণ করিয়া থাকেন। বেদান্তশাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতশূন্য অসীম উদারতাই এবংবিধ লোকানুরাগ-সংগ্রহের কারণ। দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কোনও শাস্ত্র বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নাই, যাহাতে অল্পাধিক পরিমাণে বেদান্তশাস্ত্রের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় না। এই কারণেই স্বীকার করিতে হয় যে, বেদান্তের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অনন্যসাধারণ ও অতুলনীয়।

বেদান্তশাস্ত্রের অনন্যসাধারণ গৌরব-প্রতিষ্ঠার অপর কারণ এই যে, বেদান্তশাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে কোনও ব্যক্তিবিশেষের কপোল-কল্পিত বা উচ্ছৃঙ্খল কল্পনাপ্রসূত মতবাদ নহে; উহা বস্তুতঃ অপৌরুষেয় স্বতঃ প্রমাণ বেদশাস্ত্রেরই সারভূত (রহস্যাত্মক) অংশ-বিশেষ। বেদশাস্ত্র কোন সম্প্রদায়বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে বা অধিকারভুক্ত নহে; উপযুক্ত অধিকার অর্জ্জন করিতে পারিলে

সকলেই সমভাবে উহার রসাস্বাদনে সমর্থ হইতে পারে। আলোচ্য বেদান্তশাস্ত্র সেই বেদেরই সারভূত অংশবিশেষ; সুতরাং তাহাতে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত থাকা সম্ভবপর হয় না ও হইতে পারে না।

বেদব্যাখ্যাকার আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদ-নামধেয়ম্।" মন্ত্রাত্মক সংহিতাভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ, এতদুভয়ের সম্মিলিত নাম বেদ। অভিপ্রায় এই যে, বেদশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত; একভাগের নাম মন্ত্র, অপর ভাগের নাম সংহিতা। মন্ত্রভাগ 'সংহিতা' নামে পরিচিত এবং কর্ম্মোপযোগি-মন্ত্রপ্রধান, আর ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্রেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং যজ্ঞাদিক্রিয়ার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে পরিপূর্ণ। আরণ্যকভাগও এই ব্রাহ্মণ-ভাগেরই অন্তর্নিহিত অংশবিশেষ।

বেদান্ত।

উক্ত বেদের মধ্যে যে সমুদয় অংশ প্রধানতঃ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক এবং জীব, জগৎ ও আত্মতত্ত্ব নিরূপণে নিরত, সেই সমুদয় বেদভাগ 'উপনিষদ্' নামে পরিচিত হইয়াছে। উপনিষদ্ শব্দের প্রকৃতিগত অর্থও ঐরূপ(১); সুতরাং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের

---

(১) আচার্য্যগণ উপনিষদ্ শব্দের এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'উপ' অর্থ—শীঘ্র, 'নি' অর্থ—নিশ্চয় ও নিঃশেষ, 'সদ্' ধাতুর অর্থ—বিশরণ, গতি ও অবসাদন। যে বিদ্যা অধিগত হইয়া সংসারের সত্যতা-বুদ্ধি শিথিল করিয়া দেয়, কিংবা অচিরে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটায়, অথবা সংসার ও তন্মূলীভূত অবিদ্যার অবসাদ (অকর্ম্মণ্যতা) সাধন করে, সেই বিদ্যার নাম

মধ্যে যেখানেই ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধ আছে, তাহাই উপনিষদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তবে অধিকাংশ উপনিষদ্‌ই ব্রাহ্মণ-ভাগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট, মন্ত্রভাগের মধ্যে উপনিষদের সংখ্যা খুবই কম (১)।

বেদের সার-সর্ব্বস্ব উপনিষদ্‌শাস্ত্রই যথার্থ বেদান্ত। বেদান্তশব্দের অর্থ—বেদের সার, কিন্তু বেদের অন্ত—শেষভাগ (বেদান্ত) নহে; কারণ, বেদের আদি, মধ্য ও অবসান সর্ব্বত্রই উপনিষদ্‌রূপী বেদান্তভাগের সত্তাব দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশাবাস্যোপনিষৎ প্রভৃতি ইহার উত্তম উদাহরণ রহিয়াছে। এইরূপ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রীমৎ সদানন্দ যতীন্দ্র বলিয়াছেন "বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্, তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ।" (বেদান্ত সার)।

এখানে দেখা যায়, তিনি উপনিষদ্‌কেই প্রধানতঃ বেদান্ত নামে অভিহিত করিয়া, উপনিষদের অর্থপ্রকাশক বা তাৎপর্য্যনির্ণায়ক শারীরকসূত্র (বেদান্ত দর্শন) প্রভৃতিকেও বেদান্তমধ্যে

উপনিষদ্। যে সমস্ত গ্রন্থ তাদৃশ বিদ্যার প্রকাশক বা প্রতিপাদক, সেই সমুদয় গ্রন্থও ঐ উপনিষদ্ নামে পরিচিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কারণেই বৈদিক উপনিষৎ ব্যতীত, ব্রহ্মবিদ্যার মীমাংসক ও প্রকাশক শারীরকসূত্র ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থও উপনিষদ্ নামে পরিচিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১ প্রসিদ্ধ ঈশাবাস্যোপনিষদ্, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ও কৌষীতকী মন্ত্রোপনিষদ্ প্রভৃতি উপনিষদ্ গ্রন্থ মন্ত্রভাগের অন্তর্গত। কেনোপনিষদ্, কঠোপনিষদ্, মুণ্ডকোপনিষদ্, মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্ভুক্ত। কেনোপনিষদের প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

পরিগণিত করিয়াছেন। তদনুসারে মহাভারতীয় 'সনৎ-সুজাতীয়-সংবাদ' এবং ভগবদ্গীতা প্রভৃতি অধ্যাত্মতত্ত্বপ্রকাশক কতিপয় গ্রন্থও বেদান্ত মধ্যে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে. কিন্তু ন্যায়রত্নাবলী-প্রণেতা ব্রহ্মানন্দসরস্বতী বলিয়াছেন—

"বেদান্তশাস্ত্রেতি—শারীরকমীমাংসা চতুরধ্যায়ী, তদ্ভাষ্য-তদীয়টীকা-বাচস্পত্য-তদীয়টীকা-কল্পতরু-তদীয়টীকা-পরিমলরূপগ্রন্থপঞ্চকে তাৎপর্যঃ।"

অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্র অর্থ ব্যাসকৃত শারীরকমীমাংসা বা ব্রহ্ম-সূত্র, এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, বাচস্পতিমিশ্রকৃত ভাষ্য-টীকা ভামতী, অমলানন্দকৃত তাহার টীকা বেদান্তকল্পতরু এবং অপ্যয়দীক্ষিতকৃত তট্টীকা কল্পতরুপরিমল. এই পাঁচখানি গ্রন্থ।

বলা আবশ্যক যে, ব্রহ্মানন্দসরস্বতীর এই উক্তি খুব যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, উল্লিখিত পাঁচখানি গ্রন্থ ছাড়া আরও বহুতর বেদান্তগ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ ও প্রচলিত আছে, এবং বেদান্তাচার্য্যগণ বিশেষ শ্রদ্ধা ও আদরসহকারে সে সকল গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন (১)। তবে ব্রহ্মানন্দসরস্বতী যদি বেদান্তশব্দে কেবল 'বেদান্তদর্শন' মাত্র অর্থ গ্রহণ করিয়া ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রদর্শিত পদ্ধতি নিতান্ত উপেক্ষণীয় মনে হয় না। কারণ, বেদান্ত দর্শনের দিক্

(১) শঙ্করাচার্য্যকৃত উপদেশসাহস্রী, আত্মবোধ, বিবেকচূড়ামণি, সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসার, সংক্ষেপশারীরক, অদ্বৈতসিদ্ধি, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি, চিৎসুখী, সিদ্ধান্তলেশ প্রভৃতি বহু প্রকরণগ্রন্থ এখনও বেদান্তের অঙ্গপুষ্টি ও গৌরববৃদ্ধি করিতেছে।

দিয়া ঐ পাঁচখানি গ্রন্থের গুরুত্ব ও উপযোগিতা যে, খুব বেশী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বৈদান্তিক আচার্য্যগণ বেদান্তশাস্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং ঐ তিন ভাগকে 'প্রস্থান' নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রস্থান অর্থ—সাম্প্রদায়িক বিভাগ। প্রথম প্রস্থান—উপনিষদ্, দ্বিতীয় প্রস্থান—শারীরক সূত্র বা ব্রহ্মসূত্র, তৃতীয় প্রস্থান—ভগবদ্গীতা ও সনৎ-সুজাতীয়সংবাদ প্রভৃতি। শ্রুতি, স্মৃতি ও তর্ক, এই তিনই উক্ত প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তন্মধ্যে, উপনিষদ্ভাগ—সাক্ষাৎ শ্রুতি, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি—স্মৃতি, আর ব্রহ্মসূত্র হইতেছে—শ্রুতিসহায়ক তর্কস্বরূপ (১)।

বেদান্তের প্রস্থানত্রয়।

---

(১) এই প্রকার প্রস্থানভেদ নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য পাঠসৌকর্য্যবিধান। প্রথমতঃ উপনিষদ্শাস্ত্র হইতেছে বেদান্তের সূত্রস্থানীয়। বেদান্তদর্শন তাহার ব্যাখ্যাস্থানীয়, আর ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ বেদান্তের উপসংহার শাস্ত্র। সমস্ত উপনিষদ্শাস্ত্র ও সম্পূর্ণ বেদান্তদর্শন আলোড়ন করিয়া যে সার-সিদ্ধান্ত অবধারিত হইয়াছে, মহর্ষি বেদব্যাস ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখে সেই সিদ্ধান্তরাশিই ভগবদ্গীতায় সংক্ষেপে একত্র সংগ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। উদ্দেশ্য—জিজ্ঞাসুগণ যেন অনায়াসে বেদান্তের সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। এইজন্যই ভগবদ্গীতা বেদান্তের উপসংহারশাস্ত্র বলিয়া জগতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

গীতা-মাহাত্ম্যে কথিত আছে—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়রহস্য জানিতে ইচ্ছুক হইলে পর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ" বলিয়া গীতাকেই তাঁহার হৃদয় বা মর্ম্মস্থানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

প্রথমেই বলিয়াছি যে, উপনিষদ্ই বেদান্ত-শব্দের মুখ্য অর্থ। ফেলোশিপ্ প্রবন্ধের প্রথম খণ্ডে আমরা উপনিষদের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এখানে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উপনিষদ্ কথার মুখ্য অর্থ—ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্ম আর আত্মা একই বস্তু; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা একই কথা। এই আত্মবিদ্যাই সর্ব্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ—পরা বিদ্যা,—"অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্" (ভগবদ্গীতা ১০ম)। এই আত্মবিদ্যা ভিন্ন অপর সমস্ত বিদ্যাই অ-পরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা একই প্রকার, কিন্তু অপরা বিদ্যা অনেকপ্রকার। প্রশ্নোপনিষদে ঐ দ্বিবিধ বিদ্যার নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিয়াছেন—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে—পরা চৈবাপরা চ।"

অর্থাৎ পরা ও অপরাভেদে দ্বিবিধ বিদ্যাই জানিতে হইবে। এইরূপ ভূমিকা করিয়া প্রথমতঃ অপরা বিদ্যার পরিচয় প্রদানোপলক্ষে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রকে অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন—

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি"

এখানে প্রধানতঃ ঋক্‌প্রভৃতি চারি বেদ অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াবোধক শাস্ত্রের ও শিক্ষা প্রভৃতি ছয়প্রকার বেদাঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে (১)। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, কেবল যজ্ঞাদি-

---

(১) ছান্দোগ্যোপনিষদে নারদ ও সনৎকুমারের সংবাদে আরও বহুবিধ অপরাবিদ্যার উল্লেখ আছে। যথা—"স হোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি, যজুর্ব্বেদং সামবেদং আথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং এতদ্ভগবোঽধ্যেমি।" (ছান্দোগ্য ৭।১।১)

ক্রিয়া ও তৎসিদ্ধির উপায়মাত্র-প্রদর্শক শাস্ত্রই অপরা বিদ্যামধ্যে পরিগণিত ; আর যাহা তাহা হইতে স্বতন্ত্র, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, কেবল তাহাই পরাবিদ্যারূপে "অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" বাক্যে গৃহীত হইয়াছে। এই পরাবিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা। এই বিদ্যালাভেই মানব পরম শান্তিলাভে চিরকৃতার্থ হয়। সমস্ত উপনিষদ্শাস্ত্র বিশ্বমানবকে এই অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যারই একমাত্র উপদেশ প্রদান করিতেছে। আর্য্য ঋষিগণ এই উপনিষদেরই সাহায্যে ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত হইয়া জনসমাজে প্রচার করিতেন, এবং শোকতাপদগ্ধ মানবহৃদয়ে শান্তিময় সুধাধারা সিঞ্চনে পরম পরিতৃপ্তি বিধান করিতেন (১)।

---

(১) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এবং এদেশেরও কতিপয় লোক মনে করেন যে, এদেশে অতি প্রাচীন কালে উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা কেবল ক্ষত্রিয়জাতির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণেরা পরে ক্ষত্রিয়গণের নিকট হইতেই সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণ-জাতির নিজস্ব সম্পত্তি নহে। একথার অনুকূলে তাহারা কতকগুলি আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়া থাকেন। যেমন, ছান্দোগ্যোপনিষদে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাপ্রকরণে প্রবাহণ-আরুণিসংবাদ প্রভৃতি। বস্তুতঃ এরূপ কল্পনা বড়ই উৎকট ও অসমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রথমতঃ উপনিষদের আখ্যায়িকা-সমূহই অপ্রকৃত ; কেবল বিদ্যাগ্রহণের সুবিধার জন্য ও বিদ্যার মাহাত্ম্য খ্যাপনার্থই শ্রুতিতে ঐ সকল আখ্যায়িকা কল্পিত হইয়াছে ; সুতরাং উহা ঐতিহাসিক তত্ত্বরূপে গ্রহণযোগ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ দুই একটা বিদ্যাবিষয়েই ঐরূপ আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা দ্বারা সমস্ত ব্রহ্ম-বিদ্যাকেই ক্ষাত্র সম্পত্তি বলিবার যুক্তি কি আছে? বিশেষতঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যা

এখানে বলা আবশ্যক যে, বহুজন্মসঞ্চিত ভেদবুদ্ধিবশে নিতান্ত মলিন মানবীয় মন কখনই সহজে সেই অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দরস-সমাস্বাদনে সমর্থ হইতে পারে না ; বরং পদে পদে বিবিধ সংশয় ও বিপরীত বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নিতান্ত অধীরভাবে অধিক দূরে সরিয়া যায়। জিজ্ঞাসু জনের পক্ষে ভ্রান্তিপ্রসূত সেই সংশয় ও বিপরীত বুদ্ধি বিদূরিত করিয়া অদ্বৈত তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে হইলে অগ্রে অধিগত বিষয়ে মনঃসংযমপূর্ব্বক তীব্র মননের আবশ্যক হয়। মনন অর্থই শ্রুত বিষয়ের অনুকূল বিচার। উপনিষদের ঋষিগণ এ তত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন ; সেইজন্যই তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকরণে শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতার্থের দৃঢ়তা-সম্পাদনার্থ মননেরও বিধান করিয়াছেন—"শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইত্যাদি। অধিকন্তু, ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও আদর সমুৎপাদনের নিমিত্ত এবং বিষয়টী সুখবোধ্য করিবার জন্য সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকামুখে বহুবিধ বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাতেও যাহাদের মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তিত না হয়, এবং ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা বা অনুরাগ না জন্মে, তাদৃশ মলিনচিত্ত লোকদিগের হিতের জন্য নারায়ণাবতার ভগবান্ বেদব্যাস উপনিষদাবলীর তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন।

ত ব্রহ্মবিদ্যাই নহে। উহা এক প্রকার উপাসনা মাত্র। আমরা বুঝি—উত্তম বিদ্যা অধম পাত্রগত হইলেও যে, উপেক্ষা বা ত্যাগ করিতে নাই, ইহা জ্ঞাপন করাই ঐ সকল আখ্যায়িকার গূঢ় অভিপ্রায়। সেই অভিপ্রায়েই ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের নিকট ঐ সকল বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেদান্তদর্শন।

এখানে একথাও বলা আবশ্যক যে, বেদান্তদর্শনের বিপুল কলেবর যে, কেবল উপনিষদের বিচার লইয়াই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু বেদান্তের যাহা কিছু প্রয়োজন এবং যত রকম প্রতিপাদ্য—জীবের জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত, বন্ধ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত, এবং জগতের সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত, সমস্ত বিষয়ই অতি নিপুণতার সহিত উহাতে বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। এই কারণেই বেদান্তদর্শনের এত অধিক গৌরব ও আদর অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি—গোতমকৃত ন্যায়দর্শন সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, আর বেদব্যাস-বিরচিত বেদান্তদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। ন্যায়দর্শনের জ্যেষ্ঠতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও বেদান্তদর্শনের কনিষ্ঠতা বিষয়ে কাহারও মতভেদ দৃষ্ট হয় না। ব্যবহারক্ষেত্রে যদিও কনিষ্ঠ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠেরই শ্রেষ্ঠতা বা উৎকর্ষ প্রায় সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয় সত্য, তথাপি জ্ঞানরাজ্যে এ নিয়ম সমাদৃত হয় না, বরং ইহার বিপরীত ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। জ্ঞানরাজ্যে জ্যেষ্ঠাপেক্ষা কনিষ্ঠেরই বলবত্তা বা প্রাধান্য স্বীকৃত ও সমাদৃত হইয়া থাকে। প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান অপেক্ষা পশ্চাদুৎপন্ন জ্ঞান যে, অনেকটা নির্দ্দোষ—অভ্রান্ত, একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এপক্ষে লোকব্যবহারও সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া থাকে। প্রায় অধিকাংশস্থলেই প্রথমোৎপন্ন জ্ঞানে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ বিদ্যমান

থাকে, কিন্তু শেষোৎপন্ন জ্ঞানে প্রায়ই সে সকল দোষ থাকে না ; থাকে না বলিয়াই শেষোৎপন্ন (কনিষ্ঠ) জ্ঞান দ্বারা প্রথমোৎপন্ন (জ্যেষ্ঠ) জ্ঞান বাধিত বা ভ্রান্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই কারণেই প্রামাণ-নিপুণ পণ্ডিতগণ জ্যেষ্ঠ জ্ঞানকে বাধ্য, আর কনিষ্ঠ-জ্ঞানকে বাধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

লৌকিক ব্যবহারও সর্ব্বতোভাবে একথার সমর্থন করিয়া থাকে। মনে করুন, সন্ধ্যার সময় পথে একটা রজ্জু (দড়ী) পড়িয়া আছে। এমন সময় হঠাৎ একটী লোক সেখানে উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ সেই রজ্জুতে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল এবং তাহাতে সর্পভ্রান্তি উৎপাদন করিল ; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভয় কম্পাদি উপস্থিত হইল। অনন্তর, তীব্র প্রণিধানের ফলেই হউক, অথবা বিশ্বস্ত লোকের উপদেশেই হউক, যখন তাহার সেই রজ্জুতে রজ্জু-জ্ঞান উপস্থিত হইল, তখনই তাহার সর্পভ্রমও (ভ্রান্তিজ্ঞানও) বিদূরিত হইল। এখানে সর্পভ্রম অর্থাৎ সর্প-বিষয়ক ভ্রান্তিজ্ঞান হইতেছে প্রথমোৎপন্ন—জ্যেষ্ঠ, আর রজ্জু-বিষয়ক রজ্জু-জ্ঞান হইতেছে পশ্চাদুৎপন্ন—কনিষ্ঠ। সেই শেষোৎপন্ন রজ্জু-জ্ঞান দ্বারাও প্রথমোৎপন্ন (জ্যেষ্ঠ) সর্পভ্রান্তি বাধিত হইল। এরূপ আরও বহু উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে, যেখানে কনিষ্ঠ জ্ঞান দ্বারা জ্যেষ্ঠ জ্ঞানের বাধা সংঘটিত হইয়া থাকে। তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশক শাস্ত্রসম্বন্ধেও এই নিয়ম অনতি-ক্রমনীয় ; সুতরাং আলোচ্য বেদান্ত-দর্শন বয়সে কনিষ্ঠ হইয়াও যে, প্রামাণ্য-গৌরবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য, একথা বলিলে অসঙ্গত হইতে পারে না।

বেদান্ত-দর্শনের শ্রেষ্ঠতা পক্ষে আরো একটী কারণ এই যে, ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি যে সমুদয় প্রামাণিক দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত আছে, প্রায় সকল দর্শনেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রৌঢ়িবাদ ও অভ্যুপগমবাদ স্থান পাইয়াছে, এবং স্থানবিশেষে শ্রুতিবিরুদ্ধ কথাও সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু আলোচ্য বেদান্তদর্শনে উক্ত দোষের আদৌ সম্ভাবনা ঘটে নাই। কারণ, বেদান্তদর্শন-প্রণেতা বেদব্যাস নিজে বেদ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদ্বারা বেদবিরুদ্ধ কথা সন্নিবেশিত হওয়া সম্ভবপর হয় না। এই কারণেই বেদার্থ-মীমাংসাকালে তাঁহার অভ্যুপগমবাদ প্রভৃতি অসৎপক্ষ গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনও সঙ্গত কারণ দেখা যায় না; সুতরাং তৎপ্রণীত বেদান্তদর্শনে বেদবিরুদ্ধ কথা কিম্বা কোনও অসৎকল্পনা থাকা মোটেই সম্ভবপর হয় না। এই জন্যও বেদান্তদর্শনের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিতে পারা যায়। (১)

---

(১) ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"সোঽয়মভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ স্ববুদ্ধ্যতিশয়চিখ্যাপয়িষয়া পরবুদ্ধ্যবজ্ঞানায় চ প্রবর্ত্ততে।"

অর্থাৎ অতিশয় বুদ্ধিশক্তি প্রকাশের জন্য কিংবা পরপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনার্থ এই অভ্যুপগমবাদ স্বীকৃত হইয়া থাকে।

পরাশরোপপুরাণে কথিত আছে—

"অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্য-যোগয়োঃ।
ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোঽংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভিঃ॥
জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোঽংশো ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥"

(বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যভাষ্যভূমিকা)

বেদান্তদর্শনের বেদোপজীবিত্বও গৌরবের অন্যবিধ কারণ। পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা ভিন্ন অপর সমস্ত দর্শনই তর্ক-প্রধান। শ্রুতি উহাদের পরিকল্পিত তর্কের সহায়কমাত্র; কিন্তু বেদান্তদর্শন সেরূপ নহে। বেদান্তদর্শন সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রুতি-বাক্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, শ্রুতিরই তাৎপর্য্য নির্ণয়ে নিযুক্ত; সুতরাং শ্রুতিমূলক। শ্রুতির প্রামাণ্য ও গৌরব সর্ব্বসম্মত;

এখানে দেখা যায়, গোতমকৃত ন্যায়দর্শন, কণাদকৃত বৈশেষিকদর্শন, কপিলকৃত সাংখ্যদর্শন ও পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শন, এসকলের মধ্যে শ্রুতি-বিরুদ্ধ অংশও আছে; এই জন্য শ্রুতিপরায়ণ লোকদিগকে সেই সকল অংশ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসার ও বেদব্যাসকৃত উত্তরমীমাংসার কোথাও শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন কথা স্থান পায় নাই; কারণ, তৎপ্রণেতা জৈমিনি ও বেদব্যাস উভয়েই বেদবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মেও ভঙ্গী-ক্রমে এই কথারই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"ন্যায়তন্ত্রাণ্যনেকানি তৈস্তৈরুক্তানি বাদিভিঃ।
হেত্বাগম-সদাচারৈর্যদ্ যুক্তং তদুপাস্যতাম্॥" ইতি

অভিপ্রায় এই যে, বিভিন্ন মতের প্রবর্ত্তক পণ্ডিতগণ বহুবিধ ন্যায়তন্ত্র (তর্কশাস্ত্র) প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে যাহা বেদানুগত, সদাচারসম্মত ও যুক্তিদ্বারা সমর্থিত, কেবল তাহাই গ্রহণ করিবে, কিন্তু বিপরীত অংশ গ্রহণ করিবে না।

ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রামাণিক শাস্ত্রের মধ্যেও এমন অনেক কথা সন্নিবিষ্ট আছে, যাহা কেবল তর্কের অনুরোধে কিংবা স্বীয় প্রতিভাপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে (প্রৌঢ়িবাদরূপে) সিদ্ধান্তাকারে উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সে সমুদয় কথা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বা সিদ্ধান্তরূপে

সুতরাং তত্ত্বপজীবী বেদান্তদর্শনের প্রামাণ্য-গৌরবও অবিসংবাদিত ও অপ্রত্যাখ্যেয় বলিয়া গ্রহণকরা উচিত।

বিশেষতঃ আস্তিকগণের মধ্যে যত প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, প্রায় সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণই বেদান্তদর্শনকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং প্রায় সকলেই আপন আপন সিদ্ধান্ত সংরক্ষণের সহায়তাকল্পে বেদান্তদর্শনের উপর ছোট বড় বহুপ্রকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে এরূপ সমাদর ও ব্যাখ্যান-সৌভাগ্য একমাত্র বেদান্তদর্শন ভিন্ন অপর কোন দর্শনের ভাগ্যেই সম্ভবপর হয় নাই। বেদান্তদর্শনের অসামান্য আদরের কথা স্মরণ হইলে, স্বতই মহাকবি কালিদাসের সেই কথা মনে পড়ে—

"অহমেব মতো মহীপতেরিতি সর্ব্বঃ প্রকৃতিষ্বচিন্তয়ৎ॥"

বিশেষ এই যে, সেখানে কেবল রঘুর প্রকৃতিপুঞ্জই ব্যবহার-গুণে বিমুগ্ধ ছিল; আর এখানে বেদান্তদর্শনের ভাব, ভাষা ও বিষয়ের গৌরবমহিমায় বিশ্বমানবই বিমুগ্ধ হইতেছে।

গ্রহণযোগ্য নহে। প্রাচীন আর্যশাস্ত্রেও যে, উক্ত অভ্যুপগমবাদ স্থান লাভ করিয়াছে, প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুরাণ হইতে সে সংবাদ জানিতে পারা যায়—

"এতে ভিন্নদৃশাং দৈত্যা বিকল্পাঃ কথিতা ময়া।

কৃত্বাভ্যুপগমং তত্র সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মম॥" (১।১৭।৮৩ শ্লোক)

এখানে অবস্থাভেদে 'অভ্যুপগমবাদ' অবলম্বনের কথা স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকৃত হইয়াছে।

অধিক কি, যে সকল ন্যায়াচার্য্য দ্বৈতবাদে একান্ত অনুরক্ত ও তৎসংরক্ষণে বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের মধ্যেও অনেককে আত্মজ্ঞান-প্রধান বেদান্তসিদ্ধান্তের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। ন্যায়াচার্য্য মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন—

"তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্প-বিতণ্ডে—বীজপ্ররোহ-সংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ॥" (৪।২।৫০)।

অর্থাৎ গোতমের মতে 'কথা' তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা (১)। তন্মধ্যে জল্প ও বিতণ্ডা কথার প্রকৃত উদ্দেশ্য—তত্ত্বনিশ্চয় নহে, পরন্তু কৃতনিশ্চয় তত্ত্বের সংরক্ষণ। বীজের অঙ্কুর রক্ষার জন্য জমীতে যেমন কণ্টকময় বৃক্ষশাখা দ্বারা আবরণ করা (বেড়া দেওয়া) হয়, তেমনি নির্দ্ধারিত তত্ত্বনিশ্চয়ে যাহাতে কেহ বাধা ঘটাইতে না পারে, এতদর্থে জল্প ও বিতণ্ডা-কথার আবশ্যক হয়। একথা দ্বারা প্রকারান্তরে জল্প ও বিতণ্ডা প্রধান স্বশাস্ত্রের অবস্থাও প্রকাশ করা হইল। অজ্ঞাতনামা জনৈক ন্যায়াচার্য্যের উক্তি বলিয়া একটী কথা প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতে উল্লিখিত গোতমসূত্রের মর্ম্ম আরও সুস্পষ্টার্থ করা হইয়াছে। কথাটী এইরূপ—

"ইদং তু কণ্টকাবরণং, তত্ত্বং হি বাদরায়ণাৎ।"

---

(১) তত্ত্বনিরূপণপ্রধান কথার নাম বাদ। তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশে পক্ষ প্রতিপক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক যে, বিচার, তাহার নাম জল্প। আর নিজের কোনও পক্ষ অর্থাৎ স্থিরতর মত বা সিদ্ধান্ত নাই, অথচ কেবল পরপক্ষ খণ্ডনের জন্য যে, বিচার, তাহার নাম বিতণ্ডা।

এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, তর্কপ্রধান এই ন্যায়দর্শন কেবল অঙ্কুর-রক্ষণার্থ স্থাপিত কণ্টকশাখার বেড়া মাত্র; বস্তুতঃ ইহা তত্ত্বকথা নহে; তত্ত্ব জানিতে হইবে বেদব্যাসকৃত বেদান্ত-দর্শন হইতে। একথার আর অধিক ব্যাখ্যান অনাবশ্যক।

প্রসিদ্ধ ন্যায়াচার্য্য উদয়নাচার্য্য নিজে ন্যায়সম্মত দ্বৈত-বাদের পক্ষপাতী ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি দ্বৈতবাদের পক্ষপাতী হইয়াও আত্মতত্ত্বোপদেশক বেদান্তদর্শনের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। সে অনুরাগ তাহার লিখনভঙ্গী হইতেই জানিতে পারা যায়। তিনি স্বকৃত 'আত্মতত্ত্ব-বিবেক'-নামক গ্রন্থের এক স্থানে বেদান্তসম্মত আত্মজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"সা চাবস্থা ন হেয়া, মোক্ষনগরে গোপুরায়মানত্বাৎ।"

অর্থাৎ বেদান্তসম্মত আত্মজ্ঞান কাহারও পক্ষেই উপেক্ষণীয় নহে; কারণ, উহাই মোক্ষ-নগরে প্রবেশের 'গোপুর'—পুর-প্রবেশের প্রধান উপায়। এখানে তিনি বেদান্তের মুখ্য প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ইহার পরেও তিনি শূন্যবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন প্রসঙ্গে পুনরায় বেদান্ত-সম্মত (শঙ্করসম্মত) বিবর্ত্তবাদের সমালোচনা উপলক্ষে অতি বড় একটী কথা বলিয়াছেন—

"তদাস্তাং তাবৎ, কিমার্দ্রকবণিজাং বহিত্রচিন্তয়া।"

অর্থাৎ বেদান্তসম্মত বিবর্ত্তবাদের আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। বেদান্তসম্মত বিবর্ত্তবাদের আলোচনা করা—

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর লওয়ার মত অনধিকার চর্চা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি কেবল মুখে নয়, মনে মনেও বেদান্তসিদ্ধান্তের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করিতেন। তিনি আর এক স্থানে শূন্যবাদী বৌদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন (১)—

"প্রবিশ বা অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিকুক্ষিং, তিষ্ঠ বা মতিকর্দ্দমনপহায় ন্যায়-নয়ানুসারেণ।"

হে শূন্যবাদী বৌদ্ধ, তুমি কিছুতেই তোমার সিদ্ধান্ত রক্ষা করিতে পারিতেছ না, এবং পারিবেও না। এখন তোমার দুইটা পথ উন্মুক্ত আছে,—এক বেদান্তের 'অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি'-গর্ত্তে প্রবেশ-করা, আর না হয়, মনের ময়লা অর্থাৎ বুদ্ধির দোষ দূর করিয়া ন্যায়ের মতানুসারে চলা। অতএব, হয় তুমি দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব অপলাপ করিয়া বেদান্তের অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদের আশ্রয় গ্রহণ কর (২), নচেৎ জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া

---

(১) বৌদ্ধদের এক সম্প্রদায়ের নাম 'মাধ্যমিক'। মাধ্যমিকগণ শূন্যবাদী। তাহারা বলেন, জগতে যাহা কিছু সৎ—যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই শূন্যাবশেষ, অর্থাৎ শূন্যেতে পরিসমাপ্ত হয়, শূন্যই সৎপদার্থের শেষাবস্থা। প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে যেমন শূন্যে পরিণত হয়, তেমনই জগতেরও সবই শূন্য হইয়া যায়, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। আত্মার অবস্থাও এইরূপ। শূন্যই তত্ত্ব; সুতরাং তাহাই সত্য, আর সমস্তই অসত্য।

(২) শঙ্করাচার্য্য বেদান্তব্যাখ্যায় 'অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি' নামে একটী সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহা এইরূপ,—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সমস্তই অসত্য—মিথ্যা। ব্রহ্মের একটী শক্তি আছে, তাহার নাম

আমাদের ন্যায়সম্মত মত অবলম্বন কর। তোমার শূন্যবাদ কিছুতেই রক্ষা পাইতেছে না। আচার্য্য শঙ্করস্বামী বেদান্তদর্শন অবলম্বনে 'অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি' স্থাপন করিয়াছেন। আচার্য্য উদয়ন এখানে সেই কথারই উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্তের অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি-বাদ যদি আচার্য্য উদয়নের অনুমোদিত না হইত, তাহা হইলে, তিনি কখনই পরপক্ষ খণ্ডনস্থলে 'অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি'কে স্বসিদ্ধান্তের সমান সম্মান প্রদান করিতেন না; অথচ তাহাই তিনি করিয়াছেন। অতএব, বেদান্তদর্শনের উপর যে, তাঁহার বিশেষ সম্মানবুদ্ধি ছিল, একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। (১)

আচার্য্য উদয়ন ঐ গ্রন্থেরই অন্যত্র বৌদ্ধমত খণ্ডন উপলক্ষে আরও স্পষ্ট কথায় বেদান্তের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিয়াছেন—

"ন গ্রাহ্যভেদমবধূয় ধিয়োঽস্তি বৃত্তিঃ,
তদ্বাধনে বলিনি বেদনয়ে জয়শ্রীঃ।
নোচেদনিন্দ্যমিদমীদৃশমেব বিশ্বং—
তথ্যম্, তথাগতমতস্য তু কোঽবকাশঃ॥"

মায়া বা অবিদ্যা। এই মায়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়, সৎও নয়, অসৎও নয়,—উহা অনির্ব্বচনীয়, অর্থাৎ মায়াকে সৎ বা অসৎরূপে নির্ব্বাচন করা যায় না; এইজন্য উহা অনির্ব্বচনীয়। এই অনির্ব্বচনীয় মায়াপ্রভাবে নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মেও দ্বৈতভাব উপস্থিত হয়। অনির্ব্বচনীয় মায়া দ্বারা কল্পিত বিধায় এই দ্বৈত জগৎও অনির্ব্বচনীয়রূপে পরিগণিত।

(১) কোন কোন নৈয়ায়িক "বেদান্তা যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে" ইত্যাদি প্রকার বিদ্রূপবাণী প্রয়োগ করিয়া আপনাদের অসমীক্ষ্যকারিতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাহারা উপরি উদ্ধৃত উদয়নাচার্য্যের কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন।

অভিপ্রায় এই যে, বৌদ্ধগণ বুদ্ধি-বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাহারা বলেন—আমাদের মানসিক জ্ঞানই অবিদ্যাদোষে বাহ্য ঘটপটাদি পদার্থাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, বাহিরে উহাদের কোন সত্তাই নাই ইত্যাদি। আচার্য্য উদয়ন বলিতেছেন যে, বৌদ্ধদের এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধও নয়, এবং নূতনও নয়। প্রথমতঃ বাহিরে বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন পদার্থ না থাকিলে বুদ্ধির বৃত্তিই (জ্ঞানই) হইতে পারে না; কারণ, বিষয়রহিত জ্ঞান কোথাও দৃষ্ট হয় না, এবং হইতেও পারে না। কাজেই অন্তরস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই যে, বাহ্য বস্তুরূপে প্রকাশ পায়, একথা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বাহ্য ঘটপটাদি পদার্থের অসত্যতাই যদি অবধারিত হয়, তাহা হইলেও প্রবল বেদনয়ের অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদী বেদান্তেরই জয়। কারণ, অদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণের মতে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তুই, এমন কি বুদ্ধি-বিজ্ঞানও সত্য নহে, পরন্তু মায়িক—অসত্য। কাজেই এপক্ষে বৌদ্ধকে বেদান্তমতে প্রবেশ করিতে হয়। আর যদি তাহা না হয়, তবে ত দৃশ্যমান বিশ্ব, যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং তাহা হইলে ন্যায়মতেরই জয়। অতএব বৌদ্ধমতের আর অবকাশ বা কার্য্যক্ষেত্র কোথায়?

এখানে উদয়নাচার্য্য 'বেদনয়' বেদান্তকে 'বলিনি' (প্রবল) বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইদানীন্তন নৈয়ায়িকদের মধ্যে কেহ কেহ বেদান্তদর্শনের উপর অবজ্ঞা

বা অনাস্থা প্রদর্শন করিলেও প্রাচীন প্রবীণ ন্যায়াচার্য্যগণ কখনও সেরূপ ব্যবহার করিতেন না, বরং সমধিক শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করিতেন; উক্ত উদয়নবাক্যই তাহার প্রমাণ।

[বেদব্যাসের আবির্ভাবকাল।]

এমন উপাদেয় সর্ব্বসম্প্রদায়ের আদরের বস্তু উক্ত ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শন যে, কোন শুভ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য পাঠকবর্গের কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়; সুতরাং তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অসঙ্গত মনে হয় না। ন্যায়-বৈশেষিকাদিদর্শনের আবির্ভাবকাল যেরূপ দুর্ভেদ্য অন্ধকারাবৃত ও সংশয়সমাকুল, আলোচ্য বেদান্তদর্শনের আবির্ভাবকাল সেরূপ দুর্ব্বিজ্ঞেয় বা সংশয়াবিষ্ট নহে; কারণ, উহার রচয়িতার আবির্ভাবকাল স্মরণাতীত নহে। তদ্বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদানক্ষম ইতিহাস গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে; সুতরাং সেই সময়ের সাহায্যেই তৎপ্রণীত বেদান্তদর্শনের কালও সহজেই সংকলন করা যাইতে পারে।

নারায়ণাবতার মহর্ষি বেদব্যাস যে, ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শনের রচয়িতা, তদ্বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কাহারো মতভেদ নাই। প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ নারায়ণ দ্বাপরের শেষ সময়ে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রথমে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে অভিহিত হন, পরে তিনিই বেদবিভাগপূর্ব্বক সংহিতা সংকলন করিয়া বেদব্যাস নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কলিযুগের বয়ঃপরিমাণ কিঞ্চিদধিক পঞ্চ সহস্র বৎসর।

ইহার পূর্ব্বসন্ধ্যার কাল ছত্রিশ হাজার বৎসর; সুতরাং একচল্লিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে কোন এক সময়ে বেদব্যাসের আবির্ভাব হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে এতদপেক্ষা সূক্ষ্ম জন্মপত্রিকা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক; এবং এজন্য অধিক সময়ক্ষেপ করাও নিষ্প্রয়োজন; সুতরাং এ কথা এখানেই শেষ করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচনার সময়-নির্দ্দেশের চেষ্টা করা যাউক।

[ব্রহ্মসূত্র রচনার কাল]

এদেশের প্রামাণিক ইতিহাস পুরাণ ও মহাভারতপ্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, মহর্ষি বেদব্যাস কেবল বেদশাস্ত্রের বিভাগ সাধন করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তিনি ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শন), অষ্টাদশ মহাপুরাণ, মহাভারত, এবং ধর্ম্মসংহিতা প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছিলেন। ইহাও জানিতে পারা যায় যে, বেদব্যাস সর্ব্বপ্রথমে বেদবিভাগ সম্পাদন করিয়া এবং শিষ্যবর্গে সে সকলের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ভার সমর্পণ করিয়া, পরে অপরাপর গ্রন্থনিচয় রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে কোনটী পূর্ব্বে বা কোনটী পরে রচনা করিয়াছিলেন, সে কথা কোথাও স্পষ্টাক্ষরে কথিত নাই। দেবীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে একটী শ্লোক আছে। তাহাতে বেদব্যাসকৃত গ্রন্থশ্রেণীর পারম্পর্য্য ক্রমে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"বেদশাখাঃ পুরাণানি বেদান্তং ভারতং তথা।
কৃত্বা সম্মোহ-সমুদ্রোঽভবঃ রাজন্ মনস্তপি॥"

এই শ্লোকোক্ত ক্রমকে যদি গ্রন্থরচনারই যথার্থ ক্রম বলিয়া

গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বেদশাখার পরই পুরাণগ্রন্থ, অনন্তর বেদান্ত (ব্রহ্মসূত্র), তাহার পর মহাভারত রচিত হইয়াছিল বুঝিতে হয় (১)। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহাভারতের পরে পুরাণ রচনার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রৌষ্টুকি জিজ্ঞাসুভাবে মার্কণ্ডেয়ের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—

" তদিদং ভারতাখ্যানং বহ্বর্থং শ্রুতিবিস্তরম্।
তত্ত্বতো জ্ঞাতুকামোঽহং ভগবন্তমুপস্থিতঃ॥ "

আমি মহাভারতে যে উপাখ্যান অবগত হইয়াছি, তাহাই যথাযথভাবে জানিবার ইচ্ছায় আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এখানে মহাভারতের পর যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণ বিরচিত হইয়াছিল, তাহা একপ্রকার স্পষ্ট কথায়ই ব্যক্ত করা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, পুরাণ রচনার পর যে, মহাভারত বিরচিত হইয়াছিল, একথা বহু প্রমাণ দ্বারাই সমর্থিত হয়। মৎস্যপুরাণে আছে—

"অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে তদুপবৃংহিতম্॥"

অর্থাৎ সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়া অবশেষে সম্পূর্ণ মহাভারত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

---

(১)। মৎস্য পুরাণেই অন্যত্র কথিত আছে,—

" অষ্টাদশভ্যস্তু পৃথক্ পুরাণং যৎ প্রদৃশ্যতে।
বিজানীধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তদা তেভ্যো বিনির্গতম্॥ "

অষ্টাদশ পুরাণের অতিরিক্ত যে সমস্ত পুরাণ (উপপুরাণ) দৃষ্ট হয়, ঐ সমস্ত গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে উক্ত অষ্টাদশ পুরাণ হইতেই বহির্গত হইয়াছে; সুতরাং সে সকল পুরাণের সহিত মহাভারত বা বেদান্তদর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্য চিন্তার প্রয়োজন নাই।

ইহা দ্বারা উত্তমরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, মহাভারত রচনার-পূর্ব্বেই অষ্টাদশ পুরাণ বিরচিত হইয়াছিল। আলোচ্য বেদান্ত-দর্শন যে, অষ্টাদশ পুরাণেরও অগ্রে আত্মলাভ করিয়াছিল, একথা প্রকারান্তরে প্রমাণিত হইতেছে। পুরাণশাস্ত্রই এ বিষয়ে বিস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গরুড়পুরাণে ভাগবতগ্রন্থের পরিচয় প্রদানপ্রসঙ্গে কথিত আছে,—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥"
(শ্রীধরস্বামিধৃত গরুড়পুরাণ)

এখানে যখন শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্র—বেদান্তদর্শনেরই অর্থ বা ব্যাখ্যাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন বেদান্তদর্শন যে, পুরাণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী. তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থই পশ্চাৎ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। বেদান্তদর্শন পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকিলেই পশ্চাৎ তাহার ব্যাখ্যারূপে ভাগবত পুরাণ বিরচিত হইতে পারে, নচেৎ নহে (১)। তবে যে, দেবীভাগবতে পুরাণ-রচনার পরে বেদান্তদর্শন রচনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ ঐ সমুদয় গ্রন্থরচনার পৌর্ব্বাপর্য্যবোধক নহে, পরন্তু ব্যাসকৃত গ্রন্থরাশির নিদর্শনমাত্র, এবং তাহা দ্বারা, বেদব্যাস যে,

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে 'সত্যং পরং' কথায় বেদান্তের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (১।১।১) সূত্রের অর্থ বিবৃত করা হইয়াছে, এবং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" কথায় বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২) সূত্রের অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এইরূপ অভিপ্রায়েই "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং" বলা হইয়াছে।

ঐ সমুদয় গ্রন্থ রচনা করিয়াও, প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ হন নাই, এই কথাই সেখানে ব্যক্ত করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু গ্রন্থসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য কথিত হয় নাই। দেবীভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠও একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ পুরাণে ও মহাভারতে বহুল পরিমাণে বেদান্তদর্শনের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, তদ্দর্শনেও অনুমিত হয় যে, পুরাণ ও মহাভারত রচনার পূর্ব্বেই বেদান্তদর্শন বিরচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। নচেৎ ঐ সমুদয় শাস্ত্রে বেদান্তদর্শনের উল্লেখ থাকা কখনই সম্ভবপর হইত না। পরাশরোপপুরাণে 'বৈয়াস' শব্দদ্বারা ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে—

"জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোংশো ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থ-বিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥"

এখানে 'জৈমিনীয়' শব্দে পূর্ব্বমীমাংসা, আর 'বৈয়াস' শব্দে ব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসা বেদান্তদর্শনই অভিহিত হইয়াছে।

মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতায় 'বেদান্ত' ও 'ব্রহ্মসূত্র' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্।"
"ব্রহ্মসূত্র-পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্ব্বিনিশ্চিতৈঃ।" ইত্যাদি

উল্লিখিত প্রথম বাক্যে ভগবান্ আপনাকে 'বেদান্তকৃৎ'—বেদান্তের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে 'ব্রহ্মসূত্র' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন (১)। বেদান্তদর্শন

---

(১) বেদান্ত শব্দের মুখ্য অর্থ উপনিষদ্। কিন্তু এখানে সে অর্থ গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, উপনিষদ্ বস্তুতঃ অনাদিসিদ্ধ বেদ হইতে পৃথক্ নহে, এবং 'বেদবিৎ' কথায়ই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে; কাজেই বেদান্ত শব্দে ব্রহ্মসূত্রই বুঝিতে হইবে, এবং তৎকর্তৃত্বই ভগবান্ আপনাতে স্বীকার করিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

অগ্রে রচিত না হইলে ভগবদ্গীতায় ভগবানের মুখে ঐ প্রকার উক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে—

"বিভজ্য চতুরো বেদান্ শিষ্যানধ্যাপ্য যত্নতঃ।
জৈমিনিং পূর্ব্বমীমাংসামাদিশ্য স্বয়মন্ততঃ।
ব্রহ্মবিদ্যাবিশুদ্ধ্যর্থং ব্যাসঃ সূত্রাণি নির্ম্মমে॥"
(বিশ্বরূপজী টীকাধৃত পুরাণবচন)

উল্লিখিত শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ব্যাসদেব বেদ-বিভাগের পর, প্রথমতঃ ঐ সমুদয় সংহিতা বিভিন্ন শিষ্যকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। পরে জৈমিনিকে বেদের পূর্ব্বমীমাংসা রচনার আদেশ করিয়া—স্বয়ং উত্তরভাগের তাৎপর্য্য নির্ণয়ের জন্য সূত্র-সমূহ রচনা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্মবিদ্যা বিশুদ্ধির জন্য, যে সূত্রসমূহ রচিত হইয়াছিল, সেই সূত্রসমূহ এই ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শন ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। প্রসিদ্ধ কিংবদন্তীও এ পক্ষে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে।

এখানে এ কথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র বেদার্থেরই সমর্থক (১)। বেদে যে সমুদয় দুর্ব্বিজ্ঞেয় তত্ত্ব নিরূপিত আছে, সে সমুদয়কে সরল ও সরস করিয়া লোকের বোধগম্য করানই পুরাণের ও ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য; সুতরাং

(১) "ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ" অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদার্থের পোষণ করিবে; অর্থাৎ বেদের প্রকৃতার্থ নির্ণয় করিবে।

ব্রহ্মসূত্র রচনার পরে হইলেই, পুরাণ ও ইতিহাস রচনার সার্থকতা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বে হইলে হইতে পারে না। অতএব যে দিক্ দিয়াই আলোচনা করা যাউক না কেন, বেদান্ত-দর্শন—ব্রহ্মসূত্র যে, পুরাণাদি শাস্ত্রেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই; সুতরাং কলিযুগেরও পূর্ব্বে—দ্বাপরের শেষভাগে কোন এক অনির্দ্দেশ্য সময়কে উহার আবির্ভাবকাল বলিয়া নির্দ্ধারণ করা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই।

ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে কোন কোন স্থানে কাশকৃৎস্ন, উপবর্ষ, বাদরি ও জৈমিনি প্রভৃতি কতিপয় প্রাচীন আচার্য্যের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা যে, কোন শুভ মুহূর্ত্তে ধরাধাম অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোন প্রকৃষ্ট উপায় নাই। যাহারা বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে সেই চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত, কৌটিল্য ও পাণিনি প্রভৃতি—অপেক্ষাকৃত পুরাতন মনীষিগণের আবির্ভাব ও স্থিতিকাল ধরিয়া উহাদের সময়াবধারণে প্রয়াস পান, তাহাদের চেষ্টা ও সহিষ্ণুতাকে ধন্যবাদ দিলেও, পণ্ড পরিশ্রমের পরিণাম দর্শন করিয়া সম্ভবতঃ সকলকেই পরিশেষে নৈরাশ্যের তপ্তশ্বাসে তৃপ্তিলাভ করিতে হয়। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য, বলিলাম, অতঃপর প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

[বেদান্তদর্শনের বিষয় বিভাগ।]

উক্ত বেদান্তদর্শনের অপর নাম—শারীরক মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি। বেদান্তদর্শন চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ বা পরিচ্ছেদ

আছে ; সুতরাং সমষ্টিতে বেদান্তদর্শনের পাদসংখ্যা ষোড়শ, এবং সূত্রসংখ্যা পাঁচ শত পঞ্চান্ন। অবশ্য এইরূপ সূত্রসংখ্যা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অভিমত হইলেও সর্ব্বসম্মত নহে ; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকার সূত্রসংখ্যার বিশেষ তারতম্য ঘটাইয়াছেন। এক জন ভাষ্যকার যাহা একটী সূত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অন্য ভাষ্যকার আবার স্থানবিশেষে তাহাকেই দুইটী সূত্রে বিভক্ত করিয়াছেন। এই কারণে সম্প্রদায়ভেদে সূত্রসংখ্যার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। উপরে যে, সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যানুযায়ী সূত্রসংখ্যা বুঝিতে হইবে।

উপরে, যে চারিটী অধ্যায়ের উল্লেখ করা হইল, উহারা যথাক্রমে 'সমন্বয়', 'অবিরোধ' 'সাধন' ও 'ফলাধ্যায়' নামে পরিচিত। এইপ্রকার নামকরণ হইতেই অধ্যায়গুলির প্রতিপাদ্য বিষয়ও বুঝিতে পারা যায়। যে অধ্যায়ের যাহা প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা দ্বারাই সেই অধ্যায়কে পরিচিত করা হইয়াছে। সমন্বয়াখ্য প্রথমাধ্যায়ে ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতির পদ ও বাক্যসমূহের সমন্বয় সংস্থাপিত হইয়াছে (১)। প্রথম অধ্যায়ে সিদ্ধান্তিত

(১) 'সমন্বয়' অর্থ—আপাততঃ ভিন্নার্থ প্রতিপাদক পদসমূহের যে, একই অর্থে তাৎপর্য্যাবধারণ, তাহার নাম সমন্বয়। পদের ন্যায় বাক্যেরও সমন্বয় আছে। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকরণে এমন অনেক বেদান্তবাক্য দৃষ্ট হয়, যে সকল বাক্য বা পদ দেখিবামাত্র মনে হয় যে, এ সকল বাক্য ও পদ ব্রহ্মপ্রতিপাদক নহে—অন্য বস্তুর প্রতিপাদক। অথচ বিচার করিলে বুঝা যায় যে, যদিও ঐ সকল বাক্য ও পদ আপাততঃ অন্য বস্তুর প্রতিপাদক হউক, তথাপি অদ্বিতীয় ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই ঐ সকলের তাৎপর্য্য, অন্যত্র নহে।

সমন্বয়ের উপর প্রতিপক্ষদল যে, শাস্ত্রান্তরবিরোধ ও তর্কবিরোধ উদ্ভাবিত করিয়া থাকেন, সেই সমুদয় বিরোধের পরিহার ও বিপক্ষপক্ষের অযৌক্তিকতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, এবং ভোক্তা ও ভোগ্যসৃষ্টিবিষয়ক বিরোধেরও সমাধান করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভের উপায় ও 'তত্ত্বং' পদার্থের পরিশোধন প্রণালী বিবৃত হইয়াছে; আর চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের ফলস্বরূপ মুক্তির কথা বিশেষভাবে নিরূপিত হইয়াছে।

পাঠকবর্গের বোধ সৌকর্য্যার্থ প্রত্যেক অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়গুলিই বিশ্লেষণপূর্ব্বক চারিটী পাদে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে। যেমন, প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রহ্মবোধক স্পষ্টলিঙ্গক বেদান্তবাক্যের সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে সকল বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মপরত্ব-'ব্রহ্মে তাৎপর্য্য' নির্ণয়ের বিস্পষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে, কেবল সেই সকল বাক্যেরই সমন্বয় সংস্থাপন করা হইয়াছে। আর যে সকল বেদান্তবাক্যে ব্রহ্মপরত্ব-নির্ণয়ের স্পষ্ট কোনও হেতু আপাততঃ দৃষ্ট হয় না, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে কেবল সেই সমুদয় বাক্যেরই ব্রহ্মবিষয়ে সমন্বয় সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দ্বিতীয় পাদে কেবল ব্রহ্ম-বিষয়ক উপাসনাবোধক বাক্যসমূহের সমন্বয়, আর তৃতীয় পাদে কেবল জ্ঞেয় ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের সমন্বয় মাত্র সমর্থিত হইয়াছে; এবং চতুর্থপাদে, যে সমুদয় শব্দ সন্দিগ্ধার্থ-বোধক, অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যে সকল শব্দের অব্রহ্মপরত্ব বলিয়া

সংশয় হইয়া থাকে, কেবল সেই সকল বেদান্ত-শব্দেরই প্রকৃতার্থ নির্ণয় (সমন্বয়) করা হইয়াছে (১)।

অবিরোধাখ্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে—সাংখ্য ও বৈশেষিকাদি দর্শনকর্ত্তৃগণ বেদান্ত-সমন্বয়ের বিপক্ষে, যে সকল শাস্ত্রবিরোধ ও যুক্তিবিরোধ উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, সে সকলের পরিহার দ্বারা অবিরোধ সংস্থাপন, দ্বিতীয়পাদে—বেদান্তসমন্বয়ের বিপক্ষগণের উদ্ভাবিত মতবাদের উপর দোষ প্রদর্শন, তৃতীয় পাদের প্রথম অংশে পঞ্চ মহাভূতবিষয়ক শ্রুতির ও শেষাংশে ভোক্তা জীব-বিষয়ক শ্রুতির অবিরোধ প্রদর্শন। আর চতুর্থ পাদে লিঙ্গশরীর প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসম্বন্ধে আশঙ্কিত বিরোধের পরিহার প্রদর্শন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে—মৃত্যুর পর পুনরায় দেহধারণের প্রণালী বর্ণন; দ্বিতীয় পাদে "তৎ ত্বম্ অসি" এই মহাবাক্যার্থ-শোধন, অর্থাৎ উক্ত বাক্যার্থবোধের উপযোগী 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থ নিরূপণ। তৃতীয় পাদে গুণোপ-সংহার, অর্থাৎ সগুণোপাসনায় বিভিন্ন শাখোক্ত গুণবিশেষের গ্রহণাদির নিয়ম প্রদর্শন; এবং চতুর্থপাদে ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ভূত

---

(১) যেমন 'অজা' শব্দ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং" ইত্যাদি। এই 'অজা' শব্দের অর্থ কি ?—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ? কিংবা বেদান্তের ব্রহ্ম ? অথবা আর কিছু ? প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে বিচার দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, এই 'অজা' অর্থে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বা অন্য কিছু নহে; পরন্তু বেদান্তের ব্রহ্ম, এই জাতীয় পদসমন্বয় চতুর্থপাদে স্থান পাইয়াছে।

বহিরঙ্গ সাধন—আশ্রম কর্ম্মাদির এবং অন্তরঙ্গ সাধন—শমদমাদির নিরূপণ। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবন্মুক্তি নিরূপণ; দ্বিতীয় পাদে মৃত্যুকালীন দেহত্যাগের প্রণালী কথন; তৃতীয় পাদে সগুণোপাসকের উত্তরায়ণ পথে গমনের বিবরণ, এবং চতুর্থ পাদে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নির্গুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি, আর সগুণোপাসকের ব্রহ্মলোকে অবস্থান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উল্লিখিত বিষয়সমূহই বেদান্তদর্শনের চারি অধ্যায়ের ষোড়শটী পাদে বিশেষভাবে নিরূপিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আরও অনেক বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উত্তমরূপে বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে।

আলোচ্য ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শন অবলম্বনে বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলি ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। সেগুলি টীকা, ভাষ্য, বৃত্তি বা বিবরণ নামে প্রসিদ্ধ। তাহা ছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই বেদান্তদর্শন অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইহার মর্ম্মার্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহার কতকগুলি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। হয়, সেগুলি চিরদিনের জন্য কালকবলে পতিত হইয়াছে, না হয়, লোকলোচনের অগোচরে কোথাও অজ্ঞাতবাসে অবস্থান করিতেছে। জানি না, সে সমুদায়ের পুনরুদ্ধার হইবে কি না?

প্রসিদ্ধ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনশাস্ত্র যেরূপ তর্কপ্রধান—নির্দ্দোষ তর্কের সাহায্যে অভিমত তত্ত্বনির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছে, এবং কোথাও পূর্ণমাত্রায় শ্রুতিবাক্যের উপর আত্মনির্ভর করে নাই,

নিতান্ত আবশ্যকমতে স্থানে স্থানে শ্রুতিবাক্যের সহায়তামাত্র গ্রহণ করিয়াছে ; কিন্তু আলোচ্য বেদান্তদর্শন সেরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করে নাই। বেদান্তদর্শন প্রধানতঃ শ্রুতিবাক্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সন্দিহ্যমান শ্রুতিবাক্যসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্যনির্দ্ধারণ করিয়াছে, এবং সেই অবধারিত তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি-সাধনের জন্য স্থলবিশেষে তর্কেরও সাহায্য লইয়াছে সত্য, কিন্তু কোথাও তর্কের উপর আত্মনির্ভর করে নাই। শ্রুতিবাক্যের বিরোধ সমাধানের জন্য তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত বলিয়াই—বেদান্তদর্শন 'উত্তর-মীমাংসা' নামে অভিহিত হইয়াছে (১)।

বেদান্তদর্শনের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ন্যায়াদিদর্শনে যেরূপ লৌকিক অলৌকিক উভয়বিধ বস্তুবিচারই স্থান পাইয়াছে, বেদান্তদর্শনে সেরূপ কোন বিচার স্থানলাভ করে নাই। ব্রহ্মই ইহার মুখ্য বিষয় ; সুতরাং ব্রহ্মবিচার মুখ্যরূপে এবং অন্যান্য বিষয়ের বিচার তদানুষঙ্গিকরূপে ইহার কলেবর পূর্ণ করিয়াছে। ব্রহ্মনিরূপণ মুখ্য বিষয় বলিয়াই বেদান্তদর্শন 'ব্রহ্মসূত্র' নামে পরিচিত হইয়াছে।

আস্তিক দর্শনের মধ্যে একমাত্র বেদান্তদর্শন ভিন্ন সমস্ত দর্শনেই জড় জগতের সত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে, সেই জাগতিক

---

(১) মহামুনি জৈমিনি বেদের পূর্ব্বভাগ কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বনে যে মীমাংসাদর্শন রচনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বমীমাংসা নামে পরিচিত, আর মহর্ষি বেদব্যাস বেদের উত্তরভাগ—জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বনে যে মীমাংসা-শাস্ত্র (বেদান্তদর্শন) রচনা করিয়াছেন, তাহা উত্তরমীমাংসা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পদার্থের সংখ্যা ও বিভাগাদি বিচারিত হইয়াছে, এবং সেই সমুদয় স্বীকৃত পদার্থ সমর্থনের জন্য যথাসম্ভব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণভেদও বিশেষভাবে নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু বেদান্তদর্শনে সে সকল বাহুল্য আদৌ স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই. কারণ, বেদান্তদর্শনের মতে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থই সত্য নহে, সকলই মায়িক—মিথ্যা বা অসত্য। অসত্যের সংখ্যাবিভাগাদি কল্পনা অনাবশ্যক, এবং তৎসমর্থনোপযোগী প্রমাণচিন্তাও নিরর্থক। কাজেই বেদান্তদর্শনে স্পষ্টভাষায় সে সব বিষয় আলোচিত হয় নাই। তবে আবশ্যক ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ পূর্ব্বমীমাংসা-সম্মত প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়াছেন (১)।

শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বহু প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত—বেদান্তদর্শনের উপর উল্লেখযোগ্য অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভগবান্ বোধায়ন. উপবর্ষ পণ্ডিত, ভর্তৃপ্রপঞ্চ বা ভর্তৃহরি, শঙ্কর, ভট্টভাস্কর, দ্রমিড়, রামানুজ. মধ্ব, বল্লভ, শঙ্করমিশ্র, বিজ্ঞানভিক্ষু, নিম্বার্ক, নীলকণ্ঠ, বলদেব প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামানুজাচার্য্য শ্রীভাষ্যের প্রারম্ভে বোধায়নকৃত বিস্তীর্ণ ভাষ্য-গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বোধায়নকৃত বেদান্তব্যাখ্যা অপর

---

(১) বেদান্তাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন—"ব্যবহারে তু ভাট্টাঃ।" অর্থাৎ বৈদান্তিকগণ সিদ্ধান্তস্থলে পূর্ব্বমীমাংসার মত গ্রহণ না করিলেও ব্যবহার-ক্ষেত্রে তাঁহারা সকলেই ভট্টমতাবলম্বী—অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসার আচার্য্য কুমারিল ভট্টের অভিমত প্রমাণাদি স্বীকার করিয়া থাকেন।

কোথাও দৃষ্ট হয় না, এবং কোথাও উহার নামোল্লেখপর্য্যন্ত দেখা যায় না (১)। আচার্য্য শঙ্কর উপবর্ষের নাম ও মতবিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বহুস্থানেই ভর্তৃপ্রপঞ্চের কথা বা মতবিশেষ খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।

শঙ্করকৃত শারীরকভাষ্য, রামানুজকৃত শ্রীভাষ্য (২), মধ্বাচার্য্যকৃত মাধ্বভাষ্য, বল্লভাচার্য্যকৃত অণুভাষ্য, শঙ্করমিশ্রকৃত বৃত্তি, বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য, নিম্বার্কভাষ্য, জয়াদিত্যকৃত পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গোবিন্দভাষ্য এবং আরও দুই একখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থ এখনও সুধীসমাজে অল্পাধিক পরিমাণে প্রচলিত আছে। কিন্তু শৈব বা শাক্ত সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এখনও সমাজে আত্মপ্রকাশ করে নাই, ভবিষ্যতের কথা ভবিতব্যতাই জানে।

বেদান্তদর্শনের উপর যে সমুদয় ভাষ্য বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ এখনও বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত আছে, যে সমুদয়ের প্রামাণ্য ও যৌক্তিকতা

---

(১) শ্রীভাষ্যের প্রারম্ভে রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ" ইত্যাদি।

এই বোধায়ন যে, কে, বা কবে কোথায় ছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। বস্তুতঃ ঐ নামে কেহ ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে অনেকেরই সংশয় আছে।

(২) বেদান্তদর্শনের উপর রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য ছাড়া বেদান্তসার ও বেদান্তপ্রদীপ নামে আরও দুইখানি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে, তাহা এখনও পাওয়া যায়।

সুধীসমাজে সাদরে স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে, এবং যে সমুদয়ের নির্দ্দেশানুসারে এখনও বহু সম্প্রদায় পরিচালিত হইতেছে, সেই সমুদয় প্রামাণিক ব্যাখ্যার মধ্যে আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যব্যাখ্যাই সর্ব্বপ্রধান। শাঙ্করভাষ্যের সহিত কাহারো তুলনা হয় না; উহা যেন সারস্বত-কুঞ্জের বীণাধ্বনি। উহার ভাষা যেমন মধুর, তেমনই সরস এবং তেমনই প্রসাদ-গম্ভীর। অর্থসম্পদেও উহা অতুলনীয়। জটিল দার্শনিক তত্ত্বের স্বল্প কথায় সমাধান যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা শাঙ্করভাষ্যেই আছে, অন্যত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এবংবিধ বহু গুণ থাকায়ই শাঙ্করভাষ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় ও বহু ব্যাখ্যায় সমলঙ্কৃত হইয়াছে। এখন প্রথমে আমরা এই শাঙ্করভাষ্যসম্মত সিদ্ধান্তেরই আলোচনা করিব, পরে অপরাপর ব্যাখ্যাসম্মত সিদ্ধান্তের কথাও বলিব।

[শঙ্করের আবির্ভাব সময়]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আচার্য্য শঙ্কর সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্ত্তি শঙ্করের অবতার। তাঁহার আবির্ভাবকাল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস, তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু শৃঙ্গেরীমঠে যে গুরুক্রম লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে একশত তৃতীয় (১০৩) বিক্রমাব্দ (সংবৎ) আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাবকাল বলিয়া লিখিত আছে। মহারাষ্ট্রপ্রদেশে আর একখানা অন্যপ্রকার গুরুক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত গুরু-ক্রম ও সময়ের যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু শিবরহস্য, শঙ্করচরিত বা শঙ্করদিগ্বিজয়ে ও বহুতর জৈনগ্রন্থে যাহা পাওয়া

যায়, তাহা উক্ত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। শিবরহস্যে লিখিত আছে—(১) যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনপ্রাপ্তির সময় হইতে কল্যব্দ ২০০০ (দুই হাজার) বৎসর অতীত হইলে পর, জৈন ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। জীববিজয় নামক জৈন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরাব্দ ধরিয়া কলির ২১৫৭ বৎসর গত হইলে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। এখন কলির অতীতাব্দ-সংখ্যা কিঞ্চিদধিক পঞ্চসহস্র বৎসর; সুতরাং এই হিসাবে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ধরিতে হয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে,

---

(১) "কলাবিমে মহাদেবি সহস্র-দ্বিতয়াৎ পরম্।
সারস্বতাস্তথা গৌড়াস্তথা কার্ণাঞ্জিনো দ্বিজাঃ॥
আমমীনাশনা দেবি আর্য্যাবর্ত্তানুবাসিনঃ।
উত্তরা বিন্ধ্যনিলয়া ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥
শব্দার্থ-জ্ঞানকুশলাস্তর্ক-কর্কশবুদ্ধয়ঃ।
জৈনা বৌদ্ধা বুদ্ধিযুতা মীমাংসানিরতাঃ কলৌ॥
বেদবোধক-বাক্যানামন্যথৈব প্ররোচকাঃ।" ইতি

মর্ম্মার্থ—কলিযুগে (যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনাধিরোহণের সময় হইতে) দুই হাজার বৎসর পরে আমমৎস্যভোজী সারস্বত, গৌড় ও কার্ণাঞ্জিন ব্রাহ্মণগণ প্রাদুর্ভূত হইবেন; আর জৈন ও বৌদ্ধগণ প্রাদুর্ভূত হইবেন। তাহারা সকলেই তর্কনিপুণ ও তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন। তাঁহারা বেদবাক্যের অন্যথা ব্যাখ্যা করিবেন। এখানে কলিযুগের দুই হাজার বৎসরের পর জৈন ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আবির্ভাবের কথা আছে। আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ অভ্যুদয়ের পর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; সুতরাং বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাবের সহস্র বৎসর পর শঙ্করের আবির্ভাব সময় ধরিলে বোধ হয় বিশেষ অসঙ্গতি হয় না।

উল্লিখিত সময়ের বহুশত বৎসর পরে শিবাবতার শঙ্করের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু অপর একখানি জৈন গ্রন্থে এ সিদ্ধান্তের বিপরীত কথা লিখিত আছে। সেখানে বৈদিক ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক আচার্য্য কুমারিল ভট্টের জন্মসময় কলির অতীতাব্দ ২১০৯ বৎসর ধরা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের ষোড়শ বৎসর বয়সের সময় 'রুদ্ধ' নগরে কুমারিল ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবিষয়ে সকলেই একমত। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, উল্লিখিত সময়ই যেন আচার্য্যদেবের প্রকৃত আবির্ভাব-সময়। শঙ্করদিগ্বিজয় ও শঙ্কর-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থেও শঙ্করের আবির্ভাবকাল কথিত আছে সত্য, কিন্তু তাহা পরস্পর অসংলগ্ন; সুতরাং তত্ত্বনির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। তবে, কুমারিল ভট্টের জীবদ্দশায়ই যে, শঙ্করের জন্ম হইয়াছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, বিভিন্ন প্রমাণ হইতে তাহা আমরা অবগত হইতে পারি (১)।

---

(১) "ঋষির্ব্বাণস্তথা ভূমির্ম্মর্ত্ত্যাক্ষৌ বামমেলনাৎ।
একত্বেন লভেতাঙ্কঃ (২১৫৭) তাম্রাক্ষঃ স হি বৎসরঃ॥
বিশ্বজিচ্চ পিতা যস্য বিখ্যাতশ্চ চিদম্বরে।
তস্য ভার্য্যা মহাদেবী শঙ্করং লোকশঙ্করম্।
প্রসূতা সর্ব্বলোকানাং তারণায় জগদ্‌গুরুম্॥" ইতি জিনবিজয়ে।
অন্যত্র— "ঋষির্বসুর্বসুজ্জের্য়ঃ (৮৮৭) পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
গণনা শেষকালস্য শঙ্কস্য শিবজন্মনি॥" ইতি—
"প্রাগিত্থং অজনভুবা প্রদর্শিতেঽস্মিন্,
কর্ম্মাধ্বন্যখিলবিদা কুমারিলেন।
উদ্ধর্ত্তুং ভুবনমিদং ভবাব্ধিমগ্নং
কারুণ্যাদ্পুনির্ধিরিয়েষ চন্দ্রচূড়ঃ॥" ইতি শঙ্কর বিজয়ে।
এবং—

যাহা হউক, আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাববিষয়ে কতকগুলি প্রমাণমাত্র উল্লেখ করিয়াই আমি বিরত হইতেছি, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের প্রকৃত সময় নির্দ্ধারণ দ্বারা যশোলাভ করিবার

"পশ্চাৎ পঞ্চদশে বর্ষে শঙ্করস্য গতে সতি।
ভট্টাচার্য্য-কুমারস্য দর্শনং কৃতবান্ শিবঃ॥" ইতি জিনবিজয়ে।
"আন্ধ্রোৎকলানাং সংযোগে পবিত্রে জয়মঙ্গলে।
গ্রামে তস্মিন্ মহানস্থাং ভট্টাচার্য্যঃ কুমারকঃ॥
আন্ধ্রজাতিস্তিত্তিরিকো মাতা চন্দ্রগুণা সতী।
যজ্ঞেশ্বরঃ পিতা যস্য শুক্লেন্দুরিব বর্দ্ধনঃ।
নন্দাঃ পূর্ণং ভূশ্চ নেত্রে মনুজানাং চ বামতঃ (২১০৯)॥
মেলনে বৎসরো ধাতা যুধিষ্ঠির-শকস্য বৈ॥
ভট্টাচার্য্য কুমারস্য কর্ম্মকাণ্ডস্য বাদিনঃ।
জাতঃ প্রাদুর্ভবস্তস্মিন্ বিজ্ঞেয়ো বৎসরে শুভে॥
রাধে চ শুক্লপক্ষে চ রাকায়াং ভানুবাসরে।
মধ্যাহ্নে শরজন্মাসৌ প্রাদুর্ভূতো মহাবলী॥
মহাবাদী মহাঘোরঃ শ্রুতীনাং চাভিমানবান্।
জিনানামন্তকঃ সাক্ষাৎ গুরুদ্বেষ্টাতিপাপবান্॥
সুধন্বনামকো রাজা সোঽপি দুষ্টস্তথা ভুবি।
জিনানাং যেন সাধূনাং কৃতং কদনমদ্ভুতম্॥
আত্মপাপনিবৃত্ত্যর্থং প্রয়াগে বেণীসঙ্গমে।
পশ্চাত্তাপযুতো ভট্টঃ শরীরমদহৎ স্বকম্॥
গুণানাং (৩) চ তথাস্তানাং কার্ত্তিকেয়স্য (৬) মেলনাৎ।
প্রমাথী মাঘমাসশ্চ শুক্লপক্ষশ্চ পূর্ণিমা।
ভট্টাচার্য্যস্য দহনং মধ্যাহ্নে সূর্য্য আগতে॥
ভস্মীভূতস্তদা সর্ব্বে পশ্যন্তি চ মহাদ্ভুতম্।
অষ্টচত্বারি (৪৮) বর্ষাণি জন্মকালাদ্ গতানি বৈ॥
প্রাদুর্ভবঃ শঙ্করস্য ততো জাতোঽতিবাদিনঃ॥" ইতি

(জৈনগ্রন্থেঽপরে)

সৌভাগ্য আমার নাই। ফলকথা, আচার্য্য শঙ্কর যে, কুমারিল-ভট্টের আবির্ভাবের কিছুকাল পরেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

আচার্য্য শঙ্কর প্রধানতঃ বেদবিরোধী বৌদ্ধবাদ নিরাসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আপনার কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার গ্রন্থাবলী দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। আচার্য্য গৌড়পাদ যে কার্য্যের সূচনামাত্র করিয়াছিলেন, তৎপ্রশিষ্য শঙ্কর তাহারই পূর্ণতাসাধন করিয়াছিলেন। (১)

শঙ্কর শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন। স্বকৃত উপনিষদ্‌ব্যাখ্যায়, ব্রহ্ম-সূত্র বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় ও সমস্ত প্রকরণগ্রন্থে তিনি সেই অদ্বৈতবাদটী যুক্তি তর্ক ও অনুভূতির সাহায্যে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বেদান্তদর্শনের শঙ্করকৃত শারীরক

(১) এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, শুকদেবের শিষ্য গৌড়পাদ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিপক্ষে প্রথম চেষ্টা করেন, তিনি উপনিষদের ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া বৌদ্ধবাদের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। মাণ্ডূক্যোপনিষদের উপর যে, গৌড়পাদের কারিকাবলী আছে, তাহা দেখিলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে। তিনি যখন আসন্নমৃত্যু; তখন তিনি স্বশিষ্য ভগবৎ গোবিন্দপাদকে আদেশ করিয়া যান যে, যদি কোনও উপযুক্ত শিষ্য লাভ কর, তবে তাহাকে আমার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিতে বলিবে। তদনুসারে গোবিন্দপাদ শঙ্করের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন শিষ্যকে সেই গুরু-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। শঙ্করও তদনুসারে বৌদ্ধধর্ম্ম নিরাসের পক্ষে স্বীয় শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

ভাষ্য জগতে এক অতুলনীয় গ্রন্থ। বহুবিধ টীকাগ্রন্থ সংযোজিত হওয়ায় সেই ভাষ্যের গৌরবশ্রী আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তন্মধ্যে আনন্দজ্ঞান, গোবিন্দানন্দ ও বাচস্পতি মিশ্রের কৃত টীকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাচস্পতিমিশ্রের টীকার নাম 'ভামতী'। ভামতী টীকা অনতিবিস্তীর্ণ হইলেও বড় সারগর্ভ এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের উৎস ও বহুতর জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। উহাকে বাচস্পতি মিশ্রের অগাধ পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ 'ভামতী' নামতঃ টীকা হইলেও কার্য্যতঃ উহা বেদান্তের একখানা উৎকৃষ্ট স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত। অমলানন্দ যতি উক্ত ভামতীর উপর একখানি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছেন; তাহার নাম 'বেদান্তকল্পতরু।' বেদান্তকল্পতরুও অতিশয় সারগর্ভ ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। উহারও একখানি উৎকৃষ্ট টীকা আছে; তাহার নাম 'বেদান্তকল্পতরু-পরিমল'। সাধারণতঃ উহা 'পরিমল' নামেই বিখ্যাত। মহামতি অপ্পয় দীক্ষিত উহার রচয়িতা। উক্ত পরিমলের উপরেও একখানা টীকা আছে; তাহার নাম 'আভোগ'। এইরূপে শঙ্করের মতবাদ সমধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও বহুতর খ্যাতনামা পণ্ডিত শঙ্করের মতানুসরণপূর্ব্বক বিস্তর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সে সমুদয় গ্রন্থ 'প্রকরণ' গ্রন্থনামে পরিচিত (১)।

---

(১) বহুবিধ জ্ঞাতব্য তত্ত্বে পরিপূর্ণ কোন একখানা মূলশাস্ত্রের অংশবিশেষ অবলম্বনে রচিত গ্রন্থকে সেই শাস্ত্রের 'প্রকরণ' গ্রন্থ বলা হইয়া থাকে। তাহার লক্ষণ এইরূপ—

"শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্।
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ॥"

তন্মধ্যে যোগীন্দ্র সদানন্দকৃত বেদান্তসার, ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্রকৃত বেদান্তপরিভাষা, মধুসূদন সরস্বতীকৃত অদ্বৈতসিদ্ধি, চিৎসুখাচার্য্যকৃত তত্ত্ব-প্রদীপিকা, শ্রীহর্ষকৃত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যমুনীশ্বরপ্রণীত পঞ্চদশী এবং বেদান্ত-সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, বেদান্ত-মুক্তাবলী, কাশ্মীরীয় সদানন্দকৃত অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি এবং সংক্ষেপশারীরক প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থসমূহ বেদান্তের শঙ্কর-সিদ্ধান্তানুযায়ী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন স্বয়ং শঙ্করও স্বমত সমর্থনার্থ বিবেকচূড়ামণি, উপদেশ-সাহস্রী, সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার, 'আত্মবোধ' প্রভৃতি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রকরণগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সে সমুদয় গ্রন্থ এখনও বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ আদৃত ও সযত্নে পঠিত হইয়া থাকে।

আচার্য্য শঙ্করের প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত সিদ্ধান্তকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলে। তিনি এই শুদ্ধাদ্বৈতবাদের অনুকূলেই সমস্ত উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং তাহা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, শুদ্ধাদ্বৈতবাদেই সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য; সমস্ত উপনিষদ্ই একবাক্যে ঘোষণা করিতেছে যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তদ্ভিন্ন সমস্তই অসত্য ও অনিত্য। জীবমাত্রই ব্রহ্মস্বরূপ, জীব সৃষ্টির পূর্ব্বেও ব্রহ্ম, এখনও ব্রহ্ম এবং সুদূর ভবিষ্যতে—মুক্তির পরেও ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থান করিবে, অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, কোন কালেই জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন বস্তু নহে। কেবল মায়া বা অজ্ঞানবশতই জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে মাত্র। আর দৃশ্যমান জগৎও ব্রহ্ম

হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। জগৎপ্রপঞ্চ নিত্য নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই বিবর্ত্তমাত্র অসত্য (১)। ইহাই উপনিষদের সার মর্ম্ম।

যদিও কোন কোন উপনিষদের স্থলবিশেষে অদ্বৈতবাদের প্রতিকূল ও দ্বৈতবাদের সমর্থক শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয় সত্য, তথাপি সে সব বাক্য বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে; পরন্তু প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদেরই সমর্থক। অভিপ্রায় এই যে, উপনিষদের মধ্যে যেমন দ্বৈতপ্রতিপাদক বা অদ্বৈতপ্রতিষেধক

---

(১) বিবর্ত্তের লক্ষণ এই—"সতত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥"

অর্থাৎ যেখানে উপাদান বস্তুটী স্বরূপতই কার্য্যাকারে পরিণত হয়, সেখানে হয় পরিণাম, আর যেখানে উপাদানরূপে পরিগৃহীত বস্তুটী স্বরূপতঃ অক্ষত থাকিয়াও অন্যাকারে প্রকাশ পায়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। যেমন—মৃত্তিকার পরিণাম হয় ঘট, আর শুক্তির বিবর্ত্ত হয় রজত। এইজন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ স্পষ্ট কথায় বলিয়াছেন—

"আরম্ভ-পরিণামাভ্যাং পূর্ব্বং সম্ভাবিতং জগৎ।
পশ্চাৎ কণাদ-সাংখ্যাভ্যাং যুক্ত্যা মিথ্যেতি নিশ্চিতম্॥"

অভিপ্রায় এই যে, সৃষ্টিসম্বন্ধে তিনপ্রকার মতবাদ আছে—১ম, আরম্ভবাদ। ২য়, পরিণামবাদ। ৩য়, বিবর্ত্তবাদ। তন্মধ্যে আরম্ভবাদ—কণাদের, পরিণামবাদ—সাংখ্যের, আর বিবর্ত্তবাদ—বেদান্তের (শঙ্করের) সম্মত। ন্যায় ও সাংখ্যকারগণ ক্রমে আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদ দ্বারা জগতের অস্তিত্ব সম্ভাবিত করিয়াছেন, পরে বেদান্তিগণ সত্যরূপে সম্ভাবিত জগতের মিথ্যাত্বসাধনের জন্য বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।" "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া।" "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্" ইত্যাদি বহু বাক্য পরিলক্ষিত হয়, ঠিক তেমনই আবার দ্বৈতপ্রতিষেধক বা অদ্বৈত তত্ত্বাবেদক বাক্যও বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যেমন—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ—একমেবাদ্বিতীয়ম্।" "নেহ নানাস্তি কিংচন।" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" ইত্যাদি—এইরূপে ব্রহ্মের সগুণত্ব-নির্গুণত্ববোধক শ্রুতিবাক্যও বিস্তর দৃষ্টিগোচর হয়। এখন দেখিতে হইবে, একই ব্রহ্মবিষয়ে এরূপ বিরুদ্ধার্থবোধক দুই শ্রেণীর বাক্য কখনই সার্থক বা সত্যার্থপ্রকাশকরূপে গৃহীত হইতে পারে না। একই বিষয়ে একই কালে—হাঁ, না—দুইই সত্য হইতে পারে না। অতএব উক্তপ্রকার বিরুদ্ধার্থপ্রকাশক পক্ষদ্বয়ের মধ্যে একটী পক্ষ ত্যাগ করিতেই হইবে. অর্থাৎ হয়, ব্রহ্মের সগুণত্বাদি প্রতিপাদক দ্বৈতপর শ্রুতিবাক্যসমূহের সত্যতা রক্ষা করিয়া অদ্বৈতপর বাক্যসমূহকে অপ্রমাণবোধে উপেক্ষা করিতে হইবে, আর না হয়, ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ববোধক শ্রুতিসমূহের প্রামাণ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দ্বৈতবোধক বাক্যসমূহকে অপ্রমাণবোধে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বস্তুতঃ এরূপ ব্যবস্থাও নিষ্কণ্টক নহে। কারণ, তাহা হইলে, বেদবাক্যের উপর অত্যন্ত অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে, কিছুতেই উহার স্বতঃ প্রামাণ্য রক্ষা করিতে পারা যায় না। অভিপ্রায় এই যে, আস্তিকমাত্রেই বেদকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন;

বেদের কোন অংশই অপ্রমাণরূপে অনাদরনীয় হইতে পারে, ইহা মনে করেন না। এখন সেই বেদের অংশবিশেষকে যদি অপ্রমাণ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে, অপরাপর অংশেও— যে সকল অংশ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ও হইবে, সে সকল অংশেও অপ্রামাণ্যাশঙ্কা দুর্নিবার হইয়া পড়ে। যাহার উক্তির একাংশে অপ্রামাণ্য ধরা পড়ে, তাহার উক্তির অপরাংশেও যে, অপ্রামাণ্য নাই, তাহা কে বলিতে পারে? অথচ এরূপ অব্যবস্থা কাহারই বাঞ্ছনীয় নহে। এতদুত্তরে আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে, না, বেদের কোন অংশই অপ্রমাণ বা পরিত্যাজ্য নহে। বেদ যখন স্বতঃপ্রমাণ, তখন উহার সমস্ত অংশই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষ এই যে, কোন বাক্য স্বার্থে প্রমাণ, আর কোন কোন বাক্য পরার্থে প্রমাণ, অর্থাৎ অন্য অর্থ প্রতিপাদন করাই সেই সকল বাক্যের উদ্দেশ্য। এইরূপ প্রণালী অনুসরণ করিলে পূর্ব্বোত্থাপিত বিরোধেরও সুন্দর পরিহার হইতে পারে, এবং বেদের প্রামাণ্যও অব্যাহত থাকিতে পারে।

এখন বিচার্য্য বিষয় হইতেছে এই যে, শ্রুতির তাৎপর্য্য কোন দিকে?—দ্বৈতপ্রতিপাদনে? না, অদ্বৈতপ্রতিপাদনে? কিন্তু অবিজ্ঞাত তত্ত্ব প্রতিপাদনেই যখন শ্রুতির সার্থকতা, তখন দ্বৈত-প্রতিপাদনে উহার তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে পারা যায় না; কারণ, দ্বৈতপ্রপঞ্চ ত কাহারও অবিজ্ঞাত নহে; বরং অতি মূঢ়জনেরাও পরিদৃশ্যমান দ্বৈতপ্রপঞ্চকে অভ্রান্তবুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া থাকে; এবং নিজ নিজ জ্ঞান-বিশ্বাস অনুসারে জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের

সগুণভাবই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে; সুতরাং তৎ-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রুতির এত আয়াস স্বীকার করিবার পক্ষে কোন দৃঢ়তর যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং এদিকে শ্রুতির তাৎপর্য্য কল্পনা করা সুসঙ্গত হইতে পারে না। কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, বিজ্ঞাতার্থপ্রকাশক দ্বৈতবোধক ও সগুণ-ভাব প্রতিপাদক শ্রুতিমাত্রই যথাশ্রুত অর্থে তাৎপর্য্যরহিত অনু-বাদকমাত্র; সুতরাং ঐ ঐ অর্থে প্রমাণ নহে (১)। অতএব

---

(১) যাহা লোকপ্রসিদ্ধ বা শাস্ত্রসিদ্ধ, সেইরূপ কোন বিষয়ের প্রতি-পাদক বাক্যকে 'অনুবাদক' বলে। অনুবাদে অসত্য বিষয়ও স্থান পাইতে পারে, এবং সম্পূর্ণ অসংলগ্ন উন্মত্ত বাক্যেরও অনুবাদ হইতে পারে, তাহাতে বাক্যের কোন দোষ হয় না; কারণ, কোন অনুবাদবাক্যই কোন অবিজ্ঞাত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে বলিয়া প্রামাণ্যের দাবী করে না, উহা অপ্রমাণ। লোকবিজ্ঞাত দ্বৈতপ্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্যও কেবল প্রসিদ্ধির অনুবাদকমাত্র,—প্রমাণ নহে। এ বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—

"ভেদো লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ ন শব্দেন প্রতিপাদ্যঃ। অভেদস্ত্বনধিগতত্বাদ্ অধিগতভেদানুবাদেন প্রতিপাদনমর্হতি। যেন চ বাক্যমুপক্রম্যতে, মধ্যে চ পরামৃশ্যতে, অন্তে চোপসংহ্রিয়তে, তত্রৈব তস্য তাৎপর্য্যম্। উপনিষদ শ্চাদ্বৈতোপক্রম-তৎপরামর্শ-তদুপসংহারা অদ্বৈতপরা এব যুজ্যন্তে।"

(ভামতী।)

অর্থাৎ বিশ্বভেদ যখন লোকপ্রসিদ্ধ, তখন তাহা আর শব্দদ্বারা প্রতি-পাদন করা আবশ্যক হয় না; পরন্তু, লোকের অবিজ্ঞাত অভেদবাদই (অদ্বৈতবাদই) প্রতিপাদনের উপযুক্ত। সেই অভেদপ্রতিপাদনের সুবিধার জন্যই দ্বৈতবাদের অনুবাদ। যে বিষয় লইয়া প্রকরণের আরম্ভ হয়, মধ্যেও যে বিষয় বর্ণিত হয়, এবং উপসংহারেও যাহার উল্লেখ থাকে, বুঝিতে হইবে, সেই বিষয়েই ঐ প্রকরণের তাৎপর্য্য। উপনিষদ্ শাস্ত্রগুলিও যখন উপক্রমে, উপসংহারে ও মধ্যে এক অদ্বৈত তত্ত্বের বা অভেদবাদেরই কীর্ত্তন করিয়াছে, তখন বুঝা যায় যে, অদ্বৈততত্ত্বেই সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য হওয়া যুক্তিযুক্ত।

অনিচ্ছাসত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, জন সাধারণের অবিজ্ঞাত অদ্বৈততত্ত্ব ও নির্গুণভাবের প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহই যথাশ্রুত অর্থে সার্থক, এবং তাৎপর্য্যবিশিষ্ট; সুতরাং প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য।

শ্রুতিশাস্ত্র, আপনার অভিপ্রেত সেই অদ্বৈত তত্ত্ব নির্দ্ধারণের অনুকূল বলিয়াই প্রথমে দ্বৈতপ্রপঞ্চ ও সগুণভাব বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কারণ, অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, অগ্রেই দৃশ্যমান দ্বৈতরাশির অসত্যতা প্রতিপাদন করা সঙ্গত, আর নির্গুণত্ব প্রতিপাদন করিতে হইলেও প্রথমেই ব্রহ্মে সম্ভাবিত গুণসমূহ প্রদর্শন করা আবশ্যক হয়, এবং পরে উপযুক্ত যুক্তিদ্বারা সেই দ্বৈতভাব ও সগুণভাবের অসত্যতা বা অসম্ভাবনা বুঝাইয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই ফলে ফলে অদ্বৈতভাব ও নির্গুণভাবও সিদ্ধ হইতে পারে; নচেৎ কেবল, 'অদ্বৈত' ও 'নির্গুণ' এই কথামাত্রে কখনই এতদুভয়ের সত্যতা বা অভ্রান্ততা সপ্রমাণ হইতে পারে না।

এইজন্যই শ্রুতি ব্রহ্মনিরূপণ প্রসঙ্গে দ্বৈতপ্রপঞ্চের অবতারণা করিয়াছেন, এবং তাহা দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, দৃশ্যমান দ্বৈতপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে-উৎপন্ন, বর্ত্তমানেও ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত এবং বিনাশ-কালেও ব্রহ্মেই বিলীন হয়, অর্থাৎ দ্বৈত জগৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—কালত্রয়েই ব্রহ্মাশ্রিত—অস্বতন্ত্র। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন, মৃত্তিকাতেই অবস্থিত এবং ধ্বংশকালেও মৃত্তিকাতেই বিলীন হয় বলিয়া মৃণ্ময় ঘট যেরূপ মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ সত্তাযুক্ত স্বতন্ত্র বস্তু নহে; পরন্তু চিরকালই

উহা মৃত্তিকার সত্তায় সত্তাবান্—মৃত্তিকারই অবস্থান্তরমাত্র; তেমনি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মেতে অবস্থিত ও ব্রহ্মে বিলয়স্বভাব এই বিশাল জড় জগৎও (দ্বৈতপ্রপঞ্চও) ব্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত সত্তাযুক্ত স্বতন্ত্র কোনও সত্য বস্তু নহে; পরন্তু ইহা ব্রহ্মস্বরূপই বটে; এরূপ অনুমান অপ্রমাণ বা উপেক্ষাযোগ্য নহে। ইহা দ্বারা অদ্বৈতবাদের ভিত্তিকেই সুদৃঢ় করা হইয়াছে। ইহার পর বিবর্ত্তবাদের কথা। 'বিবর্ত্তবাদ' পক্ষে ত দ্বৈতসৃষ্টির কোনরূপ সত্তা থাকাই সম্ভব হয় না—দ্বৈতপ্রপঞ্চ বলিয়া পরমার্থতঃ কোন বস্তুই নাই; উহা কেবল ভ্রান্তিকল্পিত মরু-মরীচিকার ন্যায় প্রতীতিসার কল্পনামাত্র (১)। বস্তুতঃ দ্বৈতপ্রপঞ্চের এবংবিধ স্বরূপ ও অবস্থাদি বর্ণনাদ্বারা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি অদ্বৈতশ্রুতিরই প্রামাণ্য বা সার্থকতা দৃঢ়তর করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ইহার পর সগুণবাদের কথা। নির্গুণত্ববোধক শ্রুতিমাত্রই ব্রহ্মেতে গুণ-সম্বন্ধের প্রতিষেধ করিতেছে। কারণ, অদ্বৈতশ্রুতি

---

(১) বস্তুসত্তা বিচারের নিয়ম এই যে, যাহার অভাবে যে বস্তুর কোন কালেই সত্তা নাই, তাহা বস্তুতঃ সেই মূল বস্তু হইতে পৃথক্ নহে, অর্থাৎ সেই মূলভূত প্রথম বস্তুর সত্তা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বস্তুর কোন সত্তাই নাই, প্রকৃতপক্ষে উহা অসৎ। ঘট কোনকালেই মৃত্তিকা ছাড়িয়া থাকে না, বা থাকিতে পারে না, এই কারণে ঘট যেমন মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত নহে, পরন্তু মৃত্তিকাস্বরূপই, তেমনি এই জগৎও উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, এই অবস্থাত্রয়েই—ব্রহ্ম ছাড়িয়া থাকে না; অতএব জগৎও স্বরূপতঃ অসৎ, এবং ব্রহ্ম হইতে অনতিরিক্ত। জগৎ যদি প্রকৃত পক্ষে একটা সত্য বস্তুই না হইল, তবে অসত্য জগতের দ্বারা ব্রহ্মের এক অদ্বিতীয়ভাবও খণ্ডিত হইতে পারে না।

সমূহ গুণ-গুণিভাবেও ব্রহ্মেতে ভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে নারাজ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, "প্রাপ্তং হি প্রতিষিধ্যতে" অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তি-সংভাবনা থাকে, তাহারই নিষেধ হইতে পারে। যাহার আদৌ প্রাপ্তিসংভাবনা নাই, তাহার আবার নিষেধ কি? সেরূপ নিষেধ-উক্তি কেবল উন্মত্তের পক্ষেই শোভা পায়। অতএব সকলেরই জানিতে ইচ্ছা হয় যে, ব্রহ্মেতে কোন কোন গুণের প্রাপ্তিসংভাবনা ছিল, যাহা লক্ষ্য করিয়া (নির্গুণত্ববোধক শ্রুতিসমূহ) গুণনিষেধে প্রবৃত্ত হইয়াছে? এই আকাঙ্ক্ষা অপনয়নের নিমিত্ত শ্রুতি নিজেই প্রথমে "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মেতে কতকগুলি গুণসম্বন্ধ আরোপ করিয়াছেন; শেষে—"নেতি নেতি" ইত্যাদি, এবং "অশব্দম-স্পর্শমরূপমব্যয়ম্" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" ইত্যাদি বাক্যে সেই সমুদয় সমারোপিত গুণসম্বন্ধ প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যে সকল বাক্য সত্যার্থ-প্রকাশকও নহে, এবং কোন প্রকার কার্য্যোপদেশকও নহে; অন্যত্র সেরূপ বাক্যসমূহ নিশ্চয়ই নিরর্থক—অপ্রমাণমধ্যে পরিগণনীয় হয় সত্য, কিন্তু ব্রহ্মের সগুণত্ববোধক বাক্যসমূহ কখনই সেরূপ নিরর্থকরূপে উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। কারণ, সগুণত্ব-বোধক বাক্যসমূহ যদিও সত্যার্থপ্রকাশক না হউক, তথাপি, সগুণ উপাসনায় ঐ সকল বাক্যের যথেষ্ট উপযোগিতা রহিয়াছে; সুতরাং ঐ সকল বাক্য সার্থক। সার্থক বাক্যকে নিরর্থক বলিয়া

ত্যাগ করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, নির্গুণত্ব-বোধক বাক্যসমূহের অবস্থা অন্যরূপ। ঐ সকল বাক্য যদি বস্তুতঃ সত্যার্থবোধকই না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বাক্য একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে; কারণ, এপক্ষে ব্রহ্মের নির্গুণত্ববাদ ত বস্তুতত্ত্ববোধকও নহে, এবং কোন প্রকার কার্য্যোপযোগীও নহে; কাজেই নিষ্প্রয়োজন; নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অথচ কোন শ্রুতিবাক্যেরই অপ্রামাণ্য বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব শ্রুতির প্রামাণ্য-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, নির্গুণত্ব-বোধক বাক্যসমূহই সার্থক এবং সগুণত্ববোধক বাক্য অপেক্ষা সমধিক বলবান্। বলবানের সহিত দুর্ব্বলের বিরোধ কখনই সম্ভব হয় না, বা হইতে পারে না; সুতরাং সগুণত্ব-নির্গুণত্ববোধক বাক্যের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধের সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না (১)। অতএব উভয় শ্রেণীর বাক্যই বিভিন্ন বিষয়ে ও বিভিন্ন অভিপ্রায়ে প্রমাণরূপে গ্রহণীয় হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মের সগুণত্ববাদও সার্থক, নির্গুণত্ববাদও সার্থক। তন্মধ্যে সগুণত্ববাদের সার্থকতা উপাসনা-

---

(১) সাধারণ নিয়ম এই যে, যেখানে তুল্যবল দুইটী বাক্য একই বিষয় অবলম্বন করিয়া পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থ বুঝায়, সেখানেই উভয় বাক্যে বিরোধ ঘটে, কিন্তু যদি উভয় বাক্যের মধ্যে একটী বলবান্ ও অপরটী দুর্ব্বল হয়, তবে দুর্ব্বল বাক্যটীর অর্থভেদ বা তাৎপর্য্যভেদ কল্পনা করিয়া সার্থকতা রক্ষা করিতে হয়, আর বলবান্ বাক্যটীর মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়েই তাহার সার্থকতা রক্ষা করিতে হয়।

কার্য্যে; আর নির্গুণত্ববাদের সার্থকতা তত্ত্বজ্ঞানে। কারণ, উপাসনা সগুণেরই হইতে পারে, নির্গুণের নহে। উপাসনা ব্যতীত চিত্তের একাগ্রতা ও তন্মূলক তত্ত্বজ্ঞান নিষ্পন্ন হয় না; অতএব অসত্য হইলেও ব্রহ্মে গুণারোপের আবশ্যকতা আছে। পক্ষান্তরে, অজ্ঞাননিবৃত্তি তত্ত্বজ্ঞান-সাপেক্ষ; তত্ত্বজ্ঞান আবার বস্তুবিচারের অধীন; কাজেই তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের জন্য বস্তুনির্দ্দেশক নির্গুণত্ববাদের অবতারণা করা আবশ্যক হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম-বিষয়ক উক্ত উভয়বিধ শ্রুতিবাক্যই নিজ নিজ অভিপ্রেত বিষয়ে সার্থক ও প্রমাণ।

শঙ্করের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সমস্তই অসত্য অবস্তু। ব্রহ্ম নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ এবং এক অদ্বিতীয় ও অনন্ত। সৎ অর্থ—অস্তিত্ব, চিৎ অর্থ—জ্ঞান, আর আনন্দ অর্থ—সুখ। বলা আবশ্যক যে, এ আনন্দ শব্দস্পর্শাদি-বিষয়ভোগজাত সাময়িক সুখমাত্র নহে, উহা নিত্য ও জ্ঞানস্বরূপ। "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্যে জ্ঞান ও আনন্দের পারস্পরিক পার্থক্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল শ্রুতিবাক্য অবলম্বন করিয়াই আচার্য্য শঙ্কর আপনার সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। শঙ্কর যদিও উপনিষদের স্পষ্ট উক্তির উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, এবং উপনিষদের সাহায্যেই সর্ব্বত্র আপনার সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, সত্য; তথাপি তাঁহার অভিমত অদ্বৈতবাদ একেবারে অপবাদ-নির্ম্মুক্ত

শঙ্কর-মতে ব্রহ্ম।

হইতে পারে নাই। বিদ্বেষপরবশ লোকেরা তাঁহার বেদানুগত ও যুক্তিসংগত মতবাদের উপরেও সমালোচনার তীব্র কশাঘাত করিতে বিরত হয় নাই।

তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবপ্রভা সঙ্কোচিত করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, অথবা স্বগত প্রবল বিদ্বেষবশেই হউক, কেহ কেহ—"বেদান্তা যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে?" ইত্যাদি অসার অসদুক্তি দ্বারা শাঙ্কর মতের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ" ইত্যাদি কটূক্তি বর্ষণপূর্ব্বক তদীয় বৈদিক মতটাকেও অবৈদিক বৌদ্ধমত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এরূপ অভিযোগের প্রধান কারণ এই যে, তিনি প্রথমে ব্রহ্মকে এক অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, পরে সেই ব্রহ্মেই জীবভাব আরোপ করিয়া ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থমাত্রেরই অসত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাতে প্রচলিত ন্যায় ও সাংখ্য-মতের সহিত যথেষ্ট বিরোধ ঘটিয়াছে, এবং আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন অংশে বৌদ্ধমতের সহিত কতকটা সাদৃশ্যও উপস্থিত হইয়াছে।

শঙ্কর-মতের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকগণ বলেন—আত্মা কখনই জ্ঞানস্বরূপ হইতে পারে না; আত্মা জ্ঞানবান্,—জ্ঞান তাহার গুণ। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইলে, তাহার পক্ষে জ্ঞানরহিত অবস্থা কখনও সম্ভবপর হইত না; অথচ সুষুপ্তি সময়ে ও মূর্চ্ছাকালে আত্মাতে কোনপ্রকার জ্ঞান বা জ্ঞানকার্য্য পরিদৃষ্ট হয় না। ঐ উভয়

অবস্থায় আত্মাতে জ্ঞান থাকিলে, নিশ্চয়ই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত; কিন্তু তাহা কখনও পাওয়া যায় না। এখন দেখিতে হইবে যে, ঐ উভয় অবস্থায় যখন জ্ঞানের অভাবেও আত্মার অভাব হয় না, পক্ষান্তরে আত্মা বিদ্যমান থাকিতেও যখন জ্ঞানের অভাব হয়, তখন অনিচ্ছায়ও স্বীকার করিতে হইবে যে, জ্ঞান ও আত্মা কখনই এক—অভিন্ন পদার্থ নহে। আত্মা নিজে গুণী; জ্ঞান তাহার গুণমাত্র। বিশেষ বিশেষ কারণ-সংযোগে আত্মাতে সেই জ্ঞান-গুণ উৎপন্ন হয়, আবার সেই কারণের বিয়োগে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ নিয়মানুসারে জ্ঞানোৎপাদক কারণবিশেষ না থাকায় উক্ত উভয় অবস্থায় জ্ঞানের অভাব হওয়া অসঙ্গত হয় না, কিন্তু আত্মা নিজে জ্ঞানস্বরূপ হইলে কখনই তাহা উপপন্ন হয় না, হইতেও পারে না। এই সকল কারণে আত্মাকে জ্ঞানবান্ ভিন্ন জ্ঞানস্বরূপ বলিতে পারা যায় না।

অপিচ, জ্ঞানের উৎপত্তি ও ধ্বংস প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং উহা অনিত্য। ঘটবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইল, পটবিষয়ক জ্ঞান বিনষ্ট হইল; রসজ্ঞান জন্মিল; রূপজ্ঞান ধ্বস্ত হইল; এইরূপে জ্ঞানের প্রতিনিয়ত উৎপত্তি-বিনাশ সকলেই অবিসংবাদিত রূপে অনুভব করিয়া থাকে; সুতরাং জ্ঞানের অনিত্যতাই প্রামাণিক—প্রমাণ-সিদ্ধ; আত্মা কিন্তু সেরূপ নহে। আত্মার নিত্যতা অনুভবসিদ্ধ। অতএব উৎপত্তি-বিনাশশীল অনিত্য জ্ঞান কখনই নিত্য আত্মার স্বরূপভূত এক অভিন্ন হইতে পারে না।

এতদুত্তরে শাঙ্করমতাবলম্বী আচার্য্যগণ বলেন, নৈয়ায়িকের

অভিপ্রেত জ্ঞান, আর আমাদের অভিমত জ্ঞান নামতঃ এক হইলেও বস্তুতঃ এক পদার্থ নহে। ঐ যে, উৎপত্তি-বিনাশশীল জ্ঞানের কথা বলা হইল, উহা বস্তুতঃ জড়স্বভাব অন্তঃকরণের (বুদ্ধির) বৃত্তি মাত্র (১), উহা নিত্য চৈতন্য নহে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগের ফলে বুদ্ধিতে, যে একপ্রকার স্পন্দন (বৃত্তি) উপস্থিত হয়, এবং সেই সংযোগের বিগমে আবার বিলীন হইয়া যায়, ন্যায়মতে তাহাই জ্ঞান নামে পরিচিত। বুদ্ধি সাধারণতঃ সত্ত্বগুণের পরিণাম অতি স্বচ্ছ পদার্থ, নিত্য ব্রহ্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া উহাকে প্রকাশময় করিয়া থাকে; এই কারণেই চৈতন্যের প্রতিবিম্বযুক্ত বুদ্ধি-বৃত্তিকে 'জ্ঞান' বলা হইয়া থাকে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়বর্গের সম্বন্ধানুসারে উৎপন্ন জ্ঞানের অবচ্ছেদক বুদ্ধি-বৃত্তি জন্মে ও মরে; এই জন্য ব্যবহারক্ষেত্রে তদভিব্যক্ত নিত্য চৈতন্যেরও জন্ম-মরণাদি ব্যবহার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে (২)।

---

(১) বুদ্ধিবৃত্তির স্বরূপ বা পরিচয় এইপ্রকার—"যথা তড়াগোদকং ছিদ্রাৎ নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারান্ প্রবিশ্য তদ্বদেব চতুষ্কোণাদ্যাকারং ভবতি, তথা তৈজসমন্তঃকরণমপি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়দ্বারা ঘটাদি-বিষয়দেশং গত্বা ঘটাদি-বিষয়াকারেণ পরিণমতে। স এব পরিণামো বৃত্তিরিত্যুচ্যতে" (বেদান্ত পরিভাষা)। অর্থাৎ তড়াগের জল যেরূপ ছিদ্রপথে নির্গত হইয়া বিভিন্নাকার জমীতে প্রবেশ করিয়া সেই জমীর ন্যায় চতুষ্কোণাদি আকার ধারণ করে, ঠিক তদ্রূপ তৈজস অন্তঃকরণও চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়পথে বাহ্য বিষয়ে যাইয়া সেই সেই বিষয়াকারে পরিণত হয়। এই পরিণামই 'বৃত্তি' বলিয়া অভিহিত হয়।

(২) অন্তঃকরণ-পদবাচ্য বুদ্ধি ও মনঃ প্রভৃতি সকলই জড় পদার্থ। সেই অন্তঃকরণের বৃত্তি (অবস্থাবিশেষ) উপস্থিত হইলে, তাহাতেই ব্রহ্ম-চৈতন্য প্রতিফলিত হয়, অন্যত্র হয় না; এইজন্য অন্তঃকরণবৃত্তিকে জ্ঞানের (ব্রহ্মচৈতন্য প্রতিবিম্বনের) অবচ্ছেদক কহে।

সুষুপ্তি সময়ে ও মূর্ছাদিকালে বুদ্ধির বিকলতানিবন্ধন আদৌ বৃত্তিই জন্মে না ; সেই কারণে তৎকালে বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞানেরও উন্মেষ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তৎকালেও জ্ঞানবৃত্তির আত্যন্তিক অভাব ঘটে না। কেন না, জ্ঞানের অত্যন্তাভাব হইলে, সুষুপ্তিভঙ্গের পরে কখনই লোকের 'সুখমহমস্বাপ্সম্, ন কিঞ্চিদবেদিষম্' 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, অর্থাৎ আমি পরমানন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, আর কিছুই জানিতে পারিনাই' এই প্রকারে সুষুপ্তিকালীন আনন্দানুভূতির ও অজ্ঞানের স্মরণ হইত না। অথচ সকলেরই ঐ প্রকার স্মরণ হইয়া থাকে, কেহই তাহা হইতে বঞ্চিত হয় না।

এখানে একথাও বলা আবশ্যক যে, সুষুপ্তিভঙ্গের পর ঐ যে, "সুখমহমস্বাপ্সং, ন কিঞ্চিদবেদিষম্" জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই অনুমান নহে,—স্মরণ। কেন না, অনুমান করিতে হইলে, যে সমস্ত কারণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয়, এখানে তাহার কিছুই নাই (১) ;

(১) সধারণতঃ অনুমান করিতে হইলেই একটা 'হেতু' (যাহাদ্বারা অনুমান করিতে হইবে, তাহা) থাকা চাই। সেই হেতুর সহিত আবার সাধ্যের (অনুমেয় পদার্থের) তৎকালে একস্থানে থাকা আবশ্যক হয়। এরূপ স্থলে প্রযুক্ত অনুমানই যথার্থ প্রমাণ হয়, তদ্ভিন্ন স্থলে অনুমান প্রযুক্ত হইলেও তদ্দ্বারা কোন ফলোদয় হয় না। সুষুপ্তি সময়ে যে, অজ্ঞান ও আনন্দানুভব বিদ্যমান থাকে, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহা জানিবার উপায় (হেতু) কি ? তৎকালীন জ্ঞানের অভাব কিংবা দুঃখের অভাবও উহার 'হেতু' হইতে পারে না ; কারণ, বর্তমানে উহারা উভয়েই অতীত ; সুতরাং বর্তমানকালীন অনুমানের হেতু হইতে পারে না। এতদতিরিক্ত আর কোনও হেতু দৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বারা সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান ও আনন্দানুভূতির সাধন করা যাইতে পারে ; কাজেই ঐ উভয়-বিষয়ক জ্ঞানকে স্মৃতিভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। অতএব ঐ সময়ে অজ্ঞান ও আনন্দের যে, প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

কাজেই সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির 'সুখমহমস্বাপ্সম্, ন কিঞ্চিদবেদিষম্' এই জ্ঞানকে স্মরণই বলিতে হইবে। স্মরণমাত্রই অনুভব-পূর্ব্বক, অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত বিষয়েই স্মরণ হইয়া থাকে। যাহার যে বিষয় কখনও অনুভূত হয় নাই, তাহার তদ্বিষয়ে কখনও স্মরণজ্ঞান হয় না, বা হইতে পরে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, সুষুপ্তি সময়ে ঐ অজ্ঞান ও আনন্দের নিশ্চয়ই অনুভব (জ্ঞান) হইয়াছিল (১)। সেই জন্যই সুষুপ্তি ভঙ্গের পর ঐরূপ স্মৃতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, সুষুপ্তি সময়ে যে, বুদ্ধির কোন-রূপ বৃত্তি থাকে না, তদ্বিষয়ে কাহারো আপত্তি নাই; এবং বুদ্ধির বৃত্তি বা তাদৃশ একটা অবস্থাব্যতীত যে, ব্যবহারিক জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না, এ সম্বন্ধেও কাহারো অমত দেখা যায় না। কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তির অভাবে সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান ও আনন্দের অনুভব হইবে কিসের দ্বারা? তখনত জ্ঞানাভিব্যঞ্জক কোন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিই বিদ্যমান থাকে না।

এতদুত্তরে বৈদান্তিকগণ বলেন—হাঁ, সে সময়ে অন্তঃকরণের কোন প্রকার বৃত্তি বিদ্যমান না থাকিলেও অন্য একপ্রকার বৃত্তি বিদ্যমান থাকে। তাহার নাম অবিদ্যাবৃত্তি, অর্থাৎ তৎকালে অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তে জীবগত অবিদ্যারই এমন একপ্রকার

---

(১) এখানে অজ্ঞান অর্থ—জ্ঞানের অভাব নহে; পরন্তু ভাবস্বরূপ অনির্ব্বাচ্য অবিদ্যা। আনন্দ অর্থও বৈষয়িক সুখ নহে, পরন্তু উৎপত্তি-বিনাশ রহিত ব্রহ্মানন্দ। পরে সুষুপ্তি অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

পরিণতি (বৃত্তি) উপস্থিত হয়, যাহা দ্বারা তাৎকালিক অজ্ঞান ও আনন্দ উভয়কেই প্রকাশ করিতে পারা যায়। সুষুপ্তিবিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই অবিদ্যাবৃত্তিও বিলীন হইয়া যায়; এই কারণেই সুষুপ্তিভঙ্গের পর আর কাহারো সেই অজ্ঞান ও আনন্দের স্বরূপ বুঝিবার বা বুঝাইবার ক্ষমতা থাকে না; কেবল "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম; কিছুই জানিতে পারি নাই" ইত্যাকার একটা অস্ফুট জ্ঞান-রেখা বিদ্যমান থাকেমাত্র। এ বিষয়ে বিদ্যারণ্য মুনি একটা উত্তম কথা বলিয়াছেন—

"সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ত-তমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং তৎ তদা তমঃ॥" (পঞ্চদশী)

এই সকল যুক্তি প্রমাণ দ্বারা আত্মার চিন্ময়তা পক্ষ উপপাদিত ও প্রমাণিত হয়।

ইহার পর আরও এক সম্প্রদায় আছেন, যাহারা বলেন, শঙ্কর যখন আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন, এবং জ্ঞানে ও আত্মায় যখন কিছুমাত্র ভেদ স্বীকার করেন নাই, তখন তাঁহার মতে আর বৌদ্ধমতে প্রভেদ কি? বস্তুতঃ তাঁহার সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ-বাদেরই রূপান্তর মাত্র—"প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।" কারণ, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরাও জ্ঞানের অতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, জ্ঞানকেই আত্মা বলিয়া মনে করেন, শঙ্করও ঠিক সেই কথারই পুনরাবৃত্তিমাত্র করিয়াছেন; অতএব শঙ্করের সিদ্ধান্তও বৌদ্ধবাদই বটে। এ আপত্তির সদুত্তর দিতে হইলে, অগ্রে সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধমতের কিঞ্চিৎ সমালোচনা

করা আবশ্যক। অতএব এখানে বৌদ্ধসিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে,—

[বৌদ্ধ মত।]

বুদ্ধদেব এক হইলেও, তাহার শিষ্যসম্প্রদায় সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক নামে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে (১)। এরূপ বিভাগ-সৃষ্টির প্রকৃত কারণ যে, কি, তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। তবে কেহ কেহ বলেন—একই বুদ্ধদেব সকলকে একই রকম উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একরূপ উপদেশ দিলেও, শিষ্যগণ নিজ নিজ মানসিক বৃত্তি ও শক্তির তারতম্যানুসারে একই উপদেশ হইতে চারিপ্রকার অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে উহার মধ্যে চারিপ্রকার সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন,—

"দেশনা লোকনাথানাং সত্বাশয়-বশানুগা"

---

(১) শিষ্যদের বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তাশক্তির প্রভেদানুসারে ঐরূপ নামভেদ ঘটিয়াছে। শিষ্যদের মধ্যে, যিনি সূত্রের অর্থাৎ গুরুশাস্ত্রের অন্তবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি সৌত্রান্তিক নামে; যিনি প্রতীয়মান বাহ্য পদার্থকে সত্য স্বীকার করিয়া আবার 'উহা অপ্রত্যক্ষ' এইরূপ বিরুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি বৈভাষিক নামে; যিনি গুরুর উপদেশানুসারে বাহ্য পদার্থের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিয়াও, বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি যোগাচার নামে; আর যিনি গুরুর কথানুসারে সর্ব্বশূন্যবাদ মানিয়া লইয়াছিলেন, অন্য অংশ স্বীকার করেন নাই, তিনি মাধ্যমিক নামে অভিহিত হইয়াছেন।

বৌদ্ধমতে গুরুপ্রদত্ত উপদেশ স্বীকার করার নাম 'যোগ', আর তদ্বিষয়ে আপত্তি উত্থাপনের নাম আচার; কেন না, আপত্তি উত্থাপন করা শিষ্যের একটী আচারের মধ্যে পরিগণিত।

অর্থাৎ যাঁহারা লোকনাথ—জগজ্জীবের একান্ত হিতার্থী, তাঁহারা শিষ্যের মানসিক শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তদনুসারে উপদেশ দিয়া থাকেন। এই প্রসিদ্ধ প্রবচন হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শিষ্যদের মধ্যে সকলের বুদ্ধিবৃত্তি কখনই সমান ছিল না; সেই জন্য যাহার পক্ষে যেরূপ উপদেশ শোভন বিবেচিত হইয়াছিল, তাহার প্রতি তিনি সেইরূপ উপদেশই প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু শিষ্যগণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া গুরু-লব্ধ উপদেশাবলিকেই সত্য সিদ্ধান্তবোধে গ্রহণ করত সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন। ফল কথা, যে কারণেই হউক, একই বুদ্ধদেবের শিষ্যসম্প্রদায় চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকের মত

তন্মধ্যে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। উভয়েই বাহ্যাস্তিত্ববাদী; বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য জগতেরও অস্তিত্ব ও ক্ষণিকত্ব স্বীকার করেন। বিশেষ এই যে, সৌত্রান্তিক বলেন, বাহ্য জগৎ প্রত্যক্ষগম্য, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারাই বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু বৈভাষিক একথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—যেহেতু বাহ্য জগৎ (ঘট-পটাদি পদার্থ-নিচয়) প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে, সেই হেতু অনুমান করা যায় যে, বাহ্য জগতেরও নিশ্চয়ই অস্তিত্ব আছে (১)।

(১) বৈভাষিকের যুক্তি বড়ই চমৎকার! তিনি বলেন, বাহ্য জগৎ অগ্রে প্রত্যক্ষ হয়, পরে তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এখানে বলা বাহুল্য

অতঃপর যোগাচার সম্প্রদায়ের কথা। যোগাচার সম্প্রদায় সাধারণতঃ 'বিজ্ঞানবাদী' নামে পরিচিত। তাঁহারা বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অধিকন্তু, অন্তরস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানকেই বাহিরে প্রতীয়মান ঘট-পটাদি বিষয়াকারে প্রতিভাসমান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহাদের উক্তি এইরূপ—

যোগাচার মত

"অভিন্নোঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাস-নিদর্শনৈঃ।
গ্রাহ্য-গ্রাহক-সংবিত্তি-ভেদবানিব লক্ষ্যতে॥"

অর্থাৎ বুদ্ধি বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য বস্তু, তদতিরিক্ত কোন বস্তুই সত্য নহে। অসৎ ঘট-পটাদি পদার্থগুলির বাহিরে সত্তা না থাকিলেও, অন্তরস্থ এক বিজ্ঞানই অনাদি ভ্রান্তিবশে গ্রাহ্য (ঘটাদি বিষয়), গ্রাহক (জ্ঞাতা) ও সংবিত্তি (জ্ঞান)—এই ত্রিবিধ আকারে প্রতীত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জগতে জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞেয় বা জ্ঞাতা কিছুই নাই।

ফলকথা, স্বপ্ন সময়ে মানুষ যেমন, বাহিরে কোন পদার্থ না থাকিলেও, কেবল মানসিক কল্পনা বা চিন্তাপ্রভাবে বাহিরে বহু প্রকার বস্তু দেখিতে পায়, (সেখানে বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হয়, সে সমস্ত পদার্থের সত্তা যে, বাহিরে নয়—অন্তরে, মানসিক চিন্তাবৃত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত, এবিষয়ে কাহারো সংশয় নাই।)

যে, বাহ্য জগতের যদি অস্তিত্বই না থাকে, তবে ত প্রত্যক্ষই হইতে পারে না ; পক্ষান্তরে যাহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষই হইতেছে, তাহার জন্য আবার অনুমানের প্রয়োজন কি ? এ প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিতে পারেন।

ঠিক সেইরূপ, জাগ্রৎ অবস্থায়ও আমরা বাহিরে যে সমুদয় পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, সে সমুদয় পদার্থ বস্তুতঃ বাহিরে নাই, অন্তরে আছে। অমরা মনে মনে যেরূপ কল্পনা করি, বাহিরেও ঠিক তদনুরূপ বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বাহিরে সে সমুদয় পদার্থের আদৌ অস্তিত্বই নাই, অন্তরে—বুদ্ধির অস্তিত্বেই উহাদের অস্তিত্ব ; ভ্রান্তিবশে বা বুঝিবার দোষে কেবল স্বপ্নদৃশ্য পদার্থের ন্যায় বাহিরে বিদ্যমান বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র। বিজ্ঞানের এই প্রকার একত্বকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদে অদ্বৈতবাদ বিঘোষিত হইয়াছে।

ইহাদের মতে বুদ্ধিবিজ্ঞান মাত্রই ক্ষণিক, প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, আবার দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়। কোন বিজ্ঞানই তৃতীয় ক্ষণপর্য্যন্ত স্থায়ী হয় না। নির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই প্রকারে বিজ্ঞান-প্রবাহ চলিতে থাকে, কখনও তাহার উচ্ছেদ হয় না ও হইবে না। এই বিজ্ঞানই আমাদের আত্মা—অহং-পদবাচ্য।

বিজ্ঞান যখন ক্ষণিক, তখন বিজ্ঞানাত্মক বাহ্য ও আন্তর সকল পদার্থই ক্ষণিক (১); কিন্তু উহারা ক্ষণিক হইলেও উহাদের প্রবাহ বা ধারাটা ক্ষণিক নহে—চিরস্থায়ী। জলপ্রবাহের অংশভূত জলসমূহ প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল হইলেও, উহাদের প্রবাহ

(১) ইহাদের মতে বাহ্য ও আন্তরভেদে বিজ্ঞানের পরিণাম দুই প্রকার। তন্মধ্যে ভূত ভৌতিক পদার্থসমূহ বাহ্য, আর চিত্ত ও চৈত্ত (চিত্ত সম্পর্কিত) সুখ দুঃখ প্রভৃতি পদার্থ আন্তর, উভয়ই বিজ্ঞানময়, এবং বিজ্ঞানের ন্যায় ক্ষণিক।

অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকার দরুণ যেমন লোকে প্রবাহান্তর্গত জলরাশিকেও অপরিবর্ত্তিত একই জল বলিয়া মনে করে; এবং 'ইহা সেই জল' অর্থাৎ নদীতীরে আসিয়া প্রথমে যে জলরাশি দেখিয়াছিলাম, এখন অর্দ্ধঘণ্টা পরেও সেই জলরাশিই দেখিতেছি—বলিয়া ভ্রম করে, জগতের প্রত্যেক বস্তু-ব্যবহার-সম্বন্ধেই ঠিক সেই একই ব্যবস্থা, অর্থাৎ প্রতিনিয়ত প্রত্যেক বস্তুই আমূলতঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু উহাদের প্রবাহটা অবিচ্ছিন্নই থাকিয়া যাইতেছে। প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকায়, তন্মধ্যগত পরিবর্ত্তনশীল বস্তুগুলিকেও লোকে চিরদিন একই বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। এই কারণেই অহং-পদবাচ্য আত্মা (বিজ্ঞান) ক্ষণিক হইলেও, বাল্য, কৌমার ও যৌবনাদি দশায় বিজ্ঞানময় আত্মার স্বরূপগত পার্থক্য থাকিলেও উহার প্রবাহ-বিচ্ছেদ না হওয়ায় লোকে মরণকাল পর্য্যন্ত 'সেই আমি' বলিয়া একই আত্মার অস্তিত্ব মনে করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব আত্মার বিনাশ হইতেছে, এবং নূতন নূতন আত্মার আবির্ভাব হইতেছে (১)। অনন্তকাল এই প্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব আত্মার (জ্ঞানের) বিনাশ ও উত্তরোত্তর আত্মার (জ্ঞানের)

(১) বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা বলেন—আমাদের মনোমধ্যে যে, প্রতিক্ষণে জ্ঞান হইতেছে, আর মরিতেছে; সেই বিজ্ঞানই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। প্রথম বিজ্ঞানটী দ্বিতীয় একটী বিজ্ঞান উৎপাদন করিয়া নিজে বিনষ্ট হইয়া যায়। বিনষ্ট হইবার সময় প্রাথমিক বিজ্ঞানটী আপনার সমস্ত সংস্কার দ্বিতীয় বিজ্ঞানে নিক্ষেপ করিয়া যায়। সেই কারণেই পূর্ব্বানুভূত বস্তুর কালান্তরে অনুসন্ধানে বা স্মরণে কোনই বাধা ঘটে না। ইত্যাদি

আবির্ভাব চলিতেছে ও চলিবে, কখনও ঐ প্রবাহের উচ্ছেদ হয় নাই ও হইবে না। সেই হেতুই প্রচলিত ব্যবহারে কোন প্রকার অসঙ্গতি উপস্থিত হয় না।

বিজ্ঞানের স্বভাবই এই যে, সে নিজে ক্ষণিক হইয়াও অর্থাৎ উৎপত্তির পরক্ষণে বিনাশশীল হইয়াও, বিনাশক্ষণেই অনুরূপ অপর একটী বিজ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া এবং আপনার সমস্ত সংস্কার তাহাতে সংক্রামিত করিয়া, পরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পরবর্ত্তী বিজ্ঞানসমূহও এইরূপে এক একটী বিজ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া এবং সে সমুদয়ে আপনাদের সমস্ত সংস্কার সংক্রামিত করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে বিজ্ঞানরাশি সমুৎপন্ন হওয়ায় বিজ্ঞানের প্রবাহ যেমন বিলুপ্ত হয় না, তেমনই অনুভূত বিষয়ের এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সংস্কারগুলিও একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় না। তাহার ফলে পূর্ব্ব বিজ্ঞানের বিজ্ঞাত বিষয়সমূহ স্মরণ করিতে এবং পূর্ব্ব বিজ্ঞানের অনুষ্ঠিত কর্ম্মরাশির যথাযথ ফলভোগ করিতে পরবর্ত্তী বিজ্ঞানসমূহ অধিকারী হইয়া থাকে; সেই জন্যই বিজ্ঞানরূপী আত্মা ক্ষণিক হইলেও, অক্ষণিক বিজ্ঞান-প্রবাহে স্মরণ ও কর্ম্মফলভোগ অসঙ্গত হয় না।

[মাধ্যমিক মত]

অতঃপর মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়াই প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করিব (১)। মাধ্যমিক

(১) সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক এই চতুর্ব্বিধ নাম করণের অভিপ্রায় এই:—বুদ্ধদেব বলিতেছেন—"সূত্রান্তং পৃচ্ছতাং কথিতম্। ভবতশ্চ সূত্রস্যান্তং পৃষ্টবন্তঃ—সৌত্রান্তিকা ভবাস্তত * * *

বৌদ্ধগণ 'শূন্যবাদী' নামে অভিহিত; কারণ, তাহারা শূন্যকেই পরমার্থ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং যুক্তি-তর্কের সাহায্যে তাহাই সমর্থন করেন।

মাধ্যমিকগণ বলেন,—দৃশ্যমান জগৎ সত্য বা সৎ নহে; কারণ, উহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ দ্বারা বাধিত হয়, অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই যখন জাগতিক পদার্থের স্বরূপহানি বা পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, তখন বাহ্য জগৎকে সৎ (সত্য) বলিতে পারা যায় না; পক্ষান্তরে অসৎও বলিতে পরা যায় না; কারণ, আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসৎ বা অসত্য পদার্থ কখনও প্রত্যক্ষ-গোচর হইতে পারে না; অথচ আপামর সাধারণ সকলেই সমানভাবে বাহ্য জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে; কাজেই জগৎকে অসৎও বলিতে পারা যায় না। সৎ অসৎ উভয়াত্মকও বলিতে পারা যায় না; কারণ, পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব সৎ-অসদ্ভাব কখনই এক স্থানে (এক আশ্রয়ে) থাকিতে পারে না; কাজেই জগৎ উভয়াত্মকও নহে। পক্ষান্তরে, অনুভয়-স্বভাব অর্থাৎ সৎও নয়, অসৎও নয়, এবম্বিধ অনির্ব্বচনীয়ও হইতে পারে না; কারণ, তাদৃশ বস্তু সম্পূর্ণ অপ্রসিদ্ধ ও অসম্ভব। অতএব, জগৎ যখন সৎ, অসৎ, উভয়রূপ বা

সৌত্রান্তিকসংজ্ঞা সংজাতা। * * * সেয়ং বিরুদ্ধা ভাষা—ইতি বর্ণয়ন্তো বৈভাষিকাখ্যয়া খ্যাতাঃ। শিষ্যৈঃ যোগশ্চাচারশ্চেতি দ্বয়ং করণীয়ম্। তত্র অপ্রাপ্তস্যার্থস্য প্রাপ্তয়ে পর্য্যনুযোগঃ (প্রশ্নঃ) যোগঃ। গুরূক্তস্যার্থস্যাঙ্গীকরণমাচারঃ। যে তাবৎ তদুভয়কারিণঃ, তে যোগাচারাঃ, যে পুনঃ গুরূক্তস্যার্থস্যাঙ্গীকরণাত্ উত্তমাঃ, যোগস্য (প্রশ্নস্য) অকরণাদধমাশ্চ, তে খলু মাধ্যমিকনাম্না প্রসিদ্ধাঃ। (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)

অনুভয়রূপ, এই চতুর্ব্বিধ রূপের কোন রূপেই অন্তর্ভুক্ত হইতেছে না, তখন উহা কোনও তত্ত্ব বা সত্য বস্তু নহে; উহা বিদ্যুৎ, অভ্র ও নিমেষাদির ন্যায় শূন্য মাত্র। যাহা যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত (জ্ঞেয়), এবং ক্রিয়াসাধক, শূন্যেতেই সে সকলের পর্য্যবসান বা পরিসমাপ্তি। স্বপ্নদৃশ্য পদার্থসমূহ ইহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। স্বপ্নেও বিবিধ বস্তু দৃষ্ট হয়, এবং তদনুরূপ হর্ষ শোকাদি ক্রিয়াও উপস্থিত হয়, অথচ সে সকলের পরিণাম (শেষ দশা) শূন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই সকল স্বপ্নদৃশ্য পদার্থের সহিত তুলনা করিলে দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চকেও শূন্যাত্মক বলিতে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। অতএব শূন্যই জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অতএব এরূপ অসার জগতে আসক্ত বা প্রলুব্ধ হওয়া কোন বিবেকীর পক্ষেই সঙ্গত নহে।

মাধ্যমিকগণ আরও বলেন যে, উল্লিখিত শূন্যবাদই ভগবান্ বুদ্ধদেবের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত, এবং সকল শিষ্যকে তিনি এই শূন্যবাদ-ভাবনারই উপদেশ দিয়াছিলেন, বিনেয় শিষ্যগণের বোধশক্তি ও সংস্কারের পার্থক্যানুসারে উপদেশসময়ে কেবল কথার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য মাত্র ঘটাইয়াছিলেন। যে সকল শিষ্য স্বল্পমতি, স্বভাবতই বহির্বিষয়ে আসক্ত ও সত্যতা-বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহাদের প্রতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে শূন্যবাদের উপদেশ না করিয়া দৃশ্যমান বাহ্য বস্তুর ক্ষণিকত্বমাত্র উপদেশ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য —নিরন্তর ক্ষণিকত্ব ভাবনা করিতে করিতে, ক্রমে আপনা হইতেই তাহাদের শূন্যত্ববোধ আসিবে। তাহার পর, যাহারা মধ্যম

শ্রেণীর শিষ্য—বাহ্য পদার্থের সত্যতায় বিশ্বাসহীন, অথচ উৎপত্তি-বিনাশশীল বুদ্ধিবৃত্তিরূপ বিজ্ঞানের সত্যতায় আস্থাবান্, সেই সকল মধ্যম-শ্রেণীর শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বাহ্য পদার্থের অপলাপ-পূর্ব্বক একমাত্র বিজ্ঞানের সত্যতা ও ক্ষণিকত্ব উপদেশ করিয়া-ছিলেন। ইহারও শেষ উদ্দেশ্য—শূন্যত্বে পর্য্যবসান করা। অবশেষে যাহারা উত্তমাধিকারী বিশুদ্ধচিত্ত এবং সৎ-অসৎ বিবেচনায় সমর্থ, কেবল সেই সমুদয় সুবোধ শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধেই শূন্যবাদের উপদেশ করিয়াছেন। অথবা তিনি সকলকেই সমান-ভাবে শূন্যবাদের উপদেশ দিয়াছিলেন, শিষ্যগণ কেবল নিজ নিজ বুদ্ধিশুদ্ধির তারতম্যানুসারে তাঁহার এক উপদেশকেই বিভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেকেই নিজের পরিগৃহীত সিদ্ধান্তকে বুদ্ধদেবের অভিমত সিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই শূন্যবাদই বুদ্ধদেবের যথার্থ অভিমত সিদ্ধান্ত, এবং তদনুসারেই মুমুক্ষুগণের প্রতি—"সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্" (সমস্তই ক্ষণিক), "সর্ব্বং দুঃখং দুঃখং" (সমস্তই দুঃখাত্মক), "সর্ব্বং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণম্" (সকল বস্তুই অনন্যসদৃশ) এবং "সর্ব্বং শূন্যং শূন্যম্" এইরূপ ভাবনাচতুষ্টয়ের উপদেশ করিয়াছেন। শূন্যবাদ যদি তাঁহার অভিমত না হইত, তাহা হইলে কখনই তিনি ভাবনার মধ্যে শূন্য-ভাবনার অন্তর্ভাব করিতেন না (১)। অতএব আমরা

(১) "তদেবং ভাবনাচতুষ্টয়বশাৎ নিখিল-বাসনানিবৃত্তৌ পরনির্ব্বাণং শূন্যরূপং সেৎস্যতি ইতি—বয়ং কৃতার্থাঃ, নাস্মাকমুপদেশ্যং কিঞ্চিদস্তীতি।" (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শনম্)।

উক্ত শূন্যবাদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই পূর্ব্বোক্ত ভাবনাচতুষ্টয় দ্বারা পরম নির্ব্বাণলাভে কৃতার্থ হইব; আমাদিগকে আর কিছু জানিতে, বা করিতে হইবে না, ইত্যাদি—

এখানে বলা আবশ্যক যে, বাহ্যাস্তিত্ববাদী ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ আবার ঠিক এ কথার বিপরীত ভাবে নিজ নিজ মতের অনুকূলে বুদ্ধদেবের অভিপ্রায় কল্পনা করিতে বিরত হন না (১)।

উপরে যে চারিটী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইল, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ অতি সামান্য। উহারা উভয়েই বাহিরে পরিদৃশ্যমান পদার্থের সত্যতা স্বীকার করেন, এবং উহাদের যথাসম্ভব উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশও স্বীকার করেন। বিশেষ এই যে, সৌত্রান্তিকগণ বলেন, বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব ও বিভাগ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-গ্রাহ্য, অর্থাৎ বাহিরে দৃশ্যমান বস্তুনিচয়ের যে অস্তিত্ব বা সত্তা, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, তাহা আর অনুমান করিয়া বুঝিতে হয় না; কিন্তু বৈভাষিকগণ সে কথা স্বীকার

(১) বাহ্যাস্তিত্ববাদী সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকগণ বলিয়া থাকেন যে, নিতান্ত বহিরাসক্ত লোকদিগকে, বৈরাগ্যোৎপাদন দ্বারা বহির্বিষয় হইতে বিমুখ করিবার অভিপ্রায়েই বুদ্ধদেব সর্ব্বশূন্যত্ববাদের উপদেশ দিয়াছেন; বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধ ঐরূপ উপদেশ কখনই তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। বিজ্ঞানবাদী যোগাচার-সম্প্রদায়ও এই প্রকারেই পরপক্ষ-নিরসন ও স্বপক্ষ-সমর্থন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বৌদ্ধমতাবলম্বী তিনটী প্রধান সম্প্রদায়ই পরস্পর-বিরুদ্ধ; এই জন্য ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট উক্ত তিনটী মতবাদই অপ্রমাণরূপে উপেক্ষিত হইবার যোগ্য।

করেন না। তাহারা বলেন—বাহিরে বস্তু না থাকিলে এবং সেই সকল বস্তু বৈচিত্র্যযুক্ত না হইলে, কখনই তদ্বিষয়ে লোকের বোধবৃত্তি ও তদ্গত বৈচিত্র্য সম্পন্ন হইত না; কারণ, বিম্বের সত্তা ও প্রভেদ অনুসারেই প্রতিবিম্বের প্রভেদ ঘটিয়া থাকে; আমাদের বিজ্ঞান বা অন্তরস্থ বুদ্ধিবৃত্তিরূপ বোধও নিশ্চয়ই প্রতিবিম্বস্বরূপ; প্রতিবিম্ব ও তদ্গত বৈচিত্র্যমাত্রই বিম্বসাপেক্ষ; সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তি ও তাহার প্রভেদ দর্শনে তৎকারণীভূত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিম্বের (বাহ্য পদার্থের) অস্তিত্ব সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। অতএব বহির্জগতের বাস্তবিক সত্তা কখনই অপলাপ করিতে পারা যায় না, উহা অনুমান-গ্রাহ্য—অনুমেয়।

বিজ্ঞানবাদী যোগাচার সম্প্রদায় এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইয়া বলেন—অবিজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্বে যখন কোন প্রমাণ নাই, এবং বিজ্ঞানের সম্বন্ধব্যতীত যখন কোন বাহ্য বস্তুই প্রতীতি-গোচর হয় না, বা হইতে পারে না, তখন অন্তরস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্য বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। কেন না,—

"সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীল-তদ্ধিয়োঃ।
ভেদশ্চ ভ্রান্তি-বিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে॥" (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)

অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতীত যখন কোন বিষয়েরই অনুভব হয় না, পরন্তু জ্ঞান-সহযোগে বিষয়ানুভব হওয়াই যখন স্বাভাবিক নিয়ম, (যেমন নীল বর্ণ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান,) তখন এই নীল বর্ণ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান, উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ; কেবল ভ্রান্তি বিজ্ঞানের ফলে

উভয়ের (নীল ও তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানের) মধ্যে একটা ভেদ বা পার্থক্য প্রতীতি হয় মাত্র। চক্ষুতে তিমিরনামক রোগ উৎপন্ন হইলে, অথবা অঙ্গুলীদ্বারা চক্ষুর প্রান্তভাগ চাপিয়া ধরিলে একই চন্দ্রে যেমন ভেদ দর্শন হয়, অর্থাৎ একটী চন্দ্রকে যেমন দুইটী বলিয়া ভ্রম হয়, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদপ্রতীতিও ঠিক তেমনই অজ্ঞানমূলক—অভেদে ভেদ-ভ্রান্তি মাত্র। এই জাতীয় যুক্তি ও দৃষ্টান্ত বলে তাহারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,—আমাদের মনোমধ্যে যে প্রকার চিন্তার তরঙ্গ উপস্থিত হয়, বাহিরেও আমরা তদনুসারে বস্তুর সদ্ভাব কল্পনা করিয়া থাকি, বস্তুতঃ বাহিরে সেরূপ কোনও বস্তু নাই; অন্তরেই উহার সত্তা।

শূন্যবাদী মাধ্যমিকগণ আবার ইহাকেও যথেষ্ট মনে করেন না। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও অন্তরস্থ বুদ্ধিবিজ্ঞানের সত্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ তাহাও স্বীকার করিতে রাজী নহেন। তাহারা বলেন,—"যৎ সৎ, তৎ শূন্যং, যথা দীপশিখা।" অর্থাৎ যাহা কিছু সৎ—সত্যরূপে প্রতীত হয়, তৎসমস্তই শূন্যাবসান; যেমন প্রদীপের শিখা (১)। তাঁহারা বলেন—শূন্যবাদই বুদ্ধদেবের অভিপ্রেত এবং সেই অভিপ্রেত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্যই

---

(১) ইহাদের মতে প্রদীপের শিখা প্রতিক্ষণে এক একটী উৎপন্ন হয়, আবার পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট শিখাগুলি শূন্যে পর্য্যবসিত হয়, উহাদের কোন চিহ্ন থাকে না।

'ভিক্ষুপাদপ্রসারণ' ন্যায়ে (১) প্রাথমিক মতগুলি উপদেশ করিয়াছিলেন, অথবা, তাঁহার উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া মন্দমতি শিষ্যগণ অন্যপ্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই সমুদয় কথাকেই বুদ্ধদেবের কথা বা সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ সে সকল মত বুদ্ধদেবের অভিপ্রেত সিদ্ধান্তই নহে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধমতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। এখন দেখা যাউক, উক্ত বৌদ্ধমতগুলির কোন অংশের সহিত শাঙ্কর মতের কোনরূপ সাদৃশ্য আছে কি না, যাহার দরুণ আচার্য্য শঙ্করের মতকে "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ" বলিয়া ঘোষণা করা যাইতে পারে।

[বৌদ্ধমতের সহিত শাঙ্কর মতের তুলনা]

বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত উল্লিখিত বৌদ্ধমত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্মত সিদ্ধান্তের সহিত শাঙ্কর সিদ্ধান্তের কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। তাহাদের মতে দৃশ্যমান বহির্জগৎ ক্ষণিক হইলেও সত্য; বিজ্ঞানের অভাবেও জগতের সত্তা ব্যাহত হয় না; কিন্তু শঙ্করের মতে

(১) একত্র বহু ভিক্ষুক উপবিষ্ট আছে। শয়নের স্থান নাই। এমত অবস্থায় শয়নার্থী চতুর ভিক্ষুক যেমন আস্তে আস্তে পাদ প্রসারণ করিয়া প্রথমে অবকাশ করে, পরে লম্বা হইয়া শয়ন করে, বুদ্ধদেবের অভিপ্রায়ও ঠিক সেইরূপ।

দৃশ্যমান জগৎ ক্ষণিক না হইলেও অসত্য। জগতের বাস্তব সত্তা কোন কালেই ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়ের সহিত শাঙ্কর মতের কোনরূপ সাদৃশ্য থাকা আদৌ সম্ভবপর হয় না। মাধ্যমিক-সম্মত শূন্যবাদের সহিতও শাঙ্কর মতের কোন প্রকার সাদৃশ্য দেখা যায় না; কারণ, মাধ্যমিকগণ শূন্যবাদী, আর শঙ্কর অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্ম ত শূন্য নহে—পরম সত্য; সুতরাং শূন্যবাদের সহিত অদ্বৈতবাদের কোন সম্পর্কই নাই, এবং থাকিতেও পারে না। অতএব যদি কিছু সাদৃশ্য বা সাদৃশ্যাভাস থাকে, তবে তাহা কেবল যোগাচার-সম্মত বিজ্ঞানবাদের সহিতই আছে। কেন না, শঙ্করের মতে যেমন দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন; ব্রহ্ম-সত্তার অতিরিক্ত কোন সত্তা জগতের নাই; ব্রহ্মের সত্তাই জগতের সত্তা। ব্রহ্ম নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, এবং চৈতন্য ও জ্ঞান একই পদার্থ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, যোগাচার সম্প্রদায়ের মতেও তেমনই ক্ষণিক বিজ্ঞানকে জগৎ-প্রতীতির (জগতের) কারণ বলা হইয়াছে। অন্তরস্থ জ্ঞানই বিবিধ বস্তুরূপে প্রকটিত হয়; বাহিরে বা অন্তরে বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন পদার্থ নাই—ইত্যাদি।

যদিও শঙ্করের অভিমত জ্ঞান বা চৈতন্য পদার্থ উৎপত্তি-বিনাশবিহীন ব্রহ্মেরই স্বরূপ, আর যোগাচারের অভিপ্রেত বিজ্ঞান প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-বিনাশশীল ক্ষণিক বুদ্ধিবৃত্তিমাত্র; সুতরাং ঐ উভয় বিজ্ঞান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; অতএব উক্ত উভয় মতের মধ্যে যদিও আকাশ-পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান থাকুক, তথাপি আপাতদর্শী

লোকেরা কেবল 'বিজ্ঞান' এই নামগত সাদৃশ্য মাত্র দেখিয়াই শঙ্করের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদকে বৌদ্ধের বিজ্ঞানবাদ-কুক্ষিতে নিক্ষেপ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং তাহারই ঐকান্তিক ফলস্বরূপে—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ" ইত্যাদি ঘৃণনীয় বাক্যের আবির্ভাব হইয়াছে (১)। প্রকৃতপক্ষে শঙ্করের মায়াবাদকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা, বিশাল অজ্ঞতার ফল ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সে যাহা হউক, আলোচ্য শঙ্কর-সিদ্ধান্তের প্রভাব এদেশে এতদূর বিস্তারলাভ করিয়াছে যে, ঐ সকল অসার বচনের বলে সে প্রভাব খর্ব্ব করা কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হইবে না। বিশেষতঃ মায়াবাদ না আছে কোথায়? সমস্ত পুরাণ শাস্ত্র তো মায়াবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মায়াবাদ পরিত্যাগ করিলে পুরাণ শাস্ত্রের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়া যায়। মায়াসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে পরমেশ্বরের অলৌকিক লীলাকাহিনীও উপকথায় পরিণত হয়; সুতরাং পুরাণশাস্ত্র কখনই মায়াবাদের নিন্দা করিয়া আত্মঘাতী হইতে পারে না; অতএব পুরাণে যদি সত্য সত্যই মায়াবাদের নিন্দাবাদ থাকে, তাহা হইলে উহার অর্থ অন্যরূপ কল্পনা করিতে হইবে, যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে না। এখন এখানেই একথা পরিসমাপ্ত করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে—

(১) এই বাক্যটী পদ্মপুরাণের উক্তি বলিয়া সর্ব্ব প্রথমে আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যভাষ্যের ভূমিকামধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন; পরে রামানুজাচার্য্য প্রভৃতিও ঐ বাক্য নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অনুসন্ধানদ্বারা জানিতে পারা যায় যে, বিজ্ঞানভিক্ষুর পূর্ব্বতন কোন

[শঙ্করের অধ্যাসবাদ]

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোনও বস্তু বা গুণের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই। সমস্ত উপনিষদের ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি অদ্বৈতবাদ সমর্থনোপযোগী বিস্তর যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণাদির উপন্যাস করিয়াছেন; কিন্তু সে সকল কথা বিচ্ছিন্নভাবে বিন্যস্ত থাকায় একত্র সংকলনপূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণা করা অনেকের পক্ষেই অত্যন্ত কষ্টকর হয়; এই কারণে তিনি বেদান্তদর্শনের ভাষ্যপ্রারম্ভে সেই সকল কথা বিশদ ভাষায় অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সেই ভাষ্যাংশ 'অধ্যাসভাষ্য' নামে বিদ্বৎসমাজে পরিচিত। অধ্যাস-ভাষ্যের মর্ম্মার্থ এই যে,—

জগতে ধনী, দরিদ্র ও মূর্খ পণ্ডিতনির্ব্বিশেষে সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে দুঃখবহ্নির তীব্র তাপ অনুভব করিয়া থাকে, এবং সকলেই তন্নিবৃত্তির নিমিত্ত লৌকিক ও অলৌকিক সর্ব্বপ্রকার উপায়ান্বেষণে

আচার্য্যই ঐ বাক্যের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। এই কারণে অনেকেই ঐ সকল বচনের মৌলিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ঐ সকল বাক্যে ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতি সকল দর্শনেরই নিন্দাবাদ নিহিত আছে সত্য, কিন্তু শঙ্কর-সম্মত মায়াবাদের উপর নিন্দাবাদটা আক্রোশের আকার ধারণ করিয়াছে। কারণ, ঐ সকল বাক্যে অপর সমস্ত দর্শনের নিন্দা একবার মাত্র করা হইয়াছে, কিন্তু মায়াবাদের উপর নিন্দাবাক্য একাধিকবার প্রযুক্ত হইয়াছে।

আত্ম-নিয়োগ করে। অবলম্বিত সে সকল উপায়ে কিন্তু কেহই সেই দুর্ব্বার দুঃখনিরসনে সমর্থ হয় না। এইজন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে দুঃখ নিরসনে সচেষ্ট না হইয়া, অগ্রে তাহার নিদানানুসন্ধানে মনোযোগী হন। তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে, নিদানধ্বংস ব্যতীত কখনই দুঃখরাশির আত্যন্তিক অবসান হইবে না, ও হইতে পারে না; কাজেই দুঃখনিবৃত্তির জন্য অগ্রে তৎকারণের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়।

অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় যে, জাগতিক ভেদবুদ্ধি বা দ্বৈতবিভ্রমই মানবের মানস-ক্ষেত্রে দুরন্ত দুঃখবীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ভেদবুদ্ধির প্রভাব যেখানে যত বেশী, দুঃখ ও তৎসহচর শোক-মোহাদি দোষরাশির প্রাদুর্ভাবও সেখানে তত অধিক। পক্ষান্তরে, যেখানে ভেদবুদ্ধির সম্বন্ধ অতি কম, সেখানে দুঃখ ও তৎসহচর শোক-মোহাদি দোষের সম্পর্কও সেই পরিমাণে অল্প দেখিতে পাওয়া যায় (১)। অতএব ভেদবুদ্ধি বা দ্বৈতবিজ্ঞানই যে, নানাবিধ দুঃখরাশি সমাহরণপূর্ব্বক মানবকে

---

(১) শ্রুতি বলিতেছেন—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি" ইত্যাদি। অর্থাৎ জীব যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আপনাকে যেন পৃথক্ বস্তুর ন্যায় মনে করে, তখনই একে অপরকে দর্শন করে ইত্যাদি। পক্ষান্তরে "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ যখন এ সমস্তই ইহার (সাধক জীবের) আত্মস্বরূপ হইয়া যায় (অদ্বৈত ভাব উপস্থিত হয়), তখন কে, কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে ইত্যাদি।

প্রদান করে, এবিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, জানিতে পারা যায় যে, উল্লিখিত ভেদবুদ্ধিমাত্রই অজ্ঞানপ্রসূত। অজ্ঞান-প্রভাবেই মানবগণ অদ্বৈতে (ব্রহ্মে) দ্বৈতদর্শন, বা অভেদে ভেদ দর্শন করিয়া থাকে। অভেদে ভেদ, ভেদে অভেদ, একত্বে অনেকত্ব দর্শন, ইত্যাদি বিভ্রম সমুৎপাদন করাই অজ্ঞানের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা চক্ষুর প্রান্তভাগ টিপিয়া ধরিলে যে, একটা বস্তুকে দুইটা দেখা যায়, এবং মন্দান্ধকারে রজ্জুকে যে, সর্প বলিয়া মনে হয়, এ সমস্তই অজ্ঞানের মহিমা। এখানে অজ্ঞান অর্থ—জ্ঞানের অভাব নহে,—বিপরীত জ্ঞান বা জ্ঞানবিরোধী একটা পদার্থ।

এই অজ্ঞানের প্রভাবেই এক চন্দ্রে দ্বিচন্দ্র দর্শন হয়, এবং অসর্প-রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই অজ্ঞানের মহিমায়ই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেতেও দ্বৈতভ্রম সমুপস্থিত হয়, এবং সুখদুঃখাদি সংসার-ধর্ম্ম বর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতেও অব্রহ্মভাব ও সুখদুঃখাদি সংসারধর্ম্ম আরোপিত হয় (১)। আরোপ কাহাকে বলে, সে কথা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। আরোপ, অধ্যারোপ ও অধ্যাস, এ সকল সমানার্থক শব্দ। এখানে বলা আবশ্যক যে, এক বস্তুতে অপর বস্তুর আরোপ হইলেও সেই আরোপাধার বস্তুটা কখনই অপর বস্তু হইয়া যায় না, বা অপর বস্তুর দোষগুণে

(১) আরোপ বা অধ্যারোপ অর্থ—যাহা যেরূপ নয়, তাহাতে সেইরূপ ভাব স্থাপন অর্থাৎ এক প্রকার বস্তুকে অন্য প্রকার বস্তু মনে করা।

লিপ্ত হয় না (১); সুতরাং ব্রহ্মে অব্রহ্মভাব বা সংসারধর্ম্ম আরোপিত হইলেও, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপগত কোন প্রকার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ঘটে না; ব্রহ্ম স্বরূপতঃ যেরূপ, ঠিক সেরূপই থাকেন।

এস্থলে দুই প্রকার আপত্তি উত্থিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি, জগতে যাহা নাই—নিতান্ত অসৎ বা অপ্রসিদ্ধ; সুতরাং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অত্যন্ত অবিষয় (অননুভূত), সেরূপ পদার্থের অন্যত্র আরোপ বা ভ্রান্তি কখনও হয় না, হইতেও পারে না, এবং দেখাও যায় না। কেন না, যে বিষয়ে যাহার কোন প্রকার সংস্কার বা ধারণা নাই, সে বিষয়ে তাহার ভ্রান্তি বা আরোপ হওয়া যুক্তিবাধিত ও ব্যবহারবিরুদ্ধ। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, আলোক ও অন্ধকার যেমন অত্যন্ত বিলক্ষণস্বভাব, ব্রহ্ম ও অব্রহ্ম বা চেতন ও অচেতন (জড় পদার্থ) ঠিক তেমনি নিতান্ত বিরুদ্ধ-স্বভাব। ইহাদের পরস্পর স্বরূপ-সম্মিশ্রণ বা সাহচর্য্য কখনও কোথাও দৃষ্ট হয় না; সুতরাং চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে অচেতন জগৎ-প্রপঞ্চের আরোপ বা অভেদবুদ্ধি কখনও হইতে পারে না (২)।

(১) এস্থলে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"যত্র যদধ্যাসঃ, তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অণুমাত্রেণাপি ন স সম্বধ্যতে" (বেদান্তদর্শন ভাষ্য)। অর্থাৎ যাহাতে যাহার অধ্যাস বা আরোপ হয়, সেই আরোপাধার বস্তুটী আরোপিত বস্তুর দোষে বা গুণে অতি অল্পমাত্রও সংশ্লিষ্ট হয় না; সে যাহা ছিল, তাহাই থাকে।

(২) আরোপ বা অধ্যাস দুই প্রকার। এক ধর্ম্মীর অধ্যাস, অপর ধর্ম্মের অধ্যাস। ধর্ম্মীর অধ্যাসকে বলে তাদাত্ম্যাধ্যাস, আর ধর্ম্মের অধ্যাসকে বলে সংসর্গাধ্যাস। এক বস্তুর যে, অপর বস্তুতে অধ্যাস, অর্থাৎ

অতএব উল্লিখিত অদ্বৈতবাদ অযৌক্তিক ও অপ্রামাণিক; সুতরাং সুধীগণের অনুপাদেয়।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন—উক্ত উভয় আপত্তিই অকিঞ্চিৎকর—বিচারসহ নহে। প্রথম আপত্তির উত্তর এই যে, যাহা কখনও দৃষ্ট বা অনুভূত হয় নাই, তাহার যে, অন্যত্র আরোপ হয় না বা হইতে পারে না, একথা খুবই সত্য; কিন্তু আলোচ্য জীবভাব ও দ্বৈতভাব ত সেরূপ নহে। বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রের উপদেশ হইতে জানা যায় যে, সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি (৩)। সৃষ্টির আদি অবস্থা ধরিয়া চিন্তা করিবার অধিকার বা ক্ষমতা ক্ষুদ্র মানববুদ্ধির নাই। সেই জন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণকে লক্ষ্য করিয়া পুরাণশাস্ত্র—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ, ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ"

এক বস্তুকে যে, অপর বস্তু বলিয়া মনে করা, যেমন—রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে করা, তাহা ধর্ম্মীর অধ্যাস, আর যেখানে এক বস্তুতে অপর বস্তুর ধর্ম্মমাত্র—গুণ বা ক্রিয়ামাত্র আরোপিত হয়, যেমন শুভ্র স্ফটিকে সন্নিহিত রক্তপুষ্পের লৌহিত্যের অধ্যাস,—যাহার ফলে স্ফটিককে রক্তবর্ণ বলিয়া মনে হয়, এই জাতীয় অধ্যাসকে ধর্ম্মের অধ্যাস বা সংসর্গাধ্যাস বলা হয়।

(৩) সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব বিষয়ে শ্রুতি "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা-পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" এখানে—যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ বলিয়া সৃষ্টির অনাদিত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন।

পুরাণশাস্ত্রও বলিতেছেন, "যথর্ত্তু ঋতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।" "তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ।" ইত্যাদি।

বলিয়া, চিন্তার অগোচর বিষয়ে ভাবনা বা মস্তিষ্কচালনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বস্তুতও সৃষ্টির আদি অবস্থা অনুসন্ধান করিতে গেলেই পরমেশ্বরের পবিত্রতায় ব্যাঘাত ঘটে, অধিকন্তু দুর্নিবার 'অনবস্থা' দোষ আসিয়া পড়ে; এই জন্যই সৃষ্টিপ্রবাহকে অনাদি-সিদ্ধ বলিতে হয়। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক কল্পে আবির্ভূত প্রাণিগণ পূর্ব্বসৃষ্টির সঞ্চিত সংস্কাররাশি সঙ্গে করিয়াই জন্মধারণ করে; সুতরাং সেই প্রাক্তন সংস্কারানুসারে জ্ঞান ও কর্ম্ম করাই তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। পূর্ব্বসৃষ্টিতে যে লোক যে সকল বিষয় অনুভব করিয়াছিল, সে সকল বিষয় সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, তাহাকে তদনুভবের অনুরূপ সংস্কার পাইতেই হইবে, এবং পরবর্ত্তী কল্পে যখনই সে জগতে প্রাদুর্ভূত হইবে, তখনই সে আপনার পূর্ব্বলব্ধ সংস্কারানুসারে ভ্রম বা প্রমা (যথার্থ জ্ঞান) অর্জ্জন করিতে থাকিবে। ইদানীন্তন জ্ঞানের জন্য পূর্ব্বসৃষ্টিতে দৃষ্ট পদার্থের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না; কেবল জ্ঞান ও জ্ঞানজ সংস্কারমাত্র থাকা আবশ্যক হয়। কাজেই পূর্ব্বতন সংস্কারের প্রভাবে এমন অসত্য জগতেরও ব্রহ্মেতে অধ্যাস বা আরোপ করা অসম্ভব হইতে পারে না।

অভিপ্রায় এই যে, কার্য্যমাত্রই কারণ-সাপেক্ষ; কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই আত্মলাভ করে না। এই জন্য অপ্রত্যক্ষ স্থলেও কার্য্য দেখিয়া একটা কারণ কল্পনা করিতে হয়। কিরূপ কার্য্যের জন্য কিরূপ কারণ কল্পনা করিতে হইবে, তাহা নানাপ্রকার উপায়ে

নির্দ্ধারণ করিতে হয়। স্মরণাত্মক জ্ঞানের স্থলে যেরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান-সংস্কারমাত্র থাকা আবশ্যক হয়, কিন্তু স্মর্য্যমাণ বিষয়টীর সত্যাসত্যতার কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না, আলোচ্য অধ্যাসের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। কেন না, অধ্যাসে আর স্মৃতিতে প্রভেদ অতি সামান্য। আচার্য্য শঙ্করও 'অধ্যাসকে' 'স্মৃতিরূপ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। অতএব স্মৃতিতে যেমন কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারই একমাত্র কারণ, অধ্যাসেও ঠিক তেমনই পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারই একমাত্র কারণ, কিন্তু যে বিষয়টীর অধ্যাস করা হয়, তাহার সত্যতা উহার কারণই নহে। অতএব ব্রহ্মে আরোপিত জগতের বাস্তব সত্যতা কোন কালে না থাকিলেও ক্ষতি হইতেছে না। অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহক্রমে প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে জগৎ সম্বন্ধে যে একটা জ্ঞান বা সংস্কার আছে, সেই সঞ্চিত সংস্কারপ্রভাবেই জীবগণ পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বানুরূপ ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মেতে জগতের অধ্যাস হওয়া অনুপপন্ন হইতেছে না।

যদি কেহ মনে করে, প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুতেই অপর বস্তুর আরোপ হইতে পারে, অপ্রত্যক্ষ বস্তুতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, যে বস্তুতে শ্বেত পীতাদি কোনপ্রকার গুণ বিদ্যমান থাকে,

---

(১) আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"আহ কোঽয়মধ্যাসো নাম।" অধ্যাস আবার কি? না,"স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ"—অর্থাৎ অন্য বস্তুকে যে, পূর্ব্বানুভূত অন্য বস্তু বলিয়া প্রতীতি, অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে যে, সেই বস্তু বলিয়া কিম্বা সেই বস্তুর গুণাদিযুক্ত বলিয়া প্রতীতি, তাহার নাম 'অধ্যাস'। এই অধ্যাস স্মরণাত্মক জ্ঞানের অনুরূপ, কেন না, উভয়ই পূর্ব্বতন সংস্কার হইতে আত্মলাভ করিয়া থাকে।

চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই বস্তুরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং সেইরূপ কোন একটা বস্তুতেই তথাবিধ অপর কোন বস্তুর আরোপ করা সম্ভবপর হয়, ইহাই সার্ব্বজনীন ব্যবহার। কিন্তু তোমার অভিমত ব্রহ্ম যখন নীরূপ—শ্বেত পীতাদি সর্ব্বপ্রকার রূপবিবর্জ্জিত এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরও বিষয় নহে, তখন তাঁহাতে ত দৃশ্য জগতের আরোপ বা অধ্যাস হইতেই পারে না; অতএব আচার্য্য শঙ্করের অভিমত 'অধ্যাসবাদ' যুক্তিযুক্ত বা বিচারসহ নহে।

বলা বাহুল্য যে, শঙ্কর নিজেই এ আপত্তির সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—একমাত্র প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুতেই যে, সর্ব্বত্র অধ্যারোপ বা অধ্যাস হইবে, এরূপ নিয়ম-ব্যবস্থা হইতেই পারে না। এরূপ বহু উদাহরণ বিদ্যমান আছে, যেখানে উক্ত নিয়ম সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হইয়াছে। আকাশের নীলিমা তাহার একটা সুন্দর উদাহরণ। আকাশ স্বভাবতই রূপহীন এবং সকলের নিকটই অপ্রত্যক্ষ; অথচ সেই নীরূপ অপ্রত্যক্ষ আকাশে যে, পার্থিব নীলিমার (নীল বর্ণের) আরোপ হইয়া থাকে, ইহা সকলেই অবগত আছে। অতএব অপ্রত্যক্ষ আকাশে যদি নীলিমার আরোপ সম্ভবপর হইতে পারে, তবে অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মেতেই বা জগতের অধ্যাস হইতে বাধা কি? উভয়েরই নীরূপতা ও অপ্রত্যক্ষতা ধর্ম্ম তুল্য (১)।

---

(১) এ বিষয়ে শঙ্করের নিজের উক্তি এই—"নচায়মস্তি নিয়মঃ, পুরোঽবস্থিতে এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি। অপ্রত্যক্ষেঽপি হ্যাকাশে বালাঃ তল-মলিনতাদি অধ্যস্যন্তি।" *** নচায়মেকান্তেনাবিষয়ঃ,

আচার্য্য শঙ্কর উল্লিখিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই বিরত হন নাই; তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম যে, আকাশের ন্যায় নিতান্তই অপ্রত্যক্ষ, তাহাও নহে। কারণ, বিবিধ উপনিষদ্বাক্য হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বয়ং ব্রহ্মই জীবরূপে প্রাণিদেহে অবস্থিতি করেন। জীবে ও ব্রহ্মে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সকলেই সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে মনে মনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ করে বলিয়াই আপামর সকলে 'আমি আছি' (অহমস্মি) বলিয়া বিনা বিচারে আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকে; কেহই 'আমি নাই, বা 'আমি আছি কি না?' বলিয়া আত্মার অভাব কিংবা তদ্বিষয়ে সংশয় পোষণ করে না। আত্মবিষয়ে যদি কাহারো সংশয় থাকিত, তবে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি অপরের নিকট যাইয়া আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় ভঞ্জনের চেষ্টা করিত, কিন্তু কোন উন্মত্তও সেরূপ করে বলিয়া শ্রুতিগোচর হয় না; কারণ, আত্মার স্বরূপ

অহংপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ। সর্ব্বো হি আত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি, ন 'নাহমস্মি' ইতি। আত্মা চ ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

ভাবার্থ—সম্মুখবর্ত্তী প্রত্যক্ষগোচর বস্তুর উপরেই যে, আরোপ করিতে হইবে, অন্যত্র নহে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই। কেন না, দেখিতে পাওয়া যায় যে, বালক বা অল্পবুদ্ধি লোকেরা অপ্রত্যক্ষ আকাশেও তল-মলিনত্ব প্রভৃতি গুণের আরোপ করিয়া 'আকাশতল' ও 'নীল আকাশ' ইত্যাদি বলিয়া থাকে। তাহার পর, ব্রহ্ম যে, অত্যন্ত অপ্রত্যক্ষ, তাহাও নহে, কারণ, আত্মার অস্তিত্ব তো সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে; সেইজন্যই 'আমি আছি' এই কথা নিঃসংশয়ে বলিয়া থাকে। সেই আত্মাই ব্রহ্ম; সুতরাং আত্মা নিতান্তই প্রত্যক্ষের অবিষয় নহে।

সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ নাই; কেন না, আত্মা সাধারণভাবে সকলেরই প্রতীতিগম্য বা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ বিষয়ে আবার সংশয় কি? যাহা কিছু সংশয়, তাহা কেবল আত্মার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে। অতএব আত্মাকে প্রত্যক্ষের অগোচর মনে করিয়া তাহাতে অধ্যাসের অসম্ভাবনা শঙ্কা করা সমীচীন হয় না।

অতঃপর দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, যদিও আত্মা ও অনাত্মা (দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি) আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় অত্যন্ত বিরুদ্ধস্বভাব হউক, এবং যদিও এই কারণেই চিন্ময় আত্মাতে অচেতন জড়পদার্থের আরোপ হওয়া একান্ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হউক, তথাপি উহা অসম্ভব বা বিস্ময়াবহ নহে। কেন না, যাহা অনুভবসিদ্ধ, এবং প্রমাণদ্বারাও সমর্থিত, তাহা যদি আপাত জ্ঞানে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়াও মনে হয়, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, উহা বস্তুর (বিচার্য্য বিষয়ের) দোষ নহে, পরন্তু লোক-বুদ্ধিরই সম্পূর্ণ দোষ। যেরূপ প্রণালীপথে ঐ তত্ত্ব অবধারিত করিতে পারা যায়, আমাদের বুদ্ধি সে পথ ধরিতে পারে না; তাই সে লৌকিক যুক্তি বা দৃষ্টান্তের তুলে পরমেশ্বরের সৃষ্টিলীলা পরিমাপ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। বস্তুতঃ যুক্তি ও দৃষ্টান্তের অধিকার-সীমা যে, অত্যন্ত সংকীর্ণ, তাহা বুদ্ধিমান্ মানবমাত্রই চিন্তা করিলে বুঝিতে পারেন। শুক্র-শোণিতসংযোগে শরীরোৎপত্তি ইহার একটী উত্তম উদাহরণ (১)। যুক্তিতর্কের

(১) এবংবিধ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যারণ্য মুনি বলিয়াছেন—

অগম্য সেই মহাসত্যকে লোকবুদ্ধির গোচরে আনয়নের জন্যই আচার্য্য শঙ্কর মায়াবাদের অবতারণা করিয়াছেন, এবং—

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্।" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্)
"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া॥" (গীতা)।

ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত মায়ার সাহায্যে উক্ত অসম্ভবকেও সম্ভবে পরিণত করিয়াছেন। অঘটন-সংঘটন করাই মায়ার স্বভাব; সুতরাং অজ্ঞানরূপা মিথ্যা মায়া দ্বারাও চিন্ময় আত্মাতে অচেতন জড় পদার্থের ও তদীয় ধর্ম্মসমূহের অধ্যাস বা আরোপ সম্পাদিত হইতে পারে। এ বিষয়ে শঙ্করের উক্তি এইরূপ :—

"তথাপি অন্যোন্যস্মিন্ অন্যোন্যাত্মকতাম্ অন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চাধ্যস্য ইতরেতরাবিবেকেন অত্যন্তবিবিক্তয়োর্ধর্ম্ম-ধর্ম্মিণোঃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য অহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ।"

"এবময়মনাদিরনন্তঃ নৈসর্গিকোঽধ্যাসঃ মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বপ্রবর্ত্তকঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ। (বেদান্তদর্শন, অধ্যাসভাষ্য।)

"নিরূপয়িতুমারব্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ।
অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ॥
দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবা বীর্য্যেণোৎপাদিতাঃ কথম্।
কথং বা তত্র চৈতন্যম্? ইত্যুক্তে তে কিমুত্তরম্?॥"
(পঞ্চদশী চিত্রদীপ-১৪৩-৪)

তাৎপর্য্য—জগতের সমস্ত পণ্ডিতও যদি একত্রিত হইয়া শুষ্ক তর্কের সাহায্যে তত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও ক্রমে এমন নিবিড় অন্ধকারাবৃত তত্ত্বস্থানসমূহ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে যে, তাহাদের জ্ঞানদীপের ক্ষীণালোকে সে অন্ধকাররাশি দূর করিতে পারিবে না। সামান্য শুক্র-শোণিতসংযোগে দেহ-ইন্দ্রিয়প্রভৃতি যে, কিরূপে উৎপন্ন হয়? এবং কিরূপেইবা তাহাতে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়? তুমি এ সব প্রশ্নের কি উত্তর দিতে পার? অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত কোন উত্তরই দিতে পার না।

অভিপ্রায় এই যে, যদিও বিরুদ্ধস্বভাব আত্মা ও অনাত্মার পারস্পরিক অধ্যাস অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে হউক, তথাপি মিথ্যাভূত অজ্ঞানের (মায়ার) প্রভাবে পরস্পরে পরস্পরের স্বরূপ ও ধর্ম্মের অধ্যাস হইয়া থাকে; এবং তন্নিবন্ধনই 'আমি দেহী, আমার দেহ, আমি স্থূল বা কৃশ' ইত্যাদি নানাপ্রকার লোক-ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়, এই অধ্যাসের আদি নাই, অন্ত নাই—ইহা অনাদি অনন্ত।

অতএব উল্লিখিত অধ্যাস যে অনুভবসিদ্ধ, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বলা বাহুল্য যে, অজ্ঞানকৃত এই অধ্যাসই জীবের সর্ব্ববিধ অনর্থের মূল। যতদিন এই অধ্যাস অব্যাহত থাকিবে, ততদিন দুঃখময় অনর্থরাশিও জীবের সহচররূপে অনুগামী হইবেই হইবে। সেই অনর্থরাশি অপনয়ন করিতে হইলে অগ্রে তাহার মূলকারণ অধ্যাসকে বিদূরিত করিতে হইবে। কিন্তু বিমল আত্মজ্ঞান ব্যতীত আত্ম-গত অজ্ঞানাত্মক সে অধ্যাসের নিবৃত্তি করা কখনই সম্ভবপর হয় না; এবং ব্রহ্মের স্বরূপ-পরিচয় না জানিলে আত্মারও প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারা যায় না; কারণ, ব্রহ্মই আত্মার (জীবের) প্রকৃত স্বরূপ; ব্রহ্মই জীবরূপে প্রত্যেক দেহে বিরাজ করিতেছেন; ব্রহ্ম ও জীব একই পদার্থ। অতএব সর্ব্বানর্থের নিদানভূত অধ্যাস-নিবারণাভিলাষী প্রত্যেক বিবেকী পুরুষেরই আত্মজ্ঞানলাভের জন্য অগ্রে ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা একান্ত আবশ্যক হয়। এই অভিপ্রায়েই মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্তদর্শনের প্রথমে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অবতারণা করিয়াছেন; এবং

পরবর্ত্তী চারিটী সূত্রে এতদনুকূলে আপনার অভিপ্রায় বিবৃত করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর আবার সেই প্রথম চারিটী সূত্রকেই অদ্বৈতবাদের অনুকূল ব্যাখ্যায় বিভূষিত করিয়া, তদ্দারা বেদব্যাসের অভিপ্রায়কে আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাহার প্রথম সূত্রটী এই :—

"অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ॥" (১ অঃ। ১ পাদ। ১ সূত্র)।

এখানে 'অথ' অর্থ—অনন্তর। কিসের অনন্তর? না, নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক, ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, মুক্তিলাভে প্রবল ইচ্ছা এবং শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধি, এই ষড়্‌বিধ সাধন-সম্পত্তির পর (১)। 'অতঃ' শব্দের অর্থ—এইহেতু—যে হেতু ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত নিত্য নিরতিশয় মুক্তি-ফলের আশা নাই, সেই হেতু—মুক্তিকামী লোকেরা অবশ্যই ব্রহ্মবিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন। শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে ব্রহ্মবিষয়ে নিরন্তর বিচার করিলে পর, ক্রমে তদ্বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা বা সমাধিযোগ উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের

(১) শমাদি ছয়প্রকার সাধন এই :—(১) শম—অন্তঃকরণকে বশীভূত করা। (২) দম—বহিরিন্দ্রিয় চক্ষুঃপ্রভৃতিকে বশে রাখা। (৩) উপরতি—বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয়গণকে পুনরায় সে সকল বিষয়ে যাইতে না দেওয়া। (৪) তিতিক্ষা—চিত্তের উদ্বেগকর শীত গ্রীষ্ম ও সুখদুঃখাদি উপসর্গ অনায়াসে সহ্য করিতে পারা। (৫) সমাধান—সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন। (৬) শ্রদ্ধা—শাস্ত্রবাক্যে ও গুরুবাক্যে অটুট বিশ্বাস।

বুদ্ধি-দর্পণে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিফলিত হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবের প্রকৃত তত্ত্ব (ব্রহ্মভাব) উপলব্ধিগোচর হইয়া তদ্বিষয়ক অজ্ঞান-দোষ বিদূরিত করিয়া দেয়। এইজন্য মুমুক্ষুগণের পক্ষে ব্রহ্মবিচার করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। (১।১।১ সূত্র)

প্রথম সূত্রে কেবল ব্রহ্মবিচারের উপযোগিতামাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু বিচারণীয় ব্রহ্মের কোনরূপ লক্ষণ বা পরিচয় প্রদান করা হয় নাই। অথচ ব্রহ্মের পরিচয়-প্রদানক্ষম একটা লক্ষণ জানা না থাকিলে তদ্বিষয়ে বিচারপ্রবৃত্তি বা তত্ত্বজিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষা কাহারো মনে উদিত হইতে পারে না। কেন না, যে বিষয়ে যাহার একটা সাধারণ জ্ঞানও না থাকে, তদ্বিষয়ে তাহার বিশেষ জ্ঞানের (তত্ত্বজ্ঞানের) প্রবৃত্তি কখনও হয় না, বা হইতে পারে না; এইজন্য সূত্রকার জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মের পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ॥" (১ অঃ। ১ পাঃ। ২ সূত্র)

যাহা হইতে পরিদৃশ্যমান জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় নিষ্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম, অর্থাৎ এই জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপত্তির পরেও যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, এবং বিনাশ সময়েও যাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকে, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মপদ-বাচ্য।

কোন এক বস্তুকে অপর সকল বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া দেওয়াই লক্ষণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ বস্তুগত গুণ বা ক্রিয়াদ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে

বস্তু ইন্দ্রিয়ের অগোচর—অত্যন্ত পরোক্ষ, সেরূপ বস্তুর পরিচয়-প্রদানস্থলে গুণ ও ক্রিয়াই প্রধানতঃ লক্ষণের কার্য্য করিয়া থাকে। ব্রহ্মও পরোক্ষ বস্তু; এইজন্য সূত্রকার ব্রহ্ম-লক্ষণে জন্মাদি ক্রিয়ার সন্নিবেশ করিয়াছেন।

অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে জানিতে হইলে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণরূপেই জানিতে হইবে। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তৃরূপে ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, অথবা স্থিতির হেতুরূপে বুঝিতে পারা যায়, কিংবা ধ্বংসোন্মুখ জগতের আশ্রয়রূপেও তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। স্বয়ং শ্রুতিও এই ত্রিবিধ কার্য্য দ্বারাই ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্ম।" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ৩।১।১)।

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হয়, জাত হইয়াও যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং প্রলয়কালেও যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ, তাঁহাকে অবগত হও, তাঁহাই ব্রহ্ম। এই শ্রুতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উপরি উদ্ধৃত দ্বিতীয় সূত্রটী বিরচিত হইয়াছে মনে হয়। এতদনুরূপ আরও বহু শ্রুতিবাক্য আছে, যে সকল বাক্য দ্বারা উল্লিখিত সূত্রার্থ সমর্থন করা যাইতে পারে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উপরে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা সগুণ ব্রহ্মেরই লক্ষণ, নির্গুণের নহে। নির্গুণ নির্ব্বিশেষ তুরীয় ব্রহ্মে কোন প্রকার গুণ-ক্রিয়াসম্বন্ধ নাই; সুতরাং গুণ বা ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে

বুঝাইতেও পারা যায় না ; এইজন্য তাঁহার স্বরূপই তাঁহার একমাত্র পরিচয়-প্রদানক্ষম লক্ষণরূপে পরিগৃহীত হয়। তাঁহার স্বরূপ হইতেছে—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ; সুতরাং তাহাই ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ (স্বরূপ লক্ষণ)। উল্লিখিত তটস্থ লক্ষণ তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না (১) ; পারে না বলিয়াই স্বয়ং শ্রুতি তাঁহাকে কেবল "নেতি নেতি" করিয়া নিষেধমুখে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, বিধিমুখে করেন নাই। অতএব সূত্রমধ্যে জগতের জন্মাদি-কারণরূপে যাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন, পরন্তু সবিশেষ—মায়োপহিত ব্রহ্ম—পরমেশ্বর। তিনিই জগতের মূলকারণ।

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম হইতেই যে, জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ? জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিসংবাদ না থাকিলেও, তৎকারণ সম্বন্ধে ত যথেষ্টই মতভেদ দৃষ্ট হয়। ন্যায় ও বৈশেষিক-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণুকেই জগতের মূল কারণরূপে কল্পনা করিয়াছেন ; সাংখ্যমতে অচেতন প্রকৃতিকে সেই স্থানে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। বৌদ্ধমতে আবার অভাবের উপরই

(১) সাময়িক গুণক্রিয়াঘটিত যে লক্ষণ, তাহার নাম 'তটস্থ লক্ষণ', আর শুদ্ধস্বরূপমাত্রবোধক যে লক্ষণ, তাহার নাম 'স্বরূপ লক্ষণ'। মায়োপহিত সগুণ ব্রহ্মের নাম ঈশ্বর, আর মায়াসম্বন্ধরহিত যে নির্গুণ ব্রহ্ম, তাহার কোন নাম নাই, কেবল 'তুরীয়' প্রভৃতি কতিপয় শব্দে পরোক্ষভাবে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হয় মাত্র।

এই কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, পরস্পর বিরোধী আরও বহুতর মতবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে ব্রহ্ম-কারণতাবাদ আদৌ সমর্থিত হয় নাই। অতএব ব্রহ্মই যে, জগতের নির্ব্যূঢ় কারণ, সে বিষয়ে প্রমাণ কি? উত্তর—শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিতেছেন—

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ॥" ১।১।৩॥

ব্রহ্ম যে, কি, এবং কেমন, তাহা জানিবার পক্ষে শাস্ত্রই একমাত্র উপায়, যুক্তি তর্ক তাহার সহায়ক মাত্র। ইন্দ্রিয়ের অবিষয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করিতে সমর্থ; সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্রবচন হইতেই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে হইবে। ঋগ্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র অতি বিশদ ভাবায় আলোচ্য ব্রহ্মকে জগতের জন্মাদি-কারণ বলিয়াছেন, এবং অনাদি অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি সত্যসংকল্প ও মায়াধীশ ও নিত্য চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। দুর্ব্বল মানববুদ্ধি একথায় অবিশ্বাস করিয়া শান্তিপ্রদ আর অধিক কিছু ধরিতে বা বলিতে পারে না; অতএব পূর্ব্বোক্ত জন্মাদি সূত্রে ব্রহ্মের যেরূপ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

---

(১) এ বিষয়ে কয়েকটী মাত্র শ্রুতির উল্লেখ করা যাইতেছে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্" "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্' ইত্যাদি।

ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র যে, কেন বিশ্বাস্য, তাহা প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রকার সূত্র-বিন্যাসের আর একটী অভিপ্রায় এই যে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম আছেন সত্য, এবং তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ও জগৎ-জন্মাদির কারণ, এ কথাও সত্য, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ও স্বভাব অনুমানগম্য—অনুমানের সাহায্যেই তাহা জানিতে পারা যায়, কেবল শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় না। শাস্ত্র কেবল ঐসকল অনুমানের সহায়তা করে মাত্র। অতএব তাঁহাদের মতে পূর্ব্বকথিত "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রটী ব্রহ্মবিষয়ক অনুমানেরই পরিপোষক বাক্যরূপে গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হইতে পারে; সেই অসাধু কল্পনার সম্ভাবনা করিয়া সূত্রকার বলিলেন—শাস্ত্রই ব্রহ্মবিষয়ে একমাত্র নির্ব্যূঢ় প্রমাণ; অনুমান তাহার সহায়তাকল্পে গৃহীত হইলেও আপত্তির কোন কারণ নাই। অতএব জন্মাদি-সূত্রকে অনুমান-প্রকাশক না বলিয়া শ্রুত্যর্থপ্রদর্শক বলাই সঙ্গত। বিশেষতঃ শ্রুতির প্রকৃতার্থ সংকলন করাই বেদান্ত-দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। বেদান্তের সূত্রসমূহ বিভিন্নপ্রকার শ্রুতিবাক্য সংগ্রহ করিয়া, সে সকলের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক মীমাংসা সংস্থাপন করিয়াছে, কোথাও অনুমানের অনুশীলন করে নাই; এবং তাহা করা উহার উদ্দেশ্যও নহে; এই কারণেও 'জন্মাদি' সূত্রকে (১) অনুমান-প্রকাশক বলিতে পারা

---

(১) আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে আরও একপ্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—"শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদেঃ যোনিঃ কারণং প্রকাশকং" অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞানের আকর ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের যোনি—আবির্ভাবকারণ। অভিপ্রায় এই যে, যিনি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের আকর-স্বরূপ বিশাল ঋগ্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি যে

যায় না। এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশনের উদ্দেশ্যেই "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, যদিও কতিপয় শ্রুতিবাক্যের সাহায্যে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা ও জগৎকারণতা প্রতিপাদিত ও সমর্থিত হউক এবং যদিও শাস্ত্রীয় বাক্যসমূহই তদ্বিষয়ে অভ্রান্ত প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হউক, তথাপি এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ-শূন্য হইতে পারে না; কারণ, উক্ত সিদ্ধান্তের বিপক্ষেও এমন বহুতর শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল বাক্যের সাহায্যে অচেতন পরমাণু বা ত্রিগুণা প্রকৃতিও জগৎকারণরূপে গৃহীত হইতে পারে। অধিকন্তু, যে সকল বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের কারণতা সমর্থন করা হইয়াছে, সে সকল বাক্যে ("যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি বাক্যে) সাধরণতঃ 'যৎ' 'তৎ' প্রভৃতি শব্দেরই প্রয়োগবাহুল্য রহিয়াছে। ঐ সকল শব্দের অর্থ অতিশয় উদার—যখন যেরূপ প্রয়োজন হয়, তখন সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ ঐ সকল শব্দকে পরমাণু কারণবাদে এবং সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-কারণবাদেও সঙ্গত করা যাইতে পারে; সুতরাং ঐ সকল

তদপেক্ষাও অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন—সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে; সুতরাং তাদৃশ জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন পরমেশ্বরের পক্ষেই এই অচিন্ত্যরচনাত্মক ও বিবিধ বৈচিত্র্যবহুল বিশাল জগতের রচনাকার্য্য সম্পাদন করা সম্ভবপর হয়। অতএব পূর্ব্বসূত্রে কথিত 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' কথা সঙ্গতই বটে।

শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্ম-কারণবাদ প্রমাণিত বা সমর্থিত হইতেছে মনে করা সঙ্গত হয় না.। এইরূপ আপত্তির সম্ভাবনায় সূত্রকার বলিতেছেন—

"তত্তু সমন্বয়াৎ"॥ ১।১।৪॥

পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মই যে, জগতের একমাত্র কারণ, এবং সেই ব্রহ্ম যে, এক অদ্বিতীয় সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ ও সমস্ত উপনিষদের একমাত্র প্রতিপাদ্য, ইহা বেদান্তবাক্যের সমন্বয় বা তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনা দ্বারা অবধারিত হইয়া থাকে।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ—একমেবাদ্বিতীয়ং" (হে প্রিয়দর্শন, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল)। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" (অগ্রে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল)। "নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ" (স্পন্দমান আর কিছু ছিল না)। "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ)। "তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্" (সেই এই ব্রহ্ম পূর্ব্বাপর বিবর্জ্জিত ও বাহ্যাভ্যন্তর-রহিত)। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" (এই আত্মাই সর্ব্বানুস্যূত ব্রহ্মস্বরূপ)। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে)। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" (যাহা হইতে এই আকাশাদি ভূতবর্গ উৎপন্ন, উৎপত্তির পরেও যাহা দ্বারা জীবিত এবং অন্তকালেও যাহাতে প্রবিষ্ট হয়) ইত্যাদি শ্রুতিবচনসমূহ বিভিন্ন প্রসঙ্গে ও বিভিন্ন

প্রকরণে পঠিত হইলেও, এবং আপাতজ্ঞানে বিভিন্নার্থ প্রতিপাদক বলিয়া মনে হইলেও, তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এইজাতীয় সমস্ত বাক্যেরই লক্ষ্য এক—সমস্ত বাক্যই ব্রহ্মের সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দভাব ও জগৎকারণতা সমস্বরে প্রতিপাদন করিতেছে। স্বয়ং সূত্রকারও এবম্বিধ সমন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্রহ্মকারণতাবাদ সমর্থন করিয়াছেন—"তত্তু সমন্বয়াৎ" ইতি।

এ কথার অভিপ্রায় এই যে, যদিও কোন কোন উপনিষদের অংশবিশেষে অদ্বৈত ব্রহ্মকারণতাবাদের প্রতিকূল উপদেশাবলীও পরিদৃষ্ট হউক, এবং যদিও কোন কোন আচার্য্য সেই সকল বাক্যের বা বাক্যাংশের উপর নির্ভর করিয়া উল্লিখিত ব্রহ্মকারণতাবাদের বিরোধী মতবিশেষ পোষণ করিয়া থাকুন, তথাপি সেই সকল মতবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া ব্রহ্মকারণতাবাদের প্রতি অনাদর প্রকাশ করা সমিচীন নহে। কারণ, তাৎপর্য্যই বাক্যার্থ নিরূপণের প্রধান উপায়। আবশ্যক হইলে তাৎপর্য্যের অনুরোধে শব্দের সহজলব্ধ মুখ্য অর্থপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অর্থান্তর কল্পনা করিতে পারা যায়, কিন্তু মুখ্যার্থের অনুরোধে কখনও তাৎপর্য্যের বাধা ঘটান যায় না; ইহাই বাক্যার্থ বা শব্দার্থ নির্দ্ধারণের অবিসংবাদী নিয়ম (১)। বিশেষতঃ বিভিন্ন বাক্য বা বাক্যান্তর্গত

(১) শব্দের অর্থ দুই প্রকার—এক মুখ্য, অপর গৌণ। শব্দের স্বভাবসিদ্ধ শক্তি দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায়, সেই অর্থ মুখ্যার্থ নামে পরিচিত, আর তাৎপর্য্য রক্ষার অনুরোধে শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া

শব্দরাশির পৃথক্ পৃথক্ অর্থ গ্রহণ করিলে প্রায় কোন স্থলেই উহাদের সার্থকতা রক্ষা পাইতে পারে না; এইজন্য পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সকল বাক্য ও শব্দের সমন্বয় করা আবশ্যক হয়, তাৎপর্য্য বা বক্তার অভিপ্রায়ই সমন্বয়ের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া দেয়। এইজন্য, যেখানে তাৎপর্য্যের সহিত যথাশ্রুত শব্দার্থের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেস্থলে তাৎপর্য্য রক্ষার অনুরোধে শব্দের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়াও বাক্য-সমন্বয় করিতে হয়, ইহাই শব্দ-শাস্ত্রের নিয়ম।

কোন বাক্যের কোন অর্থে তাৎপর্য্য, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় ছয়টী—১ম, উপক্রম ও উপসংহার; ২য়, অভ্যাস; ৩য়, অপূর্ব্ব; ৪র্থ, ফল; ৫ম, অর্থবাদ; ৬ষ্ঠ, উপপত্তি (১)। এই

তৎসম্পর্কিত যে অন্য অর্থ গ্রহণ করা হয়, সেই অর্থটী গৌণ অর্থ বলিয়া কথিত হয়। গৌণ অর্থকে লাক্ষণিকও বলা হয়। মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া কোথায় যে, কিরূপ অর্থ (গৌণার্থ) কল্পনা করিতে হইবে, বাক্যের তাৎপর্য্যই তাহা স্থির করিয়া দেয়। তাৎপর্য্য অর্থ—বক্তার ইচ্ছা; অর্থাৎ বক্তা যেরূপ অর্থ প্রতীতির ইচ্ছায় শব্দ প্রয়োগ করেন, সেই ইচ্ছাই তাৎপর্য্য শব্দের অর্থ। বাক্যার্থ নির্ণয়ে তাৎপর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। এই জন্য সম্পূর্ণ শব্দার্থ ত্যাগ করিয়াও তাৎপর্য্য রক্ষা করিতে হয়। আলোচ্য উপনিষদ্বাক্য সম্বন্ধেও সে নিয়ম অবশ্য পালনীয়।

(১) বৈদান্তিকগণ বলেন—"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে॥"

উপক্রম অর্থ—যে ভাবে প্রকরণের আরম্ভ, তাহা। উপসংহার অর্থ—প্রকরণার্থের পরিসমাপ্তি। অভ্যাস অর্থ—বারংবার উক্তি। অপূর্ব্বতা অর্থ—অন্যত্র অপ্রাপ্তি জ্ঞাপন। অর্থবাদ অর্থ—প্রশংসাবাদ। উপপত্তি

ষড়্‌বিধ উপায়ে অর্থানুসন্ধান করিলেই বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য ধরা পড়ে। তদনুসারে বাক্যার্থ নির্ণয় করিলে আপনা হইতেই সমস্ত বিরোধ বা অসামঞ্জস্যের সমাধান সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মকারণতাবাদের অনুকূল-প্রতিকূলরূপে যে সমস্ত উপনিষদ্বাক্য পরিলক্ষিত হয়, সে সকল বাক্যের সমন্বয় বা একবাক্যতা ব্যতীত পারস্পরিক বিরোধ পরিহারের আর অন্য উপায় নাই। পক্ষান্তরে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি বাক্যে সৃজ্যমান জগৎকে উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত বলা হইয়াছে; কার্য্যই কারণে বীজভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। কার্য্যভূত ঘটের তৎকারণ মৃত্তিকায় অবস্থিতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং ব্রহ্মেতে অবস্থিত এবং ব্রহ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত জগৎ যে ব্রহ্ম-কার্য্য. এবং ব্রহ্মই যে, তাহার মূল কারণ, একথা আর পৃথক্ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় না। "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ" ইত্যাদি বাক্যেও স্পষ্টভাষায় ব্রহ্মকে আকাশাদি ভূতবর্গের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এইভাবে কতিপয় স্থলে অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হওয়ায় সন্দিগ্ধার্থক অন্যান্য শ্রুতিবাক্যকেও অসন্দিগ্ধার্থক বাক্যার্থের অনুগামী করিয়া

অর্থ—অনুকূল যুক্তিদ্বারা সমর্থন। অভিপ্রায় এই যে, প্রকরণের আরম্ভে ও উপসংহারে যে বিষয় বর্ণিত হয়, মধ্যেও বারংবার যাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যে বিষয়ের উৎকর্ষ বা অন্যত্র দুর্লভত্ব জ্ঞাপন করা হয়; যাহার সম্বন্ধে কোন প্রকার ফলোল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং যে বিষয়ের প্রসংশা ও যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা হয়, বুঝিতে হইবে, তদ্বিষয়েই সেই প্রকরণের তাৎপর্য্য, সুতরাং সেই প্রকরণের প্রত্যেক বাক্যকেই তদনুগত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়।

লইতে হয়; সুতরাং শ্রুতিসমন্বয় যে, আলোচ্য ব্রহ্মকারণতাবাদকেই সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; অতএব সূত্রকারের "তত্তু সমন্বয়াৎ" কথা কোন অংশেই অসঙ্গত হয় নাই।

পূর্ব্বমীমাংসক (জৈমিনি) ও তন্মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ এ সিদ্ধান্তে পরিতুষ্ট না হইয়া, এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্ ॥"

অর্থাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিপ্রকাশক ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য; অতএব যে সকল বাক্য তাহা করে না, কাহাকেও কোন বিষয়ে প্রবর্ত্তিত, কিম্বা কোন বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করে না, কেবল প্রসিদ্ধ পদার্থের উল্লেখ করিয়াই বিরত হয়, সে সকল বেদবাক্য নিরর্থক বা লোকের অনুপযোগী; সুতরাং প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য নহে। ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যগুলিও প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক নহে, কেবল ব্রহ্মের স্বরূপমাত্র-প্রকাশক; অতএব সে সকল বাক্যও নিরর্থক—উপেক্ষাযোগ্য। কেন না, মানবগণকে হিতাহিত বিষয় বিজ্ঞাপন করা, এবং তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য উপদেশ দেওয়াই শাস্ত্রবাক্যের একমাত্র উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্য-বিহীন—কেবলমাত্র বস্তুনির্দ্দেশক বাক্যসকল কখনই সার্থক বা প্রমাণ হইতে পারে না। অতএব সে সকল বেদবাক্য দ্বারা তাদৃশ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মকারণতাবাদ সমর্থিত হইতেই পারে না। অতএব "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে যে, বাক্যসমন্বয়ের সাহায্যে ব্রহ্মের

জগৎকারণতা সমর্থন করা হইয়াছে, তাহা কখনই সুসঙ্গত হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, বস্তুমাত্রবোধক ঐ সকল বাক্যের যদি সার্থকতা রক্ষা করিতেই হয়, তাহা হইলেও ক্রিয়াবিধায়ক কর্ম্মকাণ্ডের সহিত একবাক্যতা করিয়াই রক্ষা করিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, কর্ত্তব্যোপদেশবিহীন বেদবাক্যকে নিরর্থক বলিয়া উপেক্ষা করিতে যদি কুণ্ঠা বোধ হয়, তাহা হইলেও, সার্থক কর্ম্মকাণ্ডে যে সমস্ত ক্রিয়া (যাগ-যজ্ঞাদি) বিহিত আছে, সেই সমস্ত ক্রিয়ার উপযোগী কর্ত্তা, কর্ম্ম বা দ্রব্যাদি প্রকাশকরূপেই ঐ সমস্ত বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে, স্বতন্ত্রভাবে নহে (১)। অতএব "তদ্ ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ" অর্থাৎ ক্রিয়াসম্বন্ধরহিত বস্তুমাত্র-প্রকাশক বাক্যগুলিকে ক্রিয়াবিধায়ক বাক্যের সহিত মিলাইতে হইবে, অর্থাৎ ক্রিয়াবিধির সঙ্গে যোগ দিয়া ঐ সকল বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাই মীমাংসকগণের অভিমত সিদ্ধান্ত।

---

(১) এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মকাণ্ডে বহুতর যাগ-যজ্ঞের বিধি আছে। যজ্ঞ করিতে হইলেই কর্ত্তার আবশ্যক হয়, এবং যে দেবতার উদ্দেশ্যে ও যে সকল দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে, সে সকল বিষয়ও জানা থাকা আবশ্যক হয়। সেই উদ্দেশ্যেই উপনিষদের মধ্যে, যজ্ঞসম্পাদক কর্ত্তারূপে আত্মার, কর্ম্মরূপে দেবতা ও ব্রহ্ম প্রভৃতির, এবং তদুপযোগী দ্রব্যাদিরও যথাসম্ভব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপে শুদ্ধ বস্তুমাত্রবোধক উপনিষদ্বাক্যও সার্থক হইতে পারে; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে—কেবল ব্রহ্মপ্রতিপাদকরূপে সার্থক হইতে পারে না। "তদ্ ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ" সূত্রে এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এ কথার উত্তরে আচার্য্য শঙ্করস্বামী যে সকল যুক্তি ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, এখানে সম্পূর্ণভাবে সে সকলের অবতারণা করা অসম্ভব। তাঁহার কথার সার মর্ম্ম এই যে, কোন বাক্য সার্থক, আর কোন বাক্য নিরর্থক, তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকিতে পারে না। সাধারণতঃ যে বাক্য শ্রবণ করিলে শ্রোতার হৃদয়ে একটা অর্থ প্রতীতি হয়, এবং তাহা দ্বারা শ্রোতার হর্ষ বিষাদাদিভাব পরিস্ফুট হয়, সেই বাক্যই সার্থক বা প্রমাণ, আর তদ্ভিন্ন বাক্যই নিরর্থক বা অপ্রমাণরূপে উপেক্ষণীয়। কর্ত্তব্যোপদেশবিহীন শুদ্ধ বস্তুমাত্রের প্রতিপাদক বাক্য হইতেও যে, অর্থ প্রতীতি ও তৎফল হর্ষ বিষাদাদিভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। 'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে' এ কথা শুনিলে কাহার মনে আনন্দ ও মুখে প্রসন্নতা দৃষ্ট না হয়? এই বাক্যে ত কোনপ্রকার বিধি-নিষেধের সম্বন্ধ নাই, কোন প্রকার কর্ত্তব্যতারও উপদেশ নাই; আছে, কেবল পুত্রোৎপত্তির সংবাদ মাত্র। অথচ এই বাক্য হইতেও শ্রোতার অর্থ-প্রতীতি হইয়া থাকে, যাহার ফলে আন্তরিক হর্ষসূচক মুখবিকাশাদি চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রোক্ত ব্যবস্থা কখনই নিয়মরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না; সুতরাং তদ্দ্বারা বেদান্তবাক্যের আনর্থক্য বা অপ্রামাণ্যও সমর্থন করা যাইতে পারে না। তাহার উপর, ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদ্‌বাক্য-সমূহ কখনই ক্রিয়াবিধির আকাঙ্ক্ষা-পরিপূরকরূপে কল্পিত হইতে পারে না। কারণ, ক্রিয়াবিধিসমূহ সাধারণতঃ সংহিতাভাগের

কর্ম্মকাণ্ডে সন্নিবিষ্ট, আর ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্যসমূহ প্রধানতঃ জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদের অন্তর্গত; বিভিন্ন প্রকরণস্থিত বাক্যসমূহ কখনই অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যগুলিকে কর্ম্মকাণ্ডীয় ক্রিয়াবিধির উপযোগী দ্রব্য-দেবতাদির প্রকাশকও বলিতে পারা যায় না। অতএব স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য পরিকল্পনা করিতে হইবে, অঙ্গাঙ্গীভাবে নহে।

ভিন্ন প্রকরণস্থ বাক্যসমূহের অঙ্গাঙ্গীভাব কল্পনা করা অযৌক্তিক ও অসম্ভব হয় বলিয়াই মীমাংসক-মতাবলম্বী কেহ কেহ ঐ সমস্ত উপনিষদ্-বাক্যকে উপাসনা কার্য্য-বিধায়ক বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন, উপনিষদ্‌শাস্ত্রমধ্যে যে সমস্ত উপাসনাবিধি আছে— "আত্মেত্যেবোপাসীত" (আত্মা-ইত্যাকারেই উপাসনা করিবে), "আত্মানমেব লোকমুপাসীত" (আত্মাকেই প্রাপণীয়রূপে উপাসনা করিবে), "ব্রহ্মবেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি", (ব্রহ্মকে জানিবে—উপাসনা করিবে, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন) ইত্যাদি। সেই সকল উপাসনাবিধিতে উপাস্যরূপে আত্মা ও ব্রহ্মের উল্লেখ মাত্র আছে, কিন্তু আত্মা বা ব্রহ্ম যে কেমন—কি প্রকার, এ সকল কথা সেখানে নাই; আলোচ্য উপনিষদ্বাক্যসমূহ সেই উপাস্য আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ পরিচয়াদি প্রকাশ করিতেছে, এবং সেইভাবেই উপাসনা-বিধির সহিত সম্বন্ধলাভ করিয়া সার্থকতা ভোগ করিয়া থাকে।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, এ কথাও শাস্ত্রসম্মত বা যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, উপনিষদ্‌শাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে,

নির্বিবশেষ ব্রহ্ম স্বরূপতঃ ক্রিয়াবিধির বিষয়ই হন্ না, অর্থাৎ তাঁহার উপর কোন প্রকার ক্রিয়াই হইতে পারে না; সুতরাং তদ্বিষয়ে উপাসনার বিধি কিম্বা অন্য প্রকার ক্রিয়াসম্বন্ধ কল্পনা করা শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

উপনিষদের বহুস্থলে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে, এবং বহু-স্থানেই উপাসনার কথাও উল্লিখিত আছে, সত্য, কিন্তু তাহা হইতে জ্ঞান ও উপাসনা এক বলিয়া মনে করা উচিত নহে; কেন না, উপাসনা বস্তুতঃ জ্ঞান হইলেও ক্রিয়াত্মক; ক্রিয়াত্মক বলিয়াই উপাসনার উপর কর্ত্তার স্বাধীনতা থাকে; কর্ত্তা নিজের ইচ্ছানু-সারে এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়াও উপাসনা (ভাবনা) করিতে পারে; কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের উপর কর্ত্তার সেরূপ স্বাধীনতা থাকে না। জ্ঞাতব্য বিষয় ও উপযুক্ত উপকরণ (যে সকলের দ্বারা জ্ঞান হইতে পারে, সে সকল বস্তু) উপস্থিত থাকিলে কর্ত্তার ইচ্ছা না থাকিলেও জ্ঞান হইবেই হইবে। মনে করুন, আমার নিকটে সুস্পষ্ট আলোকের মধ্যে একটী ঘট রহিয়াছে, আমার চক্ষুও সেই ঘটের উপর পড়িয়াছে, এমত অবস্থায় আমি যদি ইচ্ছা নাও করি, অথবা ঘটকে 'পট' বলিয়া জানিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলেও সেই ঘটের জ্ঞান আমার হইবেই হইবে, কখনই অ-জ্ঞান বা অন্যপ্রকার জ্ঞান হইবে না। ইহাই জ্ঞান ও ক্রিয়ার স্বভাবগত প্রভেদ। এই প্রভেদ আছে বলিয়াই তত্ত্বজ্ঞান হইতে উপাসনাকে পৃথক্ করিয়া ক্রিয়াশ্রেণীতে সন্নিবেশিত করা হয়। অতএব ব্রহ্মে যখন ক্রিয়াসম্বন্ধ সম্ভবই হয় না, তখন সেই উপাসনা

ক্রিয়ার কর্ম্ম-(উপাস্য-) প্রকাশকরূপেও ব্রহ্মবোধক উপনিষদ্-বাক্যের সমন্বয় করা সম্ভবপর হয় না। অতএব ব্রহ্মবোধক বেদান্ত-বাক্যনিচয় নিরর্থকও নহে, এবং কর্ম্মকাণ্ডের সহিত বা জ্ঞানকাণ্ডগত উপাসনাক্রিয়ার সঙ্গে মিলিতভাবেও সার্থক নহে; ঐ সকল বাক্য স্বপ্রধান,—স্বতন্ত্রভাবেই ব্রহ্মবোধক। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপনিষদ্‌বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে, ঐ সমস্ত বাক্যের—এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য বা সমন্বয়, অবধারিত হয়, এবং সেই সমন্বয় হইতেই অবধারিত হয় যে, সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জগতের কারণ—জন্ম, স্থিতি ও লয়ের নিদান; এইজন্যই সূত্রকার "তত্তু সমন্বয়াৎ" বলিতে সাহসী হইয়াছেন ॥ ১. ১। ৪ ॥

অদ্বৈতবাদাচার্য্য শঙ্কর "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ * * * তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়," "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি যে সমস্ত উপনিষদ্‌বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্মকে জগতের মূলকারণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সাংখ্যবাদীরা আবার সেই সমুদয় বাক্য দ্বারাই অচেতন প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। উপনিষদের সৃষ্টিপ্রকরণস্থ বাক্য ও বাক্যাংশের অস্পষ্টার্থতাই এই প্রকার মতভেদ সমুত্থানের সহায়তা করিয়া থাকে। উদাহৃত শ্রুতির 'সৎ' শব্দের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই; যাহা সত্তাযুক্ত, তাহাই সৎ-পদের বাচ্য হইতে পারে। বেদান্তমতে ব্রহ্ম যেমন পরমার্থ সত্তাযুক্ত সৎ-পদার্থ, সাংখ্যমতে প্রকৃতিও তেমন পারমার্থিক

সত্তাযুক্ত হওয়ায় 'সৎ' পদবাচ্য হইতে পারে। এই প্রকার ন্যায় ও বৈশেষিকমতে পরমাণুকেও 'সৎ' বলিতে কোন বাধা ঘটিতে পারে না (১)। অতএব উদাহৃত "সদেব সোম্যেদং" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে অচেতন প্রকৃতিকেও মূল কারণ বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অচেতন প্রকৃতিই অচেতন জগতের উপাদান কারণ হওয়া যুক্তিযুক্ত ও প্রত্যক্ষসম্মত; কারণ, জগতে অচেতন মৃত্তিকাই অচেতন ঘটের উপাদান কারণ হয়, দেখিতে পাওয়া যায়। এই আশঙ্কা অপনয়নমানসে সূত্রকার বলিতেছেন—

ঈক্ষতের্নাশব্দম্। ১।১।৫।

প্রথমতঃ বেদে সাংখ্যসম্মত প্রকৃতির বোধক কোন শব্দই নাই; দ্বিতীয়তঃ সাংখ্যবাদীরা যে সকল শব্দকে প্রকৃতির অভিধায়ক বলিয়া মনে করেন, বস্তুতঃ সে সকল শব্দ তাদৃশ প্রকৃতির বাচকও নহে, অন্যার্থের বাচক; একথা প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ

---

(১) সাংখ্যবাদীরা প্রকৃতির কারণত্বপক্ষে এবং ব্রহ্মকারণত্বের বিপক্ষে এই কথা বলেন যে, দৃশ্যমান জগৎ অচেতন পদার্থ; আমাদের প্রকৃতিও অচেতন পদার্থ। কার্য্যের সজাতীয় পদার্থই জগতে উপাদান কারণ দৃষ্ট হয়। যেমন অচেতন ঘটের কারণ হয়—অচেতন মৃত্তিকা। অচেতন প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন বলিয়াই জগৎ অচেতন—জড়পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে। পক্ষান্তরে, চেতন ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলে, জগৎও তদনুরূপ চেতনই হইত। কেন না, কারণানুরূপ কার্য্য হওয়াই নিয়ম। এই জন্য প্রকৃতির জগৎকারণত্ব পক্ষই যুক্তিযুক্ত ও নির্দ্দোষ।

পাদে বিস্তৃতভাবে প্রমাণ করা হইবে (১)। অতএব প্রকৃতিকে 'অশব্দ' বলা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি নিজে অচেতন—জড়-পদার্থ, ঈক্ষণ বা আলোচনা করিবার শক্তি তাহার নাই। অতএব সেই অশব্দ (প্রকৃতি) কখনই অনন্ত বৈচিত্র্য-নিকেতন বিশাল বিশ্বরাজ্যের কারণ (কর্ত্তা) হইতে পারে না; কারণ, "তদৈক্ষত" শ্রুতি ঐ জগৎকর্ত্তাকে ঈক্ষণকারী (আলোচনা-কারী) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চেতন ভিন্ন অচেতন প্রকৃতি কখনই ঈক্ষণ করিতে পারে না। অতএব যুক্তি ও সাক্ষাৎ শ্রুতিবাক্যানুসারেই অচেতন প্রকৃতির জগৎকারণত্ব শঙ্কা নিরস্ত হইতেছে ॥ ১।১।৫ ॥

আশঙ্কা হইতে পারে যে, সকল স্থানেই যে, শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। স্থানবিশেষে বাধ্য হইয়াও গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হয়। এ কথা ব্যবহারসম্মতও বটে। যেমন—সময়বিশেষে পতনোন্মুখ নদীতীরকে লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞ জনেরাও বলিয়া থাকেন যে, 'নদীকূলং পিপতিষতি' অর্থাৎ এই নদীতীরটী পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে। এখানে অচেতন নদীতীরের পক্ষে কখনই পতনের ইচ্ছা সম্ভবপর হয় না; ইচ্ছা বা অনিচ্ছা চেতনেরই গুণ। তথাপি পতনোন্মুখতামাত্র লক্ষ্য করিয়া

(১) বেদান্তদর্শনের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদে বিভিন্ন সূত্রে যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, উপনিষদে যে, 'অজা', 'অব্যক্ত', 'মহৎ' ও অহঙ্কার প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হয়, সে সকল শব্দের অর্থ—সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার-তত্ত্ব নহে, উহাদের অর্থ অন্য প্রকার।

'ইচ্ছা'র প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহা যেমন গৌণার্থক (মুখ্যার্থক নহে), শ্রুতি-কথিত 'ঐক্ষত' কথাও তেমনই গৌণার্থক হইতে পারে। লোকে যেমন অগ্রে আলোচনা করিয়া পরক্ষণে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, প্রকৃতির পক্ষে তেমন আলোচনার সামর্থ্য না থাকিলেও, শ্রুতি তাহার সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখতা দেখিয়া 'ঐক্ষত' পদের প্রয়োগ করিয়াছেন, বস্তুতঃ এখানে 'ঐক্ষত' পদটী গৌণার্থক, মুখ্যার্থক নহে। 'ঐক্ষত' পদটী গৌণার্থক হইলে অচেতন প্রকৃতির পক্ষে জগৎকারণত্ব কল্পনায় কোনও অনুপপত্তি থাকিতে পারে না। এ কথার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

গৌণশ্চেৎ, নাত্ম-শব্দাৎ॥ ১।১।৬॥

না, শ্রুতির 'ঐক্ষত' পদটীকে গৌণার্থ কল্পনা করিয়াও অচেতন প্রকৃতিকে জগতের মূলকারণ বলিতে পারা যায় না; কারণ, পরে ঐ শ্রুতিতেই 'ঐক্ষত' ক্রিয়ার কর্ত্তা সৎ-পদার্থকে আত্মা বলা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, যদিও 'সৎ' ও 'তৎ' পদের অর্থবিশেষ নির্দ্দিষ্ট না থাকুক, এবং যদিও 'ঐক্ষত' পদের বাস্তব অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অবাস্তব গৌণার্থ কল্পনা করিলে অচেতন প্রকৃতির পক্ষেও জগৎকারণত্ব সম্ভাবিত হউক, তথাপি এখানে 'সৎ' ও 'তৎ' পদে সাংখ্যসম্মত প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ, প্রথমে 'সৎ' ও 'তৎ' পদে যাহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বাক্যশেষে আবার তাহাকেই শ্বেতকেতুর নিকট 'আত্মা' শব্দে প্রতিনির্দ্দেশ করা হইয়াছে—"তৎ সত্যম্, স আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো" অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো, সৃষ্টির কারণীভূত

যে, সৎ পদার্থ, তাহাই পরমার্থ সত্য, তাহাই আত্মা, এবং তুমিও তাহাই, অর্থাৎ সেই আত্মা ও তুমি এক অভিন্ন বস্তু। এখানে দেখিতে হইবে, ঋষিকুমার শ্বেতকেতু নিজে চেতন, চেতনই তাহার আত্মা হইতে পারে, অচেতন প্রকৃতি কখনই চেতনের আত্মা হইতে পারে না; কিন্তু অচেতন প্রকৃতি জগৎকারণ হইলে, এবং তাহাকেই আত্ম-শব্দে নির্দ্দেশ করিলে, চেতন শ্বেতকেতুর অচেনত্বই প্রতিপাদন করা হয়। চেতনকে অচেতন বলিয়া উপদেশ করা অপেক্ষা বিস্ময়কর আর কি হইতে পারে? অথচ জনহিতৈষিণী শ্রুতির পক্ষে এরূপ অনর্থকর ভ্রান্ত উপদেশ করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব 'ঈক্ষতি'র গৌণার্থ হইতে পারে না॥ ১।১।৭॥

শ্রুতি যদি কোন উদ্দেশ্যবিশেষের বশবর্ত্তিনী হইয়া ঐরূপ অসত্য উপদেশ দিয়া থাকিতেন, তাহা হইলেও, শ্রদ্ধালু শিষ্যের মঙ্গলার্থ তাদৃশ উপদেশানুযায়ী কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য নিশ্চয়ই সেই উপদেশের হেয়ত্ব বলিয়া দিতেন; শ্রুতি কিন্তু আদৌ তাহা বলেন নাই। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

হেয়ত্বাবচনাচ্চ॥ ১।১।৮॥

অর্থাৎ শ্রুতি যদি শ্বেতকেতুকে ঐরূপ মিথ্যা উপদেশই দিয়া থাকিতেন, তাহা হইলেও, সরল বিশ্বাসী শ্বেতকেতু যাহাতে ভ্রান্ত উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া অনর্থজালে জড়িত না হয়, তজ্জন্য উক্ত উপদেশের অসত্যতা বুঝাইয়া দেওয়া শ্রুতির অবশ্যই কর্ত্তব্য ছিল। শ্রুতি নিজে যখন তাহা করেন নাই, তখন বুঝিতে হইবে,

ঐ উপদেশ যথার্থ উপদেশই বটে; অতএব উক্ত অচেতন প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিতে পারা যায় না, এবং ঈক্ষণেরও গৌণার্থ কল্পনা করা শোভা পায় না ॥ ১।১৮ ॥

বিশেষতঃ জগতের কারণ বস্তুটী চেতন কি অচেতন? ব্রহ্ম, না প্রকৃতি? এরূপ সংশয়ই এখানে আসিতে পারে না। কারণ?—

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১।১।১১ ॥

শ্রুতিই কারণ। জগতের কারণ যে, চেতন ভিন্ন অচেতন নহে, অর্থাৎ চেতন ব্রহ্ম ব্যতীত অচেতন প্রকৃতি যে, জগতের কারণ হইতেই পারে না, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ সে কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন। সেখানে পরমেশ্বরের মহিমাপ্রকাশপ্রসঙ্গে কথিত আছে:—

"ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে,
নচেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপঃ,
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ ॥"

এখানে জগৎ কারণের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এবং তাঁহাকে যে সকল বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, তাহা চেতন পরমেশ্বর ভিন্ন অচেতন প্রকৃতির পক্ষে কোন মতেই সঙ্গত হয় না বা হইতে পারে না। কেন না, এখানে জগৎকারণকে 'অলিঙ্গ' বলা হইয়াছে—'নৈব চ তস্য লিঙ্গম্'। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রকৃতিকে 'অলিঙ্গ' বলা হয় না; বরং চেতন পুরুষের সম্বন্ধেই

ঐরূপ বিশেষণ প্রদত্ত হয়। তাহার পর, করণাধিপ—জীবের অধিপ (করণাধিপাধিপঃ) হওয়া পরমেশ্বর ভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না, এমন কি, সাংখ্যমতেও তাহা হইতে পারে না। অতএব, পরমেশ্বরের জগৎকারণত্ব পক্ষে স্পষ্ট শ্রুতি থাকায়, এবং প্রকৃতির পক্ষে পূর্ণমাত্রায় তাহার অভাব থাকায় নিঃসংশয়িতরূপে অবধারণ করা যাইতেছে যে, চেতন পরমেশ্বরই জগতের কারণ, সাংখ্যসম্মত অচেতন প্রকৃতি বা অন্য কিছু সে কারণ নহে (১) ॥ ১।১।১১ ॥

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কথা বলা হইল, তদ্দ্বারা প্রমাণ করা হইল যে, জন্য বা উৎপত্তিশীল পদার্থমাত্রই কারণসাপেক্ষ। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই আত্ম-প্রকাশ করে না, বা করিতে পারে না; এই বিশাল জগৎও উৎপত্তিশীল; জগতের উৎপত্তি অবিসংবাদিত; সুতরাং ইহার উৎপত্তির জন্যও একটা কারণ থাকা আবশ্যক। চেতন ব্রহ্মই সেই কারণ, অচেতন প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতি কখনও সেই কারণ হইতে পারে না; কেন না, সমস্ত উপনিষদ্ শাস্ত্র একবাক্যে ব্রহ্মেরই কারণতা প্রতিপাদন

---

(১) চেতন পরমেশ্বরকে জগৎকারণ বলিলেও, এ সংশয় দূর হয় না যে, তিনি নিমিত্ত কারণ? কিংবা উপাদানকারণ? তিনি কেবল নিমিত্ত-কারণ হইলে ন্যায়বৈশেষিকাদি মতবাদের সহিত বড় পার্থক্য থাকে না। এইজন্য স্বয়ং সূত্রকারই চতুর্থ পাদের শেষে "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (১।৪।২৩—২৭) সূত্রে ব্রহ্মের নিমিত্তকারণতা ও উপাদান কারণতা প্রতিপাদন করিবেন, আমরাও সে কথা পরে বলিব।

করিয়াছেন, কোন উপনিষদ্ই উহাদের কারণতা স্বীকার করেন নাই; এমন কি, কারণ-নিরূপণ প্রসঙ্গে উহাদের নাম পর্য্যন্তও করেন নাই। এইরূপ সূত্র-সিদ্ধান্তের বিপক্ষে সাংখ্যবাদীর উত্থাপিত আপত্তিখণ্ডনপূর্ব্বক সূত্রকার বলিতেছেন—

বদতীতি চেৎ, ন, প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥ ১।৪।৫ ॥

কঠোপনিষদে নচিকেতার প্রতি স্বয়ং যমরাজ বলিয়াছেন—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্,
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্,
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥"

এই বাক্যে যাহাকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধবিহীন, অনাদি অনন্ত 'মহতঃ পরং' (মহতের অতীত) বলা হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সাংখ্যশাস্ত্রে জগৎকারণ প্রকৃতিকে যেভাবে শব্দ-স্পর্শাদিবিহীন, অনাদি, অনন্ত ও মহত্তত্ত্বের পরবর্ত্তী বলা হইয়াছে, এখানেও ঠিক সেইভাবেই মহত্তত্ত্বের অতীত বস্তুকে শব্দ স্পর্শাদিরহিত ও অনাদি অনন্ত বলা হইয়াছে; সুতরাং উপনিষদ্ শাস্ত্রে যে, প্রকৃতির উল্লেখ নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না।

এ কথার উত্তরে স্বয়ং সূত্রকার বলিতেছেন, যদিও আপাত-দৃষ্টিতে এরূপ আশঙ্কা অশোভন মনে না হউক, তথাপি বিচার-দৃষ্টিতে এ আশঙ্কার কোনই মূল্য নাই; কারণ, যে প্রসঙ্গে ঐ কথা বলা হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বেশ উত্তমরূপে

বুঝা যায় যে, এই 'মহতঃ পরং' অর্থ—প্রকৃতি নহে, পরন্তু প্রাজ্ঞ—পরমাত্মা। প্রাজ্ঞসংজ্ঞক পরমাত্মার কথা বুঝাইবার জন্যই যমরাজ নচিকেতাকে পূর্বাপর বহু কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে হঠাৎ প্রকৃতির কথা আসিতেই পারে না। প্রাজ্ঞসংজ্ঞক পরমাত্মাই মহতের (বুদ্ধির) অতীত. বুদ্ধি তাহাকে ধরিতে পারে না। তিনি নির্গুণ ; এইজন্য শব্দ স্পর্শাদি কোন গুণই তাঁহাতে বিদ্যমান নাই। অতএব এখানে 'মহতঃ পরং' বস্তু যে, পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ নহে, তাহা প্রকরণ বা বাক্যপ্রসঙ্গ হইতে অবধারিত হইতেছে ॥ ১।৪।৫ ॥ বিশেষতঃ—

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ ১।৪।৬ ॥

কঠোপনিষদের ঐ প্রকরণে অগ্নি জীব ও পরমাত্মা, এই তিন বিষয়েই কেবল প্রশ্ন ও প্রতিবচন দৃষ্ট হয়, তদতিরিক্ত কোন বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অভিপ্রায় এই যে, যমরাজ প্রসন্ন হইয়া নচিকেতার প্রতি তিনটীমাত্র বর দিতে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিলে পর, নচিকেতা ক্রমে অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, যমরাজও সেই প্রশ্নত্রয়ের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। সেখানে নচিকেতা কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করেন নাই ; সুতরাং অপৃষ্ট বিষয়ের অবতারণা করা যমরাজের পক্ষেও সম্ভবপর হয় নাই। অতএব "মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্" বাক্যে সাংখ্যসম্মত প্রকৃতির নির্দ্দেশ কল্পনা করা যাইতে পারে না ॥ ১।৪।৬ ॥

ইহার পরও সাংখ্যবাদীরা মনে করেন যে, কোন কোন বেদ-

শাখায় স্পষ্ট ভাবে প্রকৃতি মহৎ প্রভৃতি শব্দের নির্দ্দেশ দেখিয়া, পাছে সাংখ্যবাদীরা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের উপর সন্দিহান হন, এইজন্য স্বয়ং সূত্রকারই তাহাদের আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক বলিতেছেন—

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেৎ, ন, শরীর-রূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দ্দর্শয়তি চ ॥ ১।৪।১ ॥

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্ত পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ॥" ইত্যাদি।
(কঠোপনিষদ্)

সাংখ্যশাস্ত্রে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, অব্যক্ত ও পুরুষ প্রভৃতি যে সমুদয় তত্ত্ব (পদার্থ) যে ভাবে যেরূপে (যেরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য-ক্রমে) ও যে যে শব্দে পঠিত ও ব্যাখ্যাত আছে, উল্লিখিত কঠোপনিষদ্‌-বাক্যেও ঠিক সেই সমুদয় পদার্থই সেই ভাবে, সেই ক্রমে ও সেই সমুদয় শব্দে যথাযথভাবে অভিহিত হইয়াছে; তজ্জন্য সহজেই শঙ্কা হইতে পারে যে, উল্লিখিত বাক্যে বোধ হয়, সাংখ্যসম্মত পদার্থসমূহেরই উল্লেখ হইয়াছে। অধিকন্তু যদি তাহাই ঠিক হয়, তবে সাংখ্যীয় প্রকৃতিকে 'অশব্দ' বলিয়া জগৎ-নির্ম্মাণাধিকার হইতে বঞ্চিত করা সঙ্গত হয় কিরূপে? এবং প্রকৃতিকে 'অশব্দ' বলিয়াই বা উপেক্ষা করা যায় কি প্রকারে? এ কথার উত্তরে বলা হইতেছে যে, না,—এখানেও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি, বা অন্যান্য তত্ত্বের উল্লেখ করা হয় নাই, পরন্তু জীবের স্থূল দেহকে রথরূপে কল্পনা করিয়া, আত্মা ও ইন্দ্রিয়গণকে সেই দেহ-রথে রথী, সারথি ও অশ্বাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে;

সুতরাং ইহা দ্বারাও প্রকৃতির অশব্দত্ব সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে, কঠোপনিষদে প্রথমে শরীর, আত্মা, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে সমুদয় পদার্থকে রথ, রথী ও সারথি প্রভৃতিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, পরে একে একে সেই সমুদয় পদার্থকেই পর পর শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিনির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এবং তদনুরূপ সমস্ত শব্দই বিস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে; কেবল শরীরবোধক কোনও স্পষ্ট শব্দের উল্লেখ এখানে দৃষ্ট হয় না, অথচ উপনিষদের ঋষি যে, পূর্ব্বোক্ত আত্মা ইন্দ্রিয়াদি সকল পদার্থের উল্লেখ করিয়া কেবল শরীরের উল্লেখ করিতেই ভুলিয়া গিয়াছেন, এরূপ কল্পনাও মোটেই সঙ্গত হয় না; কাজেই এখানে 'মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্' কথায় সেই বাকী শরীরকে গ্রহণ করাই সুসঙ্গত হয় (১)। বিশেষতঃ 'অব্যক্ত' শব্দ যখন সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিতেই নিরূঢ় (প্রসিদ্ধ) নহে, তখন 'ন ব্যক্তং—অব্যক্তং'

---

(১) কঠোপনিষদে প্রথমে কথিত আছে—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি, শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি, মনঃ প্রগ্রহমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়-মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥"

এখানে আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে লাগাম, (প্রগ্রহ) ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব, শব্দাদি বিষয়সমূহকে বিচরণস্থান বলিয়া ভোক্তার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পরে আবার—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।

এইরূপ যৌগিকার্থ গ্রহণ করিলে, শরীরও 'অব্যক্ত' পদের অর্থরূপে গৃহীত হইতে পারে; কেন না, সূক্ষ্ম শরীর ত স্বভাবতই অব্যক্ত, এবং স্থূল শরীরের উপাদানসমূহ অব্যক্ত বলিয়া স্থূল শরীরকেও অব্যক্ত বলা যাইতে পারে। অতএব এখানে শরীরই 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থ, প্রকৃতি নহে ॥ ১।৪।১ ॥

তাহার পর শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে—

"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে,
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥"

এই বাক্যে যে, 'অজা' প্রভৃতি শব্দ রহিয়াছে, সে সকলও প্রকৃতপক্ষে সাংখ্যসম্মত প্রকৃতির পরিচায়ক নহে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে 'অজা' ও 'লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং' কথায় রজঃ সত্ত্ব-তমোগুণময়ী নিত্যা (জন্মরহিত) প্রকৃতি-অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে সত্য, তথাপি ঐ সকল শব্দে প্রকৃতিকেই যে, বুঝিতে হইবে, এরূপ কোনও যুক্তি বা প্রমাণ দেখা যায় না; কেন না, ঐ সকল

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥"

এই বাক্যে পূর্ব্বোক্ত আত্মা, ইন্দ্রিয়, বিষয় (অর্থ), বুদ্ধি ও মন, এই সমস্ত পদার্থই পর পর শ্রেষ্ঠরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, একমাত্র পূর্ব্বোক্ত শরীরবোধক কোন স্পষ্ট শব্দ নির্দ্দেশ করেন নাই, এমত অবস্থায় 'অব্যক্ত' শব্দে পূর্ব্বকথিত শরীর গ্রহণ করাই উচিত। নচেৎ প্রকৃতার্থের ত্যাগ ও অপ্রকৃতার্থের গ্রহণ করা হয়, তাহা বড়ই দোষাবহ।

শব্দ বস্তুবিশেষের নির্দ্দেশক নহে; এবং ঐ বাক্যের পূর্ব্বে বা পরেও এমন কোন বিবৃতি বা ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বারা ঐ শব্দগুলিকে প্রকৃতি-অর্থেই আবদ্ধ রাখা যাইতে পারে। সেরূপ কোনও বিশেষ কারণ না থাকায় আবশ্যকমতে ঐ সকল শব্দের অন্যপ্রকার অর্থও যথেচ্ছভাবে করা যাইতে পারে। সূত্রকারও নিজমুখে এ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—

চমসবদবিশেষাৎ ॥ ১।৪।৮ ॥

বেদে 'চমস' শব্দের প্রয়োগ আছে, এবং যজ্ঞে তাহার ব্যবহারও নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু 'চমস' যে কি প্রকার বস্তু, তাহা লোকে জানে না; এই জন্য নিজেই উহার আকৃতি বলিয়া দিয়াছেন—"অর্বাগ্‌বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ" অর্থাৎ যাহার উপরিভাগ গোলাকৃতি এবং নিম্নভাগ গর্ত্তযুক্ত, তাহার নাম চমস। কিন্তু শুদ্ধ এই কথা দ্বারা যেপ্রকার চমসের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা যায় না; কারণ, জগতে বহু বস্তুই ঐ প্রকার 'অর্ব্বাগ্‌বিল' ও 'ঊর্দ্ধবুধ্ন' হইয়া থাকে ও হইতে পারে, এই প্রকার আলোচ্য 'অজা' প্রভৃতি শব্দেরও অনেক প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে; সুতরাং এ সকল শব্দ যে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিরই বাচক বা পরিচায়ক, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না ॥ ১।১।৮ ॥ বিশেষতঃ—

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥ ১।১।১০ ॥

"অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" ইত্যাদি বাক্যে যেমন অমধু সূর্য্যকেও দেবগণের প্রিয় বলিয়া মধুরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, এবং অন্যত্রও যেমন বাক্যকে ধেনুরূপে, অন্তরীক্ষকে অগ্নিরূপে

কল্পনা করা হইয়াছে, এখানেও ঠিক তেমনই রূপকভাবে 'অজা'-কল্পনা করা সম্ভবপর হইতে পারে।

যেমন কোন একটী অজা (পাঁঠী) ঘটনাক্রমে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত থাকে, এবং সে নিজের অনুরূপ বহু সন্তান প্রসব করে। কোন এক অজ প্রীতির সহিত সেই অজার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে থাকে, অপর অজ আবার উপভোগান্তে সেই অজাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সংসারক্ষেত্রেও তেমনি কোন অজ অর্থাৎ স্বভাবতঃ জন্মরহিত কোন পুরুষ লোহিত (তেজ), শুক্ল (জল) ও কৃষ্ণবর্ণ (পৃথিবী), এই তিন প্রকার সূক্ষ্মাকার ভূতবর্গকে উপভোগ করে, আবার অপর কোন অজ (জ্ঞানী পুরুষ) ভোগান্তে সেই ভূত-প্রকৃতিরূপা অজাকে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ ভোগাসক্তি ত্যাগ করিয়া বিমুক্ত হইয়া থাকে। বদ্ধ ও মুক্তভেদে দ্বিবিধ আত্মাকে এইরূপ রূপকাকারে অজদ্বয়-রূপে কল্পনা করিয়া জীবভোগ্য সূক্ষ্মভূতের সমষ্টিকে অজারূপে কল্পনা করা হইয়াছে; সুতরাং এখানেও যে, সাংখ্যসম্মত প্রকৃতির কথাই বলা হইয়াছে, তাহা মনে করা অত্যন্ত ভুল।

তাহার পর, এরূপ রূপক-কল্পনা যে, উপনিষদে আর কোথাও নাই বা নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ, তাহাও বলিতে পারা যায় না। দেখা যায়, বৃহদারণ্যকোপনিষদে 'মধু ব্রাহ্মণ' নামে একটী পরিচ্ছেদ আছে, তাহাতে—"অসৌ বা আদিত্যো দেবমধুঃ" ইত্যাদি বাক্যে আদিত্যকে দেবগণের তৃপ্তিসম্পাদক 'মধু' বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে; এবং পৃথিবী প্রভৃতিকেও বিভিন্নপ্রকার মধুরূপে

কল্পনা করা হইয়াছে। উল্লিখিত 'অজাদি' বাক্যেও ঠিক সেই ভাবেই যে, জীবভোগ্য ভূতবর্গকে লক্ষ্য করিয়া রূপকচ্ছলে 'অজা' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, এ কথা বলা কখনই অসঙ্গত হইতে পারে না। অতএব উক্ত উপনিষদ্বাক্যে যে, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিই প্রতিপাদিত হইতেছে, তাহা বলিতে পারা যায় না।

অতঃপর ব্রহ্ম-কারণতাবাদের বিপক্ষে আর একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে এই যে, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বৈদিক শব্দের প্রতিপাদ্য না হয়, না হউক, এবং সে কারণে উহার জগৎ-কারণতাও অসিদ্ধ হয়, হউক; তথাপি ব্রহ্ম-কারণতাবাদ কোন-মতেই প্রমাণিত বা সমর্থনযোগ্য হইতেছে না। কারণ, যে উপনিষদ্শাস্ত্রের কথানুসারে ব্রহ্ম-কারণতাবাদ সংস্থাপন করা হইতেছে, সেই উপনিষদ্শাস্ত্রের মধ্যেই সৃষ্টিবিষয়ে বিষম বিসংবাদ বা মতভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোথাও ব্রহ্ম হইতে যুগপৎ জগৎসৃষ্টির কথা বর্ণিত আছে—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়", "স ইমান্ লোকানসৃজত, যদিদং কিঞ্চ" ইত্যাদি। কোথাও ক্রমশঃ জগদুৎপত্তির বিষয় বর্ণিত আছে, যথা—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইত্যাদি। কোন স্থানে আবার প্রথমেই প্রাণসৃষ্টির কথা বর্ণিত আছে—"স প্রাণমসৃজত, প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং" ইত্যাদি। কোথাও বা জগতের সহিত ব্রহ্মের একাত্মভাব বা অভেদের কথা দৃষ্ট হয়,—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ," "আত্মৈবেদমগ্র-আসীৎ" ইত্যাদি। কোথাও আবার অসৎকারণতাবাদের উল্লেখও

দৃষ্ট হয়, "অসদ্বা ইদমগ্রে আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত" ইত্যাদি। অন্যত্র আবার এই অসদ্বাদেরও নিন্দাবাদ পরিদৃষ্ট হয়,—"কথমসতঃ সৎ জায়েত? সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি। কোথাও আবার কোন প্রকার কর্ত্তার সাহায্য না লইয়া আপনা হইতেই জগদুৎপত্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নাম-রূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত" (এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে নামরূপবিহীন অব্যক্তাবস্থায় ছিল, পরে নিজেই নাম ও রূপ লইয়া অভিব্যক্ত হইল) ইত্যাদি। এইজাতীয় পরস্পরবিরোধী অসংবদ্ধ বাক্যরাশি হইতে যেমন সৃষ্টিসম্বন্ধে কোনও সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, তেমান উহার কারণসম্বন্ধেও সত্যাবধারণ করা সম্ভবপর হয় না; কাজেই ব্রহ্ম-কারণতা সিদ্ধান্তটী নিঃসংশয়িতরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এতদুত্তরে স্বয়ং সূত্রকার বলিতেছেন—

"কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ॥" ১।৪।১৪॥

অর্থাৎ জগদন্তর্গত আকাশাদি পদার্থের সৃষ্টিগত ক্রমসম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মতভেদ বিদ্যমান থাকিলেও, উহাদের সৃষ্টিসম্বন্ধে কোথাও মতান্তর দৃষ্ট হয় না, এবং তাহার কর্ত্তার সম্বন্ধেও (স্রষ্টার সম্বন্ধেও) কোনপ্রকার মতভেদ দেখা যায় না। অভিপ্রায় এই যে, কার্য্য থাকিলেই তাহার কর্ত্তা থাকা আবশ্যক হয়। সমস্ত শ্রুতিই যখন একবাক্যে জগতের উৎপত্তি ঘোষণা করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই ঐ সকল বাক্যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তারও আবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কোন কোন

উপনিষদে ত জগৎস্রষ্টার স্বরূপপরিচয়াদি অতি বিশদরূপেই বর্ণিত আছে। আবার এক উপনিষদে সৃষ্টিকর্ত্তাকে—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি প্রভৃতি যে সকল গুণযোগে চিত্রিত করা হইয়াছে, অপরাপর উপনিষদেও ঠিক সেই সকল গুণযোগেই তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে; কোথাও এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না (১); সুতরাং সৃষ্টির ক্রমসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও, তৎকারণ-সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না।

বিশেষতঃ, উপনিষদ্‌শাস্ত্রে সৃষ্টিসম্বন্ধে বহুপ্রকার বিরুদ্ধবাদ থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহা দোষাবহ হইতে পারে না; কারণ, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রতিপাদন করা কোন উপনিষদেরই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; ব্রহ্মপ্রতিপাদন করাই উহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই দুর্ব্বিজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রবোধের সহায়তাকল্পে সৃষ্টিপ্রসঙ্গও উপনিষদের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র, স্বতন্ত্রভাবে নহে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সৃষ্টির ভিতর দিয়া তৎকারণীভূত ব্রহ্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সহজেই তাঁহাকে বুঝিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যেই উপনিষদের মধ্যে অতি গৌণভাবে সৃষ্টির কথা স্থান পাইয়াছে। উপনিষদ্ নিজেই নিম্নলিখিত বাক্যে সে কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"অন্নেন সোম্য, শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছ; অদ্ভিঃ সোম্য, শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ; তেজসা সোম্য, শুঙ্গেন সৎ মূলমন্বিচ্ছ," ইত্যাদি।

---

(১) তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—"সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।" ছান্দোগ্যে আছে—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়।" শ্বেতাশ্বতরে আছে—যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" বৃহদারণ্যকে আছে—"সোঽকাময়ত" ইত্যাদি। এ সকল শ্রুতিতে শব্দগত প্রভেদ থাকিলেও অর্থগত প্রভেদ মোটেই নাই।

এ শ্রুতির অর্থ এই যে, হে সোম্য শ্বেতকেতু, পৃথিবীরূপ কার্য্য দ্বারা তৎকারণরূপে জলের অনুসন্ধান কর, জলরূপ কার্য্যদ্বারা তৎকারণ তেজের অনুসন্ধান কর, আবার তেজোরূপ কার্য্যদ্বারা তৎকারণীভূত সৎ পদার্থের (ব্রহ্মের) অনুসন্ধান কর, এইরূপে কার্য্যদর্শনে তৎকারণের অনুসন্ধান করিলেই সর্ব্বকারণ-কারণ সেই দুর্ব্বিজ্ঞেয় ব্রহ্মের অনুসন্ধান মিলিবে। ব্রহ্মানুসন্ধানে এইরূপ সৌকর্য্যবিধানের জন্যই উপনিষদ্‌শাস্ত্র সৃষ্টিব্যাপারের অবতারণা করিয়াছে। এখানে আচার্য্য শঙ্কর যে কথা বলিয়াছেন, মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকায় আচার্য্য গৌড়পাদও ঠিক তদনুরূপ কথায়ই সৃষ্টিপ্রসঙ্গের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন,—

"মৃল্লোহ-বিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতা পুরা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥"

অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে (উপনিষদের মধ্যে) যে, মৃত্তিকা, লৌহ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা (১) সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করা

---

(১) দৃষ্টান্তগুলি এইরূপ—"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ. বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাৎ", "যথা অগ্নের্জ্বলতো বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি, এবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ" ইত্যাদি।

অর্থ—হে সোম্য যেমন একটী মৃত্তিকাপিণ্ড জানিলেই সমস্ত মৃণ্ময় বস্তু বিজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ মৃৎপিণ্ডাদিগুলি কেবল অবস্থানুযায়ী নাম মাত্র, বস্তুতঃ ঐ সমস্তই মৃত্তিকা ছাড়া আর কিছুই নহে। তেমনই এক ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জগৎ জানা হইয়া যায়; তখন জানিতে পারা যায় যে, দৃশ্যমান জগৎ কেবল একটা নাম মাত্র, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু; অপর সমস্তই মিথ্যা অসত্য।

হইয়াছে, তাহা কেবল ব্রহ্মবিষয়ে বুদ্ধি-প্রবেশের উপায় মাত্র; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ব্রহ্মে ও জগতে কিছুমাত্র ভেদ নাই, অর্থাৎ পরমার্থসত্য ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জগৎ বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থই নাই; সুতরাং উহার বাস্তব সত্তাও নাই। সত্তা নাই বলিয়াই উহা অসৎ—অবস্তু; অসতের উৎপত্তি একটা কথার কথা মাত্র; কাজেই উহা উপনিষদের মুখ্য প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। এই সকল কারণেই সৃষ্টিবাক্যে অসামঞ্জস্য বা বিরোধ থাকিলেও তদ্দারা সৃষ্টিকর্তার (ব্রহ্মের) স্বরূপনিরূপণে কোনও বাধা ঘটিতে পারে না। কেন না, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রই এবিষয়ে ঐকমত্য জ্ঞাপন করিতেছে। অতএব ব্রহ্ম-কারণতাবাদের বিপক্ষে যে সকল আশঙ্কা উত্থাপিত হইয়াছিল, এতাবৎ সে সকল আপত্তিও খণ্ডিত হইল, বুঝিতে হইবে' ১।৪।১৪।

[ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ]

অতঃপর এ বিষয়ে আর একটী আপত্তি উত্থিত হইতে পারে। তাহা এই যে, ব্রহ্ম দৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। এ সিদ্ধান্ত স্থিরতর হইলেও তদ্বিষয়ে, কিন্তু আপত্তির অবসান হইতেছে না—তিনি যে, কিরূপ কারণ, তাহা ঐ কথায় নির্ণীত হইতেছে না। প্রত্যেক কার্য্যের জন্যই দ্বিবিধ কারণ থাকা আবশ্যক হয়। একটী নিমিত্ত কারণ, অপরটী উপাদান কারণ। যেমন কুম্ভকার ঘটকার্য্যের নিমিত্তকারণ, আর মৃত্তিকা তাহার উপাদানকারণ। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, উক্ত ব্রহ্ম ঐ দুই কারণের মধ্যে কিপ্রকার কারণ ?—নিমিত্ত কারণ ?

না, উপাদান কারণ ? যদি তিনি নিমিত্ত কারণ হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, কুম্ভকার যেমন ঘট নির্ম্মাণ করিতে মৃত্তিকার অপেক্ষা করে, ব্রহ্মও তেমনই জগৎ-রচনার জন্য নিশ্চয়ই পরমাণু প্রভৃতি বাহ্য পদার্থের সাহায্য গ্রহণ করেন। এরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইলে, ন্যায় ও বৈশেষিকের সঙ্গে বেদান্তের কোনও পার্থক্য থাকে না, অধিকন্তু "একমেবাদ্বিতীয়ং" শ্রুতিরও (অদ্বৈত বাদেরও) মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। পক্ষান্তরে, ব্রহ্ম যদি ঘটাদি কার্য্যের মৃত্তিকা প্রভৃতির ন্যায় জগতের সম্বন্ধে কেবলই উপাদান কারণ হন, তাহা হইলেও আর একটী এমন দোষ উপস্থিত হয়, যাহার সমাধান করিতে হইলে অদ্বৈতবাদের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। উপাদানকারণ মাত্রই জড় পদার্থ; এবং সম্পূর্ণরূপে চেতনের অধীন—চেতনের সহায়তা ব্যতীত সে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। মৃত্তিকা যে, কুম্ভকারের সাহায্য লাভ না করিয়া ঘটোৎপাদনে সমর্থ হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; সুতরাং জগদুৎপত্তির জন্য ব্রহ্মকে পরিচালিত করিবার নিমিত্তও অপর একটী শক্তিশালী (চেতন) নিমিত্তকারণের সদ্ভাব কল্পনা করিতে হয়। তাহা হইলেও যে, অভিমত অদ্বৈতবাদ রক্ষা পায় না, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্তকারণ বলিয়া স্বীকার করিলে কোনমতেই অভিমত অদ্বৈতবাদ প্রমাণিত হয় না, এই অসঙ্গতি নিবারণার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ। ১।৪।২৩।

পূর্ব্বকথিত ব্রহ্ম যে, জগতের নিমিত্তকারণ, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত:; সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। এখানে এইমাত্র বিশেষ বক্তব্য যে, তিনি জগতের কেবল নিমিত্ত-কারণ নহেন, পরন্তু প্রকৃতিও (উপাদানকারণও) বটে। তিনি যেমন স্বীয় অসীম জ্ঞানশক্তি-প্রভাবে জগতের নিমিত্তকারণ হন, তেমনি আবার স্বীয় মায়াশক্তি-প্রভাবে উপাদানকারণও (প্রকৃতিও) হইয়া থাকেন। একই বস্তু যে, নিমিত্ত ও উপাদান, এই উভয়বিধ কারণ হইতে পারে, প্রসিদ্ধ মাকড়সা (লূতাপোকা) তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মাকড়সা যে, আপনার জ্ঞানশক্তি প্রভাবে স্বীয় শরীর হইতে রাশি রাশি সূত্র নিঃসারণ করিয়া জাল প্রস্তুত করে, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সেখানে যেমন একই মাকড়সা সূত্র প্রসব কার্য্যে নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণভাব প্রাপ্ত হয়, আলোচ্য ব্রহ্মও যে, ঠিক তেমনই জগৎ রচনাকার্য্যে—উভয়বিধ কারণতা লাভ করিবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এই জন্য শ্রুতিও মাকড়সার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া একথা সমর্থন করিয়াছেন—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ (মুণ্ডক ১।১।৭)

অর্থাৎ মাকড়সা যেমন স্বশরীর হইতে সূত্র প্রসব করে, এবং নিজেই আবার সেই সূত্র গ্রহণকরে (ভক্ষণকরে), পৃথিবী হইতে যেমন ওষধি সকল (তৃণ-লতা প্রভৃতি) উৎপন্ন হয়, এবং জীবদেহ

হইতে যেমন কেশ ও লোমসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি অক্ষর ব্রহ্ম হইতে দৃশ্যমান বিশ্ব সমুৎপন্ন হয়। উক্ত তিনটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মের উপাদান-কারণতা সমর্থিত হইয়াছে, অধিকন্তু ঊর্ণনাভের দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মের নিমিত্তকারণতাও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। একই বস্তু যে, নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ হইতে পারে, এখানে ঊর্ণনাভের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করা হইয়াছে।

এক ব্রহ্মই যে, জগতের দ্বিবিধ কারণ, সূত্রকার দুইটী হেতু দ্বারা তাহা সমর্থন করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী হেতু—শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞার সার্থকতা রক্ষা, দ্বিতীয় হেতু—শ্রুতি-প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অনুপঘাত। ছান্দোগোপনিষদ্ জগৎ-কারণরূপে ব্রহ্মের অনুসন্ধান-পথ প্রদর্শনের জন্য প্রথমেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের উল্লেখ (প্রতিজ্ঞা) করিয়া বলিয়াছেন যে (১), "হে সোম্য শ্বেতকেতু, তুমি তোমার গুরুর নিকট এমন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি, যাহার তত্ত্ব শুনিলে অপর সমস্ত তত্ত্ব শোনা হইয়া যায়, এবং যাহার তত্ত্ব চিন্তা করিলে বা অবগত হইলে অপর সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বও চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হইয়া যায়?" ইত্যাদি। চেতন ব্রহ্ম সর্ব্ব জগতের উপাদান-কারণ হইলেই এই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা সঙ্গত হইতে পারে, কেবল নিমিত্তকারণ হইলে হইতে পারে না; কারণ, ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকারকে উত্তমরূপে জানিলে বা শুনিলেও

(১) "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ, যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং ভবতি" ইত্যাদি। (ছান্দগ্যোপনিষদ্ ৬।১।৩)

অপর কোন বস্তু—এমন কি, তৎকৃত ঘটটী পর্য্যন্তও জানা-শুনা হয় না ও হইতে পারে না; কেন না, নিমিত্তকারণ ও তৎকার্য্য, উভয়ে পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিজাতীয় পদার্থও হইতে পারে। পক্ষান্তরে, উপাদানকারণের পক্ষে সে দোষ ঘটে না। উপাদানকারণই যখন কার্য্যাকারে পরিণত হইয়া কেবল স্বতন্ত্র একটী নাম ও আকৃতিমাত্র গ্রহণ করিয়া কার্য্যরূপে (ঘটাদিরূপে) পরিচিত হয়, তখন উপাদানকারণকে জানিলে ও শুনিলে, ফলতঃ তৎকার্য্যকেও নিশ্চয়ই জনা-শুনা হয়। এই অভিপ্রায় পরিজ্ঞাপনের জন্যই শ্রুতি নিজে ঐরূপ দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। যথা—

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ—বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"। (ছান্দোগ্য ৬।১।৪)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, একটীমাত্র মৃৎপিণ্ড (মৃত্তিকাখণ্ড) জানিলেই যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ জানা হয় যে,—মৃন্ময় পদার্থ মাত্রই পরমার্থতঃ মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিকার বা ঘটাদি কার্য্য কেবল একটা কথামাত্র; উহা অসত্য, মৃত্তিকাই উহার যথার্থ স্বরূপ—ইত্যাদি উক্তি উপাদানকারণের পক্ষেই সঙ্গত ও সম্ভবপর হয়, নিমিত্তকারণের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হয় না।

এখানে মৃত্তিকাপিণ্ড হইতেছে উপাদানকারণ, আর মৃন্ময়—ঘটাদি বস্তু হইতেছে মৃত্তিকার কার্য্য বা পরিণাম। মৃত্তিকার তত্ত্ব জানা থাকিলে সহজেই যেমন বুঝিতে পারা যায় যে, মৃন্ময়

বস্তু সকল বস্তুতঃ মৃত্তিকারই রূপান্তরমাত্র—মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তেমনই জগতের কারণীভূত এক অখণ্ড ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারিলে, ব্রহ্ম-প্রসূত এই সমস্ত জগৎই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। তখন জানিতে পারা যায় যে, এ জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত স্বতন্ত্র কিছুই নহে; ব্রহ্মই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইতেছেন, এবং বিভিন্ন নামে ও রূপে পরিচিত হইতেছেন মাত্র। শ্রুতিপ্রদর্শিত উক্ত প্রতিজ্ঞা (একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান) ও দৃষ্টান্ত যথাযথরূপে আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্ম কেবল নিমিত্তকারণ নহে, উপাদান-কারণও বটে। একথার আরও দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্ত সূত্রকার পুনশ্চ বলিতেছেন —

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ১।৪।২৭ ॥

ব্রহ্ম যে, জগতের উপাদান কারণ, এবিষয়ে আর সন্দেহ করিবার অবসর নাই; কারণ, স্বয়ং শ্রুতিই তাঁহাকে জগতের যোনি বা উপাদানকারণ বলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে, জগতের কেবল নিমিত্তকারণমাত্র, তাহা নহে, পরন্তু তিনি উপাদানকারণও বটে। শ্রুতি বলিতেছেন—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম যোনিম্"। (মুণ্ডক ৩।১।৩)
"তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ"। (মুণ্ডক ১।১।৬)

এই উভয় শ্রুতিতেই ব্রহ্ম পুরুষকে 'যোনি' ও 'ভূতযোনি' শব্দে

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (১)। 'যোনি' শব্দ সাধারণতঃ উপাদান-কারণেই প্রসিদ্ধ। অতএব শ্রুতির প্রামাণ্যানুসারে জগৎকারণ ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ—উভয় কারণই বলিতে হইবে, নচেৎ শ্রুতির প্রামাণ্যে ব্যাঘাত ঘটে। যুক্তি এবং দৃষ্টান্তদ্বারাও যে, ব্রহ্মের উভয়বিধ কারণত্ব সমর্থিত হয়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব শ্রুতি, যুক্তি ও দৃষ্টান্তানুসারে এই সিদ্ধান্তই স্থির হইতেছে যে, জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ—দুইটী বিভিন্ন পদার্থ নহে, পরন্তু একই পদার্থ, অর্থাৎ এক ব্রহ্মই অন্যের অপেক্ষা না করিয়া উক্ত উভয়বিধ কারণরূপে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন (২)। ইহাই শঙ্কর-সম্মত অদ্বৈতবাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

[জগৎকারণ-সম্বন্ধে মতান্তর।]

জগতের কার্য্য-কারণভাব লইয়া ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পাশুপত ও পাঞ্চরাত্র (সাত্বত) প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত প্রায় প্রত্যেক আচার্য্যই স্বতন্ত্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই এবিষয়ে বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত

(১) উদ্ধৃত দুইটী শ্রুতির অর্থ—জ্ঞানী (পশ্য) যখন সুবর্ণবর্ণ জগৎকর্ত্তা ও জগৎ-যোনি সেই মহাশক্তি ব্রহ্ম পুরুষকে দর্শন করেন, ইতি।

ধীরগণ যে ভূত-যোনিকে (সর্ব্বভূতের উপাদানকে) সম্যক্‌রূপে দর্শন করেন, তিনি অব্যয়—নির্ব্বিকার, ইত্যাদি।

(২) ন্যায়মতানুসারে ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ বলিলেও তদতিরিক্ত পরমাণুপুঞ্জকে উপাদানকারণরূপে স্বীকার করিতে হয়। অতএব দুইটী পৃথক্ কারণ কল্পনায় গৌরব দোষ ঘটে, অদ্বৈতবাদে তাহা ঘটে না, ইহাই বিশেষ।

হইয়াছেন, এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য যতদূর সম্ভব শ্রুতি, যুক্তি ও দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। সেই সমুদায় মতবাদ প্রসিদ্ধ বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে বিশেষভাবে আলোচিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। আমরা এখানে সে সমুদয় কথার সারমর্ম্ম মাত্র উদ্ধৃত ও বিবৃত করিতেছি।

প্রথমতঃ মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের (১) কথা বলা হইতেছে। তাঁহরা বলেন, জগতে পাচঁপ্রকার পদার্থ আছে,—কার্য্য, কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত। কার্য্য অর্থ—মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূতপর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত। কারণ দুই প্রকার, এক—মূল প্রকৃতি বা 'প্রধান', দ্বিতীয় কারণ ঈশ্বর। যোগ অর্থ—সমাধি, পাতঞ্জলে যাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। বিধি অর্থ—ত্রৈকালিক স্নান হোমাদি অনুষ্ঠান। দুঃখান্ত অর্থ—দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি—মুক্তি। পরমেশ্বর পশুপতি পশু-পাশ ছেদনের উদ্দেশ্যে উক্ত পাঁচপ্রকার পদার্থ উপদেশ করিয়াছেন।

পশুপতি (পশু অর্থ—জীব, তাহাদের অধিপতি) হইতেছেন—পরমেশ্বর। তিনিই জগতের নিমিত্তকারণ, আর মূল প্রকৃতি হইতেছে জগতের উপাদানকারণ। স্বয়ং পশুপতিই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক প্রকৃতি দ্বারা জগৎ রচনা করিয়া থাকেন।

(১) মাহেশ্বর সম্প্রদায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত—শৈব, পাশুপত, কারুণিক, সিদ্ধান্তী ও কাপালিক। ইহাদের মধ্যে আচার ও অনুষ্ঠানে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

যোগ-দর্শন-প্রণেতা পতঞ্জলি মুনিও এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনিও প্রকৃতিকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়া পরমেশ্বরকে তাহার পরিচালক নিমিত্তকারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং এ অংশে মাহেশ্বর মত ও যোগমত সম্পূর্ণ একরূপ। বৈশেষিকদর্শনপ্রণেতা কণাদের মতানুযায়ী পণ্ডিতেরাও সাধারণতঃ এই মতেরই সমর্থন করিয়া থাকেন। তাহারা পরমেশ্বরকে নিমিত্তকারণ, আর পার্থিবাদি পরমাণুপুঞ্জকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সুতরাং তাহাদের মতও বেদান্তের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানকারণ-সিদ্ধান্তের বিরোধী। এই সমুদয় সিদ্ধান্ত এবং এবংবিধ আরও যে সমস্ত সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদের বিরোধী বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই সকল মতবাদ খণ্ডনের অভিপ্রায়ে সূত্রকার বেদব্যাস বলিয়াছেন—

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ২।২।৩৭ ॥

জগৎপতি পরমেশ্বরকে প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃরূপে (প্রেরক বা পরিচালকভাবে) জগৎকারণ বলিলে বিষম অসামঞ্জস্য দোষ উপস্থিত হয়। কারণ, পরমেশ্বর যখন রাগ-দ্বেষাদিদোষবর্জ্জিত পরম পবিত্র, তখন তাঁহার কার্য্যে এত বৈষম্য ঘটিতে পারে না; পক্ষান্তরে জগদ্ব্যাপী অনন্ত বৈষম্য দর্শনে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনিও বোধ হয় আমাদেরই মত রাগ-দ্বেষের বশীভূত; সেই কারণেই তিনি এক জনকে ধনী, অপরকে দরিদ্র, এক জনকে রোগী, অপরকে ভোগী করিয়াছেন। জীবের প্রাক্তন কর্ম্ম-বৈচিত্র্যের সহায়তা লইলেও

এ দোষের পরিহার হয় না; কারণ, প্রথম সৃষ্টিতে এ দোষ থাকিয়াই যায়॥ ২।২।২৭॥ তাহার পর—

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ॥ ২।২।৩৯॥

পরমেশ্বর দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধশূন্য ও নিষ্কাম। হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট সর্ব্বজনদৃশ্য কুম্ভকার প্রভৃতি যেরূপ মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদান লইয়া স্বীয় চেষ্টাদ্বারা ঘটাদিকার্য্য সম্পাদন করে, দেহেন্দ্রিয়াদিসম্পর্কশূন্য অপ্রত্যক্ষ পরমেশ্বরের পক্ষে সেরূপ জগৎ-সৃষ্টিকরা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সেরূপ কল্পনা একেবারেই দৃষ্টবিরুদ্ধ, সুতরাং উপেক্ষণীয়॥ অতএব উল্লিখিত সদোষ মতবাদের দ্বারা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদসম্মত অভিন্ন-কারণবাদ বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে না; সুতরাং পূর্ব্বপ্রদর্শিত ব্রহ্মকারণতা-বাদই শ্রুতিসম্মত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত॥২।২।৩৯॥

পূর্ব্বপ্রদর্শিত মাহেশ্বরাদিসম্মত সিদ্ধান্ত সকল যে কারণে সদোষ বলিয়া গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না, সেই কারণেই চতুর্ব্যূহবাদী পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তও গ্রহণীয় হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন—

শ্রুতিতে যিনি নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত, তিনিই ভাগবতে বাসুদেব নামে কথিত। ভগবান্ বাসুদেবই জগতের একমাত্র কারণ—তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ। তিনি যেমন আপনার দেহ হইতে বিশাল বিশ্বরাজ্য রচনা করিয়াছেন, তেমনই আবার আপনি আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে বিরাজ

করিতেছেন। তাঁহার এক একটা বিভাগকে ব্যূহ বলা হয়। কোন ব্যূহই ভগবান্ হইতে পৃথক্ বা অতিরিক্ত নহে ; এই জন্য ভগবান্‌কেও চতুর্ব্যূহ বলা হয়। উক্ত ব্যূহচতুষ্টয়ের মধ্যে বাসুদেব হইতেছেন—পরমাত্মা (পর ব্রহ্ম), সংকর্ষণ হইতেছেন জীবাত্মা এবং প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ হইতেছেন—যথাক্রমে মন ও অহঙ্কার। ভগবান্ বাসুদেবই পরবর্ত্তী ব্যূহত্রয়ের প্রকৃতি বা উপাদানকারণ, অর্থাৎ সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই তিনটা ব্যূহই বাসুদেব-ব্যূহ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ভক্তগণ দীর্ঘকালব্যাপী অভিগমন, উপাদান ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ-সাধনাদ্বারা আরাধনা করিয়া সেই ভগবান্ বাসুদেবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (১)। তাহাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সূত্রকার বলিয়াছেন—

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ২।২।৪১ ॥

ভাগবতগণ যে, ভগবান্ বাসুদেবকে সর্ব্বজগতের নিমিত্ত ও উপাদান বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই ; এবং অভিগমন ও উপাদান প্রভৃতি সাধনা দ্বারা যে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, তদ্বিষয়েও অসম্মতি প্রদর্শনের কোন কারণ নাই ; কিন্তু তাহারা যে, বাসুদেব হইতে জীবরূপী সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি ঘোষণা করেন, সে কথা কিছুতেই স্বীকার

---

(১) অভিগমন অর্থ—বাক্য, দেহ ও মনকে সংযত করিয়া ভগবানের পূজাগৃহে গমন। উপাদান—পূজার দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ, ইজ্যা—পূজা। স্বাধ্যায়—অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রের জপ। যোগ অর্থ—ধ্যান।

করিতে পারা যায় না; কারণ, সেরূপ উৎপত্তি একেবারেই অসম্ভব (১)। উৎপত্তিশালী পদার্থমাত্রই অনিত্য—যাহারই উৎপত্তি আছে, তাহারই ধ্বংস আছে, এ নিয়ম জগতে অখণ্ডনীয় ও অনুল্লঙ্ঘনীয়। অতএব সঙ্কর্ষণনামধারী জীব যদি সত্যসত্যই বাসুদেব হইতে সমুৎপন্ন হইত, তাহা হইলে ঘটাদির ন্যায় তাহারও ধ্বংস বা বিনাশ অপরিহার্য্য হইত, এবং অনিত্য জীবের পক্ষে মোক্ষ বা পরলোকগমন উভয়ই অসম্ভব হইত।

"নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ॥" ২।২।৪২॥

ইহার পর এই অধ্যায়েরই তৃতীয় পাদে ত্রয়োদশ-সংখ্যক সূত্রে বিশেষভাবে জীবোৎপত্তি প্রত্যাখ্যাত হইবে। অতএব কর্ত্তা—জীবস্বরূপ সংকর্ষণ যে, বাসুদেব হইতে উৎপন্ন হয়, একথা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে॥ ২।২।৪২॥

তাহাদের মতে কেবল যে, জীবোৎপত্তিই একমাত্র অসম্ভব, তাহা নহে; পরন্তু—

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্॥ ২।২।৪৩॥

কর্ত্তা হইতে যে, 'করণে'র (যাহার দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই সাধন বস্তুর) উৎপত্তিও শ্রুতিবিরুদ্ধ। অভিপ্রায় এই যে,

---

(১) শঙ্করের মতে শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, জীব পরমাত্মা হইতে—উৎপন্ন হয় না; পরন্তু পরমাত্মাই অন্তঃকরণরূপ উপাধিযোগে জীবভাবে পরিচিত হন। জীব পূর্ব্বেও ব্রহ্মস্বরূপ, এখনও ব্রহ্মস্বরূপ, সুদূর ভবিষ্যতেও ব্রহ্মস্বরূপই থাকিবে। এই জন্যই জীবের উৎপত্তিবাদ শঙ্কর-মতের বিরুদ্ধ।

ভাগবত-সম্প্রদায়ের লোকেরা যে, কর্ত্তৃস্বরূপ সংকর্ষণ (জীব) হইতে প্রদ্যুম্ননামক অন্তঃকরণের (মনের) উৎপত্তি এবং সেই প্রদ্যুম্ননামক মনঃ হইতেই আবার অনিরুদ্ধনামক অহঙ্কারের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া থাকেন, একথাও যুক্তিযুক্ত বা দৃষ্টান্ত-সম্মত হয় না। কারণ, প্রত্যেক কর্ত্তাই পূর্ব্বসিদ্ধ কোন বস্তুকে করণরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত কোথাও দৃষ্ট হয় না যে, যাহা দ্বারা কার্য্যসম্পাদন করিতে হইবে, কর্ত্তাই অগ্রে সেরূপ কোনও করণবস্তু নির্ম্মাণ করিয়া পশ্চাৎ তাহা দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। কুম্ভকার ঘটনির্ম্মাণকালে পূর্ব্বসিদ্ধ দণ্ড প্রভৃতি উপকরণ (করণ প্রভৃতি) লইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অতএব সংকর্ষণ যে, মনঃস্থানীয় প্রদ্যুম্নকে সমুৎপাদন করিয়া পশ্চাৎ স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হন বলা হইয়াছে, তাহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

উপরি প্রদর্শিত আপত্তির ভয়ে তাঁহারা যদি বলিতে চাহেন যে, বাসুদেবব্যূহের ন্যায় অপর তিনটী ব্যূহও (সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই তিন ব্যূহও) নিত্যসিদ্ধ, এবং প্রত্যেকেই স্বাধীন ও অনন্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি তুল্যগুণ-সমন্বিত, কেহ কাহারও অপেক্ষিত বা অধীনতাপাশে আবদ্ধ নহেন। এ কথার প্রতিবাদরূপে সূত্রকার বলিতেছেন—তাহা হইলেও জগতের উৎপত্তি—কেবল উৎপত্তি কেন, স্থিতি ও সংহারকার্য্যও অবাধে সম্পন্ন হইতে পারে না; কারণ, কর্ত্তা, করণ ও অহঙ্কার প্রত্যেকেই যখন

স্বাধীন, তখন কেহই অপরের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হইবে না; সুতরাং একমতে কার্য্য করা কখনই সম্ভবপর হইবে না। অধিকন্তু এক ঈশ্বর দ্বারাই যখন কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন অতিরিক্ত ব্যূহত্রয় স্বীকার করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইত্যাদি দোষবাহুল্যবশতঃ এ সকল মতবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের অভিমত বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদসম্মত কার্য্য-কারণভাব গ্রহণ করাই সঙ্গত ও সমীচীন।

আচার্য্য শঙ্কর উক্ত ভাগবতসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আরও অনেকপ্রকার অসামঞ্জস্য-দোষ প্রদর্শন করিয়া এ মতের অসারতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সে সকল কথা শাঙ্করভাষ্য মধ্যে অতি সরল ভাষায় বিস্তৃতভাবে বিবৃত রহিয়াছে, আবশ্যক মনে করিলে, জিজ্ঞাসু পাঠকবর্গ তাহা দেখিলেই নিঃসন্দেহরূপে সমস্ত কথা জানিতে পারিবেন। (২।২।৪৪)।

[ভূতসৃষ্টি ও ভৌতিক সৃষ্টি]

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ। কুম্ভকার যেরূপ ঘটকার্য্যের কারণ, অথবা মৃত্তিকা যেরূপ ঘটকার্য্যের কারণ (উপাদান), ব্রহ্ম সেরূপ কারণ নহেন, তিনি এককই নিমিত্ত-উপাদান উভয়প্রকার কারণ। মাকড়সা যেমন স্বীয় চৈতন্যের সাহায্যে স্বশরীর হইতে সূত্র নিষ্কাসনপূর্ব্বক জাল নির্ম্মাণ করে, পরমেশ্বরও ঠিক তেমনই স্বীয় চৈতন্যবলে শরীরস্থানীয় নিজ মায়া দ্বারা জড় জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন; সুতরাং তিনি কেবল

নিমিত্তকারণ বা উপাদানকারণমাত্র নহেন, পরন্তু উভয়বিধ কারণ-রূপেই সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

[আকাশের উৎপত্তি]

অতঃপর তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যের বিষয় বিশ্লেষণ করা আবশ্যক হইতেছে, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে স্থূল, সূক্ষ্ম, ছোট বড় যাহা কিছু আছে বা থাকিতে পারে, তৎসমস্তই কি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? অথবা তাঁহা হইতে অনুৎপন্নও কিছু আছে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, অগ্রে অনুকূল ও প্রতিকূল শ্রুতিবাক্য এবং ন্যায়সম্মত যুক্তিতর্কের আলোচনা করিতে হয়, নচেৎ প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না। কেবলই শ্রুতি বা কেবলই যুক্তি দ্বারা এ তত্ত্বের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হইতে পারে না, হইলেও তাহা সংশয়শূন্য সিদ্ধান্ত-রূপে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না; এইজন্য আবশ্যকমতে যথা-সম্ভব শ্রুতি ও যুক্তিতর্কের সহায়তা লইতেই হয়। বলা বাহুল্য যে, শ্রুতিবিরুদ্ধ যুক্তি স্বভাবতই দুর্ব্বল; তাদৃশ যুক্তি কখনই তত্ত্বনির্ণয়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত উপায় নহে; সুতরাং শ্রুতির প্রতিকূলে উত্থাপিত যুক্তিতর্ক সর্ব্বত্রই অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এই বিচারপ্রসঙ্গে সূত্রকার প্রথমেই আকাশের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া, আপত্তিস্থলে বলিয়াছেন—

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ২।৩।১ ॥

পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর, এবং সূক্ষ্ম ও নিরবয়ব বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিরবয়ব দ্রব্যের কোথাও উৎপত্তি

দেখা যায় না, এবং যুক্তিদ্বারাও তাহা সমর্থন করা যায় না। বিশেষতঃ উৎপত্তিপ্রকরণে আকাশের উৎপত্তিবোধক কোন শ্রুতি-বাক্যও দেখা যায় না। ছান্দোগ্যোপনিষদে কেবল তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই ভূতত্রয়ের মাত্র উৎপত্তি বর্ণিত আছে—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়। তৎ তেজোঽসৃজত" অর্থাৎ পরমেশ্বর (সৃষ্টিবিষয়ে) ইচ্ছা করিলেন; ইচ্ছার পর প্রথমেই তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। এখানে আকাশ ও বায়ুসৃষ্টির কোন কথাই নাই, আছে কেবল তেজঃ প্রভৃতি ভূতত্রয়ের উৎপত্তির কথা। অতএব আকাশের উৎপত্তি বিষয়ে শ্রুতি যখন নির্ব্বাক্, কোনও অনুকূল মত প্রকাশ করিতেছেন না, এবং কোন যুক্তিও তাহা সমর্থন করিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে, আকাশ পঞ্চভূতের মধ্যে উৎপত্তিবিনাশবিহীন নিত্যসিদ্ধ একটী দ্রব্য পদার্থ (১)॥

(১) বৌদ্ধ সম্প্রদায় আকাশের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। তাহারা উহাকে অবস্তু—অভাবমাত্র বলিয়া বর্ণনা করেন। নৈয়ায়িকগণ আকাশকে নিত্যসিদ্ধ একটী দ্রব্যপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। তাহারা আকাশের উৎপত্তি না হইবার পক্ষে এইরূপ যুক্তি দিয়া থাকেন যে, সাধারণতঃ দ্রব্যোৎপত্তি সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, প্রথমে কতকগুলি অবয়ব পরস্পর সংযুক্ত বা মিলিত হয়, পরে সেই সংযোগের ফলে একটী কার্য্য অবয়বী উৎপন্ন হয়, কিন্তু যাহার অবয়ব নাই, তাহার পক্ষে আরম্ভক অবয়বের অভাবে উৎপত্তি বা অবয়বীরূপে আবির্ভূত হওয়া সম্ভব হয় না। আকাশ নিরবয়ব পদার্থ, অবয়ব না থাকাতেই আকাশের উৎপত্তি অযৌক্তিক ও অসম্ভব হয়। অতএব আকাশের উৎপত্তি হইতে পারে না, উহা একটী নিত্য পদার্থ।

(২।৩।১)॥ এই কল্পনার বিপক্ষে সূত্রকার নিজের অভিমত বলিতেছেন—

অস্তি তু ॥ ২।৩।২ ॥

তোমরা যে, বলিতেছ আকাশের উৎপত্তিপ্রকাশক কোন শ্রুতিবচন নাই, সেকথা সত্য নহে। অপরাপর ভূতের ন্যায় আকাশেরও উৎপত্তিবোধক স্পষ্ট শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে। যদিও ছান্দোগ্যোপনিষদে আকাশোৎপত্তির কোন কথা নাই সত্য, তথাপি আকাশের অনুৎপত্তি বা নিত্যতা সিদ্ধ হইতেছে না; কারণ, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশোৎপত্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে। সেখানে অন্যান্য ভূতের সঙ্গে আকাশেরও উৎপত্তি-বার্ত্তা বিঘোষিত হইয়াছে। যথা—

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইতি।

সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী সমুৎপন্ন হইল।

এখানে ত স্পষ্টাক্ষরেই আকাশকে পরমাত্মা হইতে 'সম্ভূত' বলা হইয়াছে। স্বয়ং শ্রুতিই যখন আকাশের উৎপত্তি কথা কীর্ত্তন করিতেছে, তখন তদ্বিরোধী যুক্তিতর্কের কোন অবসরই নাই। আকাশ নিরবয়ব; সুতরাং তদারম্ভক অবয়বেরও অভাব; অবয়বের অভাব নিবন্ধনই আকাশের উৎপত্তি সম্ভবে না, ইত্যাদি যুক্তিও এখানে কার্য্যকরী বা সফল হইতে পারে না; কারণ,

আকাশ যে, সত্য সত্যই নিরবয়ব, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আকাশ বস্তুতই নিরবয়ব হইলে উক্ত শ্রুতি কখনই অসংকোচে উহার উৎপত্তি ঘোষণা করিত না। অতএব শ্রুতির উপদেশ হইতেই জানা যায় যে, আকাশ নিরবয়বও নহে, এবং স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পদার্থও নহে। উহা উৎপত্তিবিনাশশীল জন্য পদার্থমাত্র।

অবশ্য, এখানে একটা আশঙ্কা হইতে পারে যে, ছান্দোগ্যোপনিষদে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরমেশ্বর হইতেই তেজঃপ্রভৃতি ভূতত্রয়ের উৎপত্তি বার্ত্তা কথিত আছে, কিন্তু তৈত্তিরীয়োপনিষদে বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং উভয় উপনিষদের কথা পরস্পরবিরুদ্ধ হইতেছে, বিরুদ্ধ বাক্যদ্বয় কখনই প্রমাণরূপে গ্রহণীয় হইতে পারে না। ঐ বাক্যদ্বয়ের প্রামাণ্য রক্ষা করিতে হইলে, অগ্রে ঐ বিরোধের পরিহার করা আবশ্যক হয়। কিন্তু সে বিরোধ-পরিহারের উপায় কি? এতদুত্তরে আচার্য্যগণ বলেন, তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্যোপনিষদের উক্তিতে আপাততঃ যে বিরোধ লক্ষিত হয়, বাস্তবিকপক্ষে তাহা বিরোধই নয়। সামান্য প্রণিধান করিলেই উভয় শ্রুতির সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে। মনে কর, পরমেশ্বর যদি প্রথমে আকাশ ও বায়ুরূপ প্রকটিত করিয়া পশ্চাৎ তেজঃসৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও, তাঁহাকে তেজের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে কোনও আপত্তি হইতে পারে না। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ সেই অভিপ্রায়েই আকাশ ও বায়ুসৃষ্টির পর তেজঃসৃষ্টির কথা বলিয়াছেন, আর ছান্দোগ্যোপনিষদ্ আকাশ ও বায়ুসৃষ্টির কথা না বলিয়া প্রথমেই

পরমেশ্বর হইতে তেজঃসৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন। উভয় পক্ষেই পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রমাণিত হইতেছে। বিশেষতঃ সৃষ্টিকর্তা-রূপে ব্রহ্মপ্রতিপাদন করাই ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য, সৃষ্টিক্রম প্রতিপাদন নহে। আকাশ ও বায়ু ব্যাপক পদার্থ হইলেও অতি সূক্ষ্মতানিবন্ধন সাধারণের অপ্রত্যক্ষ; তদুভয়ের স্বরূপ ও উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি স্বভাবতই দুর্বোধ্য ও সংশয়সঙ্কুল; সুতরাং সেরূপ দুর্ব্বোধ্য পদার্থের সৃষ্টি ধরিয়া তৎকর্তারূপে ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাপন করা, অথবা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া সহজসাধ্য নহে; এইজন্য শিষ্যের বোধ সৌকার্য্যার্থই শ্রুতিতে ঐ দুইটী ভূতের সৃষ্টিকথা উল্লেখ না করিয়া প্রথমেই তেজঃসৃষ্টির কথা অভিহিত হইয়াছে, আর তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উল্লিখিত আশঙ্কা না করিয়া সৃষ্টিচক্রের ক্রমসিদ্ধ ধারা অনুসারে পর পর যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টি-কথা বর্ণিত হইয়াছে; অতএব উল্লিখিত শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে বিরোধ কিছুই নাই। অভিপ্রায়ভেদে একই কথা যে, বিভিন্ন-প্রকারে বলিতে পারা যায়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত (১)। উক্ত দুইটী সৃষ্টিবাক্যেও সেই চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারেই নির্দ্দেশ-ক্রমে মাত্র পার্থক্য ঘটিয়াছে, প্রকৃত তাৎপর্য্য অব্যাহতই আছে।

---

(১) তাৎপর্য্য এই যে, অন্যান্য শ্রুতির সহিত একবাক্যতা করিয়া বুঝিতে হইবে যে, ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও "তৎ তেজঃ অসৃজত" এই কথার অগ্রে "আকাশং বায়ুং চ সৃষ্ট্বা" এই অনুক্ত অংশটুকু পূরণ করিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলেই উভয় শ্রুতির সামঞ্জস্য হইয়া যায়।

অতএব ঐ প্রকার উক্তি বিরোধব্যঞ্জক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ অপ্রমাণ নহে। (২।৩।২)॥

আকাশোৎপত্তির পক্ষে আরও একটী যুক্তি এই যে, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে প্রথমে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে; পরে সেই প্রতিজ্ঞাত বিষয়টী সমর্থনের জন্য উদাহরণ-চ্ছলে বলা হইয়াছে যে,, কার্য্যমাত্রই কারণ হইতে অপৃথক্ বস্তু, অর্থাৎ উপাদানকারণই বিভিন্ন কার্য্যাকারে প্রকটিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়। কোন কার্য্যবস্তুই স্ব স্ব কারণদ্রব্য হইতে অতিরিক্ত নহে; সুতরাং কারণবস্তুটী জানিতে পারিলেই তদুৎপন্ন (তৎকার্য্য) নিখিল বস্তু জানা হইয়া যায়। ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ; সুতরাং ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে তৎকার্য্য নিখিল জগৎই পরিজ্ঞাত হইতে পারে। আকাশ যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন না হইত, উহা যদি ব্রহ্মেরই মত নিত্যসিদ্ধ স্বতন্ত্র বস্তু হইত, তাহা হইলে, ব্রহ্মকে জানিলেও আকাশ-বিজ্ঞানের কোনই সম্ভাবনা থাকিত না; কারণ, আকাশ ত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন—ব্রহ্মকার্য্য নহে। অতএব শ্রুতিপ্রদর্শিত উক্ত প্রতিজ্ঞা-রক্ষার অনুরোধেও আকাশের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিতে হয়, নচেৎ শ্রুতির প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষ ঘটে। এই অভিপ্রায়ই সূত্রকার—

প্রতিজ্ঞাঽহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥ ২।৩।৬ ॥

সূত্রদ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়াছেন। এই সূত্রের ব্যাখ্যা উপরেই বিশদভাবে বিবৃত করা হইয়াছে, আর অধিক কিছু বলিবার নাই ॥ ২।৩।৬ ॥

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উল্লেখ না থাকিলেও, যে সকল কারণে আকাশের উৎপত্তি সমর্থন করা হইল, সেই সকল কারণেই বায়ুর উৎপত্তিও সমর্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেইজন্য সূত্রকার অধিক কথা না বলিয়া সংক্ষেপতঃ বলিয়াছেন—

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২।৩.৮ ॥

অর্থাৎ যদিও ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বায়ুর উৎপত্তিকথা বর্ণিত না থাকুক, এবং যদিও কোন কোন শ্রুতিবাক্যে বায়ুর অনুৎপত্তি-সূচক 'অনস্তমিত' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হউক, তথাপি বায়ুর নিত্যতা সম্ভাবনা করা যায় না। কারণ, ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বায়ুর উৎপত্তিকথা না থাকিলেও. তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে এবং অন্যান্য স্থলে বায়ুর উৎপত্তি সংবাদ স্পষ্ট কথায় উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহার পর বায়ুর উৎপত্তি অনভিপ্রেত হইলে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাই রক্ষা পায় না, এই সমুদয় কারণে ছান্দোগ্যের মতেও বায়ুর উৎপত্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আকাশ হইতে বায়ুর. বায়ু হইতে তেজের, তেজ হইতে জলের এবং জল হইতে সর্ব্বকনিষ্ঠ পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে (১)। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জড়স্বভাব আকাশ বায়ু প্রভৃতি ভূতবর্গ স্বয়ং স্বাধীনভাবে কোন কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না, এবং করেও না, পরন্তু "তদভিধ্যানাদেব" (২।৩।১৩) অর্থাৎ সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরই সংকল্পপূর্ব্বক আকাশাদিরূপে প্রকটিত হইয়া পরবর্ত্তী

(১) তেজঃপ্রভৃতি ভূতত্রয়ের কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১০—১৩শ সূত্রে বর্ণিত আছে।

ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন (১); সুতরাং পরমেশ্বরের বিশ্বজনীন কর্তৃত্ব কোথাও ব্যাহত হইতেছে না (২)॥ ২।৩।১৫॥

[আলোচনা]

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে বসিলে প্রথমেই আকাশের কথা মনে পড়ে। কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত আকাশকে উৎপত্তি-বিনাশবিহীন নিত্যপদার্থ মধ্যে গণনা করিলেও বৈদান্তিকগণ তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা আকাশকেও পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় উৎপত্তি-বিনাশশীল একটা অনিত্য পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বৈদান্তিকগণ আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, আপাতজ্ঞানে তাহা যুক্তিসম্মত মনে হয় না। কারণ,

(১) "স্বয়মেব পরমেশ্বরঃ তেন তেনাত্মনাবতিষ্ঠমানোঽভিধ্যায়ন্ তং তং বিকারং সৃজতীতি" শাঙ্কর ভাষ্য। ২। ৩। ১৩।

(২) এস্থলে আর একটী বিষয় আলোচনার যোগ্য। তাহা এই—পঞ্চভূতের ন্যায় বুদ্ধি, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ এবং ব্যবহারসিদ্ধ; সুতরাং উহাদেরও উৎপত্তিক্রম চিন্তা করা আবশ্যক। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বুদ্ধি, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ যদি ভৌতিক হয়, তবে ত ভূতোৎপত্তিক্রমেই উহাদেরও উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। যেমন আকাশের সাত্ত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ত্বক্ এবং তেজ, জল ও পৃথিবীর সাত্ত্বিকাংশ হইতে যথাক্রমে চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকার উৎপত্তি। এইরূপ প্রাণ ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণেরও পঞ্চভূতের রাজসিক অংশ হইতে উৎপত্তি হইবে। আর ঐ সকল বস্তু যদি ভৌতিক না হয়, তবে ভূতোৎপত্তির অগ্রে বা পশ্চাৎ স্বতন্ত্রভাবে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। ইহাই অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত।

আকাশ নিরংশ বা নিরবয়ব; সাবয়ব পদার্থই অবয়বসমূহের পারস্পরিক সংযোগের ফলে একটা স্বতন্ত্র বস্তুরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আকাশ যখন নিরবয়ব, তখন তাহার সম্বন্ধে অবয়ব-সংযোগ কল্পনাই করা যায় না; অবয়বসংযোগ ব্যতীত কোন বস্তুই স্বতন্ত্র অবয়বিরূপে উৎপত্তি লাভ করিতে পারে না; পারে না বলিয়াই আকাশকে উৎপত্তিশীল বলিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ ছান্দোগ্যোপনিষদের যে স্থানে সৃষ্টিতত্ত্ব কথিত আছে, সেখানে কেবল তেজঃ, জল ও পৃথিবীর উৎপত্তিমাত্র বর্ণিত হইয়াছে, বায়ু বা আকাশের নামগন্ধ পর্য্যন্ত নাই। অতএব শ্রুতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ আকাশোৎপত্তি বৈদান্তিকগণের অভিমত হইলেও সমর্থন করা যাইতে পারে না।

এ কথার উত্তরে বৈদান্তিকগণ বলেন, যদিও আপাতজ্ঞানে আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া মনে হউক, এবং যদিও উপরি উক্ত নিয়মানুসারে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া কল্পিত হউক, অধিকন্তু শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়াও বিবেচিত হউক, তথাপি, আমাদের সিদ্ধান্তে সন্দেহ করা সঙ্গত হয় না। কেন না, আপাতজ্ঞান কখনই প্রমাণরূপে গণনীয় হইতে পারে না। আপাতজ্ঞান প্রায়ই ভ্রান্তিমিশ্রিত হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাদ্বারা কখনই সত্যাসত্য নির্ণীত হয় না। দ্বিতীয়তঃ আকাশ অতি সূক্ষ্ম— দৃষ্টির অতীত সত্য, কিন্তু সেইজন্যই যে, নিরংশ বা নিরবয়ব হইবে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? আর দর্শনের অগোচর হইলেই যদি বস্তুকে নিরবয়ব ও নিত্য বলিয়া মানিতে হয়, তবে অদৃশ্য বায়ুকেও নিত্য নিরবয়ব

বলিয়াছেন, কিন্তু কোথাও জীবের উৎপত্তিকথা বলেন নাই; এবং যুক্তি দ্বারাও তাহা সমর্থিত হয় নাই, বরং শ্রুতির উপদেশ অনুসারে বিচার করিতে গেলে জীবের অনিত্যতা দূরে থাকুক, নিত্যতাই প্রমাণিত হইয়া পড়ে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অপ্রত্যক্ষবিষয়ে শ্রুতির প্রামাণ্য সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ; সুতরাং শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন তর্কই সে স্থলে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। আত্মার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন—"জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে" অর্থাৎ জীবপরিত্যক্ত এই দেহই মরে, কিন্তু জীব মরে না। "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ" এই আত্মা জন্মরহিত (অজ), নিত্য নির্ব্বিকার ও চিরন্তন। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" অর্থাৎ সর্ব্বদ্রষ্টা এই আত্মা জন্মেও না, মরেও না ইত্যাদি।

বিশেষতঃ জীব ত কখনও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। আকাশ যেরূপ ঘটশরাবাদি উপাধিযোগে বিভিন্ন নামরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিসম্বন্ধবশতঃ এক ব্রহ্মই বিভিন্ন জীবরূপে প্রকটিত হন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা একই দেব (পরমাত্মা) সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে নিহিত আছেন, এবং "স বা এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ," সেই এই পরমাত্মা এই দেহমধ্যে নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট আছেন। এই সকল শ্রুতিবাক্য আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ।

ব্রহ্মই উপাধিযোগে জীবসংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন। জীব-ব্রহ্ম-বিভাগ কেবল ঔপাধিকমাত্র, উপাধি যতক্ষণ, এই বিভাগও ততক্ষণ। উপাধিবিনাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাগও বিলুপ্ত হইয়া যায়—জীবের জীবভাব ঘুচিয়া যায়, ব্রহ্মভাব ফুটিয়া উঠে। অতএব আত্মার উৎপত্তিকল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিগর্হিত।

এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, উৎপত্তিশীল পদার্থমাত্রই ধ্বংশের কবলে পতিত হয়। আত্মা উৎপত্তিশীল হইলে নিশ্চয়ই ধ্বংশের অধীন হইত; তাহা হইলে ধ্বংসের কবলীকৃত আত্মার পক্ষে মুক্তিকামনা ও তদুদ্দেশ্যে কঠোর সমাধিসাধনা প্রভৃতি উপায়ানুষ্ঠান সমস্তই বিফল হইয়া যাইত। এই সমুদয় কারণে বলিতে হয় যে, আকাশাদির ন্যায় আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ কখনই সম্ভবপর হয় না, ও হইতে পারে না। ২।৩।১৭॥

[আত্মার স্বরূপ বিচার]

উপরি উক্ত হেতুবাদে এবং শাস্ত্রার্থ দৃষ্টে এই পর্য্যন্ত অবধারিত হইল যে, আত্মার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই; আত্মা নিত্য নির্ব্বিকার। কিন্তু ইহা দ্বারা তাহার প্রকৃত স্বরূপ অবধারিত হইল না। আত্মা চেতন, কি অচেতন; চেতন হইলেও চৈতন্য তাহার গুণ, না স্বরূপ ইত্যাদি সংশয় থাকিয়াই গেল। সংশয়ের কারণ শাস্ত্রকারগণের মতভেদ-বাহুল্য। নৈয়ায়িকগণ বলেন—আত্মা স্বরূপতঃ কাষ্ঠ পাষাণাদির ন্যায় অচেতন; মনের সহিত সংযোগে আত্মাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়। এইজন্য আত্মাকে

চেতন বলা হয়, বস্তুতঃ উহা অচেতনেরই মত। চৈতন্য তাহার একটা গুণমাত্র; সময়বিশেষে সেই গুণ জন্মে ও মরে। পূর্ব্বমীমাংসকগণও সাধারণতঃ আত্মার সম্বন্ধে এইরূপ মতেরই সমর্থন করিয়া থাকেন। আবার সাংখ্যসম্প্রদায় বলেন, আত্মা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ। আত্মার সহিত চৈতন্যের যোগও নাই, বিয়োগও নাই; চৈতন্য উহার নিত্যসিদ্ধ ধর্ম্ম, চৈতন্যস্বরূপ বলিয়াই আত্মাকে চেতন বলা হয়, গুণ যোগে নহে। এই সমুদয় মতভেদ দর্শনে সহজেই আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়া থাকে, সেই সন্দেহ নিরাসার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

[চৈতন্য আত্মার স্বভাব।]

জ্ঞোঽত এব ॥ ২।৩।১৮ ॥

যেহেতু আত্মা জন্মমরণরহিত নিত্য—অবিকৃত ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই অবধারিত হইয়াছে, এবং যেহেতু "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্ম নিত্যচৈতন্য-স্বরূপ বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন, সেইহেতু প্রমাণিত হইতেছে যে, আত্মা অচেতনও নহে, অথবা আগন্তুক চৈতন্যসম্পন্নও নহে, নিত্য-চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ বলিয়াই কখনও তাহার প্রকাশশক্তির অভাব বা অভিভব হয় না। এইজন্য আত্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া কোন বিষয়ই অপ্রকাশিত (অবিজ্ঞাত) থাকে না। আত্মার চৈতন্য যদি আগন্তুক বা সাময়িক হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে আত্ম-সন্নিহিত বিষয়গুলি

অবিজ্ঞাতও থাকিত, কিন্তু কখনও তাহা থাকে না, এবং সেরূপ দেখাও যায় না। এইজন্য মহামুনি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ, তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ ॥" ৪।১৮ ॥

অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তিসমূহ সর্ব্বদাই জ্ঞাত বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, কখনও অবিজ্ঞাত অবস্থায় থাকে না; কারণ, তৎ-প্রকাশক পুরুষ (আত্মা) অপরিণামী বা নির্ব্বিকার। অভিপ্রায় এই যে, জাগতিক কোন বিজ্ঞেয় বস্তুই সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মার সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রকাশ পায় না; চিত্তই একমাত্র সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মার সমীপবর্ত্তীরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাহ্য বস্তুসকল সেই চিত্তের সাহায্যেই আত্মার সমীপবর্ত্তী হয়। বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হইলে পর, চিত্ত সেই সেই ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত হইয়া সেই সেই বাহ্য বস্তুর আকারে আকারিত হয়, এবং সেই সকল বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব লইয়া আত্মার সম্মুখীন হয়, তখন সেই বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্ত অর্থাৎ চিত্ত ও বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব—উভয়ই নিত্য চৈতন্যের ছায়ায় উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, ইহাকেই সাধারণতঃ 'জ্ঞান' নামে অভিহিত করা হয়। জ্ঞান কখনও অবিজ্ঞাত থাকে না; অবিজ্ঞাত জ্ঞানের সদ্ভাবে কোন প্রমাণই নাই। চিত্তবৃত্তির যে, এইরূপে সর্ব্বদা বিজ্ঞাতভাব, তাহার দ্বারাই আত্মার নিত্য-চৈতন্যরূপতা প্রমাণিত হয়।

সুষুপ্তিসময়ে বা মূর্চ্ছাদি অবস্থায় যে, আত্মার চৈতন্য থাকে না—কোনরূপ বোধশক্তিরই উন্মেষ দেখা যায় না, তাহাদ্বারা আত্মচৈতন্যের অভাব বা অনিত্যতা প্রমাণিত হয় না। তৎকালে

আত্মচৈতন্যের অভিব্যঞ্জক ইন্দ্রিয়সমূহ বৃত্তিহীন বা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, এবং চৈতন্যবিকাশের বাহ্য উপায় সকলও প্রতিহত হইয়া থাকে, সেই কারণেই বাহিরে বোধশক্তির বিকাশ দেখা যায় না মাত্র; বস্তুতঃ সে সময়েও আত্মচৈতন্য অক্ষত অবস্থায়ই বিদ্যমান থাকে। এবিষয়ে উপনিষদ্‌শাস্ত্রসকল একবাক্যে বলিতেছেন—

"নহি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতেবিপরিলোপো বিদ্যতে।" বিজ্ঞাতার (আত্মার) স্বরূপভূত জ্ঞানের (চৈতন্যের) কখনও অভাব হয় না।

"তদায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি।" এই পুরুষ (আত্মা) তখন স্বয়ংজ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশই থাকে।

"অসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি" আত্মা অসুপ্ত থাকিয়া—অলুপ্ত-চৈতন্য থাকিয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে সুপ্ত অর্থাৎ নির্ব্ব্যাপার দর্শন করে।

"যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি।" তখন (সুষুপ্তি-সময়ে) যে দর্শন করে না; বস্তুতঃ তখন দেখিয়াও দেখে না; অর্থাৎ স্বরূপচৈতন্যদ্বারা প্রকাশ করিলেও, ইন্দ্রিয়বৃত্তি না থাকায় বাহিরে তাহার অভিব্যক্তি হয় না মাত্র; এই কারণে পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা তাহার অদর্শন (দর্শনের অভাব) কল্পনা করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তখনও তাহার দর্শনশক্তি পূর্ব্ববৎ অবিলুপ্ত অবস্থায়ই থাকে ইত্যাদি।

উল্লিখিত প্রমাণপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই অবধারিত হয় যে, আলোচ্য আত্মা কাঠপাষাণাদির ন্যায় জড়

পদার্থ নহে, অথবা খদ্যোতের (জোনাকীপোকার) ন্যায় আগন্তুক চৈতন্যবিশিষ্টও নহে, পরন্তু আত্মা নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, সে চৈতন্যের সহিত তাহার কখনও যোগ বা বিয়োগ ঘটে না। প্রাণি-শরীরে কামাদি বৃত্তিসমূহ নিত্য বিদ্যমান থাকিলেও যেমন শিশু-বয়সে সে সকলের সদ্ভাবজ্ঞাপক কোন ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ প্রত্যক্ষ না হইলেও সে সকল বৃত্তির অসদ্ভাব প্রমাণিত হয় না, তেমনই অবস্থাবিশেষে (সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি সময়ে) আত্ম-চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় না মাত্র, বস্তুতঃ সে সকল সময়েও স্বরূপচৈতন্যের অভাব বা উচ্ছেদ হয় না, ইহাই অদ্বৈতবাদ সম্মত সিদ্ধান্ত (১)। (২।৩।১৮ সূত্র পর্য্যন্ত)

[আত্মার ব্যাপকতা]

আত্মা নিত্যচৈতন্যস্বরূপ; এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলেও তাহার পরিমাণ বিষয়ে সংশয় থাকিয়াই যায়। উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারাও—আত্মা কি অণু (সূক্ষ্ম)? কিংবা মধ্যম? অথবা পরম মহান্? —এ সংশয়ের অবসান হয় না। দার্শনিকগণের মধ্যেও এবিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ আত্মাকে অণুপরিমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কেহ কেহবা মধ্যম পরিমাণযুক্ত বলিয়া

---

(১) আচার্য্য শঙ্কর যেমন "জ্ঞোহতএব" সূত্র ব্যাখ্যায় আত্মার চৈতন্য-স্বরূপতা প্রমাণ করিয়াছেন, তেমনি রামানুজস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণও ঐ সূত্রের বিবরণে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং আত্মাকে চৈতন্যস্বরূপ না বলিয়া চৈতন্যগুণসম্পন্ন—জ্ঞানী বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মনে করেন; কেহ কেহ আবার এ সকল কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া আত্মার পরম মহৎ পরিমাণ স্বীকার করেন। শ্রুতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এ সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়া পড়ে। শ্রুতি একস্থানে বলিয়াছেন—

"এষোঽণুরাত্মা হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ," এই অণুপরিমাণ সূক্ষ্ম আত্মা লোকের হৃদয়ে নিহিত আছে। এবং—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ, স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।"

কেশের অগ্রভাগকে একশত ভাগে বিভক্ত করিয়া, পুনশ্চ উহাদের এক এক ভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগের যাহা পরিমাণ হয়, তাহাই জীবের পরিমাণ—অতি সূক্ষ্ম। সেই অণু জীবই আবার অনন্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী-পরিমিত পুরুষ (আত্মা) সর্ব্বদা প্রাণিগণের হৃদয়াভ্যন্তরে সন্নিবিষ্ট আছেন।

মহাভারতেও আছে—

"অথ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশংগতম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ বলাদ্ যমঃ॥"

অর্থাৎ যমরাজ সত্যবানের শরীর হইতে কালবশপ্রাপ্ত অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পুরুষকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এখানে আত্মাকেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত শ্রুতি-স্মৃতি বাক্যে আত্মার মধ্যম পরিমাণ স্পষ্টই কথিত হইয়াছে, এবং আরও বহুস্থলে আত্মার মধ্যম পরিমাণ বিবৃত রহিয়াছে।

অন্যত্র শ্রুতিই আবার আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশস্থলে মহৎ পরিমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন।—

"স বা এষ মহানজ আত্মা, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃহদাঃ ৪।৪।২২) প্রাণবর্গের অধিষ্ঠাতারূপে অবস্থিত সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা মহান্ ও অজ (জন্মরহিত)।

"আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" (সর্ব্বোপ০ ৪), এই আত্মা নিত্য এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত (সর্ব্বব্যাপী—মহান্)।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরী০ ২।১।১), ব্রহ্ম, (আত্মা) সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত (সর্ব্বব্যাপী)। পুরাণাদি শাস্ত্রেও আত্মার ব্যাপকতাবোধক এই জাতীয় বাক্য যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

কোথাও আবার শ্রুতিকে একতর পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অণুত্ব ও বিভুত্ব উভয় পক্ষই সমর্থন করিতে দেখা যায়। যথা—"নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্" (মুণ্ডক০ ১।১।৬), আত্মা নিত্য, বিভু সর্ব্বগত (সর্ব্বব্যাপী), অথচ সুসূক্ষ্ম অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্ম বা অণু। এখানে একই নিঃশ্বাসে আত্মাকে অণু বিভু দুইই বলা হইয়াছে। অন্যত্র আবার—

"অণোরণীয়ান্, মহতো মহীয়ান্" (কঠ০ ২।২০), আত্মা অণু অপেক্ষাও অণু, এবং মহৎ অপেক্ষাও মহৎ। এখানে অণু বিভু

উভয়ভাবই স্বীকৃত হইয়াছে। পরস্পরবিরোধী এই সকল প্রমাণ ও যুক্তি পর্য্যালোচনা করিলে আত্মার পরিমাণসম্বন্ধে স্বতই সংশয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এতদনুসারে সূত্রকার প্রথমে পূর্ব্বপক্ষীয় মতাবলম্বনপূর্ব্বক আত্মার অণু ও মধ্যম পরিমাণের অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—

উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্॥ ২।৩।১৯॥

শ্রুতি স্মৃতিপ্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্রে আত্মার উৎক্রমণ অর্থাৎ স্থূল দেহ হইতে বহির্গমন, লোকান্তরে গতি এবং পুনরায় ইহ-লোকে প্রত্যাগমনের কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু বিভু বা ব্যাপক আত্মার পক্ষে এ সকল ব্যাপার কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; কাজেই আত্মাকে হয় অণু, না হয় মধ্যম-পরিমাণ বলিতে হইবে (১)। অতএব আত্মার মহৎ পরিমাণ বা ব্যাপকতা কখনই সিদ্ধ হয় না॥ ২।৩।২০॥

---

(১) দেহ হইতে আত্মার উৎক্রমণবোধক শ্রুতি এই—"স যদাস্মাৎ শরীরাদুৎক্রামতি, সহৈবৈতৈঃ সর্ব্বৈরুৎক্রামতি," অর্থাৎ জীবাত্মা যখন দেহ হইতে যায়, তখন এইসকল ইন্দ্রিয়াদিকে সঙ্গে লইয়াই যায়। গতিবোধক শ্রুতি এইরূপ—"যে বৈ কে চাস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ান্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি।" অর্থাৎ যে কোন লোক ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে। আত্মার আগমন শ্রুতি এইরূপ—"তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি, অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" ইত্যাদি। অর্থাৎ চন্দ্রলোকগত ব্যক্তিরা সেখান হইতে পুনরায় এখানে আসিয়া কর্ম্ম করে।

সূত্রকার পুনরায় উক্ত সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আশঙ্কা উত্থাপন-পূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষবাদীর মুখে বলিতেছেন—

নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ॥ ২।৩।২১॥

শঙ্কা হইতে পারে যে, "স বা এষ মহানজ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে অণুত্ববিরোধী মহৎপরিমাণ নির্দ্দেশ থাকায় আত্মার অণু পরিমাণ বা মধ্যম পরিমাণ সিদ্ধ হইতে পারে না। বস্তুতঃ এরূপ আশঙ্কাও সঙ্গত হইতে পারে না,—এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; কারণ, ঐ সকল শ্রুতি পরমাত্মারই স্বরূপ-নির্দ্দেশপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত—জীবাত্মার নহে; সুতরাং আত্মার মহত্ত্ব-প্রতিপাদক ঐ সকল শ্রুতিবাক্য দ্বারা জীবাত্মার অণুপরিমাণ বাধিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ" এবং "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সচানন্ত্যায় কল্পতে" ইত্যাদি শ্রুতিতেও আত্মার অণুত্ব ও সূক্ষ্মপরিমাণত্ব স্পষ্টাক্ষরে প্রতি-পাদিত হইয়াছে; অতএব আত্মা নিশ্চয়ই অণু-পরিমাণসম্পন্ন—মধ্যম বা মহৎ-পরিমাণযুক্ত নহে। সেই পরিচ্ছিন্ন আত্মা দেহের একাংশে (হৃদয়মধ্যে) বর্ত্তমান থাকিয়াও সর্ব্বদেহব্যাপী ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট চন্দন যেমন শরীরের একাংশে স্থাপিত হইয়াও সর্ব্বদেহব্যাপী আনন্দ সমুৎপাদন করে, আত্মাও তেমনই দেহৈকদেশে হৃদয়মধ্যে থাকিয়াও দেহের সর্ব্বত্র অনুভূতি সম্পাদন করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে বলিতে পারাযায় যে, প্রদীপের গুণ আলোক যেমন প্রদীপ ছাড়িয়া

বাহিরে দূরদেশেও প্রকাশকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তেমনি হৃদয়স্থ আত্মাও স্বীয় গুণ জ্ঞানের সাহায্যে দেহগত সমস্ত কার্য্য অনুভব করিয়া থাকে। অথবা পুষ্পাদির গুণ গন্ধ যেরূপ পুষ্প ছাড়িয়াও অন্যত্র যাইতে পারে, সেইরূপ আত্মগুণ জ্ঞানশক্তিও আত্মাকে ছাড়িয়া দেহের সর্ব্বত্র কার্য্য করিতে পারে। অতএব আত্মা বিভু বা সর্ব্বব্যাপী নহে, পরন্তু অণুপরিমাণ, ইহাই যুক্তি-সিদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত ॥ ২।৩।২২—২৮॥

এতদুত্তরে সূত্রকার নিজেই আপনার অভিমত সিদ্ধান্ত পরি-জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন—আত্মা যদিও অণু বা পরিচ্ছিন্ন নহে, পরন্তু নিত্যচৈতন্যস্বরূপ ও বিভু (ব্যাপক), তথাপি—

তদ্‌গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ॥ ২। ৩। ২৯॥

অর্থাৎ জীবাত্মার অণুপরিমাণ সমর্থনের জন্য যে সকল প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপিত করা হইয়াছে, সেই সকল যুক্তিপ্রমাণে আত্মার অণুপরিমাণ সমর্থিত হয় না। সাক্ষাৎ পরমাত্মাই যে, বুদ্ধিরূপ উপাধিযোগে জীবভাবপ্রাপ্ত সংসারী হইয়াছেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পরমাত্মা যে, মহান্ বিভু, তদ্বিষয়ে কাহারো মতভেদ নাই, কোন শাস্ত্রেরই তদ্বিষয়ে বৈমত্য নাই; অতএব জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যেমন কেবল উপাধিকৃত প্রভেদ ছাড়া আর কোনই প্রভেদ নাই, তেমন তদুভয়ের পরিমাণ সম্বন্ধেও কোন প্রভেদ নাই বা থাকিতে পারে না। পরমাত্মা মহৎপরিমাণসম্পন্ন; সুতরাং তদভিন্ন জীবাত্মাও মহৎপরিমাণ-বিশিষ্ট ব্যাপক; অণু বা মধ্যম পরিমাণসম্পন্ন নহে।

জীবাত্মা পরমার্থতঃ পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন ও তৎসম-পরিমাণ—বিভু হইলেও, বুদ্ধিরূপ উপাধির (পার্থক্য-সাধকের) অধীন ; বুদ্ধিই পরমাত্মাতে জীবভাব আনয়ন করে, এবং বুদ্ধির সাহায্যেই জীবাত্মা স্বকৃত পাপপুণ্যের ফল সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ; সুতরাং বুদ্ধিগত যে, কাম ও সংকল্পপ্রভৃতি গুণ, সেই সমস্ত গুণই জীবাত্মার ভোগরাজ্যে সারভূত অবলম্বন। বুদ্ধিকে বাদ দিলে যেমন জীবের জীবত্ব থাকে না, তেমনি বুদ্ধির গুণ—কামনা প্রভৃতি ত্যাগ করিলেও জীবের বিষয়ভোগ সম্ভবে না ; এইজন্যই বুদ্ধিগত গুণসমূহকে জীবের সারভূত বা প্রধান অবলম্বন বলিতে হয়। বুদ্ধির গুণাবলী প্রধান অবলম্বন বলিয়াই শ্রুতি স্থানে-স্থানে বুদ্ধির অণু পরিমাণ অনুসারে জীবকেও অণু বা সূক্ষ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মহৎপরিমাণও ঘোষণা করিয়াছেন (১)।

অতএব আত্মার অণুপরিমাণ কল্পনা শ্রুতিসম্মতও নহে, যুক্তি-সিদ্ধও নহে। তাহার পর, আত্মার অণুত্ব সমর্থনকল্পে যে সমস্ত যুক্তি বা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সকল দৃষ্টান্ত আপাত-দৃষ্টিতে রমণীয় মনে হইলেও বিচারসহ বা প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুকূল নহে। বিচার করিলেই ঐ সকল দৃষ্টান্তের অসারতা

(১) "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" এখানে জীবকে যেমন শত শত ভাগে খণ্ডিত কেশাগ্রের সমপরিমাণ বলা হইয়াছে, তেমনই আবার 'স চ আনন্ত্যায় কল্পতে' বলিয়া তাহারই অসীমতাও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

প্রতিপন্ন হইতে পারে। প্রথমতঃ প্রদীপ ও প্রদীপপ্রভার কথাই ধরা যাউক। প্রদীপপ্রভা (আলোক) যে, প্রদীপকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান করে, এ কথাই ভুল। কারণ, প্রদীপ ও প্রদীপপ্রভা স্বতন্ত্র পদার্থই নহে। পরস্পর গাঢ় সংশ্লিষ্ট তৈজস অবয়বপুঞ্জ প্রদীপ নামে, আর বিশ্লিষ্ট তৈজসাবয়বের রশ্মিসমূহ প্রভা নামে ব্যবহৃত হয় মাত্র। উভয় স্থানের আলোকই তৈজস অবয়বপুঞ্জকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কখনও নিরাশ্রয় হইয়া স্বাধীনভাবে থাকে না বা থাকিতে পারে না। তাহার পর, গন্ধের অবস্থাও সেইরূপ। পুষ্পাদির যে সমুদয় সূক্ষ্ম রেণুকে আশ্রয় করিয়া গন্ধ থাকে, বায়ুবেগে সেই রেণুসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে সঞ্চালিত হইয়া গন্ধ বিকিরণ করিয়া থাকে; সূক্ষ্মতানিবন্ধন গন্ধের আশ্রয়ভূত রেণুগুলি প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল গন্ধমাত্র অনুভূত হয়; বস্তুতঃ সেখানেও নিরাশ্রয় গন্ধের অস্তিত্ব নাই। চন্দনস্পর্শাদির অবস্থাও এতদনুরূপ। অতএব এ সকল দৃষ্টান্ত কখনই আলোচ্য স্থলে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

উপরে প্রদর্শিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, গুণ কখনই গুণীকে (আশ্রয়কে) পরিত্যাগ করিয়া থাকে না এবং থাকিতেও পারে না। ইহা গুণমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। আত্মার সম্বন্ধেও সে নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না; সুতরাং দেহের একদেশস্থিত পরিচ্ছিন্ন আত্মার গুণ—চৈতন্য কখনই আত্মাকে ছাড়িয়া দেহে সর্ব্বাঙ্গীন অনুভূতি সম্পাদন করিতে পারে না; পারে না বলিয়াই জীবাত্মাকে অণু বা পরিচ্ছিন্নও

বলিতে পারা যায় না। গুণ যখন গুণীকে ছাড়িয়া থাকে না, এবং পরিচ্ছিন্ন আত্মার পক্ষে যখন সর্ব্বদেহব্যাপী ক্রিয়া নির্ব্বাহ করাও সম্ভবপর হয় না, তখন বাধ্য হইয়াই আত্মার ব্যাপকতা বা বিভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, আত্মার বিভুত্বই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহার পরিচ্ছিন্নতা কেবল বুদ্ধিরূপ উপাধিকৃত আগন্তুকমাত্র।

এখানে বলা আবশ্যক যে, আত্মা তদ্‌গুণসার হইলেও এবং বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞান বা চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইলেও ঐ চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। উহা আত্মা হইতে পৃথক্ আগন্তুক বা সাময়িক গুণমাত্র নহে, উহা যাবদাত্মভাবী, অর্থাৎ অগ্নি ও তাহার উষ্ণতা গুণ যেমন পরস্পর অবিযুক্তভাবে চিরকাল অবস্থিতি করে, অগ্নিও উষ্ণতা ছাড়িয়া, কিংবা উষ্ণতাও অগ্নিকে ছাড়িয়া যেমন কখনও থাকে না, উভয়ই পরস্পরের সহিত সংবদ্ধভাবে চিরকাল থাকে, ঠিক তেমনই আত্মা ও তাহার জ্ঞানশক্তি পরস্পর অবিযুক্তভাবেই চিরকাল থাকে, কখনও একটী অপরটীকে ছাড়িয়া থাকে না; সুতরাং আত্মা যতকাল থাকিবে, আপনার প্রধান গুণ জ্ঞানকে সঙ্গে লইয়াই থাকিবে, এবং জ্ঞানও আত্মার সহিত মিলিতভাবেই আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিবে। অগ্নি ও উষ্ণতার ন্যায় আত্মা ও জ্ঞানের সম্বন্ধ নিত্য; সুতরাং জ্ঞানের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ বা বিলোপের সম্ভাবনা কখনও নাই; কাজেই জ্ঞানের অভাবে যে, আত্মার অজ্ঞতা অর্থাৎ অনুভূতিবিলোপ, তাহা কখনই কল্পনা করা যাইতে পারে না।

তবে যে, সময় সময় বিষয়বিশেষে আত্মার জ্ঞান ও অজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আত্ম-গুণ জ্ঞানের অভাব নিবন্ধন নহে, পরন্তু আত্মা যাহার সাহায্যে বিষয়রাশি অনুভব করিয়া থাকে, সেই অন্তঃকরণের অবস্থাবিশেষের ফল। মনোনামক অন্তঃকরণ অতি সূক্ষ্ম; সে কখনও এক সময়ে দুইটী বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না; সে যখন যে বিষয়ে সংযুক্ত থাকে, তখন সেই বিষয়টীমাত্র অনুভবগোচর করে, অপরাপর বিষয়রাশি তখন অবিজ্ঞাত থাকে। আত্মার সহিত মনঃসংযোগের ফলেই জ্ঞান-শক্তির উদ্বোধ হইয়া থাকে। যখন সেই সংযোগের অভাব হয়, তখন আত্মার কোন বিষয়ই অনুভব করিবার সামর্থ্য থাকে না। সুষুপ্তি-সময়ে মনঃ আত্মার সহিত সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন থাকে, সেইজন্য সেই সময় এবং তাদৃশ অন্য সময়েও আত্মার জ্ঞান-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। এই জ্ঞানসাধন অন্তঃকরণের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে, আত্মার যে, কখনও বিষয় উপলব্ধি হয়, কখনও হয় না, এ ব্যবস্থা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই কারণে সকলকেই আত্মা ও ইন্দ্রিয়বর্গের অতিরিক্ত এই জ্ঞানসাধন অন্তঃকরণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; স্বয়ং শ্রুতিও এই অন্তঃকরণের বৃত্তি বা অবস্থাবিশেষকেই ব্যবহারিক জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া বলিয়াছেন—

"কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইত্যাদি।

এখানে 'ধী' শব্দে মনোবৃত্তিরূপ জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে (১)। এই মনোবৃত্তির উদ্ভব ও অভিভবানুসারেই বিষয়বিশেষে আত্মার বোধ ও অবোধ হইয়া থাকে। অতএব আত্ম-চৈতন্য নিত্যসিদ্ধ হইলেও সাময়িকভাবে আত্মার বোধ ও অবোধ উভয়ই উপপন্ন হইতে পারে। অতএব শ্রুতি ও যুক্তি অনুসারে আত্মার বিভুত্ব ও চৈতন্যরূপত্ব উভয়ই সিদ্ধ হইতেছে ॥ ২।৩।৩০—৩৩ ॥

[আত্মার কর্তৃত্ব]

নির্দ্দোষ যুক্তি, প্রমাণভূত শাস্ত্র ও শিষ্টব্যবহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যক্ষ-দৃশ্য দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত স্বতন্ত্র এক আত্মা আছে, এবং তৎসঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, সেই আত্মা দেহের সঙ্গে সঙ্গে জন্মেও না, মরেও না; চিরকাল নিত্য নির্ব্বিকার চৈতন্যস্বরূপে থাকে। তাহার সম্পর্কবশতই অচেতন দেহাদি

---

(১) এই একই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে (ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যানুসারে) বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—

" মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরং।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।"

একই অন্তঃকরণ সংশয়াত্মক বৃত্তি অনুসারে মনঃ, নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি অনুসারে বুদ্ধি, অহঙ্কার বা গর্ব্বাত্মক বৃত্তি অনুসারে অহঙ্কার, আর স্মরণকার্য্য অনুসারে চিত্ত নামে কল্পিত হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার বৃত্তিভেদে নামভেদ কল্পিত হইলেও, ব্যবহারক্ষেত্রে সর্ব্বদা এই বিভাগ অনুসৃত হয় না। অনেকস্থলেই সাধারণ অন্তঃকরণ অর্থেই মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার শব্দের যথেচ্ছ প্রয়োগ হইয়া থাকে, কেবল বিশেষ বিশেষ স্থলেই ঐরূপ অর্থানুসারে মনঃ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগভেদ ঘটিয়া থাকে।

বস্তু চেতনের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে, ইহাও বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে ও হইবে। এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে এই যে, উক্ত আত্মার কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব বা কার্য্যকারিণী শক্তি আছে কি না? আত্মার যদি আদৌ কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের কোনই সার্থকতা থাকে না; কারণ, সে সকল বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিবার উপযুক্ত কর্ত্তা পাওয়া যায় না, পক্ষান্তরে কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেও আত্মার বিকার বা স্বরূপ-প্রচ্যুতি সম্ভাবিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আত্মার-নির্ব্বিকারতা রক্ষা পায় না। এ বিষয়ে দার্শনিকগণ একমতাবলম্বী না হওয়ায় তত্ত্ব-নির্দ্ধারণের পথ আরও কণ্টকিত হইয়া পড়িয়াছে। দার্শনিকগণের মধ্যে গোতম ও কণাদ অতি দৃঢ়তার সহিত আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আবার কপিল ও পতঞ্জলি প্রভৃতি আচার্য্যগণ বুদ্ধির উপর কর্ত্তৃত্ব-ভার অর্পণ করিয়া আত্মাকে নির্লিপ্ত রাখিয়াছেন। প্রচলিত পুরাণাদি শাস্ত্রও এ বিষয়ে স্পষ্ট কথা না বলিয়া বরং উভয় পক্ষেই সাক্ষ্য দিয়া উক্ত সংশয়ের মাত্রা সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সংশয় নিরসনের নিমিত্ত সূত্রকার বেদান্তসিদ্ধান্ত সমালোচনাপূর্ব্বক আত্মার কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে আপনার অভিমত সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্বাৎ ॥ ২।৩।৩৪ ॥

উক্ত জীবাত্মা কর্ম্মের কর্ত্তা ও তৎফলের ভোক্তা। জীবের কর্ত্তৃত্ব থাকিলেই "যজেত" (যাগ করিবে), "জুহুয়াৎ" (হোম করিবে), "দদ্যাৎ" (দান করিবে) ইত্যাদি শাস্ত্রোপদেশ সার্থক

হইতে পারে, পক্ষান্তরে জীবের কর্তৃত্ব-শক্তি না থাকিলে, উপদেশানুযায়ী কর্ম্মকর্ত্তার অভাবে ঐ সকল আদেশবাক্যের কোনই সার্থকতা থাকিতে পারে না। আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার উপযুক্ত অধিকারী কেহ না থাকিলে, সে আদেশবাক্য উন্মত্তপ্রলাপের ন্যায় অসার অর্থহীন অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অথচ স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্য কখনই অপ্রমাণ হইতে পারে না। অতএব বিধিশাস্ত্রের সার্থকতাসংরক্ষণের জন্যই জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করা অপরিহার্য্য হইয়া থাকে।

অভিপ্রায় এই যে, পুরুষমাত্রই কামনার দাস; কামনার প্রেরণাবশে লোক বিভিন্নপ্রকার বিষয় পাইতে ও ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু, ইচ্ছামাত্রেই অভীষ্ট ফল কাহারো হস্তগত হয় না; তাহার জন্য উপযুক্ত উপায়ানুষ্ঠান করিতে হয়। উপযুক্ত উপায়ের যথাযথ অনুষ্ঠানেই অভীষ্ট ফল সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। কোন ফলের পক্ষে কিরূপ উপায় উপযুক্ত ও অনুষ্ঠেয়, মানুষ তাহা নিজ বুদ্ধিতে নিরূপণ করিতে পারে না; এই কারণে ভ্রমপ্রমাদরহিত বেদশাস্ত্র ও তদনুগত স্মৃত্যাদি শাস্ত্র বিধিমুখে সেই সকল ফলসাধন উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ফলাভিলাষী পুরুষ শাস্ত্রবিধিদৃষ্টে আপনার অভিমত ফলসিদ্ধির জন্য উপযুক্ত উপায়টী বাছিয়া লন, এবং স্বীয় প্রযত্নদ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করত আপনার অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হন।

এখানে এ কথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সাধারণ নিয়মে কর্ম্ম-কর্ত্তাই স্বকৃত কর্ম্মফলের অধিকারী হইয়া থাকে; একের

কর্ম্মফল অপরে ভোগ করে না; তাহা হইলে ব্যবহারজগতে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত, এবং লোক-ব্যবহারই একপ্রকার অচল হইয়া পড়িত। পূর্ব্বমীমাংসা-প্রণেতা জৈমিনি মুনিরও ইহাই মত। তিনি বলিয়াছেন—

"শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি, তল্লক্ষণত্বাৎ।"

শাস্ত্রোক্ত যে কর্ম্ম যিনি অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্ম্মের ফল তিনিই প্রাপ্ত হন, অপরে নহে; ইহাই কর্ম্মের স্বভাব; কর্ম্ম কখনই এ স্বভাব পরিত্যাগ করে না। আচার্য্যগণও "ফলং চ কর্ত্তৃগামি" বলিয়া উক্ত বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। এ কথার উপর আশঙ্কা হইতে পারে যে, যজমান আপনার অভিলষিত যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ঋত্বিক্ নিয়োগ করেন। সেই ঋত্বিক্গণই প্রত্যক্ষতঃ যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন; যজমান সাধারণতঃ ঋত্বিক্ নিয়োগ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন; তিনি কখনও কর্ম্মানুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করেন না; অথচ সেই পরানুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল কর্ম্মকর্ত্তা ঋত্বিক্গণ প্রাপ্ত না হইয়া, প্রাপ্ত হন—যজমান, ইহাও শাস্ত্রেরই আদেশ,—"যাং কাংচন আশিষমাসাশতে, যজমানস্যৈব আসাশতে" অর্থাৎ কর্ম্মে নিযুক্ত ঋত্বিক্গণ যে কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা যজমানের জন্যই করেন, নিজেদের জন্য করেন না, ইত্যাদি শাস্ত্রও ঋত্বিক্কৃত কর্ম্মের ফল যজমানের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। এখন কথা হইতেছে এই যে, কর্ম্মকর্ত্তাই যদি ন্যায়তঃ কর্ম্মফলের অধিকারী হন, তাহা হইলে ঋত্বিক্-সম্পাদিত কর্ম্মের ফল অকর্ত্তা

যজমান প্রাপ্ত হন কিরূপে? পক্ষান্তরে, যজমান কর্ম্মফলের অধিকারী না হইলে কর্ম্মানুষ্ঠানেই বা প্রবৃত্ত হইবেন কি কারণে? এবং পরস্পরবিরোধী শাস্ত্রবাক্যেরই বা সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে কি প্রকারে? এ সকল প্রশ্ন স্বতই মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে।

এতদুত্তরে মীমাংসক আচার্য্যগণ বলেন—শাস্ত্রার্থে বিরোধ সম্ভাবিত হইলে শাস্ত্রবাক্যদ্বারাই তাহার সমাধান করিতে হয়, কেবল যুক্তির অনুসরণ করিলে চলে না। শাস্ত্র যেমন ক্রিয়াফল কর্ত্তৃগামী হয় বলিয়াছেন, তেমনই আবার ঋত্বিকের দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মের ফলভোগে যজমানের দাবীও বাহাল রাখিয়াছেন। শাস্ত্রে যে, ক্রিয়াফল কর্ত্তৃ-ভোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, তাহা অখণ্ডনীয় নিয়মরূপে ধর্ত্তব্য, সে নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও নাই বা হইতে পারে না। ঋত্বিকের দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মস্থলেও এ নিয়ম ব্যাহত হইতেছে না। কারণ, ঋত্বিক্‌কৃত কর্ম্মস্থলেও ঋত্বিক্‌গণই প্রথমে কর্ম্মফলের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; পরে যজমান দক্ষিণারূপ মূল্যদ্বারা তাঁহাদের নিকট হইতে সেই কর্ম্মফল ক্রয় করিয়া লন; ক্রয়ের পরে সেই ফলের উপর তাহার অধিকার লাভ হয়। যজমান যতক্ষণ কর্ম্মের দক্ষিণা প্রদান না করেন, অথবা মোটেই দক্ষিণা না দেন, ততক্ষণ সেই কর্ম্মের ফল তাহার ভোগে আইসে না। এই কারণেই কর্ম্মান্তে দক্ষিণাদানের প্রশংসা, আর অদানে বিষম নিন্দাবাদ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন—

"দীক্ষিতানদীক্ষিতা দক্ষিণাভিঃ ক্রীতা যাজয়ন্তি।"

যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে যজমানকে কতকগুলি নিয়ম গ্রহণ করিতে হয়, সেই নিয়মগ্রহণকে দীক্ষা বলে। সেই সকল নিয়ম গ্রহণ করিলে পর যজমানকে 'দীক্ষিত' বলা হয়, কিন্তু ঋত্বিক্‌গণকে সে সকল নিয়ম গ্রহণ করিতে হয় না, এইজন্য তাঁহারা 'দীক্ষিত'-পদবাচ্য হন না—অদীক্ষিতই থাকেন। দীক্ষিত যজমান দক্ষিণা দ্বারা অগ্রে ঋত্বিক্‌গণকে ক্রয় করেন, পশ্চাৎ সেই দক্ষিণাক্রীত ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা আপনার অভিলষিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদন করেন। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, ব্যবহার-জগতে মূল্যক্রীত ভৃত্যাদি দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মে ও তৎফলে যেরূপ মূল্যদাতারই সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে, ঋত্বিকের দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞাদিস্থলেও সেইরূপ কর্ম্মে ও তৎফলে মূল্যদাতা যজমানেরই নির্ব্যূঢ় অধিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঋত্বিকের নহে। ইহা দ্বারা কর্ম্ম-ফলে কর্ত্তারই অধিকার-সদ্ভাব প্রমাণিত হইল, এবং যজমানও যে, কিরূপে পরানুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলে অধিকারী হয়, তাহাও প্রদর্শিত ও সমর্থিত হইল। অতএব সূত্রকার যে, "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত বা যুক্তিবিরুদ্ধ হয় নাই।

কেবল যে, বিধিশাস্ত্রের সার্থকতা রক্ষার অনুরোধেই জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব বা কার্য্যকারিতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা নহে, এ বিষয়ে সাক্ষাৎ শ্রুতির উপদেশও এইরূপই আছে। স্বপ্নসময়ে আত্মার অবস্থা পর্য্যালোচনাপ্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন—"স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামম্" অমরণশীল আত্মা যেখানে (স্বপ্নসময়ে) ইচ্ছানুসারে গমন করে। এখানে আত্মাকে স্বেচ্ছানুরূপ গতির কর্ত্তা বলা

হইয়াছে। অন্যত্র আবার এই স্বপ্নাবস্থাপ্রসঙ্গেই বলা আছে যে,—
"স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে।" নিজের ইচ্ছামত স্বীয় শরীর-
মধ্যেই বিচরণ করে। এখানেও বিচরণক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব আত্মাতেই
অর্পিত হইয়াছে। তাহার পর অন্যস্থলে আবার—"তদেষাং
প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়।" অর্থাৎ 'অপরাপর ইন্দ্রিয়-
জাত বিজ্ঞানের সহিত বুদ্ধিবিজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়া', এস্থলে
গ্রহণক্রিয়ার কর্ত্তৃরূপে আত্মার নির্দ্দেশ রহিয়াছে, অতএব ঐ
সকল শ্রৌত প্রমাণ দ্বারাও আত্মার কর্ত্তৃত্বই প্রমাণিত হইতেছে।
(২।৩।৩৪—৩৫ সূত্র।। আত্মার কর্ত্তৃত্ব যে, কেবল এই সকল
প্রমাণের দ্বারাই সমর্থিত হইতেছে, তাহা নহে,—

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং, নচেৎ নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ ॥ ২।৩।৩৬ ॥

"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" অর্থাৎ
বিজ্ঞানসংজ্ঞক জীবাত্মা যজ্ঞ (বেদোক্ত কর্ম্ম) ও ব্যবহারিক
কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, ইত্যাদি শ্রুতিতে লৌকিক ও বৈদিক
কর্ম্মে জীবাত্মার কর্ত্তৃত্বনির্দ্দেশ হইতেও জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব প্রমাণিত
হইতেছে। এখানে 'বিজ্ঞান' শব্দে যদি জীবাত্মা ভিন্ন বুদ্ধি বা
অপর কিছু অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রুতিতে অন্য-
প্রকার নির্দ্দেশ থাকিত—'বিজ্ঞানং' না হইয়া 'বিজ্ঞানেন' নির্দ্দেশ
হইত; কেন না, বুদ্ধির করণত্বই প্রসিদ্ধ, কর্ত্তৃত্ব নহে; সুতরাং
'বিজ্ঞান' শব্দের উত্তর করণবিভক্তি (তৃতীয়া বিভক্তি) হওয়াই
উচিত ছিল। তাহা না হইয়া যখন 'বিজ্ঞান' শব্দে কর্ত্তৃত্ববোধক
প্রথমা বিভক্তি রহিয়াছে, তখন উহার অর্থ জীবাত্মা ব্যতীত বুদ্ধি

বা অপর কিছু হইতেই পারে না। অতএব এখানে আত্মারই কর্ত্তৃত্ব বলা হইয়াছে, বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব বলা হয় নাই। যাহারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া কেবল ভোক্তৃত্বমাত্র স্বীকার করেন, এবং বুদ্ধিরও ভোক্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া কেবল কর্ত্তৃত্ব-মাত্র স্বীকার করেন, তাহাদের সিদ্ধান্ত বিশেষ যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, অগ্রে ফল-প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়, পরে তাহার উপায়ান্বেষণ হয়, তাহার পর হয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। ইহাই ক্রিয়ানুষ্ঠানের সাধারণ পৌর্ব্বা-পর্য্যক্রম। যাহার ভোগ নাই, ফলভোগে তাহার ইচ্ছাও নাই; সুতরাং তাহার উপায়ান্বেষণেও প্রয়োজন নাই; কাজেই তাহার পক্ষে কোনপ্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠানই সম্ভবপর হয় না, বা হইতে পারে না। বুদ্ধি অচেতন জড় পদার্থ; তাহার ভোগচিন্তা থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহার পক্ষে ফলেচ্ছা, উপায়চিন্তা বা ক্রিয়ানুষ্ঠান কোনটাই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, বুদ্ধিই যদি ক্রিয়ানির্ব্বাহক্ষম কর্ত্রী হইত, (আত্মার কর্ত্তৃত্ব না থাকিত), তাহা হইলে, ব্যবহারসিদ্ধ কর্ত্তৃত্বভাগী লোকেরা যেরূপ কোন একটা সাধনের (করণের) দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকে, যেমন কুম্ভকার দণ্ডদ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, অন্তঃকরণরূপা বুদ্ধিকেও সেইরূপ অপর একটা করণের সাহায্যেই সমস্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে হইত। যদি বুদ্ধির কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য অপর একটা করণ বস্তুরই অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে ত কেবল কল্পনাগৌরব ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। অধিকন্তু

আত্মা যেমন বুদ্ধির সাহায্যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, বুদ্ধিও যদি ঠিক তেমনই অপর একটা বস্তুর (করণের) সাহায্যে সমস্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে ত প্রকারান্তরে বুদ্ধিই আত্মার স্থান অধিকার করিয়া থাকায়, তদতিরিক্ত আর স্বতন্ত্র আত্মা স্বীকার করিবার আবশ্যকই হয় না; বরং লাঘবতঃ বুদ্ধিকেই আত্মার স্থানে বসাইয়া তাহাকেই কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বশক্তি প্রদান করা অধিকতর সঙ্গত হয়, অনর্থক একটা অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না (১)। এই সমস্ত কারণেই বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে পারা যায় না। আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব দুইই গৌণ বা ঔপচারিক; সুতরাং আত্মাতে ঐ দুইটী ধর্ম্ম স্বীকার করিলেও তাহার বিশুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হয় না। অতএব ঐ ধর্ম্মদ্বয় আত্মারই ধর্ম্ম বলিয়া প্রমাণিত হয়॥ ২।৩।৩৬ সূ০॥

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, আত্মাই যদি কর্ম্মকর্ত্তা ও ফলভোক্তা হয়, তাহা হইলে, আত্মা স্বাধীন হইয়াও আপনার অপ্রিয় দুঃখময় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে কেন? কোন স্বাধীন ব্যক্তিই আপনার অহিতকর কর্ম্ম করে না; এমন কি, উন্মত্তও এরূপ কর্ম্ম করে কি না সন্দেহ; এমত অবস্থায় আত্মার পক্ষে অহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কখনই সম্ভবপর হয় না। কেন না, আত্মা যখন কর্ত্তা; কর্ত্তা অর্থই পরের অনধীন স্বতন্ত্র।

---

(১) পরবর্ত্তী ৩৮ সংখ্যক "শক্তিবিপর্য্যয়াৎ" প্রভৃতি সূত্রে একথা আরও বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে।

সেই স্বতন্ত্র আত্মা কর্ম্ম করিবার সময় আপনার হিতকর প্রিয় কর্ম্মই করিবে, অহিতকর কর্ম্ম করিবে কেন ? অথচ প্রত্যেক আত্মাকেই যথেচ্ছভাবে হিত অহিত বা প্রিয় অপ্রিয় কর্ম্ম করিতে দেখা যায়। স্বাধীন আত্মার পক্ষে এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। এই কারণেও আত্মার কর্ত্তৃত্বকল্পনা যুক্তি-সঙ্গত হয় না। এ প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং সূত্রকার বলিতেছেন—

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ২।৩।৩৭ ॥

অভিপ্রায় এই যে, আত্মার কর্ত্তৃত্বসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও ভোক্তৃত্বসম্বন্ধে কাহারো মতান্তর দৃষ্ট হয় না। যাহারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকারে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, তাহারাও আত্মার ভোক্তৃত্ব-পক্ষে সাদরে সম্মতি দান করেন। আত্মার ভোক্তৃত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব-সম্বন্ধে "দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা বিজ্ঞাতা" ইত্যাদি শ্রুতিও উদারভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভোগ আর উপলব্ধি একই কথা। বিষয়বিশেষের উপলব্ধিকেই ভোগনামে অভিহিত করা হয়। এই ভোগ বা বিষয়োপলব্ধি প্রিয় ও অপ্রিয়ভেদে দুইপ্রকার দৃষ্ট হয়। চেতন আত্মা যে, উক্ত দুইপ্রকার (প্রিয় ও অপ্রিয়) ভোগই যথাসম্ভব সম্পাদন করিয়া থাকে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এখন দেখিতে হইবে যে, আত্মা যেমন চেতন হইয়াও, এবং স্বাধীনভাবে কর্ত্তা হইয়াও যথাসম্ভব প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় পর্য্যায়ক্রমে উপলব্ধি (অনুভব) করিয়া থাকে, ঠিক তেমনি-ভাবেই আবার পর্য্যায়ক্রমে যথাসম্ভব হিতাহিত উভয়বিধ কার্য্যই করিয়া থাকে; এবং স্বাধীনতাসত্ত্বেও আত্মা যেমন অপ্রিয় বিষয়

পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলই প্রিয় বিষয় সকল উপলব্ধি (ভোগ) করে না, বা করিতে পারে না, ঠিক তেমনই স্বাধীনতাসত্ত্বেও সে, অনিষ্টকর কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলই হিতকর কার্য্য করে না, বা করিতে পারে না, ইহাতে আর আপত্তির কারণ কি আছে ?

আত্মা স্বাধীন হইয়াও কেন যে, ইচ্ছামত কেবলই প্রিয় কার্য্য করে না, এবং কেনই বা কেবল প্রিয় বিষয়মাত্র উপলব্ধি করে না, তাহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, আত্মা স্বাধীন হইলেও, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নহে। তাহাকেও কার্য্যকালে দেশ, কাল ও নিমিত্ত-ভেদের অপেক্ষা করিতে হয়। আত্মা সেই বিভিন্নপ্রকার দেশ-কালাদি নিমিত্তানুসারে বিভিন্নপ্রকার (হিত ও অহিত) কার্য্য করিতে এবং বিভিন্নপ্রকার বিষয় উপলব্ধি করিতে বাধ্য হয়; সেই জন্যই তাহার সম্বন্ধে প্রিয়াপ্রিয় কার্য্য ও হিতাহিত বিষয়-ভোগ অনিয়মে সংঘটিত হইয়া থাকে।

আত্মা স্বীয় কার্য্যসম্পাদনে ঐ সকল নিমিত্তের সহায়তা-গ্রহণ করিয়া থাকে; সেই কারণে যে, তাহার কর্ত্তৃত্বের (স্বাতন্ত্র্যের) হানি হয়, তাহা নহে। কার্য্য করিতে হইলেই কর্ত্তাকে অপর কতকগুলি সহকারীর সহায়তাগ্রহণ করিতেই হয়। কোনও সহকারীর সহায়তা না লইয়া একাকী কেহই কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। সমর্থ হয় না বলিয়াই— সহকারী কারণের সাহায্য গ্রহণে যে, কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব-হানি ঘটে না, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ একবাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে কোনরূপ সহকারী লইয়া কার্য্য করিলেই যদি কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য (কর্ত্তৃত্ব) বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর, তাঁহারও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পায় না, কারণ, তাঁহাকেও এই বিশাল বিশ্বরাজ্য সৃষ্টি করিতে, জীবের প্রাক্তন কর্ম্মরাশির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। তিনি জীবগণের কর্ম্মভেদ অনুসারেই সৃষ্টিগত বৈচিত্র্য-বিধান করিয়া থাকেন (১); তাহাতে যদি পরমেশ্বরেরও স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, 'স্বাতন্ত্র্য' একটা কথার কথা মাত্র; জগতে কোথাও স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কোন পদার্থই নাই। অতএব দেশকালাদি নিমিত্ত-সাপেক্ষ হইয়া কার্য্য করাতেও আত্মার স্বাতন্ত্র্যহানি হইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই।

বস্তুতঃ এই সাপেক্ষতাবাদও খুব সমীচীন মনে হইতেছে না। না হইবার কারণ এই যে, আত্মা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ; তাহার প্রকাশ বা উপলব্ধি স্বতঃসিদ্ধ; তাহাতে অপর কোনও নিমিত্তের অপেক্ষা থাকিতেই পারে না; সুতরাং তাহার কর্ত্তৃত্বসম্বন্ধে অপর নিমিত্তের অপেক্ষা থাকিলেও প্রকাশরূপ উপলব্ধিতে নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা থাকিতেই পারে না। তবে,

(১) বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে পরমেশ্বরের বিষমদর্শিতা বা পক্ষপাতিতা ও নির্দ্দয়তা দোষের আশঙ্কায়, তন্নিরাকরণার্থ সূত্রকার বলিয়াছেন —"বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ" অর্থাৎ ঈশ্বর জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্ম-সাপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহার উপর বৈষম্য (পক্ষপাতিত্ব) ও নৈর্ঘৃণ্য (নিষ্ঠুরতা) দোষ আরোপিত হইতে পারে না।

উপলব্ধিশব্দে যদি বুদ্ধিবৃত্তিকে লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে নিমিত্তাপেক্ষার কথা দোষাবহ না হইতেও পারে; কেন না, বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতই অনিত্য; সুতরাং তাহার উৎপত্তির জন্য নিমিত্তকল্পনা আবশ্যকই হয়। সে যাহা হউক, বিষয়োপলব্ধি নিমিত্ত-সাপেক্ষ হউক, বা নাই হউক, তাহাতে আত্মার কর্তৃত্ব-সিদ্ধির কোনই ব্যাঘাত হইতেছে না। আত্মার কর্তৃত্ব অসিদ্ধ হইলে শাস্ত্রে যে, ধ্যান ধারণা ও সমাধিপ্রভৃতি মুক্তিসাধনের উপদেশ রহিয়াছে, সে সমুদয় উপদেশ একেবারেই ব্যর্থ—অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অতএব আত্মার কর্তৃত্ব অস্বীকার করিতে পারা যায় না ॥ ২।৩।৩৯ ॥

[আত্মার কর্তৃত্ব—ঔপাধিক]

প্রদর্শিত প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা জীবাত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইল সত্য, কিন্তু সেই কর্তৃত্ব ধর্ম্ম কি আত্মার স্বাভাবিক—অগ্নিধর্ম্ম উষ্ণতার ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ ? অথবা জলগত উষ্ণতার ন্যায় অন্যাপেক্ষিত আগন্তুক বা ঔপাধিক মাত্র ? যদি নিত্যসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এমন কোন সময় বা অবস্থাই কল্পনা করা যায় না, যাহাতে আত্মার কর্তৃত্ব ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিরত হইতে পারে। কর্তৃত্ব বিরত না হইলে জীবাত্মার সংসারনিবৃত্তি বা মুক্তিলাভ একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কর্তৃত্বই জীবকে সংসারে ও সাংসারিক দুঃখভোগে নিয়োজিত করিয়া থাকে; সেই কর্তৃত্বই যদি জীবের নিত্যসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে মোক্ষদশায়ও সে কর্তৃত্বের বিরাম হইবে না; কর্তৃত্বের অবিরামে সংসার ও

সাংসারিক দুঃখভোগও নিবৃত্ত হইবে না; সুতরাং জন্মমরণ-সম্পর্কশূন্য নির্দুঃখ মোক্ষলাভ কোন কালে বা কোন অবস্থায় কোন জীবের পক্ষেই সম্ভবপর হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, আত্মার কর্তৃত্ব যদি উপাধিজনিত আগন্তুক ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে না সত্য, কিন্তু জানিতে ইচ্ছা হয় যে, সেই উপাধিটা কি ও কি প্রকার, এবং কি কারণে কোথা হইতে আইসে? যাহার সংস্পর্শে থাকিয়া জীবকে এতদূর অনর্থরাশি ভোগ করিতে হয়, তাহার স্বরূপাদি সম্বন্ধে পরিচয় জানা নিতান্তই আবশ্যক হয়। এতদুত্তরে নৈয়ায়িকগণ ও মীমাংসক সম্প্রদায় বলেন—আত্মার কর্তৃত্ব উপাধি-সম্পর্কজনিত আগন্তুক নহে, উহা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। আত্মার স্বভাব-সিদ্ধ কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ-প্রতিপালনের জন্য জীবকে বাধ্য করা হইয়াছে। আত্মার যদি কর্তৃত্বই না থাকিত, তাহা হইলে ঐ সকল বিধিনিষেধশাস্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়িত। বিশেষতঃ কর্তৃত্বের স্বাভাবিকতা সম্ভবপর হইলে, উহার ঔপাধিকত্ব কল্পনা যুক্তিসম্মতও হয় না। এমন কিছু অনুপপত্তি বা বাধক প্রমাণ দৃষ্ট হয় না, যাহার দ্বারা আত্মার কর্তৃত্বকে আগন্তুক বা ঔপাধিক বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে; অতএব আত্মার কর্তৃত্ব আগন্তুক নহে—স্বাভাবিক। ইহা ন্যায় ও মীমাংসাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হইলেও বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অন্য-প্রকার। বেদান্তাচার্য্য সূত্রকার আপনার অভিমত সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন—

যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ ২।৩।৪০ ॥

তক্ষা অর্থ—সূত্রধর (যাহারা কাঠের জিনিষ প্রস্তুত করে)। সেই তক্ষা যেমন কর্ত্তা অকর্ত্তা উভয়রূপেই অবস্থান করে, আত্মাও তেমনই কর্ত্তা অকর্ত্তা উভয়ভাবেই অবস্থান করে। সূত্রধর যতক্ষণ আপনার যন্ত্রাদি লইয়া তক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, ততক্ষণ কর্ত্তারূপে পরিচিত হয়, সেই তক্ষাই আবার যখন আপনার যন্ত্রপাতী পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য হইতে বিরত হয়, তখন আর সে কর্ত্তারূপে পরিচিত হয় না। কারণ, তাহার কর্তৃত্ব ধর্ম্ম স্বাভাবিক নহে,—ঔপাধিক অর্থাৎ নিজের কার্য্যঘটিত। সেই ক্রিয়ারূপ উপাধি যতক্ষণ, ততক্ষণ সে কর্ত্তা, আবার সেই উপাধির অভাব হইলেই সে হয় অকর্ত্তা। আত্মার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। আত্মা যতক্ষণ উপাধি সহযোগে ক্রিয়া করে, ততক্ষণ কর্ত্তারূপে পরিচিত হয়, আবার সেই উপাধিসম্বন্ধরহিত হইয়া যখন ক্রিয়া হইতে বিরত হয়, তখন অকর্ত্তারূপে স্বভাব প্রাপ্ত হয়। মুক্তিদশায় আত্মার উপাধিসম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং তখন ঔপাধিক কর্তৃত্ব ও তন্মূলক দুঃখাদিসম্পর্কও থাকে না। তখন জীবের সর্ব্বদুঃখের উপশমরূপ মুক্তি সুসম্পন্ন হয়।

এই যে, জীবের কর্তৃত্ব ধর্ম্মের অভিব্যক্তি ও নিবৃত্তি, ইহাদ্বারা কর্তৃত্বের ঔপাধিকত্বই (অস্বাভাবিকত্বই) প্রমাণিত হয়। আত্মার কর্তৃত্ব ধর্ম্ম স্বভাবসিদ্ধ হইলে, উষ্ণতা যেমন অগ্নির চিরসহচর, কখনও তদুভয়ের বিচ্ছেদ ঘটে না, বরং স্বাভাবিক উষ্ণতাধর্ম্মের বিলোপে অগ্নিরই অভাব ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ কর্তৃত্বের বিলোপে আত্মারই উচ্ছেদ বা অস্তিত্ব-বিলোপ অবশ্যম্ভাবী

হইত, এবং জীবের মুক্তি উচ্ছেদেরই একটা নামান্তরমাত্র বলিয়া গণ্য হইত। আত্মার স্বরূপোচ্ছেদের নাম মুক্তি হইলে প্রকৃতিস্থ কোন লোকই মুক্তির জন্য এত কঠোর সাধনায় ব্রতী হইত না। এই সকল কারণেই স্বীকার করিতে হয় যে, আত্মার কর্তৃত্ব ধর্ম্ম স্বাভাবিক নহে—ঔপাধিক—বুদ্ধিরূপ উপাধি-সম্বন্ধের ফল। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কর্তৃত্ব বুদ্ধিরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধ বশতই পরমাত্মা জীব-ভাব প্রাপ্ত হন; বুদ্ধিকে লইয়াই জীবের জীবত্ব; বুদ্ধিকে বাদ দিলে জীবভাবই ঘুচিয়া যায় (১)। অতএব, অধিক পরিমাণে অগ্নিসন্তপ্ত লৌহ যেরূপ অগ্নির সহিত অবিবিক্তভাবে অবস্থান করে, অগ্নি ও লৌহের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য করা সহজ হয় না, তাহার ফলে সেই লৌহাগ্নিতে শরীর দগ্ধ হইলেও লোকে অবিবেক-বশতঃ 'লৌহে আমার শরীর দগ্ধ করিয়াছে' বলিয়া উল্লেখ করে, সেইরূপ গাঢ়ভাবে সংসৃষ্ট বুদ্ধি ও চৈতন্যের মধ্যে বিবেক বা পার্থক্য করিতে না পারিয়া অজ্ঞ লোকেরা বুদ্ধিকৃত কর্ম্মকেই চৈতন্যরূপী

---

(১) জীবাত্মার ব্যবহারিক স্বরূপ কথনপ্রসঙ্গে বিদ্যারণ্যস্বামী বলিয়াছেন—

"চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ
চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসঙ্ঘো জীব উচ্যতে॥" (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ যে চৈতন্যের উপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, লিঙ্গশরীর এবং লিঙ্গশরীরগত চিৎপ্রতিবিম্ব, এই সকলের সমষ্টিকে জীব বলা হয়। কথিত বুদ্ধিও লিঙ্গশরীরেরই একটা প্রধান অংশ, এই কারণেই জীবভাবের উপর বুদ্ধির এত প্রভাব দৃষ্ট হয়।

আত্মার কর্ম্ম বলিয়া মনে করে, এবং তদনুরূপ ব্যবহারও করিয়া থাকে; কিন্তু সেই ভ্রান্তকল্পনা ও অসত্য ব্যবহার দ্বারা নিষ্ক্রিয়স্বভাব আত্মার কর্তৃত্ব কখনই স্বাভাবিকে পরিণত হয় না, ও হইতে পারে না। এইজন্যই আত্মার কর্তৃত্ব অস্বাভাবিক বলিতে হয়॥ ২।৩।৪০ ॥

[আত্মার কর্ত্তৃত্বে অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের প্রভাব]

বুদ্ধিকৃত ক্রিয়া দ্বারা কর্তৃত্ব আরোপিত হয় বলিয়া আত্মার কর্ত্তৃত্ব যেমন স্বাভাবিক নহে, তেমনি স্বাধীনও নহে; সম্পূর্ণ পরাধীন। জীব পরেচ্ছাপরবশ হইয়াই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, কোন কার্য্যেই তাহার স্বাধীন কর্তৃত্বশক্তি নাই, সমস্তই পরায়ত্ত। জীব কোথা হইতে সেই কর্তৃত্বশক্তি প্রাপ্ত হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ২।৩।৪১ ॥

এই সূত্রের সহজ অর্থ এই যে, আত্মার কর্তৃত্ব আছে সত্য, কিন্তু তাহা 'পরাৎ'—অপর বস্তু হইতে আগত। সেই অপর বস্তুটী বুদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; সুতরাং বুদ্ধিই 'পরাৎ'পদের প্রতিপাদ্য। সেই বুদ্ধি হইতেই আত্মার কর্ত্তৃত্ব নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ সূত্রার্থ সহজ বুদ্ধিগম্য হইলেও, আচার্য্য শঙ্কর ইহার অন্যপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

আত্মার যে কর্ত্তৃত্ব, তাহা 'পরাৎ'—পরমাত্মা হইতে প্রাপ্ত। পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে জগতের অন্যান্য সমস্ত কার্য্য যেমন

নিষ্পন্ন হয়, জীবের কর্ত্তৃত্বও ঠিক তেমনভাবেই তাঁহার ইচ্ছায় প্রকটিত হয়। পরমেশ্বর জীবগণের প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে ভালমন্দ বিষয়ে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন; তদনুসারে তাহারা কার্য্য করিয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিয়াছেন—

"এষ উ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিনীষতে।"

অর্থাৎ তিনি যাহাকে উন্নত বা উর্দ্ধলোকগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে উত্তম কর্ম্মে নিয়োজিত করেন, আবার তিনি যাহাকে অবনত বা অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অসাধু কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, পরমেশ্বর কাহারো শত্রুও নন, মিত্রও নন; তিনি রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত—সকলের প্রতি সমান। তিনি কখনও রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া অনুচিত অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করেন না। পরন্তু পূর্ব্বকল্পে বা পূর্ব্বজন্মে, যে জীব যে প্রকার কর্ম্মাশয় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন মাত্র। সে ফল শুভই হউক, বা অশুভই হউক, সে দিকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন না, এবং করিতেও পারেন না; কারণ, তাহা হইলে পরমেশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহার কৃত সৃষ্টিবৈচিত্র্য যদি জীবগণেরই অনুষ্ঠিত প্রাক্তন কর্ম্মের ফলস্বরূপ হয়, তাহা হইলে, তাঁহার সমদর্শিতা ও উদারতা ব্যাহত হয় না এবং বিষমদর্শিতা ও নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দোষরাশিও তাঁহাকে

স্পর্শ করিতে পারে না। স্বয়ং সূত্রকারই—"বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ ॥" (২।১।৩৪) সূত্রে এ কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এখানে আর সে কথার অধিক আলোচনা আবশ্যক মনে হয় না।

এপর্য্যন্ত যে সমস্ত কথা বলা হইল, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, আত্মার কর্ত্তৃত্ব আছে সত্য, কিন্তু তাহা তাহার নিজস্ব বা স্বাভাবিক নহে,—ঔপাধিক। বুদ্ধির যে স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যকারিতা বা কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহাই অবিদ্যা বা অবিবেকবশতঃ আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে মাত্র। আত্মার তাদৃশ কর্ত্তৃত্বও স্বেচ্ছাতন্ত্র নহে, পরন্তু পরমাত্মার অমোঘ ইচ্ছায় সম্পাদিত। পরমাত্মার ইচ্ছার অন্তরালেও আবার জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মরাশি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহে এই কর্ম্ম (অদৃষ্ট) ও সৃষ্টিকার্য্য অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে, ইহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা মানববুদ্ধির সাধ্য নহে। এবিষয়ে মানবকে কেবল 'অনাদি' বুঝিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে ॥ ২।৩।৪১ ॥

[অবচ্ছিন্নবাদ—জীব ও পরমাত্মার অংশাংশিভাব]

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, পরমাত্মাই অবিদ্যাবশে বুদ্ধিরূপ উপাধি-সংযোগে জীবভাব প্রাপ্ত হন, এবং জীবগণ পরমাত্মারই ইচ্ছাবশে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পরমাত্মার সহিত যে, জীবের সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধটা কিপ্রকার? উহা কি প্রভু-ভৃত্যের ন্যায়? অর্থাৎ প্রভু যেমন ভৃত্যকে ইচ্ছানুসারে নিয়োগ করেন, ঠিক তেমনই? অথবা অগ্নি-

স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ?—অগ্নি হইতে নির্গত স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নির মধ্যে যেরূপ স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই, জীব ও পরমাত্মার অবস্থাও কি ঠিক তদ্রূপ ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানপ্রসঙ্গে অনেকগুলি মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটী বাদ প্রধান—এক অবচ্ছিন্নবাদ, অপর প্রতিবিম্ববাদ।

অবচ্ছিন্নবাদীর মতে এক অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়, এবং অসংখ্য দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ দেহ ও অন্তঃকরণ-ভেদে জীবভেদও অনন্ত। অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন বলিয়া তদবচ্ছিন্ন অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যেরও খণ্ড বা বিভাগ সম্পাদিত হয়; এই কারণেই অন্তঃকরণকে ব্রহ্মচৈতন্যের অবচ্ছেদক ও ভেদক 'উপাধি' বলা হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অন্তঃকরণরূপ উপাধি দ্বারা পরমাত্মাই জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এক অখণ্ড আকাশ যেরূপ ঘটপটাদি উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাকাশ পটাকাশাদিরূপে অসংখ্য বিভাগ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এক অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যও অন্তঃকরণরূপ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া অনন্ত বিভাগ প্রাপ্ত হন। সর্ব্বগত আকাশের যেরূপ ঘটপটাদি দ্বারা অবচ্ছেদ লাভ (সীমাবদ্ধভাব প্রাপ্তি) অপরিহার্য্য, সর্ব্বগত ব্রহ্ম-চৈতন্যের পক্ষেও সেইরূপ অন্তঃকরণযোগে (সীমাবদ্ধভাব লাভ) অবশ্যম্ভাবী। উক্ত অন্তঃকরণ দ্বারা অবচ্ছিন্ন (অবচ্ছেদ প্রাপ্ত বা সীমাবদ্ধ) চৈতন্যই জীবনামে অভিহিত হয়। অব-চ্ছেদক অন্তঃকরণের ভেদানুসারে জীবচৈতন্যও অসংখ্য।

সূত্রকার বেদব্যাস—

অংশো নানাব্যপদেশাৎ, অন্যথা চাপি
দাশ-কিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥ ।২।৩।৪৩ ॥

এই সূত্রে পূর্ব্বকথিত অবচ্ছিন্নবাদই সমর্থন করিয়াছেন। আলোচ্য জীবাত্মা ব্রহ্মচৈতন্যেরই অংশ। স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, তেমনি জীবাত্মাও পরমাত্মারই অংশমাত্র,—পৃথক্ পদার্থ নহে। এইপ্রকার অংশাংশিভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উক্ত সূত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন—"সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (পরমাত্মার অন্বেষণ করিবে, তাহাকে জানিবে) "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি" (তাহাকে—পরমাত্মাকে জানিয়াই জীব মৃত্যু অতিক্রম করে) ইত্যাদি শ্রুতিও জীবাত্মা ও পরমাত্মার নানাত্ব (ভেদ) নির্দ্দেশ করিতেছে। উক্ত উভয় বাক্যে জীবাত্মাকে বলা হইতেছে অন্বেষণ ও বেদনের কর্ত্তা, আর পরমাত্মাকে বলা হইতেছে ঐ উভয় ক্রিয়ার কর্ম্ম—অন্বেষ্টব্য ও বেদ্য। অভেদে কর্ত্তৃ-কর্ম্মভাব হইতে পারে না; কাজেই শ্রুতির ঐ প্রকার নির্দ্দেশের ফলে জীব ও পরমাত্মার প্রভেদ (নানাত্ব) প্রমাণিত হইতেছে, বলা যাইতে পারে।

এই ভেদবাদ শ্রুতির অভিমত বলিয়াই—"যথাগ্নের্ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি, এবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টান্তদ্বারা জীব-পরমাত্মার নানাত্বপক্ষ স্পষ্ট-ভাষায় সমর্থিত হইয়াছে। সমস্ত উপাসনাকাণ্ডটাই এইপ্রকার

ভেদবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীব ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ না থাকিলে কে কাহার উপাসনা করিবে? কেই-বা কাহার ধ্যান ধারণাদি করিবে? কারণ, উপাস্য-উপাসকভাব চিরকালই ভেদসাপেক্ষ; ভেদ থাকিলেই উপাস্য-উপাসকভাব থাকে, ভেদের অভাবে থাকে না। ইহাই উপাস্য-উপাসকভাবের চিরন্তন ব্যবস্থা।

এখানে একথাও বলা আবশ্যক যে, শ্রুতিতে জীব ও পরমাত্মার ভেদনির্দ্দেশ আছে বলিয়াই যে, জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে সত্য সত্যই ভিন্ন বস্তু, তাহা নহে। শ্রুতি একত্র যেমন জীব ও পরমাত্মার উপাস্য-উপাসকভাব নির্দ্দেশ দ্বারা উভয়ের নানাত্ব (ভেদ) জ্ঞাপন করিয়াছেন, তেমনই অন্যত্র আবার প্রকারান্তরে তদুভয়ের অভেদও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অথর্ববেদের ব্রহ্মসূক্তে কথিত আছে—

"ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্মেমে কিতবা উত"

অর্থাৎ দাশগণ (কৈবর্ত্তগণ), দাসগণ (দাসত্বকারী ভৃত্যগণ) এবং কিতবগণ (দ্যূতকারী ধূর্ত্তগণ), ইহারা সকলেই ব্রহ্ম। এ সকল নিন্দিতকর্ম্মা হীনজাতীয় লোকদিগকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, স্থূলদৃষ্টিতে উহারা নিন্দিত হইলেও বস্তুতঃ তত্ত্বদৃষ্টিতে কেহই নিন্দনীয় নহে; কারণ, সকলের আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম, এক—খণ্ড ও তারতম্যবিহীন; সুতরাং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে কেহই নিন্দনীয় হইতে পারে না। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মূলতঃ অভেদ বা একত্ব না থাকিলে শ্রুতির

এরূপ অভেদোক্তি কখনই শোভন ও সঙ্গত হইতে পারে না। তাহার পর ব্রহ্মনিরূপণপ্রসঙ্গে শ্রুতিই বলিয়াছেন—

"ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী,
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।"

হে ব্রহ্ম, তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী, তুমিই বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডের সাহায্যে গমনাগমন করিয়া থাক, এবং বিশ্বরূপ তুমিই শিশুরূপে জন্মধারণ কর, ইত্যাদি। স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব ও বাল্য বার্দ্ধক্য প্রভৃতি ভাবগুলি শরীরধারী জীবধর্ম্ম। ব্রহ্ম হইতে জীব অত্যন্ত পৃথক্ বস্তু হইলে, জীবধর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মস্তুতি করা কখনই সম্ভবপর হইত না। তাহার পর "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্রষ্টা বা শ্রোতা কেহ নাই, এখানে ত জীবের ব্রহ্মাতিরিক্তভাব স্পষ্টাক্ষরেই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ—

"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ংপ্রভঃ।"
"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ॥" ইত্যাদি।

প্রথমোক্ত শ্রুতিবচনে ভূত-পদবাচ্য জীবগণকে ব্রহ্মের একটী পাদ বা একাংশমাত্র বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিখিল জীবকে তাঁহারই অংশ বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। অতএব জীব যে, ব্রহ্মেরই অংশ, অর্থাৎ ব্রহ্মই

---

(১) প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা নিরংশ নিরবয়ব হইলেও শিষ্যগণের বোধসৌকর্য্যার্থ, তাঁহাতে অংশাংশিভাব কল্পনা করিয়া শ্রুতি ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এই অংশাংশিভাবের অসত্যতা জ্ঞাপনের নিমিত্ত বিদ্যারণ্য স্বামী বলিয়াছেন—

"নিরংশেঽপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেঽংশে বেতি পৃচ্ছতঃ।
তদ্ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতৃহিতৈষিণী॥" (পঞ্চদশী)

বুদ্ধিরূপ উপাধিতে প্রবিষ্ট হইয়া (অবচ্ছিন্ন হইয়া) জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, একথা অপ্রামাণিক বা উপেক্ষাযোগ্য নহে। উল্লিখিত বাক্য-প্রামাণ্যে স্থির হইতেছে যে, জীব-ব্রহ্মের ভেদাভেদ দুইই আছে। তন্মধ্যে ভেদ হইতেছে অবিদ্যাকল্পিত—ঔপাধিক—বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা সম্পাদিত, আর অভেদ হইতেছে পারমার্থিক বা স্বভাবসিদ্ধ; সুতরাং তাহাই পরমার্থসত্য (১)।

[প্রতিবিম্ববাদ]

এ পর্য্যন্ত আত্মার সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইল, সমস্তই অবচ্ছিন্নবাদের কথা। এই অবচ্ছিন্নবাদসম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। অন্যান্য দার্শনিকগণের ন্যায় অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক-গণের মধ্যেও এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা আত্মার অবচ্ছিন্নবাদ মোটেই স্বীকার করেন না। তাঁহারা অবচ্ছিন্নবাদের পরিবর্ত্তে প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করেন, এবং স্বপক্ষ সমর্থনকল্পে নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণাপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় প্রমাণ-প্রয়োগ প্রদর্শন করেন, এবং ইহাই যে, শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্ত, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বিশেষ প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

---

(১) আচার্য্য শঙ্করের মতে জীব-ব্রহ্মের ভেদ অবিদ্যা-কল্পিত; সুতরাং ব্যবহারদশায় সত্য হইলেও, পারমার্থিক সত্য নহে; অবিদ্যাবিনাশেই ভেদের অবসান হইয়া যায়। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ বলেন—অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীব ও ব্রহ্ম হইতে বহির্গত হইয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মেরই অংশ। জীব-ব্রহ্মের যে, এই অংশাংশিভাব ও বিভাগ, তাহা কখনও নষ্ট হইবে না—মুক্তিতেও এই ভেদ বিলুপ্ত হইবে না, এই ভেদ সত্য—পারমার্থিক সত্য।

প্রতিবিম্ববাদী পণ্ডিতগণ বলেন যে, "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" এই সূত্রে জীবাত্মাকে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন পরমাত্মার অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় অবচ্ছিন্নবাদ যেমন সূত্রকারের অভিমত বলিয়া মনে হইতে পারে, তেমনি আবার তাঁহারই অন্য কথায় প্রতিবিম্ববাদও তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সূত্রকার নিজেই উপসংহারচ্ছলে জীবকে পরমাত্মার প্রতিবিম্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

আভাস এবচ ॥ ২।৩।৫০ ॥

এই সূত্রে সূত্রকার জীবকে জলগত সূর্য্য-প্রতিবিম্বের ন্যায় অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত পরমাত্মার আভাস (প্রতিবিম্বমাত্র) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার উপর আবার অবধারণসূচক 'এব' ('আভাস এব') শব্দদ্বারা প্রতিবিম্বপক্ষকেই যেন আপনার অভিপ্রেত পক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—মনে হয়। বেদান্তদর্শনের শাঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যাকর্ত্তা বা টীকাকার গোবিন্দানন্দও স্বকৃত 'রত্নপ্রভা' টীকায় এই 'এব' শব্দের উপর জোর দিয়া প্রতিবিম্ববাদকেই সূত্রকারের অভিমত পক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)।

---

(১) "অংশ ইত্যাদিসূত্রে জীবস্যাংশত্বং ঘটাকাশবদেব উপাধ্যবচ্ছেদ-বুদ্ধ্যোক্তম্। সম্প্রতি 'এব' কারেণাবচ্ছেদ-পক্ষারুচিঃ সূচয়ন্ "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" ইত্যাদি-শ্রুতিসিদ্ধং প্রতিবিম্বপক্ষমুপসংহরতি ভগবান্ সূত্রকারঃ" ইতি।

ইহার ভাবার্থ এই যে, সূত্রকার প্রথমতঃ "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রে ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় জীবকে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন বলিয়াছেন, কিন্তু সেই অবচ্ছেদবাদ যেন তাঁহার মনঃপূত হয় নাই; সেই

শ্রুতিবাক্য পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল সূত্রকার কেন, বহুতর শ্রুতিবচনও প্রতিবিম্ববাদের উপরই যেন সমধিক পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্ অপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপঃ দেবঃ ক্ষেত্রেষেবমজোঽয়মাত্মা॥"

অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় একই সূর্য্য যেমন বিভিন্ন জলাধারে প্রতিফলিত হইয়া অনেকাকারে প্রকাশ পান, ঠিক তেমনই জন্মমরণরহিত স্বপ্রকাশ একই পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে (দেহস্থ বুদ্ধিতে) প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাকারে প্রতিভাসমান হন। উভয় স্থলেই বিম্ব-বস্তুটী ঠিক একরূপই থাকে, উপাধিদ্বারা প্রতিবিম্বে কেবল নানাবিধ ভেদ প্রকটিত হয় মাত্র। উপনিষদ্ বলিতেছেন—

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥" (কঠ ৫।৯)

অর্থাৎ একই অগ্নি যেরূপ জগতে বিভিন্ন বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সেই সকল বস্তুর আকারে আকারিত হয়, সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা সেই এক পরমাত্মাও সেইরূপ বিভিন্ন বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সেই সেই বস্তুর আকারে প্রকটিত হন। আচার্য্য হস্তামলক একথা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—

জন্যই পুনরায় "আভাস এব চ" সূত্র করিয়াছেন। এই সূত্রে 'এব' শব্দ প্রয়োগ করিয়া অবচ্ছেদপক্ষে আপনার অরুচি জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং 'রূপং রূপম্' ইত্যাদি-শ্রুতিসম্মত প্রতিবিম্ববাদের উপর অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন।

"মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ,
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥" (হস্তামলক—৩)

অর্থাৎ দর্পণে দৃশ্যমান মুখের প্রতিবিম্ব যেরূপ মুখ হইতে ভিন্ন—স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, সেইরূপ বুদ্ধিতে পতিত চিৎপ্রতিবিম্বও প্রকৃতপক্ষে চিৎস্বরূপ পরমাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, পরন্তু পরমাত্মারই স্বরূপ। এই সকল প্রমাণদ্বারা, এবং এতদতিরিক্ত আরও বহু প্রমাণ আছে, যাহা দ্বারা প্রতিবিম্ববাদীর পক্ষ সমর্থন করা যাইতে পারে। তদনুসারে প্রতিবিম্ববাদিগণ মনে করেন যে, বুদ্ধি-দর্পণে পতিত পরমাত্মার প্রতিবিম্বই জীব-পদবাচ্য, কিন্তু অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য নহে (১)।

[অনেক-জীববাদ]

যাঁহারা জীবাত্মাকে চিৎপ্রতিবিম্ব চিদাভাস বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও আবার দুইটী সম্প্রদায় আছে। এক সম্প্রদায় অন্তঃকরণকেই চিৎপ্রতিবিম্বের আধার বলিয়া

(১) প্রকৃতপক্ষে অবচ্ছেদবাদে ও প্রতিবিম্ববাদে প্রভেদ অতি অল্প। জীবাত্মা অবচ্ছিন্নই হউক, আর প্রতিবিম্বই হউক, উভয়মতেই জীবাত্মাকে অন্তঃকরণের সহিত চিৎসম্বন্ধের ফল বলিতে হইবে। উভয় পক্ষেই যখন অন্তঃকরণের সহিত চিদাত্মার সম্বন্ধ অপরিহার্য্য, তখন অবান্তর বিষয়ে বিবাদ সম্ভাবিত হইলেও প্রধান বিষয়ে কোন বিবাদ নাই বলিতেই হইবে। অতএব এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

নির্দ্দেশ করেন, অন্য সম্প্রদায় আবার সে কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া কারণ-শরীরনামক অজ্ঞানকেই প্রতিবিম্বাধাররূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। উক্ত উভয় মতে জীবের স্বরূপগত কোন প্রভেদ না থাকিলেও প্রকারগত প্রভেদ যথেষ্টই আছে। কারণ, অন্তঃ-করণই যদি চিৎপ্রতিবিম্বের একমাত্র আধার হয়, তাহা হইলে দেহভেদে যখন অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন, তখন তত্তৎ অন্তঃকরণে পতিত প্রতিবিম্বও নিশ্চয়ই বিভিন্ন—অনেক হইবে। প্রতিবিম্ব অনেক হইলেই জীবসংখ্যাও আর পরিগণিত থাকিতে পারে না, জীবের সংখ্যা অনন্ত হইয়া পড়ে। জীবের সংখ্যা অনন্ত হইলেও জাগতিক ব্যবহার ও বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থার কোনই ব্যাঘাত ঘটে না, বরং লৌকিক ব্যবহার এ পক্ষকেই বিশেষ-ভাবে সমর্থন করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে জীব যদি অজ্ঞানে প্রতিফলিত চিদাভাসমাত্র হয়, তাহা হইলে, অজ্ঞান যখন মূলতঃ এক—অভিন্ন, তখন তৎপ্রতিফলিত চিৎপ্রতিবিম্বও একাধিক—অনেক হইতে পারে না, প্রতিবিম্বাধারের একত্ব নিবন্ধনই জীবের একত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়। এমতে ভোক্তা জীব এক হইলেও, ভোগসাধন অন্তঃকরণ দেহভেদে অনেক ; সুতরাং ভোগসাধন অন্তঃকরণের পার্থক্যানুসারে প্রত্যেক দেহে পৃথক্ পৃথক্ ভোগানুভূতি সম্ভবপর হইতে পারে।

এইপ্রকার কল্পনার প্রভেদানুসারে প্রতিবিম্ববাদিগণের মধ্যে বিরুদ্ধবাদী দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। একদল অনেক জীব-বাদী, অপর দল এক-জীববাদী। অনেক জীববাদীর পক্ষে

স্বর্গ-নরকাদিভোগ যেমন প্রত্যেকনিষ্ঠ পৃথক্ পৃথক্, বন্ধ-মোক্ষও ঠিক তেমনই পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। যে জীব অজ্ঞানে আবদ্ধ হয়, সেই জীবই বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়, আর যে জীব সাধনলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা স্বগত অজ্ঞানরাশি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেই জীবই মুক্তিলাভে অধিকারী হয়; সুতরাং ভোগরাজ্যে ও মোক্ষরাজ্যে কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলা বা অব্যবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; অতএব ব্যবহার-জগতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সুখ, দুঃখ ও বন্ধ-মোক্ষাদির ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে বলিয়া অনেক-জীববাদিগণ অন্তঃকরণকেই চিৎপ্রতিবিম্বের আধাররূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু অপর পক্ষ এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইয়া অন্যপ্রকার পদ্ধতি কল্পনা করিয়া থাকেন।

[এক-জীববাদ]

এক-জীববাদিগণ বলেন, পরিবর্ত্তনশীল অন্তঃকরণ কখনই চিরস্থায়ী জীবভাব রক্ষা করিতে পারে না। কারণ, প্রলয়-কালে প্রত্যেক অন্তঃকরণই স্ব স্ব প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়; জীবগণ কিন্তু তখনও স্বরূপে বিদ্যমান থাকে। এখন দেখিতে হইবে এই যে, যে অন্তঃকরণে পতিত হইয়া চিৎপ্রতিবিম্ব জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, এখন (প্রলয়কালে) সেই অন্তঃকরণের অভাবেও প্রতিবিম্বরূপী জীবের বিদ্যমান থাকা সম্ভবপর হয় কিরূপে? বিশেষতঃ প্রলয়ের অবসানে পুনরায় যখন কল্পারম্ভ হয়, তখন অন্তঃকরণ ও তদগত কর্ম্মাদি-সংস্কার সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যায়, সে সময় পরমেশ্বর কোন নিয়মের অনুসারে

সৃষ্টিবিভাগ সম্পন্ন করিবেন ? বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিবিভাগ যেমন শাস্ত্র-সম্মত, তেমনি প্রত্যক্ষসিদ্ধও বটে। প্রাক্তন কর্ম্মই এই বৈচিত্র্য-বিধানের মূল কারণ, কিন্তু বিনাশশীল অন্তঃকরণকে প্রতিবিম্বাধার কল্পনা করিলে প্রলয়ে প্রাক্তন কর্ম্ম নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। এই-জাতীয় আরও অনেক দোষ এপক্ষে সম্ভাবিত হয়, এবং সে সকল দোষের পরিহার সম্ভবপর হয় না; অতএব অনেক-জীববাদের অনুরোধে অন্তঃকরণকে চিৎপ্রতিবিম্বের আধার কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। পক্ষান্তরে, অজ্ঞানকে চিৎপ্রতিবিম্বের আধার স্বীকার করিলে এ সকল দোষের কোন সম্ভাবনাই থাকে না; অতএব কারণ-শরীরনামক অজ্ঞানই চিৎ-প্রতিবিম্বের প্রকৃত অধিকরণ—অন্তঃকরণ নহে।

উক্ত অজ্ঞান পদার্থ টা অন্তঃকরণের ন্যায় কালবশে বিনষ্ট হয় না; একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই উহার বিনাশ বা বাধ সম্ভাবিত হয়; সুতরাং বর্ত্তমানের ন্যায় প্রলয়কালেও অজ্ঞান অক্ষতদেহেই বিদ্যমান থাকে; কাজেই তদধীন জীবভাবও তখন অব্যাহতই থাকিতে পারে। অতএব জীবের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি বৈচিত্র্য সংঘটন করা পরমেশ্বরের পক্ষেও অসম্ভব হইতে পারে না। তাহার পর, অজ্ঞানে প্রতিফলিত চিৎপ্রতিবিম্বরূপী জীব স্বরূপতঃ এক হইলেও তাহার ভোগাদি-সাধন অন্তঃকরণ এক নহে (অনেক); সেই অন্তঃকরণের পার্থক্যানুসারে প্রত্যেক শরীরগত ভোগাদিবৈচিত্র্যও সহজেই উপপন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য আর অনেক জীব কল্পনা করা আবশ্যক হয় না। কায়ব্যূহ-

রচনাস্থলে আমরা এইরূপ ভোগবৈচিত্র্যই দেখিতে পাই (১)। এ পক্ষে মুক্তিসম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, সমস্ত জগতে একই অজ্ঞানে প্রতিবিম্বমান জীব যখন এক, তখন একের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি সিদ্ধ হয়। অভিপ্রায় এই যে, অধিষ্ঠানভূত এক অজ্ঞানই যখন সমস্ত জীবের বন্ধন, তখন যে কোন এক দেহ-মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলেই জ্ঞানবিরোধী সেই অজ্ঞান—(যাহাতে চিৎপ্রতিবিম্ব পতিত হইয়া জীবভাব আনয়ন করিয়াছে, তাহা) আপনা হইতেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়; কাজেই তখন প্রতিবিম্বও (জীবও) নিরাধারভাবে থাকিতে না পারিয়া মূলভূত বিম্বচৈতন্যে মিশিয়া যায়। এইরূপে যে প্রতিবিম্বের বিম্বভাব-প্রাপ্তি, তাহারই নাম মুক্তি বা অপবর্গ। অজ্ঞানের একত্ব-নিবন্ধন এক দেহাবচ্ছেদে মুক্তি সিদ্ধ হইলেই সর্ব্ব দেহাবচ্ছেদে

---

(১) যোগশাস্ত্রে কথিত আছে যে, যোগী পুরুষ উন্নত স্তরে উঠিবার পর, যদি মনে করেন যে, শীঘ্র শীঘ্র মুক্তিলাভ করিতে হইবে, আর সংসারে থাকিবার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে, তিনি অল্প সময়ের মধ্যে আপনার প্রারব্ধভোগ শেষ করিবার জন্য এবং সাধনপথেও সত্বর অগ্রসর হইবার জন্য সংকল্পদ্বারা বহু শরীর রচনা করেন। সেই সকল শরীরে পৃথক্ পৃথক্ জীব থাকে না, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ অন্তঃকরণ থাকে সেই সকল অন্তঃকরণদ্বারা পরস্পরবিরোধী বহুবিধ কার্য্য করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে প্রমাণ এই—

"আত্মনো বৈ শরীরাণি বহূনি ভরতর্ষভ। যোগী কুর্য্যাদ্বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্বৈর্মহীং চরেৎ॥ ভুঞ্জতে বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ। সংহরেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব॥"

মুক্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত অপর সকলের আর পৃথক্ চেষ্টা আবশ্যক হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এ পক্ষে আজপর্য্যন্ত কেহই মুক্তিলাভ করে নাই। যখন একজন মুক্তিলাভ করিবে, তখন সকলেই মুক্ত হইয়া যাইবে (১), এবং সৃষ্টির কার্য্যও তখন পরিসমাপ্ত হইবে। তখন পরমেশ্বর চিরকালের তরে অবসর গ্রহণ করিবেন—সমস্ত বিশেষভাব বিসর্জ্জন দিয়া আপনার স্বরূপে অবস্থান করিবেন (২), আর ফিরিবেন না।

[ব্রহ্মে জীবধর্ম্মের অসংক্রমণ]

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, অবচ্ছেদবাদ সত্য, কি প্রতিবিম্ববাদ সত্য, অথবা এক-জীববাদ ভাল, কিংবা অনেক-জীববাদ ভাল, এ সকল বিষয় আর অধিক আলোচনার আবশ্যক নাই। এখন

---

(১) এক-জীববাদীর অভিপ্রায় এই যে, জীব আত্ম-সাক্ষাৎকার করিলেই তাহার উপাধি বা প্রতিবিম্বাধার অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। অজ্ঞানের অভাবে জীবভাবেরও অভাব হয়; কাজেই একমুক্তিতে সর্ব্বমুক্তি সিদ্ধ হয়। পুরাণাদি শাস্ত্রে যে, শুক ও নারদ প্রভৃতির মুক্তি-সংবাদ আছে, তাহা গৌণ মুক্তি, যথার্থ মুক্তি নহে।

২) জীবগণের ভোগসম্পাদনার্থই পরমেশ্বরকে ভোগযোগ্য জগৎ সৃষ্টি করিতে হয়। সমস্ত জীবই যদি বিমুক্ত হইয়া যায়,—ভোগ করিবার যদি কেহই না থাকে, তবে পুনরায় আর নূতন জগৎসৃষ্টির কোন প্রয়োজন থাকে না; কাজেই তাঁহার কোনপ্রকার কর্ত্তব্যও থাকে না; কর্ত্তব্য থাকে না বলিয়াই তাঁহারও আর পৃথক্ থাকিবার আবশ্যক হয় না, তখন তিনি মূলকারণীভূত ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান। ইহার পরে আর সৃষ্টি হয় না।

প্রধান আলোচ্য বিষয় হইতেছে এই যে, জীব যদি পরমাত্মারই অংশ হয়, তাহা হইলে জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল পরমাত্মাতে সংক্রামিত হয় না কেন ? কোন এক জলাশয়ের একাংশ দূষিত হইলে যেমন সমস্ত জলাশয়টাই দূষিত হইয়া পড়ে, ঠিক তেমনই —পরমাত্মার অংশভূত জীবগণ স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারা কলুষিত হইলে তৎসম্পর্কবশতঃ পূর্ণ পরমাত্মাও ঐ সকল দোষে দূষিত হন না কেন? দূষিত হইলে, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র যে, তারস্বরে তাঁহার নিত্য-নির্দ্দোষ পরম পবিত্র-ভাব ঘোষণা করিতেছেন, তাহারই বা সমাধান কি ? এইপ্রকার আরও অনেক আপত্তি উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন—

প্রকাশাদিবৎ, নৈবং পরঃ, ॥২।৩।৪৬॥

অর্থ এই যে, সূর্য্যালোক সূর্য্যেরই অংশ ; সেই আলোক যখন গবাক্ষরন্ধ্র প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রবেশ করে, তখন তাহা ঋজুবক্রাদিভাব ধারণপূর্ব্বক লোকচক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া থাকে। সূর্য্যেরই অংশভূত আলোকে ঋজুবক্রাদি ভাব দৃষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা যেমন তাহারই অংশী বা মূলীভূত সূর্য্যদেব কখনও সংস্পৃষ্ট হন না, অর্থাৎ সেখানে যেমন অংশের দোষ-গুণে অংশী দূষিত বা প্রশংসিত হয় না, তেমনি ব্রহ্মাংশভূত জীবে দোষ-গুণ উপস্থিত হইলেও তাহা দ্বারা পরব্রহ্ম কখনই দোষ-গুণভাগী হন না, ও হইতে পারেন না। এ সমস্ত আপত্তি

উত্থাপনপূর্ব্বক ইতঃপূর্ব্বেও নিম্নলিখিত তিনটী সূত্রে তাহার সমাধানপ্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে,—

১। ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ ; স্যাৎ লোকবৎ ॥২।১।১৩॥

২। ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ ॥ ২।১।২০ ॥

৩। অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥২।১।২১॥

ইহার মধ্যে প্রথম সূত্রে বলা হইয়াছে—জীব ও ব্রহ্ম যদি স্বরূপতঃ অবিভক্ত একই বস্তু হয়, [জীব ও ব্রহ্মের একত্বই বেদান্তের সিদ্ধান্ত] তাহা হইলে, জীবের সুখ-দুঃখাদিভোগের দ্বারা তদভিন্ন ব্রহ্মেরও সুখ-দুঃখাদিভোগ অপরিহার্য্য হইতে পারে ? ব্রহ্মে ভোগ সম্ভাবিত হইলে, জীবের ন্যায় ব্রহ্মেরও মায়াবশ্যতা ও সংসারিত্ব ধর্ম্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, তাহার ফলে শাস্ত্রে যে, জীব ও ব্রহ্মের প্রভেদ বর্ণিত আছে, তাহাও অপ্রমাণ অলীক কথায় পর্য্যবসিত হয়।

এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন যে, না—জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব বিভাগ না থাকিলেও, জীবের ভোগে ব্রহ্মের ভোগ-সম্ভাবিত হয় না ; কারণ, অবিভক্ত পদার্থের মধ্যেও একদেশগত ধর্ম্মদ্বারা যে, মূলীভূত অংশী বস্তু সংস্পৃষ্ট হয় না, তদ্বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সমুদ্র ও তদীয় তরঙ্গাবলী ইহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। জলময় সমুদ্রের তরঙ্গসমূহও জলময়, কোন তরঙ্গই সমুদ্র হইতে বিভক্ত বা পৃথক্ পদার্থ নহে। কিন্তু সেই তরঙ্গসমূহের মধ্যে ছোট-বড়, হ্রস্ব-দীর্ঘ প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও, এবং সমুদ্রের সহিত তরঙ্গাবলীর অবিভাগ

অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও, তরঙ্গগত ধর্ম্মসমূহের কোনটাই যেমন সমুদ্রে সংক্রামিত হয় না, তেমনি বস্তুগত্যা জীব-ব্রহ্মের অবিভাগ বিদ্যমান থাকিলেও জীবগত সুখ-দুঃখাদিভোগ পরব্রহ্মে সঞ্চারিত হয় না ; অতএব জীবের ভোগে যে, ব্রহ্মের ভোগাশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা অমূলক ও যুক্তিবিরুদ্ধ। অতঃপর উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রের মর্ম্মার্থ উদ্‌ঘাটন করা যাইতেছে—

প্রথমতঃ দ্বিতীয় সূত্রে আশঙ্কা করা হইয়াছে যে, [শঙ্করের মতে] জীব ও পরব্রহ্ম যখন একই পদার্থ, অর্থাৎ স্বয়ং পরমেশ্বরই যখন ভোগনির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে জীবরূপে সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, জীবের ভোগ বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, প্রকৃতপক্ষে তাহা পরমেশ্বরেরই ভোগ। এমত অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর জানিয়া শুনিয়া নিজের অহিতকর দুঃখময় সংসারে প্রবেশ করিলেন কেন? এবং কেনই বা তিনি নিকৃষ্টতর জীবভাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন? এই আপত্তির সমাধানার্থ সূত্রকার তৃতীয় সূত্রটীর অবতারণা করিয়াছেন, এবং তাহাদ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, "অধিকন্তু", অর্থাৎ জীব বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে বিভক্ত বা স্বতন্ত্র পদার্থ না হইলেও জীব অপেক্ষা ব্রহ্মে কিঞ্চিৎ আধিক্য বা বৈশিষ্ট্য আছে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" "সোঽন্বেষ্টব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কর্তৃ-কর্ম্মভাব নির্দ্দেশ থাকায় ব্রহ্মগত সেই পার্থক্যটা (আধিক্য) বুঝিতে পারা যায়। জীব ও ব্রহ্ম যদি সম্পূর্ণভাবে এক অবিভক্তই হইত, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই জীবকে অন্বেষণের কর্ত্তা বলিয়া, ব্রহ্মকে কর্ম্ম বলা সঙ্গত

হইত না। একই পদার্থে একই ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব থাকিতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, জীবে যেরূপ অবিদ্যাকৃত নামরূপাত্মক দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধ আছে, ব্রহ্মে তাহা নাই; নাই বলিয়াই এতদুভয়ের আত্যন্তিক অভেদ বা অবিভাগও নাই; সেই কারণেই অবিদ্যাপরবশ জীবের হিতাহিত বোধ আছে, এবং তদনুরূপ চেষ্টাও আছে; কিন্তু পরমাত্মার হিতাহিতবুদ্ধিও নাই; সুতরাং তন্নিমিত্ত তাঁহার কোন চেষ্টাও নাই; কাজেই পরমেশ্বরের উপর হিতাকরণাদি দোষ আরোপিত হইতে পারে না।

প্রকৃত কথা এই যে, হিতাহিত-চিন্তা বা সুখ-দুঃখাদিবোধ, এ সমস্তই বুদ্ধির ধর্ম্ম। বুদ্ধিগত সেই সমুদয় ধর্ম্ম অবিদ্যাবশে অজ্ঞানান্ধ জীবে আরোপিত হইয়া থাকে। আরোপিত কোন ধর্ম্মই আরোপাধার বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্ফটিকে আরোপিত লৌহিত্য গুণদ্বারা স্ফটিক কখনও লোহিত বর্ণ প্রাপ্ত হয় না; সেইরূপ জীবে আরোপিত ঐ সমুদয় বুদ্ধিধর্ম্ম দ্বারাও চিদানন্দময় জীব কখনই সংস্পৃষ্ট হয় না (১)। বিশেষতঃ প্রতিবিম্বগত দোষগুণ কখনও বিম্ব-বস্তুতে সঞ্চারিত হয় না; ইহা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। জলে পতিত সূর্য্য-প্রতিবিম্ব কম্পিত হইলেও বিম্বভূত সূর্য্য কখনও কম্পিত হয় না। কথিত জীবাত্মা

---

(১) এ বিষয়ে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"যত্র যদধ্যাসঃ, তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অণুমাত্রেণাপি ন স সম্বধ্যতে।" (শাঙ্কর ভাষ্য)

অর্থাৎ যে বস্তুর উপর অপর যে বস্তুর আরোপ হয়, সেই আরোপাধার বস্তুটী আরোপিত বস্তুর দোষে বা গুণে অতি অল্পমাত্রও সম্বদ্ধ হয় না।

বস্তুতঃ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং তাহার দোষ-গুণ বিম্বভূত পরমাত্মায় সংক্রামিত হইতে পারে না, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব জীবের কোন ধর্ম্মই যখন বিম্বভূত পরমাত্মায় যাইতে পারে না, তখন পরমাত্মার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত হিতাকরণাদি দোষের আপত্তি করা কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না॥ ২।৩।৪৬॥

[প্রাণ-চিন্তা।]

[জীব ও প্রাণের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ]

জীবের স্বরূপপরিচয়, পরিমাণ, সংখ্যা, সম্বন্ধ ও সুখ-দুঃখাদি-ভোগ বিষয়ে প্রায় সমস্ত কথাই বলা হইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা কিছু বলিবার আছে, সে সমস্ত কথা পরে মুক্তিপ্রসঙ্গে বলা হইবে। এখন জীবাত্মার পরম সহায় প্রাণের কথা বলা যাইতেছে।

জীবের সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ট। জীব ও প্রাণ এক সঙ্গেই দেহমধ্যে অবস্থান করে, আবার এক সঙ্গেই দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, উভয়ের মধ্যে কেহই যেন অপরের বিচ্ছেদ-বেদনা সহ্য করিতে পারে না। "সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ, সহোৎক্রামতঃ" (এই প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা জীব এই শরীরমধ্যে এক সঙ্গে বাস করে, এবং এক সঙ্গে উৎক্রমণ করে, অর্থাৎ শরীর ছাড়িয়া চলিয়া যায়), এই শ্রুতিবচনও প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মার (জীবের) সহচরভাব বর্ণনা করিয়াছেন। 'জীব'শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও ঐ ভাবেরই সমর্থন করিয়া থাকে। 'জীব'ধাতু হইতে 'জীব'শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। জীবধাতুর অর্থ প্রাণধারণ।

বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যই প্রাণকে ধরিয়া রাখে বলিয়া 'জীব' নামে অভিহিত হন। বিদ্যারণ্যস্বামীও "প্রাণানাং ধারণাৎ জীবঃ" এই বাক্যে প্রাণধারণকেই জীব-সংজ্ঞার নিদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল কারণে জীবের সহিত প্রাণের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ প্রমাণিত হইতেছে। মনে হয়, মুখ্য প্রাণের সঙ্গে জীবাত্মার যেরূপ ঘনিষ্টতা, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিতও জীবাত্মার প্রায় সেইরূপই ঘনিষ্টতা; কারণ, ইন্দ্রিয়গণই ভৃত্যের ন্যায় জীবাত্মার সর্ব্বপ্রকার ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে। এইপ্রকার ঘনিষ্ট সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সূত্রকার জীবচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবিষয়ক চিন্তারও অবতারণা করিয়াছেন।

[উৎপত্তি সম্বন্ধে সংশয়]

জীবাত্মার ন্যায় মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গের সম্বন্ধেও অনেক বিষয় আলোচনা করিবার আছে; কিন্তু যতক্ষণ উহাদের উৎপত্তি ও অনুৎপত্তি, এতদুভয়ের মধ্যে একতর পক্ষ অবধারিত না হয়, ততক্ষণ অপর কোন বিষয়ই আলোচিত বা মীমাংসিত হইতে পারে না। এই কারণে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা সর্ব্বাদৌ কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্রুতিবাক্য ধরিয়া আলোচনা করিতে বসিলে আপাততঃ উহাদের উৎপত্তি-কল্পনা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কেন না, "তৎ তেজোঽসৃজত" (সেই পরমেশ্বর তেজঃ [ভূতবর্গ] সৃষ্টি করিলেন)। এখানে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-সৃষ্টির কোন কথাই নাই। তাহার পর, "তস্মাদ্বা

এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নে-রাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" (সেই এই পরমাত্মা হইতে প্রথমে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল।) ইত্যাদি। এখানেও আকাশাদি সৃষ্টির কথামাত্র আছে, প্রাণসৃষ্টির উল্লেখই নাই। অন্যত্র আবার প্রাণোৎপত্তির বিপক্ষেই উক্তি দৃষ্ট হয়। যথা—"অসদ্বা ইদমগ্র-আসীৎ। তদাহুঃ—কিং তদসদাসীদিতি? ঋষয়ো বাব তেঽগ্রেঽসদাসীৎ। তদাহুঃ—কে তে ঋষয় ইতি? প্রাণা বা ঋষয় ইতি।" (অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ ছিল। সেই অসৎ কি? অগ্রে ঋষিগণই সেই অসৎ ছিল। সেই ঋষি কাহারা? প্রাণ সমূহই সেই সকল ঋষি)। এখানে সৃষ্টির পূর্ব্বেও ইন্দ্রিয়গণের অস্তিত্ব বর্ণিত রহিয়াছে। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ উৎপত্তিশীল হইলে সৃষ্টির অগ্রে তাহাদের সদ্ভাবের কথা থাকা কোন প্রকারেই উপপন্ন হয় না। এইজাতীয় আরও বহুতর শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে, যাহাতে প্রাণের ও ইন্দ্রিয়-সমূহের অনুৎপত্তি বা নিত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে। সেই সকল বাক্যের প্রামাণ্যের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আত্মার ন্যায় উহারাও বোধ হয় নিত্য পদার্থ, উহাদের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই, উহারা স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ। এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণার্থ সূত্রকার প্রথমে ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

তথা প্রাণাঃ ॥ ২।৪।১ ॥

অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূতের ন্যায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণও সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে আকাশাদির ন্যায় উহাদেরও উৎপত্তিকথা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে।—"এতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি চ ব্যুচ্চরন্তি" অর্থাৎ এই পরমাত্মা হইতে—সমস্ত প্রাণ (১), সমস্ত লোক (স্বর্গাদি), সমস্ত দেবতা ও সমস্ত ভূত প্রাদুর্ভূত হয়। এখানে একই পরমাত্মা হইতে লোক ও দেবাদির সঙ্গে প্রাণেরও উৎপত্তিকথা বর্ণিত আছে। তাহার পর "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ" অর্থাৎ এই পরমাত্মা হইতে প্রাণ, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয়। "স প্রাণমসৃজত, প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং" তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন, এবং প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার সৃষ্টি করিলেন, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যখন প্রাণোৎপত্তির কথা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে, তখন বাধ্য হইয়াই পরমাত্মা হইতে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে।

যদিও পূর্ব্বপ্রদর্শিত সৃষ্টিপ্রকরণস্থ কোন কোন বাক্যে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তির উল্লেখ দৃষ্ট না হউক, এবং যদিও কোন কোন শ্রুতিবাক্যে প্রাণের নিত্য-সম্ভাবজ্ঞাপক কথাও থাকুক, তথাপি সে সকল বাক্যের দ্বারা প্রাণোৎপত্তিসিদ্ধান্ত ব্যাহত

---

(১) বেদান্ত শাস্ত্রে পঞ্চবৃত্তি প্রাণের ন্যায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহও প্রাণশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এখানে উভয়প্রকার অর্থেই প্রাণশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

হইতে পারে না। কারণ, সে সকল বাক্যে ইন্দ্রিয়োৎপত্তির উল্লেখ নাই মাত্র, কিন্তু সেইজন্য যে, যে সকল বাক্যে স্পষ্ট কথায় উৎপত্তিবার্ত্তা বিঘোষিত হইয়াছে, সে সকল স্পষ্টার্থক শ্রুতিবাক্যও অপ্রমাণ হইবে, তাহার অনুকূল কোনও যুক্তি দেখা যায় না। একস্থানে উল্লেখ নাই বলিয়া যে, অন্যস্থানের বিস্পষ্ট উল্লেখও উপেক্ষা করিতে হইবে, এরূপ কোনও যুক্তি বা প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, আকাশাদি ভূত-সমষ্টি যেরূপ পরমাত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, চক্ষুঃ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও সেইরূপই পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে (১); অতএব কোন ইন্দ্রিয়ই উৎপত্তি-বিনাশবিহীন নিত্যসিদ্ধ নহে, সমস্তই অনিত্য। ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপত্তিশীল হইলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কেবল যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা নহে, পরন্তু—

অণবশ্চ ॥ ২।৪।৭ ॥

অর্থাৎ উল্লিখিত প্রাণসংজ্ঞক ইন্দ্রিয়গণ কেবলই যে, ইন্দ্রিয়-

---

(১) বেদান্তাচার্য্যগণ বলেন—ইন্দ্রিয়সমূহ পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইলেও ভৌতিক, অর্থাৎ ভূতসমূহ উহাদের উপাদান। আকাশ বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর সাত্ত্বিকভাগ হইতে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ জিহ্বা ও নাসিকা সমুৎপন্ন হইয়াছে, এবং ঐ পঞ্চভূতেরই এক একটী রজোভাগ হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (মূত্রদ্বার) সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ পঞ্চভূতেরই সম্মিলিত সাত্ত্বিক ভাগ হইতে অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত) এবং সম্মিলিত রজোভাগ হইতে পঞ্চপ্রাণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। (সদানন্দযতিকৃত বেদান্তসার)।

গণের অগ্রাহ্য বা অগোচরমাত্র, তাহা নহে; পরন্তু প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই অণু। এখানে 'অণু' অর্থ—অতিশয় সূক্ষ্ম ও পরিমিত, কিন্তু প্রসিদ্ধ পরমাণুতুল্য নহে। ইন্দ্রিয়গণ পরমাণুতুল্য হইলে, দেহব্যাপী কার্য্য (অনুভূতি) হইত না; আবার স্থূলপরিমাণ হইলেও, মৃত্যুসময়ে সূক্ষ্ম শরীর যখন দেহ হইতে বহির্গত হয়, তখন সমীপস্থ লোকদিগের অদৃশ্যভাবে চলিয়া যাইতে পারিত না; অতএব উহাদের মধ্যম পরিমাণই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই আচার্য্য শঙ্করের অভিমত সিদ্ধান্ত। ইন্দ্রিয়সমূহের সংখ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়, সূত্রকারও সে বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। এখানে সে বিষয়ের অবতারণা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল ॥ ২।৪।৩—৭ ॥

[মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি]

কেবল যে, ইন্দ্রিয়সংজ্ঞক প্রাণবর্গই পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নহে,—

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ২।৪।৮ ॥

অর্থাৎ অপরাপর প্রাণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ প্রাণও (পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণও) সেই পরমাত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" এই শ্রুতিতে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের তুল্যরূপে উৎপত্তি নির্দ্দেশ রহিয়াছে। বহুস্থানে প্রাণের মহিমা বর্ণিত আছে, এবং বেদের মধ্যেও প্রাণের নিত্যতাব্যঞ্জক অনেক শব্দ রহিয়াছে; তদনুসারে মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে সহজেই লোকের মনে সংশয় হইতে পারে, সেই

সংশয়-ভঞ্জনার্থ সূত্রকার পৃথক্ সূত্রদ্বারা মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তিবার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। আত্মার ভোগসাধন করণবর্গের মধ্যে প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং উপনিষদ্‌ও "প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" বলিয়া একাধিক স্থলে এই প্রাণেরই শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়াছেন; এইজন্য সূত্রকার এখানে কেবল 'শ্রেষ্ঠ' শব্দদ্বারা প্রাণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর পৃথক্ করিয়া 'প্রাণ' শব্দের প্রয়োগ করেন নাই।

[প্রাণের স্বরূপসম্বন্ধে মতভেদ]

উল্লিখিত শ্রুতিপ্রমাণের বলে প্রাণের উৎপত্তিবাদ সমর্থিত হইলেও উহার স্বরূপসম্বন্ধে অনেকপ্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, আলোচ্য মুখ্যপ্রাণ বায়ুর পরিণতিবিশেষ; ইহা বায়ু ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাহ্য বায়ুই দেহমধ্যগত হইয়া প্রাণসংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। শ্রুতিও এপক্ষে সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছেন—"যঃ প্রাণঃ, স এব বায়ুঃ" অর্থাৎ যাহা প্রাণনামে পরিচিত, তাহা এই প্রসিদ্ধ বায়ু, অর্থাৎ উহা বায়ুরই বিকার-বিশেষ। অতএব বায়ুই প্রাণের উপাদান বা মূলভূত পদার্থ। সাংখ্যবাদিরা অবার একথায় পরিতুষ্ট হন না; তাঁহারা বলেন—

"সামান্যকরণ-করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ।" (সাংখ্যসূত্র ২।৩১।)

অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই তিনটী অন্তঃকরণ শরীরা-ভ্যন্তরে থাকিয়া প্রতিনিয়ত আপনাদের যে সকল কার্য্য—সংকল্প-বিকল্প, অধ্যবসায় (কর্ত্তব্য নির্ণয়) ও অহঙ্কার বা গর্ব্ব করিয়া থাকে, তাহাদের সেই সকল কার্য্যের ফলে দেহমধ্যে যে, একপ্রকার

বিক্ষোভ বা স্পন্দন উপস্থিত হয়, তাহাই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুনামে প্রসিদ্ধ, বস্তুতঃ উহা বায়ু-বিকার নহে; সুতরাং প্রাণ বলিয়া কোনও স্থিরতর স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, এবং থাকিবার আবশ্যকও নাই (১)।

[প্রাণের বেদান্তসম্মত স্বরূপ]

সূত্রকার প্রবল শ্রুতিপ্রমাণের সাহায্যে এই সকল মতভেদ নিরাসপূর্ব্বক বলিতেছেন—

"ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ" ॥২।৪।৯॥

অর্থাৎ মুখ্যপ্রাণ বস্তুতঃ সাধারণ বায়ুমাত্র, অথবা অন্তঃকরণের সাধারণ বৃত্তি বা ব্যাপারবিশেষ নহে। শ্রুতিতে বায়ু ও প্রাণের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে, প্রাণ কখনই সাধারণ বায়ু-মাত্র নহে। "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।" এখানে একই স্থানে প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বায়ুর পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ রহিয়াছে। অন্যত্র আবার—"প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ।" প্রাণকে ব্রহ্মের চতুর্থপাদ বলিয়া বায়ু ও জ্যোতি দ্বারা তাহার প্রকাশ ও তাপদান বর্ণিত হইয়াছে। বায়ু ও প্রাণ যদি একই পদার্থ হইত, তাহা হইলে কখনই ঐরূপে

(১) তাৎপর্য্য এই যে, অন্তঃকরণের সাধারণ কার্য্যদ্বারা শরীরে যে, বিক্ষোভ উৎপন্ন হয়, ইহাকে 'পঞ্জর-চালন ন্যায়' বলে। একটা পঞ্জরে পাঁচটা পাখী থাকিলে, সেই পাখীদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মদ্বারা যেমন পঞ্জরে স্পন্দন উপস্থিত হয়, অথচ কোন পাখীই সেই পঞ্জর-সংচালনের জন্য ক্রিয়া করে না, তেমনি করণবর্গের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলেই দেহমধ্যে একপ্রকার স্পন্দন উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাই পঞ্চপ্রাণ নামে কথিত হয়।

পৃথক্ উল্লেখ শোভা পাইত না। ঐরূপে পৃথক্ উল্লেখ হইতেই প্রমাণিত হয় যে, মুখ্যপ্রাণ কখনই বায়ুর বিকার নহে।

মুখ্যপ্রাণ যেমন বায়ু বা বায়ু-বিকার নহে, তেমনি করণবর্গের সাধারণ ব্যাপারস্বরূপও নহে; কারণ, শ্রুতিতেই ("এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ") প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। মুখ্যপ্রাণ যদি করণ-বর্গের সাধারণ ব্যাপারমাত্র হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকের ঐরূপ নাম করিয়া পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন হইত না, বিশেষতঃ ক্রিয়া ও ক্রিয়াবানে যখন ভেদ নাই, উভয়ই যখন অভিন্ন পদার্থ, তখন ক্রিয়াবান্ মনঃ ও ইন্দ্রিয়গণের উল্লেখেই প্রাণের উল্লেখ সিদ্ধ হইত; স্বতন্ত্রভাবে প্রাণনির্দ্দেশের কোন প্রয়োজনই হইত না। তাহার পর, ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণসংবাদ-প্রস্তাবে দেখা যায়, চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিবাদে পরাজিত হইল এবং মুখ্য-প্রাণের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাহারই সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। প্রাণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকিলে তাহার সহিত বিবাদকরণ, এবং পরাজিত হইয়া তাহার উদ্দেশ্যে উপহার প্রদান, ইত্যাদি কথারও কোনই সার্থকতা থাকে না। অধিকন্তু উপ-নিষদের "সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ এবৈকো জাগর্ত্তি," এবং "প্রাণঃ সংবর্গঃ বাগাদীন্ সংবৃঙ্ক্তে" ইত্যাদিপ্রকার পার্থক্যোপদেশও সার্থক হইতে পারে না। এই সমুদয় কারণে বুঝিতে হইবে যে, আলোচ্য মুখ্যপ্রাণ কখনই বায়ু বা করণবৃত্তিমাত্র নহে। পরন্তু—

চক্ষুরাদিবৎ তু তৎসহশিষ্টাদিভ্যঃ ॥২।৪।১০॥

চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ যেরূপ ভৃত্যের ন্যায় জীবাত্মার ভোগ-সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকে, মুখ্যপ্রাণও সেইরূপই জীবাত্মার ভোগ-সম্পাদনে নিয়ত ব্যাপৃত থাকে, স্বতন্ত্রভাবে নিজের জন্য কোনও কার্য্যে লিপ্ত থাকে না। এ সিদ্ধান্ত আমরা উপনিষদুক্ত প্রাণসংবাদপ্রভৃতি আখ্যায়িকা হইতে প্রাপ্ত হই। সেখানে অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রাণকেও জীবাত্মার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রাণ একটী স্বতন্ত্র সাধনপদার্থ হইলেও জীবের উপকারসাধন ব্যতীত তাহার নিজের কোনও উপকারচিন্তা নাই। প্রাণ সম্পূর্ণ পরার্থপর হইয়া ভৃত্যের ন্যায় আত্মার ভোগ সম্পাদন করিয়া পরিতুষ্ট থাকে; সে আর কিছু চাহে না। উক্ত প্রাণ স্বরূপতঃ এক হইলেও—

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ ব্যপদিশ্যতে ॥২।৪।১২ ॥

[প্রাণের বিভাগ ও পরিমাণ]

একই অন্তঃকরণ যেরূপ বৃত্তিভেদে অর্থাৎ সংকল্প, অধ্যবসায়, গর্ব্ব ও স্মরণ, এই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া বা ব্যাপার অনুসারে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত নামে চারিপ্রকার বিভাগ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ একই প্রাণ প্রাণনাদি ব্যাপারভেদ অনুসারে পাঁচপ্রকার বিভাগ প্রাপ্ত হয়। তদনুসারে একই বস্তু—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামে অভিহিত হয়। (১)।

---

(১) প্রাণ যখন মুখ ও নাসিকাপথে ক্রিয়া করে, তখন 'প্রাণ' নামে, যখন অধোগামী হইয়া মলদ্বারপ্রভৃতিতে কার্য্য করে, তখন 'অপান'

আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের অন্যপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—একই মন যেমন চক্ষুঃপ্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া ঐন্দ্রিয়িক বৃত্তিভেদ অনুসারে পাঁচ প্রকার বৃত্তিভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি এক প্রাণেই পাঁচ প্রকার ক্রিয়ানুসারে প্রাণ-অপানাদি পাঁচ প্রকার বিভাগ ও নামভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। মূলতঃ প্রাণ একই বস্তু (২)। ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রাণসংবাদে দেখা যায়, মুখ্যপ্রাণ অপরাপর ইন্দ্রিয়গণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—

"—মা মোহমাপদ্যথ, অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্য এতদ্বানমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি," অর্থাৎ হে ইন্দ্রিয়গণ, তোমরা বিমুগ্ধ হইও না, আমিই আমাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া এই শরীর-ধারণের ব্যবস্থা করিতেছি। এই শ্রুতি হইতেও একই

নামে, যখন শ্রমসাধ্য কার্য্য উপলক্ষে প্রাণ ও অপানের সন্ধি (একত্র স্থিতি) হয়, তখন 'ব্যান' নামে, যখন উৎক্রমণ ও উদ্গারাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে, তখন 'উদান' নামে, আর যখন ভুক্ত অন্নপানাদি বস্তু পরিপাকপূর্ব্বক রসরুধিরাদি সম্পাদন করে, তখন 'সমান' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে একই প্রাণ পাঁচটী বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়।

(২) শঙ্করের ব্যাখ্যায় সূত্রস্থ 'মনঃ' শব্দটীর মুখ্য অর্থ রক্ষা পাইলেও এবং 'পঞ্চবৃত্তি' কথাটীর অর্থসঙ্গতি কোন প্রকারে রক্ষা পাইলেও 'ব্যপদেশ' কথার অর্থ রক্ষা পায় না। 'ব্যপদেশ' অর্থ—ব্যবহার; প্রাণের যেমন পাঁচটী নামে পৃথক্ ব্যবহার আছে, মনের ও বৃত্তিভেদে সেরূপ নামভেদের ব্যবহার দেখা যায় না।

প্রাণের পাঁচপ্রকার বিভাগ প্রমাণিত হইতেছে। অতএব প্রাণের একত্ব সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

একই প্রাণ পাঁচ প্রকার বৃত্তি অনুসারে সর্ব্বদেহব্যাপী ক্রিয়ানির্ব্বাহ করিলেও, স্থূল বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দৃশ্য নহে। কেন না,—

অণুশ্চ ॥২।৪।১৩॥

প্রাণ দেহব্যাপী হইলেও অণু—অতিশয় দুর্লক্ষ্য ; এইজন্যই পার্শ্বস্থ ব্যক্তিরা প্রাণের ক্রিয়ামাত্র প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু প্রাণকে দেখিতে পায় না। মৃত্যুকালে প্রাণ যখন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখনও প্রাণের প্রস্থান-ব্যাপার কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না। এখানে 'অণু' অর্থ—পরমাণুর ন্যায় অতিশয় সূক্ষ্ম পরিমাণ নহে। কেবল দৃশ্য নয় বলিয়াই প্রাণকে 'অণু' বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে প্রাণ দেহব্যাপী মধ্যম পরিমাণযুক্ত।

[ইন্দ্রিয়গণের দেবতা]

মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের স্বতন্ত্র সদ্ভাব স্বীকৃত হইলেও উহারা জড়স্বভাব। উহাদের স্ব স্ব কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই। উহাদের কার্য্যপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য অপর কোনও নিয়ন্তার আবশ্যক আছে, এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিতেছেন—

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ ॥২।৪।১৪॥

বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্যশক্তি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য জ্যোতিঃপ্রভৃতি (অগ্নিপ্রভৃতি) দেবতাগণের অধিষ্ঠান বা অধ্যক্ষতা আবশ্যক হয়, নচেৎ জড়স্বভাব

ইন্দ্রিয়গণ নিয়মিতরূপে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে কখনই সমর্থ হইতে পারে না। জড়পদার্থমাত্রই যে, চেতনের সাহায্যে পরিচালিত হয়, ইহা প্রায় সকলেরই অনুমোদিত সিদ্ধান্ত। শ্রুতিও এই সিদ্ধান্তবাদের অনুকূলে মত দিয়া বলিয়াছেন—

"অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" অর্থাৎ অগ্নিদেব বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন ইত্যাদি। কেবল যে, বাগিন্দ্রেয়ের সম্বন্ধেই অধিষ্ঠাতৃত্ববিধি, তাহা নহে; অপরাপর সকল ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেই অধিষ্ঠাত্রী ভিন্নভিন্ন দেবতার কথা উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় (১)। অতএব যুক্তি ও প্রমাণ-দ্বারা সমর্থিত হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যপরিচালনের জন্য চেতনা-শক্তিসম্পন্ন স্বতন্ত্র দেবতাগণের অধিষ্ঠাতৃত্ব আবশ্যক হয়। ইন্দ্রিয়বর্গ সেই সকল দেবতার প্রেরণা অনুসারে নিজ নিজ কার্য্য নিয়মিতভাবে সম্পাদন করিয়া থাকে। বিশেষ কথা এই যে, আত্মার ভোগোপকরণ এই সকল করণবর্গের মধ্যে

---

(১) কোন্ দেবতা কোন্ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী, তাহার নির্দ্দেশ এইরূপ—

"দিগ্ বাতার্ক-প্রচেতোঽশ্বি-বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র-মিত্র-কাঃ।" অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার অশ্বিনীকুমার দেবতা। এবং "চন্দ্র-চতুর্ম্মুখ-শঙ্করাচ্যুতৈঃ ক্রমান্নিয়ন্ত্রিতেন মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার-চিত্তাখ্যেন অন্তঃকরণেন" ইত্যাদি।

অর্থাৎ মনের দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির ব্রহ্মা, অহঙ্কারের শঙ্কর ও চিত্তের বিষ্ণু। উঁহাদের দ্বারা ঐ সকল অন্তঃকরণ নিয়মিত হয়।

মুখ্যপ্রাণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অপর একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় অপেক্ষা জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় অপেক্ষাও অন্তঃকরণ চতুষ্টয় শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যেও আবার বুদ্ধির প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কিন্তু উহারা সকলে স্বগণের মধ্যে উত্তমাধমভাবাপন্ন হইলেও জীবের সম্বন্ধে সকলেই ভৃত্যস্থানীয়—ভোগ-সাধনরূপে পরিকল্পিত; সুতরাং জীবাপেক্ষা উহাদের সকলকেই অপ্রধানরূপে গণনা করিতে হইবে।

এখানে আর একটী বিষয় আলোচ্য এই যে, শ্রুতির উপদেশ হইতে জানা যায় যে, পঞ্চপ্রাণ, মনঃ (অন্তঃকরণ), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ইহারা সকলেই 'প্রাণ'শব্দ-বাচ্য। প্রাণ বলিলে যেমন ঐ ষোড়শ পদার্থই বুঝিতে হয়, তেমন 'ইন্দ্রিয়' বলিলে ঐ ষোড়শ পদার্থই বুঝিতে হইবে কি না? এতদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, না—সেরূপ বুঝিতে হইবে না, কারণ?—

ত ইন্দ্রিয়াণি, তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ॥ ২।৪।১৭॥

এ সকল অলৌকিক ব্যবহারবিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। সেই শ্রুতিই যখন শ্রেষ্ঠ প্রাণকে (পঞ্চ প্রাণকে) পরিত্যাগ করিয়া অপর একাদশটীর (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের উপরে) 'ইন্দ্রিয়' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, অর্থাৎ ঐ একাদশটীকেই কেবল ইন্দ্রিয়শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ", তখন মুখ্য-প্রাণকে 'ইন্দ্রিয়'শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না; সুতরাং উহাকে ইন্দ্রিয়নামে ব্যবহারও করিতে পারা যায় না। ফল কথা,

উহারা সকলেই প্রাণশব্দ-বাচ্য হইলেও 'ইন্দ্রিয়'-শব্দবাচ্য হইতে কেবল একাদশটাই হয়, মুখ্যপ্রাণ হয় না। মনের ইন্দ্রিয়ত্ব পুরাণ শাস্ত্র প্রসিদ্ধ।

[দেবতাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ]

এখানে বলা আবশ্যক যে, যদিও সূর্য্য, চন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাগণ অধিষ্ঠাতা বা অধ্যক্ষরূপে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের পরিচালনা করিয়া থাকেন, তথাপি সেই সমুদয় ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দ্বারা সম্পাদিত শুভাশুভ কর্ম্মফলের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা ঐ সকল কর্ম্মের ফলভোগে অধিকারী হন না। ফল-ভোগের অধিকার একমাত্র জীবাত্মাতেই পর্য্যবসিত, অপর সকলে কর্ম্মনিষ্পাদনে সহায়তা করিয়াই চরিতার্থ হয়। একই দেহে একাধিক ফলভোক্তা থাকিতে পারে না। এইজন্য শ্রুতি ফল-ভোগের অধিকার জীবাত্মার উপরেই সমর্পণ করিয়াছেন এবং তদনু-রূপ উপদেশও করিয়াছেন—"অথ যো বেদ—ইদং জিঘ্রাণি ইতি, স আত্মা, গন্ধায় ঘ্রাণন্" ইত্যাদি, ('আমি এই বস্তু আঘ্রাণ করিতেছি' বলিয়া যিনি অনুভব করেন, তিনি আত্মা; ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবল সেই গন্ধ গ্রহণের দ্বারমাত্র (ভোক্তা নহে)। এখানে দেখা যায়, শ্রুতি নিজেই জীবের ভোক্তৃত্ব স্বীকারপূর্ব্বক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ভোগ-সাধনত্ব-মাত্র (গন্ধগ্রহণের করণত্বমাত্র) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়ের বা তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিলে, লোক-ব্যবহারও অচল ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কারণ, প্রত্যেক দেহে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অনেক; এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সংখ্যাও বহু।

একের অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল অপরে ভোগ করে না, এবং একের অনুভূত বিষয় অপরে স্মরণ করে না, ইহাই বিশ্বজনীন সুনিশ্চিত নিয়ম।

এতদনুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে, যখন যে ইন্দ্রিয় যে কার্য্য করে, কালান্তরে সেই ইন্দ্রিয়ই সেই কার্য্যের শুভাশুভ ফল উপভোগ করে, এবং পূর্ব্বানুভূত বিষয়রাশিও সেই ইন্দ্রিয়ই স্মরণ করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যবহার অন্যরূপ দেখা যায়। চক্ষু দ্বারা পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুও ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক বলা হয় যে, আমি সেই 'পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুটী স্পর্শ করিতেছি', অর্থাৎ পূর্ব্বে যে আমি চক্ষু দ্বারা যে বস্তুটী দর্শন করিয়াছিলাম, এখন সেই আমিই ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা এই সেই বস্তুটীই স্পর্শ করিতেছি। এখানে চক্ষু যদি দর্শনের কর্ত্তা হইত, আর ত্বক্ যদি স্পর্শের কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে কখনই উভয় ক্রিয়াতে এক 'আমি' শব্দের প্রয়োগ করা সঙ্গত হইত না, এবং 'এই—সেই' বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞার ব্যবহারও সম্ভবপর হইত না (১)। তাহার পর, চক্ষু নষ্ট হইয়া গেলে, চক্ষুর দৃষ্ট বস্তু মনে মনে স্মরণ করাও অসম্ভব হইত ; কারণ, সেখানে চক্ষু হইতেছে পূর্ব্ব দর্শনের কর্ত্তা, আর মন হইতেছে ইদানীন্তন স্মরণের কর্ত্তা। একের অনুভূত বস্তু যে, অপরে স্মরণ করিতে পারে না, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জীবকে কর্ত্তা ও ভোক্তা স্বীকার করিলে এ সমস্ত দোষের সম্ভাবনা

(১) পূর্ব্বদৃষ্ট কোন বস্তুকে যদি পরে দেখিয়া—প্রত্যক্ষপূর্ব্বক স্মরণ করা হয়, তাহা হইলে সেই স্মরণমিশ্রিত প্রত্যক্ষকে প্রত্যভিজ্ঞা বলা হয়।

থাকে না। কারণ, প্রত্যেক দেহে জীবাত্মা এক ও নিত্য। এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিতেছেন—

প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ২।৪।১৫ ॥
তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥ ২।৪।১৬ ॥

উদ্ধৃত সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা উপরে বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে, প্রাণবান্ (প্রাণবতা) অর্থাৎ প্রাণধারী জীবের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যে সম্বন্ধ, তাহা প্রভু-ভৃত্যসম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধ। অতএব জীবই এই দেহে কর্ত্তা ও ভোক্তা, ইন্দ্রিয়গণ তাহার ভোগ-সাধনমাত্র। জীবাত্মা এক ও নিত্য; সুতরাং কর্ম্মফলভোগ বা পূর্ব্বানুভূত বিষয় স্মরণ করিতে তাহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত কোন বাধা ঘটিতে পারে না। অতএব জীবকেই কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ॥ ২।৪।১—১৭ ॥

[পরমেশ্বর হইতে নাম-রূপ প্রকাশ]

তেজঃ, জল ও পৃথিবীসৃষ্টির পর ত্রিবৃৎকরণের কথা উপনিষদে (ছান্দোগ্যে) বর্ণিত আছে। সেই প্রসঙ্গে নাম (ঘট, পট ইত্যাদি সংজ্ঞা) ও রূপ বা আকৃতি-প্রকাশনের উল্লেখও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। যথা—"হন্তাহম্ ইমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ একৈকাং করবাণি," অর্থাৎ আমি এই জীবাত্মারূপে এই দেবতাত্রয়ের (তেজঃ, জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নাম ও রূপ প্রকাশ করিব, ইহাদের এক একটী দেবতাকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্র্যাত্মক

ত্র্যাত্মক করিব'। এখানে কেবল ত্রিবৃৎকরণেরও নাম-রূপ প্রকাশনের কথামাত্র আছে, কিন্তু জীব অথবা পরমেশ্বর এই কার্য্য সম্পাদন করেন, সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। কাজেই সংশয় হইতে পারে যে, এ কার্য্যের কর্ত্তা কে?—জীব? অথবা পরমেশ্বর? শ্রুতিতেই জীবের উল্লেখ (অনেন জীবেনাত্মনা) থাকায় জীবের কর্ত্তৃত্বপক্ষই যুক্তিযুক্ত মনে হইতে পারে, সেই ভ্রান্তি-নিরসনের নিমিত্ত সূত্রকার বলিতেছেন—

সংজ্ঞা-মূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্ত ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥ ২।৪।২০ ॥

উক্ত শ্রুতির উপদেশানুসারে ত্রিবৃৎকরণ ব্যাপারে যখন পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্বই প্রমাণিত ও সুনিশ্চিত হইয়াছে, তখন তৎসহ-পঠিত সংজ্ঞা (নাম) ও মূর্ত্তির (রূপ বা আকৃতির) অভিব্যঞ্জন-কার্য্যেও সেই ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্বই অবধারিত হইতেছে। অন্যান্য স্থলেও এইরূপই স্পষ্ট উপদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব এই সিদ্ধান্তই স্থির হইল যে, যে পরমেশ্বর তেজঃপ্রভৃতি ভূতবর্গ সৃষ্টি করিয়া (নাম-রূপ প্রকটিত করিবার উদ্দেশ্যে) ত্রিবৃৎকরণ-(পঞ্চীকরণ-) ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই পরমেশ্বরই উহাদিগকে সংজ্ঞা ও মূর্ত্তিরূপে পরিণমিত করিয়াছেন। নাম-রূপ প্রকটনের জন্যই ত্রিবৃৎকরণ করিয়াছেন, এখন তিনি যদি নাম-রূপ অভিব্যক্ত না করিয়াই বিরত হন, তাহা হইলে তাঁহার ত্রিবৃৎ-করণের উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যায়; কাজেই ত্রিবৃৎকারী পরমেশ্বর-কেই নাম-রূপপ্রকাশের কর্ত্তা বলিতে হইবে, জীবকে নহে।

এই ত্রিবৃৎকরণ ব্যাপার উপলক্ষে সূত্রকার এখানে জীবশরীর-

সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। শরীরের উপাদান সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥ ২।৪।২১ ॥

পরমেশ্বর প্রথমে সূক্ষ্ম তেজঃ, জল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। সেই সূক্ষ্ম তন্মাত্রাত্মক ভূতত্রয়ের দ্বারা জীবের ভোগনির্ব্বাহ অসম্ভব বুঝিয়া ঐ প্রত্যেক ভূতকে পরস্পরের সহিত সম্মিশ্রিত করিলেন। ঐরূপ সম্মিশ্রণেরই নাম 'ত্রিবৃৎকরণ'। এই 'ত্রিবৃৎকরণ' শব্দটা পঞ্চীকরণের উপলক্ষণ; অর্থাৎ ইহাদ্বারা আকাশাদি পঞ্চভূতেরই সম্মিশ্রণ বুঝিতে হইবে (১)। ঐপ্রকার সম্মিশ্রণের ফলে ব্যবহার-জগতে ভূত ও ভৌতিক পদার্থমাত্রই ত্রিবৃৎকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ব্যবহারক্ষেত্রে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ কোন ভূতের সন্ধান পাই না, সমস্তই ত্রিবৃৎকৃত বা মিশ্রিত। আমাদের দৈনন্দিন উপভোগ্য অন্ন-পানাদি যাহা কিছু, সমস্তই সেই ত্রিবৃৎকৃত পঞ্চভূতের পরিণাম। আমাদের স্থূল শরীরও সেই পঞ্চীকৃত ভূতবর্গ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। বিশেষ এই যে, "মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ" অর্থাৎ শরীরগত মাংসপ্রভৃতি

---

(১) ত্রিবৃৎকরণ ও পঞ্চীকরণ একই কথা। ছান্দোগ্যোপনিষদে তিনটীমাত্র ভূতের উৎপত্তির কথা আছে; সেইজন্ত সেখানে 'ত্রিবৃৎকরণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে পঞ্চভূতেরই উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং তদনুসারে পঞ্চীকরণ (পঞ্চভূতের সম্মিশ্রণ) স্বীকার না করিলে অসঙ্গত হয়, এইজন্ত আচার্য্যগণ "ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণ-স্যাপ্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ" বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অংশগুলি ভূমির সারভাগ হইতে উৎপন্ন, এবং জল ও তেজ হইতে যথাসম্ভব দৈহিক অপরাপর অংশ সমুৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে জল হইতে শরীরগত প্রাণ, মূত্র, রক্ত নিষ্পন্ন হয়, আর তেজ হইতে অস্থি, মজ্জা ও বাগিন্দ্রিয় প্রকটিত হয় (১)। উক্ত আকাশ ও বায়ু হইতেও দৈহিক যে যে অংশ সমুৎপন্ন হয়, তাহা উপনিষদ্ হইতে জানিতে হইবে।

ব্যবহার-জগতে অগ্নি, জল, বায়ুপ্রভৃতি যে সমস্ত ভূত ও ভৌতিক পদার্থ আমরা দেখিতে পাই, সে সমস্তই ত্রিবৃৎকৃত—পঞ্চভূতের সম্মিশ্রণযুক্ত—পঞ্চীকৃত, অবিমিশ্র বিশুদ্ধ কোন ভূত বা ভৌতিক পদার্থ ভোগ-জগতে নাই। এ কথার উপর আপত্তি হইতে পারে যে, জগতের সমস্ত ভূতই যদি পঞ্চীকৃত হয়, সমস্ত ভূতেই যদি অপর সমস্ত ভূতের অংশ বিদ্যমান থাকে, তবে 'ইহা তেজঃ, উহা জল' এই প্রকার ব্যবহারভেদ হয়

---

(১) এ সকল পরিণতির ক্রম উপনিষদের বিভিন্ন অংশে বর্ণিত আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে কথিত আছে যে, "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে—তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ, তৎ পুরীষং ভবতি ; যো মধ্যমঃ, তৎ মাংসং ; যোঽণিষ্ঠঃ, তৎ মনঃ" ইত্যাদি। অর্থ এই যে, ভুক্ত অন্ন উদরস্থ হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়, স্থূল, মধ্যম ও অণু। তন্মধ্যে স্থূলভাগ পুরীষরূপে, মধ্যম ভাগ মাংসরূপে এবং অতি সূক্ষ্মভাগ মনোরূপে অর্থাৎ মনের পোষকরূপে পরিণত হয়। এই প্রকার অন্যান্য ভূতত্রয়সম্বন্ধেও পরিণামক্রম উপনিষদে বর্ণিত আছে। এখানে যে সকল পরিণামের কথা বলা হইল, সে সমস্তই ত্রিবৃৎকৃত বা পঞ্চীকৃত ভূতের পরিণাম। অত্রিবৃৎকৃত সূক্ষ্ম ভূতের এবংবিধ কোন পরিণাম নাই।

কি কারণে? অনিয়মে সকলকেই সকল শব্দে নির্দ্দেশ করা হয় না কেন? অথচ সেরূপ নির্দ্দেশ কেহ কখনও করে না, এবং তাহা হইলে লোক-ব্যবহারও রক্ষা পায় না। ইহার উত্তরে স্বয়ং সূত্রকারই বলিতেছেন—

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥২।৪।২২॥

অর্থ এই যে, যদিও ব্যবহার-জগতে সমস্ত ভূত-ভৌতিক পদার্থই ত্রিবৃৎকৃত (পঞ্চীকৃত) হউক, তথাপি 'বৈশেষ্যাৎ তদ্বাদঃ' অর্থাৎ মাত্রার আধিক্যানুসারে বিভিন্ন নামে ব্যবহার হইয়া থাকে। ভূত-ভৌতিক পদার্থের মধ্যে যাহাতে যে ভূতের ভাগ অধিক, সেই ভূতের নামানুসারে তাহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইদানীন্তন পণ্ডিতগণও—'আধিক্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি,' আধিক্য অনুসারেই ব্যবহার হয়, এই কথা বলিয়া থাকেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, যাহাতে পৃথিবীর ভাগ অধিক (অর্দ্ধেক), তাহা পৃথিবীনামে, যাহাতে জলের ভাগ অধিক, তাহা জলনামে ব্যবহার লাভ করিয়া থাকে। অপরাপর ভূত-ভৌতিক সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা (১)। এই নিয়মানুসারে

---

(১) পঞ্চীকরণের প্রণালী এইরূপ—

"দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতর-দ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে॥" (পঞ্চদশী)

পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকটাকে প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার এক এক অর্দ্ধ ভাগকে আবার চারি ভাগ করিয়া উহার এক এক ভাগকে অপরাপর ভূতের অর্দ্ধাংশের সহিত সংযোজিত করা। যেমন আকাশের অর্দ্ধাংশকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, এই চারিভাগের এক

মনুষ্যাদিশরীরে পৃথিবীর ভাগ অধিক থাকায় 'পার্থিব' নামে, এবং তেজের ভাগ অধিক থাকায় দেবাদি-শরীর 'তৈজস' নামে পরিচিত হইয়াছে। এই নিয়ম সর্ব্বত্র পরিচালিত করিতে হইবে, এবং তাহা দ্বারাই বিশেষ বিশেষ নামাদি-ব্যবহার উপপন্ন হইবে; সুতরাং পঞ্চীকরণ-ব্যবস্থা প্রচলিত ব্যবহারের বিরোধী হয় না ॥২।৪।২২॥

[জন্মান্তর চিন্তা]

ইতঃপূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, জগতে একমাত্র জীব-ব্যতিরিক্ত আর সমস্তই অনিত্য—জন্মমরণের অধিকারে অবস্থিত। আকাশাদি পঞ্চভূত এবং প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গ—সমস্তই পরমেশ্বর হইতে যথানিয়মে উৎপন্ন হইয়া জীবের ভোগসাধনে নিযুক্ত আছে। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মপদার্থ হইয়াও—বস্তুতঃ জন্ম-মরণাদিরহিত হইয়াও অবিদ্যাবশে সংসারে প্রবেশ করে, এবং অবিবেক দোষে, জন্ম-মরণ ও সুখ-দুঃখাদিময় সংসারদশা প্রাপ্ত হয়। জীবের জন্ম-মরণ বা স্বর্গ-নরকাদিগমন বাস্তবিকই হউক, আর কাল্পনিকই (ঔপাধিকই) হউক, মানবমাত্রেই উহার স্বরূপতত্ত্ব

এক ভাগকে বায়ুপ্রভৃতি চারি ভূতের অর্দ্ধাংশের সহিত মিলিত করা। এইরূপে মিলিত করিলেই প্রত্যেক ভূতই পঞ্চীকৃত বা পঞ্চাত্মক হয়। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, আমরা যাহাকে আকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তাহাতে আকাশের মাত্র অর্দ্ধাংশ আছে, এবং অপর চারি ভূতের দুই দুই আনা অংশের মিলনে উহার অপর অর্দ্ধেক পূর্ণ হইয়াছে। এইরূপ মিশ্রণসত্ত্বেও আধিক্যানুসারে আকাশাদি নাম-ব্যবহার হইয়া থাকে।

জানিতে উৎসুক হয়। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্রও এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ও তত্ত্ব-নির্দ্ধারণ করিতে অবহেলা বা ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। বর্ত্তমান জনসমাজেও ঐ চিন্তার নিতান্ত অভাব নাই। সকলে না হউক, অধিকাংশ লোকই ঐ বিষয়ের খাঁটি সত্য খবর পাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইজন্য সূত্রকার বেদব্যাসও এবিষয়ে চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই তিনি এ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। জীব দেহান্তর-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কিরূপে এই দেহ ত্যাগ করিয়া যায়, তখন তাহার সঙ্গে অপর কেহ গমন করে, অথবা জীব একাকীই এই দেহ হইতে বহির্গত হইয়া কার্য্যানুযায়ী গন্তব্য স্থানে গমন করে, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় অবহিত হইয়াছেন। এই বিষয়টী তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুগণের যেরূপ কৌতূহলোদ্দীপক, সেইরূপ আবার সাধারণেরও উৎসাহবর্দ্ধক। এই কারণেই এখানে জীবের পরলোকচিন্তা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

জগতে প্রাণিমাত্রেরই শরীরগ্রহণ ও শরীর-ত্যাগ প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং এ বিষয়ে কাহারও কোনপ্রকার সন্দেহ করিবার অবসর নাই। অতি পামর লোকেরাও এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইয়া থাকে; কাজেই এবিষয়ে বলিবার কিছু নাই; এবং মৃত্যুর সময়ে যে, ভোগসাধন ইন্দ্রিয়বর্গ, মনঃ, প্রাণ, জ্ঞানসংস্কার ও কর্ম্মসংস্কার জীবের সঙ্গে অনুগমন করে, তাহাও "অথৈনমেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি"

অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গমনের সময় এই সমুদয় (প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) জীবের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, এইজাতীয় নানাবিধ শাস্ত্র প্রমাণের সাহায্যে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়; সুতরাং সে সম্বন্ধেও অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এখন প্রধান জিজ্ঞাস্য বিষয় হইতেছে এই যে, "অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে" অর্থাৎ জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে যেখানে গমন করে, সেখানে যাইয়া ভোগক্ষম আর একটী নূতন দেহ নির্ম্মাণ করে, ইত্যাদি শ্রুতিবচন হইতে জানিতে পারা যায় যে, জীব নূতন লোকে যাইয়া আপনার উপযুক্ত দেহ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। দেহ নির্ম্মাণ করিতে হইলেই দৈহিক উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্যক হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, জীব দেহান্তরপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এই দেহ হইতে যাইবার সময়ই ভাবী দেহের উপাদান সূক্ষ্ম ভূতাংশসমূহ সঙ্গে লইয়া যায়? অথবা সেখানে যাইয়া আবশ্যকমত দেহোপাদান সংগ্রহ করিয়া লয়? উভয় প্রকারে দেহরচনা সম্ভবপর হইলেও শাস্ত্রসম্মতি জানিবার জন্য এইপ্রকার প্রশ্নের উত্থাপন হইতেছে। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ ॥৩।১।১॥

জীব যখন এক দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহপ্রাপ্তির জন্য যায়, তখন দেহোপাদান ভূতসূক্ষ্মসম্বলিত হইয়াই যায়, ইহা শ্রুতিপ্রদর্শিত প্রশ্ন ও প্রতিবচন (উত্তর বাক্য) হইতে জানা যায়। রাজা প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি?" অর্থাৎ পঞ্চমী

আহুতিতে অর্পিত জলসমূহ যেপ্রকারে পুরুষ-শব্দবাচ্য হয়, অর্থাৎ মনুষ্যদেহরূপে পরিণত হয়, তাহা তুমি জান কি? এতদুত্তরে প্রথমতঃ দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ (স্ত্রী), এই পাঁচটী পদার্থকে অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া, সেই পাঁচপ্রকার অগ্নিতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন (খাদ্যবস্তু) ও রেতঃ, এই পাঁচপ্রকার আহুতি নির্দ্দেশ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, "ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি," অর্থাৎ এই-প্রকারে (পূর্ব্বদর্শিত দ্যু-পর্জ্জন্যাদিতে শ্রদ্ধা সোমাদিক্রমে) পঞ্চম আহুতিতে অর্পিত 'অপ্'সকল পুরুষপদবাচ্য হইয়া থাকে (১)।

---

(১) শ্বেতকেতুনামক ঋষিকুমার প্রবাহণনামক রাজার নিকট আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে 'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা' অবলম্বনে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। উক্ত প্রশ্নটী তাহারই অন্যতম। শ্বেতকেতু প্রশ্নোত্তরদানে অক্ষম হইলে পর, রাজা নিজেই ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। যজ্ঞাদি-কর্ম্মানুষ্ঠাতা লোক মৃত্যুর পর যখন স্বর্গে যান, তখন আহুতি-সম্পর্কিত 'অপ্' (জলীয়ভাগ) অদৃষ্টরূপে তাহার সঙ্গে যায়। পরে তিনি যখন স্বর্গভোগ সমাপ্ত করিয়া পুনরায় জন্মলাভের জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন সেই সঙ্গীয় জলে বেষ্টিত হইয়া প্রথমে আকাশে পতিত হন, সেখান হইতে মেঘে, মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হন, এবং ভক্ষণযোগ্য শস্যাদির মধ্যে প্রবেশ করেন, সেই অন্ন পুরুষভুক্ত হইয়া শুক্ররূপে পরিণত হয়, শেষে স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করে, এবং সেখানে দেহাকার ধারণ করে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জরায়ুমধ্যে দেহ নির্ম্মিত হইবার পর, জীব তন্মধ্যে প্রবেশ করে না, পরন্তু জীবই 'অপ্' পরিণতিভূত শুক্রে বেষ্টিত হইয়া জরায়ুতে প্রবেশ করে। জীবযুক্ত শুক্রই

এখানে স্পষ্টই বলা হইল যে, একই 'অপ্' প্রথমে শ্রদ্ধারূপে দ্যুলোক-অগ্নিতে আহুত হয়, পরে সোমরূপে পর্জ্জন্য-অগ্নিতে (অগ্নিরূপে কল্পিত মেঘে) ও তাহার পর বৃষ্টিরূপে পৃথিবী-অগ্নিতে আহুত হইয়া ভুক্তান্নরূপে পুরুষরূপ-অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়, সেখানে সেই অন্নই শুক্রে পরিণত হইয়া অগ্নিরূপে কল্পিত স্ত্রীতে আহুত হয় এবং দেহাকারে পরিণত হইয়া মনুষ্যাদি-শব্দে উল্লেখ-যোগ্য হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, জীব পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়েই দেহোপকরণ সূক্ষ্ম ভূতসমূহ সঙ্গে লইয়া যায়, এবং তাহাদ্বারাই দ্যু, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎরূপ পাঁচপ্রকার অগ্নিতে আহুত হইয়া নিজের দেহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

এখানে বলা আবশ্যক যে, যদিও পূর্ব্বপ্রদর্শিত শ্রুতির প্রশ্ন ও প্রতিবচনের মধ্যে 'অপ্' (জল) ভিন্ন অন্য কোন ভূতেরই নামোল্লেখ নাই, তথাপি যথোক্ত সিদ্ধান্তে অবিশ্বাস করা উচিত হয় না। কারণ, এই এক 'অপ্' শব্দদ্বারাই অপরাপর সূক্ষ্ম ভূতেরও সদ্ভাব সূচিত হইয়াছে। কারণ ?—

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ॥ ৩।১।২॥

শরীর রচনা করিয়া থাকে, অর্থাৎ দেহাকারে পরিণত হয়। রেশমের গুটিপোকা যেরূপ নিজেই গুটি নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আবদ্ধ হয়, জীবও সেইরূপ নিজেই নিজের সংগৃহীত ভূতসূক্ষ্মদ্বারা দেহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আবদ্ধ হয়। উক্ত দিব্, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ—এই পাঁচটীকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিতে হয়। তাহার প্রণালী ছান্দোগ্যোপনিষদে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবৃৎকরণ-প্রণালী অনুসারে জানা যায় যে, সমস্ত ভূতই ত্রিবৃৎকৃত—ত্র্যাত্মক (তেজঃ, অপ্ ও পৃথিব্যাত্মক)। অপর ভূতদ্বয়ের সহিত মিশ্রিত না হইয়া শুদ্ধ 'অপ' কোন কার্য্যই সম্পাদন করে না, বা করিতে পারে না ; এবং সেরূপ অমিশ্রিত সূক্ষ্ম ভূত ব্যবহার-জগতের উপযোগীও হয় না, এই কারণে শ্রুতিকথিত কেবল 'অপ্' (আপঃ) শব্দ হইতেই অপর ভূতদ্বয়েরও (বস্তুতঃ সমস্ত ভূতেরই) সদ্ভাব বুঝিতে হইবে। এক অপ্ শব্দদ্বারা অপর সমস্ত ভূতের সদ্ভাব বিজ্ঞাপিত হইতে পারে বলিয়াই শ্রুতি অপর কোন ভূতের নামোল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। অতএব ঐ শ্রুতিদ্বারাই জীব যে, দেহোপাদান সমস্ত ভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া বহির্গত হয়, তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

সূত্রস্থ 'ত্র্যাত্মক' শব্দের অন্যপ্রকার অর্থ করিলে ঐ সিদ্ধান্ত আরও স্ফুটতর হইতে পারে। এ পক্ষে 'ত্র্যাত্মক' (ত্রি + আত্মক) অর্থ—বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা এই ত্রিধাতুময়। প্রত্যেক দেহেই যে, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কারণ, দেহমধ্যে ঐ ত্রিবিধ ধাতুরই পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'বাত' দ্বারা বায়ুর, পিত্তদ্বারা তেজের, আর শ্লেষ্মা দ্বারা জলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ, ঐ তিনটী ধাতু যথাক্রমে বায়ু, তেজঃ ও জলের বিকার বা পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নয়। দেহমধ্যে যদিও ভূতত্রয়ই বিদ্যমান থাকিয়া সমানভাবে কার্য্য করিতেছে সত্য,

তথাপি দেহমধ্যে জলের বা জলীয় অংশেরই আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দেহেই রস-রুধিরাদি জলীয় ভাগের ভূয়স্ত্ব বা বাহুল্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সেই ভূয়স্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রুতি কেবল 'অপ্' শব্দের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন—"পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি ইতি"। অতএব দেহ হইতে বহির্গমনের কালে জীব যে, দেহোপাদান সূক্ষ্ম ভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া যায়, ইহাই শ্রুতির অভিমত সিদ্ধান্ত ॥ ৩।১।২ ॥

জীব দেহ ছাড়িয়া যাইবার সময়ে যে, দেহোপকরণ ভূতবর্গে বেষ্টিত হইয়াই যায়, একথা প্রকারান্তরেও সমর্থন করা যাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে সূত্রকার অপর একটা হেতু উল্লেখপূর্ব্বক বলিতেছেন—

প্রাণগতেশ্চ ॥৩।১।৩॥

জীবের দেহত্যাগপ্রসঙ্গে অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি, প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইত্যাদি। জীব যখন দেহ ছাড়িয়া গমন করে, প্রাণ তখন তাহার সঙ্গে উৎক্রমণ করে, এবং অপরাপর প্রাণও (ইন্দ্রিয়গণও) প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে উৎক্রমণ করিয়া থাকে ইত্যাদি। এখানে জীবের সঙ্গে মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গের বহির্গমনের কথা রহিয়াছে। কিন্তু প্রাণই হউক, আর ইন্দ্রিয়ই হউক, কেহই নিরাধারভাবে (নিরাশ্রয়ভাবে) থাকিতে বা যাইতে পারে না। প্রসিদ্ধ ভূতবর্গ ই উহাদের আশ্রয়; সুতরাং প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের গতিদ্বারাই উহাদের আশ্রয়রূপ সূক্ষ্ম ভূত-

বর্গের গতিও অনুমিত হয়; সুতরাং ইহাদ্বারাও ভূতবর্গ-সহযোগে জীবের গতি প্রমাণিত হয়। অতএব জীব পরলোকে যাইবার সময়ে যে, সূক্ষ্ম ভূত সঙ্গে লইয়াই যায়, ইহাই শ্রুতির অভিমত সিদ্ধান্ত স্থির হইল ॥ ১—৩ ॥

[কর্ম্মী জীবের স্বর্গাদিগতি]

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার কোথাও স্বর্গাদি-লোকে গমনের কথা, অথবা সেখানে যাইয়া কোনরূপ ফলভোগের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ অপ্‌শব্দ-বাচ্য আহুতি যে, জীবের সঙ্গে অনুগমন করে, এমন কথাও কোন স্থানে স্পষ্টাক্ষরে বলা হয় নাই; অতএব জীব যে, সত্য সত্যই লোকান্তরে ফলভোগের উদ্দেশ্যে ভূতসূক্ষ্ম-সহযোগে গমন করে, এ কথা ত প্রমাণিত হইতেছে না। এই আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক সূত্রকার বলিতেছেন—

অশ্রুতত্বাদিতি চেৎ, ন; ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥ ৩।১।৬ ॥

পূর্ব্বপ্রদর্শিত কোনও শ্রুতিবচনে স্বর্গাদিলোকগতির উল্লেখ নাই বলিয়াই যে, উক্ত সিদ্ধান্ত উপেক্ষণীয় হইবে, তাহা নহে; কারণ, এরূপ বহু শ্রুতিবাক্য আছে, যে সকল বাক্য হইতে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠাতা জীবগণের স্বর্গলোকে বা চন্দ্রলোকে গতির সংবাদ জানিতে পারা যায়। কর্ম্মীদিগের পারলৌকিক গতি-নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন—

"অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভি-

সম্ভবন্তি, * * * আকাশাৎ চন্দ্রমসং, এষ সোমো রাজা ভবতি" ইত্যাদি। অর্থাৎ যে সমস্ত গৃহস্থ কেবল 'ইষ্টাপূর্ত্ত' ও 'দত্ত' কর্ম্মের (১) অনুষ্ঠান করেন, তাহারা মৃত্যুর পর ধূমাদি-পথে (পিতৃযানে) গমন করেন। ক্রমে তাঁহারা আকাশ পর্য্যন্ত যাইয়া সেখান হইতে চন্দ্রলোকে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহারা উত্তম সোম-রূপ প্রাপ্ত হন, ইত্যাদি এবং আরও কয়েকটী শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকার সে সকল বাক্যের সারসংকলনপূর্ব্বক নিজের ভাষায় বলিয়াছেন—

"তেষাং চ অগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদিকর্ম্ম-সাধনভূতা দধিপয়ঃ-প্রভৃতয়ো দ্রবদ্রব্যভূয়স্ত্বাৎ প্রত্যক্ষমেবাপঃ সম্ভবন্তি। তা আহবনীয়ে হুতাঃ সূক্ষ্মা আহুতয়োঽপূর্ব্বরূপাঃ সত্যঃ তানিষ্টাদিকারিণ আশ্রয়ন্তি। তেষাং চ শরীরং নৈধনেন বিধানেনান্ত্যে অগ্নৌ ঋত্বিজো জুহ্বতি 'অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা' ইতি। ততস্তা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক-কর্ম্মসমবায়িন্য আহুতিময্য আপোঽপূর্ব্বরূপাঃ সত্যঃ তানিষ্টাদিকারিণো জীবান্ পরিবেষ্ট্য অমুং লোকং ফলদানায় নয়ন্তীতি যৎ, তদত্র জুহোতিনাভিধীয়তে—শ্রদ্ধাং জুহোতি ইতি।"

---

(১) 'ইষ্ট', 'পূর্ত্ত' ও 'দত্ত' কর্ম্মের পরিচয় এইরূপ—

"অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাং চানুপালনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবং চ 'ইষ্টম্' ইত্যভিধীয়তে ॥"
"বাপী-কূপ-তড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামঃ 'পূর্ত্তম্' ইত্যভিধীয়তে ॥"
"শরণাগতসন্ত্রাণং ভূতানাং চাপ্যহিংসনম্।
বহির্ব্বেদি চ যদ্দানং 'দত্তম্' ইত্যভিধীয়তে ॥"

শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত উক্ত প্রকার তিন শ্রেণীর কর্ম্মক্রমে 'ইষ্ট' 'পূর্ত্ত' ও 'দত্ত' নামে অভিহিত হয়। শ্লোক তিনটীর অর্থ সরল।

মর্ম্মার্থ এই যে, "যাহারা ইষ্ট-পূর্ত্তাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত, তাহাদের অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্র দর্শপূর্ণমাসযাগপ্রভৃতি কর্ম্ম প্রধানতঃ দ্রববহুল দধিঘৃতাদি দ্রব্যদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সে সকল দ্রব্যে যে, জলীয়ভাগ প্রচুরতর, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। দ্রববহুল সেই সকল দ্রব্য আহবনীয় অগ্নিতে আহুত হইবার পর সূক্ষ্ম বাষ্পাকার-ধারণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টাকারে পরিণত হয়, এবং কর্ম্মকর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অবশেষে, সেই কর্ম্মী পুরুষের শরীর শ্মশানাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলে পর, অপূর্ব্বরূপে পরিণত সেই সকল আহুতি (শ্রদ্ধাশব্দে-নির্দ্দিষ্ট অপ্) সেই কর্ম্মী পুরুষকে অর্থাৎ সূক্ষ্ম-শরীরগত জীবকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক কর্ম্মফল দিবার নিমিত্ত পরলোকে (চন্দ্রাদিলোকে) লইয়া যায়। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি 'জুহোতি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যাগাদি কার্য্যে অপ্ বহুল দ্রব্যসকল শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত হয়, এইজন্য শ্রুতির কোন কোন স্থলে অপ্-শব্দের পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধাশব্দও প্রযুক্ত হইয়াছে ইতি"।

উপরি উদ্ধৃত ভাষ্যোক্ত সমাধানপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, যাহারা যাগাদি কর্ম্ম যথানিয়মে নিষ্পাদন করেন, তাহারা নিশ্চয়ই কর্ম্মানুরূপ ফলভোগের জন্য চন্দ্রাদিলোকে গমন করেন, এবং ফলভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই অবস্থিতি করেন ॥৩।১।৭॥

[চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণের ক্রম]

ইষ্টাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃবর্গ ধূমাদি-পথে চন্দ্রমণ্ডলে গমন

করেন, এবং ফলভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই বাস করেন, একথা বলা হইয়াছে। কিন্তু তত্রত্য ভোগ সম্পূর্ণ হইলে, তাহারা কোন পথে কোথায় কিরূপে যান, তাহা বলা হয় নাই; এখন বলিতে হইবে। এসম্বন্ধে উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"তস্মিন্ যাবৎসম্পাতমুষিত্বা, অথৈতমেবাধ্বানং নিবর্ত্তন্তে—যথেতম্" অর্থাৎ কর্ম্মী পুরুষ যে পর্য্যন্ত কর্ম্মফল শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত চন্দ্রমণ্ডলে বাস করিয়া, অনন্তর যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথেই ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রুতির এই উপদেশ স্মরণ করিয়া স্বয়ং সূত্রকার বলিয়াছেন—

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাম্, যথেতমনেবং চ ॥৩।১।৮॥

কর্ম্মফল ভোগের জন্য যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন, তাহারা যখন বুঝিতে পারেন যে, এখানেই আমাদের সুখ-সম্ভোগ শেষ হইল, অতঃপর আমাদিগকে এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। তখন তাহাদের হৃদয়ে এমন দুঃসহ শোক-সন্তাপ উপস্থিত হয় যে, সেই তীব্র সন্তাপের ফলে তাহাদের তত্রত্য জলময় দেহগুলি গলিয়া যায় (১)। সেই অবস্থায় তাঁহারা সূক্ষ্মদেহে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া, যে পথে চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ

(১) প্রাণিদেহ সর্ব্বত্র এক উপাদানে গঠিত ও একরূপ নহে। পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের স্থূল দেহ যেরূপ পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবীরূপ উপাদানে নির্ম্মিত, চন্দ্রমণ্ডলস্থ প্রাণিগণের স্থূল দেহ সেইরূপ জলরূপ উপাদানে রচিত হয়; বরফের পুতুল যেরূপ, ঠিক সেইরূপ হয়। এইজন্য উত্তাপস্পর্শে বরফের ন্যায় সেই জলময় দেহ শোকজ তাপে গলিয়া যায়।

করিয়াছিলেন, সেই পথে কতকটা যাইয়া শেষে অন্যপথ ধরিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং নিজের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে উত্তমাধম যোনিতে জন্মধারণ করেন। এ তত্ত্ব 'দৃষ্ট' হইতে (১) অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রুতি হইতে ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—"তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা" ইত্যাদি। এতদপেক্ষা আরও স্পষ্টতর শ্রুতি-প্রমাণ এই যে,—

"প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥" ইতি

মানুষ ইহলোকে যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, চন্দ্রমণ্ডলে যাইয়া তাহার ফলভোগ শেষ করিয়া পুনরায় কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত সেই চন্দ্রলোক হইতে এই পৃথিবীলোকে প্রত্যাগমন করে। চন্দ্রমণ্ডলে ভোগ শেষ হইলে যে, ইহলোকে পুনরায় আগমন

---

(১) প্রত্যক্ষ প্রমাণ যেরূপ নির্ভুল, শ্রুতিপ্রমাণও ঠিক সেইরূপ নির্ভুল; এইজন্য শ্রুতিকে 'প্রত্যক্ষ' বলা হয়। চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণের সময় ধূমাদিপথ অবলম্বন করিয়া আকাশ বা দ্যুলোকের ভিতর দিয়া চন্দ্রলোকে যাইতে হয়, কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কেবল ধূম ও আকাশের মাত্র উল্লেখ থাকায় এবং ধূমাদি-পথের অপরাপর অংশের কথা না থাকায় বুঝা যায় যে, চন্দ্রমণ্ডলারোহী পুরুষগণ যে পথে আরোহণ করেন, ফিরিবার সময়ে ঠিক সেই পথেই ফিরেন না। সে পথে কেবল ধূম ও আকাশের সহিত সম্বন্ধ হন মাত্র। এই জন্যই সূত্রে 'যথেতম্' যেপ্রকার পথে গমন হইয়াছে, আসিবার সময় 'অনেবং চ' ঠিক সেই পথেই ফিরেন না, কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও আছে, এইকথা বলা হইয়াছে।

করেন, উক্ত শ্রুতিবাক্যদ্বারা তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। স্মৃতিশাস্ত্রও এ কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

"বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বধর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্ট-দেশ-জাতি-কুল-রূপায়ুঃ-শ্রুত-বৃত্ত-বিত্ত-সুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে" ইত্যাদি।

অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক যাহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাহারা মৃত্যুর পর ভোগযোগ্য স্বকৃত কর্ম্মের ফল উপভোগ করিয়া, অবশিষ্ট কর্ম্মানুসারে বিশেষ বিশেষ দেশ, জাতি, কুল (বংশ), রূপ, আয়ুঃ, বিদ্যা, চরিত্র, ধন, সুখ ও মেধা (ধারণাশক্তি) লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এখানেও, লোকান্তরে স্বকৃত কর্ম্মফল-ভোগান্তে অবশিষ্ট কর্ম্মানুসারে পুনরায় জন্মগ্রহণের কথা স্পষ্ট ভাষায় কথিত আছে; সুতরাং কর্ম্মী পুরুষগণ যে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে নিজের অভুক্ত সঞ্চিত কর্ম্ম লইয়া মর্ত্ত্যভূমিতে ফিরিয়া আইসে, তাহাতে আর সংশয় থাকিতে পারে না। পরলোকে অভুক্ত কর্ম্মরাশিকে লক্ষ্য করিয়াই সূত্রে 'অনুশয়' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে(১)। সেই

(১) সূত্রস্থ 'অনুশয়' শব্দের অর্থসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। কেহ বলেন, কর্ম্মী পুরুষগণ যে সকল কর্ম্মের ফলভোগের জন্য চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন, সেখানে তাহারা সেই সকল কর্ম্মের ফল নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া আসিতে পারেন না; কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতেই চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। ঘৃতভাণ্ড হইতে ঘৃত উঠাইয়া লইলেও যেমন তাহাতে কিঞ্চিৎ স্নেহভাগ থাকিয়া যায়, ঠিক তেমনই কর্ম্মী পুরুষেরা চন্দ্রমণ্ডলে যথাসম্ভব

অনুশয়ই চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগমন-সময়ে কর্ম্মীদিগের গন্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। তদনুসারে কেহ উৎকৃষ্ট দেশে, উত্তম বংশে রমণীয় দেহ ও ভোগ-সম্পদ্ প্রাপ্ত হন, কেহ বা নিজ কর্ম্মফলে ইহার বিপরীত অবস্থায় উপনীত হন। 'অনুশয়'-পদবাচ্য কর্ম্মই ঐ সকল পার্থক্যের একমাত্র নিদান ॥৩।১।৮॥

কর্ম্মী পুরুষদিগের চন্দ্রমণ্ডল হইতে ফিরিবার পথসম্বন্ধে—শ্রুতি বলিয়াছেন—

"অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতম্—আকাশং, আকাশাদ্বায়ুং, বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবতি, অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি" ইত্যাদি।

ইহার অর্থ এই যে, চন্দ্রমণ্ডলে দেহ বিগলিত হইবার পর কর্ম্মীরা যে পথে সেখানে গিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন

সমস্ত কর্ম্মফল ভোগ করিলেও কর্ম্মশেষ কিছু অভুক্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়। ভুক্তাবশিষ্ট সেই কর্ম্মাংশই 'অনুশয়' শব্দের অর্থ।

আচার্য্য শঙ্কর এরূপ অর্থ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—কর্ম্মী লোক যে কর্ম্মফল ভোগের জন্য চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন, সেই কর্ম্মের ফল সেখানেই নিঃশেষরূপে ভোগ করেন, তাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না; সুতরাং ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মাংশকে 'অনুশয়' বলা যাইতে পারে না। চন্দ্রমণ্ডলগত কর্ম্মী পুরুষদিগের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মরাশির মধ্যে যে কর্ম্ম তখনও ফল প্রদান করে নাই,—ফলপ্রদানে উন্মুখ হইয়া আছে, যাহাদ্বারা অব্যবহিত পরবর্ত্তী জন্ম ও ভোগাদি নির্ণীত হইবে, ফলপ্রদানোন্মুখ সেই কর্ম্মই 'অনুশয়'-পদবাচ্য। এখানেও সেই অর্থই গ্রাহ্য, পূর্ব্বোক্ত অর্থ নহে।

করেন। প্রথমে আকাশে পতিত হন, এবং আকাশ হইতে বায়ুতে পতিত হন। বায়ু হইয়া ধূম হন, ধূম হইতে অভ্র হন, অভ্রের পর মেঘ হন, মেঘ হইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হন (১) ইত্যাদি। এই শ্রুতিকে উপলক্ষ্য করিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন—

সাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥৩।১।২২॥

উপরি উদ্ধৃত শ্রুতিতে যে, কর্ম্মী পুরুষদিগের আকাশ-ধূমাদি প্রাপ্তির কথা আছে, তাহার অর্থ—কর্ম্মী পুরুষেরা প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে আকাশাদির সঙ্গে মিলিত হইয়া ঐ সকল বস্তুর সমান স্বভাব প্রাপ্ত হন মাত্র, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে এক হইয়া যান না; কারণ, উহা যুক্তিবিরুদ্ধ। কেন না, এক বস্তু কখনই অপর বস্তু হইয়া যাইতে পারে না; পরন্তু অপর বস্তুর তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। এইরূপে আকাশাদির সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীবকে দীর্ঘকাল (নাতিচিরেণ, বিশেষাৎ ॥ ৩।১।২৩ ॥) অতিবাহিত করিতে হয় না,—অতি অল্পকালের মধ্যেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হইতে হয়। কিন্তু ভূমিপতিত জীব যখন—"ব্রীহিযবা ওষধি-বনস্পতয়ঃ, তিলমাষা জায়ন্তে" ব্রীহি (ধান্য), যব, তৃণ, লতা ও বৃক্ষজাতি এবং তিল

(১) এখানে ধূম অর্থ—জলের বাষ্পাবস্থা—যে অবস্থার পরিণামে মেঘের সঞ্চার হয়; অভ্র অর্থ—জলপূর্ণভাব, তখনও বারিবর্ষণের ক্ষমতা হয় নাই, সেই অবস্থা; আর মেঘ অর্থ—বারিবর্ষণ করিবার উপযুক্ত অবস্থা, মেঘের যে অবস্থা হইলে পর বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। এইপ্রকার অবস্থাত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া ধূম, অভ্র ও মেঘ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

মাষকড়াই প্রভৃতি শস্যাকারে প্রাদুর্ভূত হয়, তখনকার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—"অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" এখান হইতে বহির্গমনই বড় কষ্টকর—অত্যন্ত অনিশ্চিত (১)। এই যে, ব্রীহিযবাদি অবস্থা হইতে কষ্টে নির্গমনের কথা, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা হইতে নির্গমনে তত কষ্ট বা কালবিলম্ব ঘটে না। কর্ম্মী পুরুষেরা জন্মধারণের অনুরোধে ব্রীহিযবাদি শস্যের কিংবা তৃণলতাপ্রভৃতি বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিলেও, সে সকল স্থানে তাহাদের কোনরূপ ভোগ থাকে না। ঐ সকল শস্য ও তৃণলতার ছেদনে, কর্ত্তনে, ভক্ষণে কিংবা চূর্ণাদি-অবস্থান্তর করণে তাহাদের কিছুমাত্র যাতনা-বোধ হয় না। কিন্তু যাহারা প্রাক্তন

(১) ব্রীহিযবাদিভাবপ্রাপ্তির পরে নির্গমন যে, কেন অনিশ্চিত, তাহার কারণ এই—জীব কর্ম্মানুযায়ী যেরূপ জন্ম লাভের জন্য যে শস্যমধ্যে প্রবেশ করে, ঘটনাক্রমে সেই শস্যটী যদি এমন কোন প্রাণিকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, যাহার ফলে তাহার অভীষ্ট জন্ম লাভ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। মনে করুন, মনুষ্যজন্ম লাভের জন্য যে জীব যে শস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, কোনও পশু যদি সেই শস্যটী ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার আর মনুষ্য জন্ম লাভ করা সম্ভবপর হয় না। সেই পশুর দেহ হইতে মলমূত্ররূপে নির্গত হইয়া পুনরায় তাহাকে শস্যমধ্যে যাইতে হইবে, সেবারও যদি সেই শস্যটী মনুষ্যের উদরস্থ না হয়, তাহা হইলে তখনও তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইবে; যতক্ষণ মনুষ্য-ভক্ষিত না হইবে, ততক্ষণ এইরূপ অবস্থায়ই তাহাকে থাকিতে হইবে, এইজন্যই এখান হইতে নির্গমন বড় কষ্টকর বলা হইয়াছে।

কর্ম্মবশে ঐ সকল শস্যাদিরূপে জন্মলাভ করে, তাহারাই ঐ সকল দেহের ভাল মন্দ অবস্থাভেদে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে ; কারণ, ঐ সকল বস্তু তাহাদেরই ভোগদেহ—সুখদুঃখ-ভোগের আয়তন, কর্ম্মীদের নহে ; কাজেই সেখানে কর্ম্মীদের কোনপ্রকার ভোগ সম্ভবে না। তাহারা কেবল রেতঃসেকসমর্থ মনুষ্যাদির দেহে প্রবেশের জন্য ঐ সকল বস্তুর সহিত সংসৃষ্ট (সম্বদ্ধ) হয় মাত্র। তাহারা মনুষ্যাদির দেহে প্রবিষ্ট হইয়া শুক্ররূপে পরিণত অন্নরসের সহিত স্ত্রী-দেহে প্রবেশ করিয়াই আপনাদের কর্ম্মানুরূপ দেহ রচনা করিয়া চরিতার্থ হয়॥ ৩।১।২২—২৪, ২৬—২৭॥

[বৈধহিংসায় পাপের অভাব]

কেহ কেহ মনে করেন, যাগাদি কর্ম্মমাত্রই হিংসাসাপেক্ষ। যাগাদি কার্য্যে প্রাণিহিংসার বিধান আছে ; প্রাণিহিংসা উহার একটী অঙ্গ ; অন্ততঃ কর্ম্মমাত্রেই বীজহিংসা অপরিহার্য্য। হিংসার ফল পাপ, পাপের ফল দুঃখভোগ। অতএব কর্ম্মীরা ভোগশেষে যখন চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শস্য ও তৃণলতাদির মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন ঐ সকল বস্তুর নিপীড়নে তাহাদেরও স্বকৃত হিংসাসম্ভূত পাপের ফলে দুঃখভোগ করা অপরিহার্য্য হইতে পারে ; সুতরাং ঐ সকল বস্তুর নিপীড়নে যে, তাহাদের দুঃখ হয় না, এ পক্ষে যুক্তি বা প্রমাণ কি ? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অশুদ্ধমিতি চেৎ, ন, শব্দাৎ ॥৩।১।২৫॥

অর্থাৎ বিধিবোধিত কর্ম্মে হিংসার সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যে, ঐ সকল কর্ম্ম অশুদ্ধ—পাপযুক্ত, তাহা নহে ; কারণ, শব্দ-প্রমাণ বেদই যাগাদি কর্ম্মে প্রাণিহিংসার অনুমতি দিয়াছেন। পাপ পুণ্য নির্দ্ধারণের একমাত্র উপায় হইতেছে বেদ (শব্দ)। বেদের সাহায্য ব্যতীত কেবল যুক্তি বা তর্কের সাহায্যে পাপ-পুণ্য নির্দ্ধারণ করা যায় না। সেই বেদই যখন যজ্ঞকার্য্যে হিংসার বিধান দিয়াছেন, তখন কোন সাহসে বলিতে পারা যায় যে, যজ্ঞাদি কর্ম্মে অনুষ্ঠিত বৈধ হিংসাতেও পাপ হইবে, এবং সেই পাপের ফলে কর্ম্মীরা শস্যাদি-দেহে থাকিয়া দুঃখযাতনা ভোগ করিবেন ? ফল কথা এই যে, বৈধহিংসা করিয়া কর্ম্মীরা কখনই পাপভাগী হন না, এবং শস্যাদি-দেহে প্রবেশ করিয়া পাপফলও ভোগ করেন না। ঐ সকল দেহে তাহাদের সংশ্লেষ মাত্র ঘটে ; আর কিছুই হয় না ॥৩।১।২৫॥

[পাপকর্ম্মীদিগের গতি]

যাঁহারা যাগাদি পুণ্য কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় করেন, মৃত্যুর পর তাঁহাদের চন্দ্রমণ্ডলে গতি হয়, এবং ফল-ভোগান্তে দিব্, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পঞ্চ পদার্থের ভিতর দিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পুনরায় তাহাদিগকে জন্ম ধারণ করিতে হয় ; কিন্তু যাহারা সৎকর্ম্ম-বহির্ম্মুখ পাপাচারী, চন্দ্রমণ্ডলে তাহাদের ভোগ-যোগ্য কোন স্থান বা বস্তু নাই ; সুতরাং সেখানে তাহাদের গমনেও কোন প্রয়োজন নাই। তাহাদের সম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন—

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষাম্ আরোহাবরোহৌ ॥ ৩।১।১৩ ॥

যাহারা যাগাদি পুণ্য কর্ম্ম করে না—পাপকর্ম্মান্বিত, তাহারা মৃত্যুর পর সংযমনপুরে (যমালয়ে) গমন করে, এবং সেখানে কর্ম্মানুরূপ যম-যাতনা ভোগ করিতে থাকে। তাহারা সেখানকার ফলভোগ শেষ করিয়া পুনরায় কর্ম্মফল ভোগের জন্য পৃথিবীতে আগমন করে। যমালয়ে গমনই তাহাদের আরোহ, আর সেখান হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসাই অবরোহ। কঠোপনিষদে এই কথাই যমরাজ নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন—

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্,
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী,
পুনঃপুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥"

অর্থাৎ যাহারা বালক, যাহারা স্বার্থে অমনোযোগী, অথবা যাহারা ধনমোহে অন্ধ, তাহারা মনে করে যে, ইহলোকই একমাত্র সত্য, পরলোক বলিয়া কিছু নাই; সুতরাং পরলোকের জন্য পুণ্য-সঞ্চয়েরও আবশ্যক নাই; তাহারা বারংবার আমার বশ্যতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আমার প্রদত্ত নরক-যাতনা ভোগ করে। এ কথায় মনু, ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণও অনুরূপ সম্মতি-প্রদান করিয়াছেন। পাপীদিগের পাপের তারতম্যানুসারে যাতনা-ভোগের জন্য কতকগুলি স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। সে স্থানগুলির নাম 'নরক'। নরকের স্থূল সংখ্যা কত?—

অপি চ সপ্ত॥ ৩।১।১৫॥

নরকের সমষ্টিসংখ্যা সপ্ত—রৌরব, মহারৌরব ইত্যাদি। এই

সাতপ্রকার নরকের স্বরূপ-পরিচয়প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। যদিও উক্ত সাতপ্রকার নরকে চিত্রগুপ্তপ্রভৃতি বিভিন্ন শাসনকর্ত্তার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় সত্য, তথাপি—

তত্রাপি তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ৩।১।১৬ ॥

সে সকল স্থানেও যমরাজেরই সম্পূর্ণ অধিকার। তাঁহারই শাসনাধীনে থাকিয়া চিত্রগুপ্তপ্রভৃতি শাসনকর্ত্তারা যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া থাকেন; সুতরাং সে সকল স্থানেও যমরাজের প্রভুত্বের বাধা ঘটিতেছে না ॥ ১।১।১৬ ॥

যাহারা বিদ্যার অনুশীলন করেন—উপাসনায় নিরত থাকেন, মৃত্যুর পর তাহারা 'দেবযান' পথ (অর্চ্চিরাদি পথ) অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন, আর যাহারা কর্ম্মনিরত কেবল যাগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা জীবন অতিবাহিত করেন, মৃত্যুর পর তাহারা ধূমাদিপথে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন; কিন্তু যাহারা কর্ম্ম বা উপাসনা, এই উভয় পথের কোন পথেরই অনুসরণ করে না, তাহাদের কিপ্রকার গতি হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে উপনিষদ্ বলিতেছেন—

"অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণচন, তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি—জায়স্ব ম্রিয়স্বেতি, তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" ইতি

অর্থাৎ যাহারা এতদুভয়ের কোন পথেই গমন করে না, তাহারা পুনঃ পুনঃ যাতায়াতশীল 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' (স্বল্পকালজীবী) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে (মশা-মাছী প্রভৃতিরূপে) জন্মলাভ করে।

ইহা হইতেছে স্বর্গ-নরকাতিরিক্ত তৃতীয় স্থান। এই তৃতীয় একটী গন্তব্য স্থান আছে বলিয়াই ঐ চন্দ্রলোক বা যমলোক পরিপূর্ণ হয় না (১)। উক্ত শ্রুতিবাক্যে কেবল 'এতয়োঃ পথোঃ' এই কথা মাত্র আছে; কিন্তু ঐ কথার অর্থ যে, কি, তাহা নির্দ্ধারণ করা দুষ্কর; এই জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

বিদ্যা-কর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥ ৩।১।১৭ ॥

শ্রুতির 'এতয়োঃ' শব্দের অর্থ বিদ্যা ও কর্ম্ম। কারণ, বিদ্যা ও কর্ম্মের প্রসঙ্গেই এই শব্দটী (এতয়োঃ) প্রযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য হইতেছে—যাহারা পূর্ব্বকথিত বিদ্যা-পথে কিংবা কর্ম্মপথে যাইতে অক্ষম অর্থাৎ বিদ্যা ও কর্ম্মপথের অনধিকারী, তাহারা স্বর্গেও যায় না, নরকেও যায় না; তাহারা মশক-মক্ষিকাদিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' নামক তৃতীয় স্থান পূর্ণ করে। বিশেষ এই যে,—

ন তৃতীয়ে, তথোপলব্ধেঃ ॥ ৩।১।১৮ ॥

যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে যাইবার অনধিকারপ্রযুক্ত তৃতীয় স্থানে

(১) প্রথমে প্রশ্ন হইয়াছিল—"বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যত-ইতি" তুমি জান কি—যে কারণে ঐ চন্দ্রলোক ও যমলোক যাত্রীদ্বারা পূর্ণ হইয়া যায় না? তদুত্তরে বলা হইল যে, সকল লোকইত মৃত্যুর পর ঐ লোকে গমন করে না। যাহারা উপাসনায় রত, তাহারা ব্রহ্মলোকে যান; যাহারা কেবল কর্ম্মনিষ্ঠ, তাহারা চন্দ্রলোকে যান; আর যাহারা নিতান্ত পাপী, তাহারা যমলোকে যায়, কিন্তু যাহারা উপাসনাবিমুখ, কিংবা সৎকর্ম্মবিহীন, অথচ পাপকার্য্য-পরাঙ্মুখ, তাহাদের ঐ সকল লোকে গতি হয় না, তাহারা মশক-মক্ষিকাদিরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মধারণ করে; এই কারণেই চন্দ্রাদিলোক পূর্ণ হইয়া যায় না।

যায়, তাহাদের দেহলাভের জন্য আর পঞ্চাগ্নি-সংযোগ আবশ্যক হয় না। 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে যাইবার অধিকারী, কেবল তাহাদেরই দেহোৎপত্তির জন্য দ্যু-পর্জ্জন্যাদি পঞ্চাগ্নি-সম্বন্ধ অপরিহার্য্য হইয়া থাকে (১), কিন্তু যাহারা মনুষ্যশরীর পরিগ্রহ না করিয়া অন্যপ্রকার দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের জন্য আর পঞ্চাহুতি আবশ্যক হয় না, কেন না,—

স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥৩।১।১৯॥

দর্শনাচ্চ ॥৩।১।২০॥

পুরাণ ও ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে প্রদর্শিত লৌকিক উদাহরণ হইতেও ইহা জানা যায়। দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সীতা ও দ্রৌপদীপ্রভৃতির নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সকলেই অযোনি-সম্ভূত, তন্মধ্যে দ্রোণাচার্য্যের দেহোৎপত্তিতে যোষিৎ-সম্বন্ধের অভাব, আর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সীতা ও দ্রৌপদীর দেহধারণে যোষিৎ ও পুরুষ—উভয়-

(১) মৃত ব্যক্তিমাত্রই চন্দ্রমণ্ডলে যাইতে পারে না, তাহার জন্য অধিকার চাই। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যে বৈ কেচিদধিকৃতা অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" অর্থাৎ যাহারা কর্ম্মদ্বারা অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহারাই কেবল মৃত্যুর পর চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন। চন্দ্রমণ্ডল হইতে আসিয়া পুনরায় মনুষ্যাদি দেহ লাভ করিতে হইলেই দিব্-পর্জ্জন্যাদি পঞ্চবিধ অগ্নিতে আহুতিব্যবস্থা অনুসরণীয়; কিন্তু সকলের পক্ষে নহে। স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও অণ্ডজ প্রভৃতির দেহও এই তৃতীয় স্থানের অন্তর্গত। তাহা পরবর্ত্তী "তৃতীয়-শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য" (৩।১।২১) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

সম্বন্ধেরই অভাব পরিলক্ষিত হয় (১)। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই স্থির হয় যে, যাহারা চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মনুষ্যশরীর গ্রহণ করেন, তাহারাই পঞ্চাগ্নিসংযোগে বাধ্য হন, আর যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে যাইবার অনধিকারী—এখানেই কর্ম্মানুরূপ শরীর পরিগ্রহ করেন, তাহাদের শরীরের জন্য আর পঞ্চসংখ্যার কোনই আবশ্যক নাই। নানাপ্রকারে তাহাদের দেহ রচনা হইতে পারে। স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জপ্রভৃতির দেহনির্ম্মাণে যে, স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গের কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারাও সমর্থিত। অতএব দেহ ধারণ করিতে হইলেই যে, সর্ব্বত্র পঞ্চাহুতির আবশ্যকতা আছে, তাহা নহে ॥ ৩।১।১৯—২০ ॥

[স্বপ্নাবস্থা]

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটী অবস্থা জীবজগতে সুপ্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে জাগ্রৎ অবস্থা অতি বিশাল ও বিবিধ বৈচিত্র্যের আধার। জাগ্রৎ অবস্থাই জীবের ব্যবহারিক সুখদুঃখ-সম্পাদনপূর্ব্বক সংসারাসক্তি অধিকতর বৃদ্ধি করিয়া থাকে; এবং মুগ্ধ জীবগণও অসার সংসারকে সত্য মনে করিয়া সতত তাহারই সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। কেহই ইহার অসত্যতা উপলব্ধি করে না, অপরে বলিলেও, তাহা বিশ্বাস করে না, এবং করিবার চেষ্টাও করে না। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথা উন্মত্ত-প্রলাপ জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া থাকে। এইজন্য স্বপ্নদৃষ্টান্তের সাহায্যে

(১) দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির উৎপত্তিবিবরণ মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

জাগ্রৎ-ব্যবহারের অসত্যতা বিজ্ঞাপিত করিবার উদ্দেশ্যে সূত্রকার তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভেই স্বপ্নাবস্থার অবতারণা করিয়াছেন। স্বপ্ন সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তন্মধ্যে—

কেহ কেহ মনে করেন—মানুষ জাগরণসময়ে ভাল মন্দ যে সমুদয় বিষয় দেখে শুনে বা অনুভব করে, সেই সকল বিষয়ের জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেলেও উহাদের সূক্ষ্ম সংস্কারগুলি মানুষের মানস-পটে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত থাকে। নিদ্রাকালে সেই সকল সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া—অতীত বিষয়রাশি স্মরণ করাইয়া দেয়। ভ্রান্তিবশে সেই স্মরণাত্মক জ্ঞানই প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতীত হয় মাত্র; বস্তুতঃ সেখানে প্রত্যক্ষ করিবার মত কোন বাস্তব বিষয়ও নাই, এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানও নাই; সমস্তই স্মৃতির বিলাসমাত্র। এ আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥৩।২।১॥

জাগরণ ও সুষুপ্তি-অবস্থার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বপ্নাবস্থাকে 'সন্ধ্য' বলা হয়। সেই সন্ধ্য-অবস্থায় অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নের মধ্যস্থলবর্ত্তী স্বপ্নাবস্থায় যে সমস্ত বস্তু দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত বস্তুই তৎকালের জন্য সৃষ্ট (উৎপন্ন) হইয়া প্রত্যক্ষ-গোচর হয়; সুতরাং সে সমস্ত দৃশ্য কেবলই স্মরণমাত্র নহে। শ্রুতি একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" অর্থাৎ সেখানে (স্বপ্নে) রথ নাই, রথের ঘোড়া নাই, পথও নাই; কিন্তু রথ, রথযোগ্য অশ্ব ও পথসকল সৃষ্টি করে। জীবই সে সৃষ্টির কর্ত্তা। এই শ্রুতির উপদেশ হইতে

বুঝা যায় যে, স্বপ্ন-সময়ে দৃশ্য বস্তুসকলের যথার্থই সৃষ্টি হইয়া থাকে; উহা কেবল ভ্রান্তি বা কল্পনামাত্র নহে। শ্রুতি যে, কেবল সৃষ্টির কথামাত্র বলিয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু—

নির্ম্মাতারং চৈকে, পুত্রাদয়শ্চ ॥৩।২।২॥

কোন কোন শ্রুতি আবার আত্মাকেই স্বপ্ন-দৃশ্য সেই সকল পুত্রাদি কাম্য বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ" অর্থাৎ এই পুরুষ (জীবাত্মা) স্বপ্নসময়ে ইচ্ছামত কাম্য বিষয়সমূহ নির্ম্মাণ করতঃ জাগরিত থাকে। অন্যত্র আবার আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"স হি তস্য কর্ত্তা" সেই দ্রষ্টা জীবই সেই স্বপ্নদৃশ্য রথাদিসৃষ্টির কর্ত্তা; অর্থাৎ জীব নিজেই দৃশ্য বিষয়সমূহ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে; সুতরাং ঐ সকল বস্তু কেবলই স্মরণমাত্র নহে, পরন্তু তৎকালোৎপন্ন প্রাতিভাসিক (১)।

---

(১) অদ্বৈতবাদীরা সত্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। যাহা চিরকালই সত্য, কখনও অসত্য বা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তাহা পারমার্থিক সত্য, যেমন ব্রহ্ম। যাহা কেবল ব্যবহারদশায় সত্যরূপে ব্যবহৃত হয়, পরমার্থদর্শনে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা ব্যবহারিক সত্য, যেমন জল, বায়ু, তেজঃ প্রভৃতি পদার্থ। আর যাহা পরমার্থতও সত্য নহে, ব্যবহারদশায়ও সত্য নহে, অথচ সাময়িকভাবে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়,—যতক্ষণ প্রতীতি, ততক্ষণই সত্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়—শোক হর্ষাদির সমুৎপাদক হয়, আবার প্রতীতি-নাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহা 'প্রাতিভাসিক' সত্য; যেমন রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত প্রভৃতি।

এইজন্য ঐ সকল বস্তু জীবকর্তৃক নিৰ্ম্মিত হইলেও ব্যবহারিক বস্তুর ন্যায় সত্য নহে, পরন্তু—

মায়ামাত্রং তু কাৎস্ন্যের্নানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ ॥৩।২।৩।
সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৩।২।৪॥

স্বপ্নদৃশ্য পুত্র পশুপ্রভৃতি বস্তু জীবসৃষ্ট হইলেও পরমার্থ সত্য নহে, সমস্তই মায়ামাত্র—মায়াকল্পিত—অসত্য। এইজন্যই স্বপ্নদৃশ্য কোন বস্তুই সম্পূর্ণ যথাযথরূপে প্রকাশ পায় না। যে বস্তু যে দেশে, যে কালে ও যে ভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত, স্বপ্নে তাহার কোন সম্বন্ধই থাকে না। জীর্ণ কুটীরে শয়ান দীন-দরিদ্র ব্যক্তিও স্বপ্ন-সময়ে আপনাকে দূরদেশস্থ প্রাসাদোপরি সুখশয্যায় শয়ান দেখিতে পায়। কখন কখন এরূপও স্বপ্ন-দর্শন হইয়া থাকে যে, নিজে যেন বহু দূরদেশে যাইয়া বহুবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে; অথচ সেখান হইতে ফিরিয়া আসি-বার পূর্ব্বেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে নিজেকে যথাস্থানে বর্ত্তমান দেখিতে পায়। এইরূপ আরও শত শত দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে, যে সম্বন্ধে কাহারো কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাস করিবার অবসর নাই। স্বপ্নদর্শন বাস্তব সত্য হইলে এরূপ বিসদৃশ সংঘটন কখনই সম্ভবপর হইত না; সুতরাং স্বপ্নদর্শনকে মায়ামাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হয় নাই।

স্বপ্ন নিজে মায়িক বা অসত্য হইলেও, কখন কখন ভবিষ্যৎ শুভাশুভ সম্ভাবনা সূচনা করিয়া থাকে। অদূর-ভবিষ্যৎ জীবনে যে সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা নিশ্চয় ঘটিবে,

তাহাও কোন কোন স্বপ্নদর্শন হইতে নিঃসংশয়িতভাবে জানিতে পারা যায়। শ্রুতির উপদেশ হইতেও এ তত্ত্ব স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, এবং যাহারা স্বপ্নবিদ্যা-বিশারদ, তাহারাও একথা বলিয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥"
"পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি, স এনং হন্তি" ইত্যাদি।

অর্থাৎ যাগাদি কাম্য কর্ম্ম আরম্ভের পর কর্ত্তা যদি স্বপ্ন-যোগে কোনও স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন যে, তাহার আরব্ধ কর্ম্ম সুসম্পন্ন ও সুফলপ্রদ হইবে। আর স্বপ্নে যদি কেহ কৃষ্ণদন্তযুক্ত কৃষ্ণকায় পুরুষমূর্ত্তি দর্শন করে, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষই তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে। পৌরাণিক স্বপ্নাধ্যায়ে এসম্বন্ধে বহু বিস্তৃত আলোচনা ও উদাহরণ সন্নিবেশিত আছে; জিজ্ঞাসু পাঠক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি পুরাণে অনুসন্ধান করিবেন॥৩।২।৩—৪॥

[সুষুপ্তি অবস্থা]

জাগরণের পর যেমন স্বপ্নাবস্থা, স্বপ্নের পর তেমনি সুষুপ্তি-অবস্থার আবির্ভাব হয়। যে অবস্থায় মানুষ আপনার কোন অবস্থাই অনুভবে আনিতে পারে না; এবং আপনার হিতাহিত বা শুভাশুভ বুঝিতে পারে না; অধিক কি, আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অনুভব করিতে পারে না, তাহাই আলোচ্য সুষুপ্তি-অবস্থার স্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ

স্বপ্নঃ ন বিজানাতি, আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ বিরতব্যাপার হইলে পর, সুপ্ত পুরুষ যখন সম্প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ সুষুপ্তি-অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন জীব এই সমুদয় নাড়ীতে প্রবিষ্ট হয় ইত্যাদি। এইরূপ আরও বহু স্থানে সুষুপ্তির কথা বর্ণিত আছে। কোথাও আছে—"পুরীততি শেতে," কোথাও আছে—"সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি," তখন সৎ-পদবাচ্য পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়, আবার কোথাও আছে—"য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে" ইত্যাদি। এই সকল বাক্যের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে স্বতই সংশয়ের উদয় হয় যে, সুষুপ্তির প্রকৃত স্থান কোনটী—নাড়ী? কিংবা পুরীতৎ? অথবা ব্রহ্ম (হৃদয়াকাশ)? বিভিন্ন শ্রুতিতে ঐ তিন স্থানেরই উল্লেখ রহিয়াছে; সুতরাং তত্ত্ব-নির্ণয় করা সহজ হয় না। এই দুরপনেয় সংশয়-নিরসনার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

তদভাবো নাড়ীষু, তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥৩।২।৭॥

সুষুপ্তি-অবস্থার উদয়ে স্বপ্নাবস্থার অবসান হয়; এইজন্য সুষুপ্তিকে 'তদভাব'-শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জীব যখন নাড়ীপথে অগ্রসর হইয়া পুরীতৎস্থানের ভিতর দিয়া পরমাত্মাতে উপস্থিত হয়, তখনই পূর্ণ সুষুপ্তি সম্পন্ন হয়। কেবল নাড়ী, বা কেবল পুরীতৎ, অথবা কেবলই আত্মা সুষুপ্তির স্থান নহে; পরন্তু নাড়ী, পুরীতৎ (হৃদয়বেষ্টনী) ও আত্মা, এই তিনই পর্য্যায়ক্রমে সুষুপ্তি অবস্থা সম্পাদন করিয়া থাকে;

সুতরাং ঐ তিনটী স্থানই সুষুপ্তির স্থান। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন— "সমুচ্চয়েনৈতানি নাড্যাদীনি স্বাপায়োপৈতি, ন বিকল্পেন" অর্থাৎ জীব সুষুপ্তির জন্য নাড়ীপ্রভৃতি সমস্তস্থানেই ক্রমশঃ গমন করে, কিন্তু বিকল্পে নহে—অর্থাৎ কখনও নাড়ীতে, কখনও পুরীততে, কখনওবা আত্মাতে, এরূপ নহে। টীকাকার গোবিন্দানন্দও সমুচ্চয়পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক বলিয়াছেন—"নাড়ীদ্বারা পুরীততং গত্বা ব্রহ্মণি শেতে" অর্থাৎ নাড়ীপথে পুরীততে যাইয়া ব্রহ্মেতে বিশ্রাম করে। ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই যখন সুষুপ্তির শেষ ভূমি বা বিশ্রামস্থান, তখন সুষুপ্তির অবসানেও—

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ১।২।৮ ॥

সেই পরমাত্মা হইতেই জীবের প্রবোধ বা প্রত্যাগমন প্রমাণিত হইতেছে। "সত আগম্য ন বিদুঃ—সত আগচ্ছামহে" অর্থাৎ জীবগণ প্রবোধসময়ে সৎ—পরমাত্মা হইতে আসিয়াও বুঝিতে পারে না যে, আমরা সৎ—পরমাত্মার নিকট হইতে আসিয়াছি, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও যথোক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতেছে; সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্তকে অসঙ্গত বা অপ্রামাণিক বলা যাইতে পারে না।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, সুষুপ্তিসময়ে জীবের যখন কোনপ্রকার আত্ম-পরিচয়ই থাকে না, এবং স্বয়ং শ্রুতিও যখন তৎকালে জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলিতেছেন—"সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি", আর ব্রহ্মলাভের পরে যখন প্রত্যাগমনও

সম্ভবপর হয় না, তখন সেই জীবই যে, প্রবোধকালে ফিরিয়া আইসে, তাহার প্রমাণ কি ? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ ॥৩।২।৯॥

সেই জীবই যে, ফিরিয়া আইসে, ইহা অপ্রামাণিক নহে ; তাহার কর্ম্ম, অনুস্মৃতি ও শব্দই (শ্রুতিই) তদ্বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সুষুপ্ত ব্যক্তিকে জাগরণের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত অসম্পূর্ণ কর্ম্মের শেষাংশ পূরণ করিতে এবং পূর্ব্বানুভূত বিষয়গুলি স্মরণ করিতে দেখা যায়, সুষুপ্ত ও জাগরিত ব্যক্তি এক না হইলে এরূপভাবে শেষাংশপূরণ ও পূর্ব্বানুভূত স্মরণ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সুষুপ্ত ব্যক্তির পুনরুত্থান সম্ভবপর না হইলে, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মোপদেশেরও সার্থকতা থাকে না। কারণ, সুষুপ্তিতেই যদি জীবের সমস্ত শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে জাগ্রৎকালীন কর্ম্মের ফলভোগ করা তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং একের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল যে, অপরে ভোগ করিবে, ইহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। অথচ সুষু-প্তের পুনরুত্থান স্বীকার করিলে এ সকল আপত্তি উঠিতেই পারে না। তাহার পর, শ্রুতি বলিয়াছেন—"পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব" অর্থাৎ 'সুষুপ্ত ব্যক্তি বুদ্ধান্তা-বস্থা (জাগরিতাবস্থা) লাভের জন্য পুনরায় নিজ নিজ আশ্রয়-স্থানে গমন করে।' এবং "ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা * * * যদ্‌যদ্ ভবন্তি, তৎ তদা ভবন্তি" অর্থাৎ 'সুষুপ্তির পূর্ব্বে ব্যাঘ্র, বৃক বা সিংহ প্রভৃতিরূপে যে যাহা ছিল,

সুতরাং ঐ তিনটী স্থানই সুষুপ্তির স্থান। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন— "সমুচ্চয়েনৈতানি নাড্যাদীনি স্বাপায়োপৈতি, ন বিকল্পেন" অর্থাৎ জীব সুষুপ্তির জন্য নাড়ীপ্রভৃতি সমস্তস্থানেই ক্রমশঃ গমন করে, কিন্তু বিকল্পে নহে—অর্থাৎ কখনও নাড়ীতে, কখনও পুরীততে, কখনওবা আত্মাতে, এরূপ নহে। টীকাকার গোবিন্দানন্দও সমুচ্চয়পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক বলিয়াছেন—"নাড়ীদ্বারা পুরীততং গত্বা ব্রহ্মণি শেতে" অর্থাৎ নাড়ীপথে পুরীততে যাইয়া ব্রহ্মেতে বিশ্রাম করে। ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই যখন সুষুপ্তির শেষ ভূমি বা বিশ্রামস্থান, তখন সুষুপ্তির অবসানেও—

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ১।২।৮ ॥

সেই পরমাত্মা হইতেই জীবের প্রবোধ বা প্রত্যাগমন প্রমাণিত হইতেছে। "সত আগম্য ন বিদুঃ—সত আগচ্ছামহে" অর্থাৎ জীবগণ প্রবোধসময়ে সৎ—পরমাত্মা হইতে আসিয়াও বুঝিতে পারে না যে, আমরা সৎ—পরমাত্মার নিকট হইতে আসিয়াছি, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও যথোক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতেছে; সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্তকে অসঙ্গত বা অপ্রামাণিক বলা যাইতে পারে না।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, সুষুপ্তিসময়ে জীবের যখন কোনপ্রকার আত্ম-পরিচয়ই থাকে না, এবং স্বয়ং শ্রুতিও যখন তৎকালে জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলিতেছেন—"সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি", আর ব্রহ্মলাভের পরে যখন প্রত্যাগমনও

সম্ভবপর হয় না, তখন সেই জীবই যে, প্রবোধকালে ফিরিয়া আইসে, তাহার প্রমাণ কি ? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ ॥৩।২।৯॥

সেই জীবই যে, ফিরিয়া আইসে, ইহা অপ্রামাণিক নহে; তাহার কর্ম্ম, অনুস্মৃতি ও শব্দই (শ্রুতিই) তদ্বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সুষুপ্ত ব্যক্তিকে জাগরণের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত অসম্পূর্ণ কর্ম্মের শেষাংশ পূরণ করিতে এবং পূর্ব্বানুভূত বিষয়গুলি স্মরণ করিতে দেখা যায়, সুষুপ্ত ও জাগরিত ব্যক্তি এক না হইলে এরূপভাবে শেষাংশপূরণ ও পূর্ব্বানুভূত স্মরণ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সুষুপ্ত ব্যক্তির পুনরুত্থান সম্ভবপর না হইলে, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মোপদেশেরও সার্থকতা থাকে না। কারণ, সুষুপ্তিতেই যদি জীবের সমস্ত শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে জাগ্রৎকালীন কর্ম্মের ফলভোগ করা তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং একের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল যে, অপরে ভোগ করিবে, ইহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। অথচ সুষুপ্তের পুনরুত্থান স্বীকার করিলে এ সকল আপত্তি উঠিতেই পারে না। তাহার পর, শ্রুতি বলিয়াছেন—"পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব" অর্থাৎ 'সুষুপ্ত ব্যক্তি বুদ্ধান্তাবস্থা (জাগরিতাবস্থা) লাভের জন্য পুনরায় নিজ নিজ আশ্রয়স্থানে গমন করে।' এবং "ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা * * * যদ্যদ্ ভবন্তি, তৎ তদা ভবন্তি" অর্থাৎ 'সুষুপ্তির পূর্ব্বে ব্যাঘ্র, বৃক বা সিংহ প্রভৃতিরূপে যে যাহা ছিল,

সুষুপ্তিভঙ্গের পরেও সে তাহাই হয়,' এই সকল বেদবাণী হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি সুষুপ্তিদশা প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই পুনরায় জাগরণ-অবস্থায় উপনীত হয়, এবং আপনার প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া কৃতার্থ হয়।

অতএব, বুঝিতে হইবে যে, সুষুপ্তিসময়ে জীব সৎ-সম্পন্ন হইলেও—পরমাত্মার সহিত মিলিত হইলেও—আত্মদর্শী মুক্ত পুরুষের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে মিলিত হয় না; তখনও তাহার প্রাক্তন কর্ম্মরাশি সঙ্গেই থাকে, কিন্তু আত্মদর্শীর কোনপ্রকার কর্ম্মসম্বন্ধ থাকে না; থাকে না বলিয়াই ব্রহ্মলাভের পর তাঁহাকে আর ফিরিয়া, আসিতে হয় না, কিন্তু অনাত্মজ্ঞ পুরুষকে ব্রহ্মলাভের পরও ফিরিয়া আসিতে হয়। প্রাক্তন কর্ম্মরাশিই তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া আসে, এবং পুনরায় সংসারভোগে নিয়োজিত করে (১)।

---

(১) সুষুপ্তি অবস্থাকে দৈনন্দিন 'প্রলয়' বলা হয়। এ সময়ে জীবের ভোগোপকরণ সমস্তই 'কারণশরীর' নামক অজ্ঞানে বিলীন হইয়া যায়; থাকে কেবল প্রাক্তন কর্ম্মসমূহ। সেই সমুদয় কর্ম্ম লইয়াই জীব পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়। অজ্ঞান থাকে বলিয়াই জাগ্রৎকালে আপনার আত্মানুভূতি ব্যক্ত করিতে পারে না, এবং কর্ম্মরাশি সঙ্গে থাকায় সেখানেও চিরকাল থাকিতে পারে না, ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। উপনিষৎ বলিয়াছেন—

"সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি।
পুনশ্চ জন্মান্তর-কর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ ॥" ইত্যাদি।

[মূর্চ্ছা-অবস্থা]

উক্ত সুষুপ্তি-অবস্থার আলোচনাপ্রসঙ্গে সূত্রকার লোক-প্রসিদ্ধ মূর্চ্ছাবস্থার সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥৩।২।১০॥

মূর্চ্ছা-অবস্থা যখন মৃত্যু বা সুষুপ্তি-অবস্থার অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে না, তখন বাধ্য হইয়াই ঐ অবস্থাকে 'অর্দ্ধ-সম্পত্তি' বলিতে হইবে। সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের পূর্ণমাত্রায় সৎ-সম্পত্তি হয় (ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়), কিন্তু মূর্চ্ছাকালে ঠিক তাহা হয় না, আধা-আধি হয়; অতএব মূর্চ্ছা-অবস্থাকে 'অর্দ্ধ-সম্পত্তি' বলাই সুসঙ্গত হয় (১)।

[পরব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ]

সুষুপ্তিসময়ে জীব, যে পরমাত্মার (ব্রহ্মের) সহিত সম্মিলিত হয়, এবং প্রবোধসময়েও যাঁহা হইতে প্রত্যুত্থিত হয়, সেই পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে সূত্রকার বলিতেছেন—

অরূপবদেব হি তৎ-প্রধানত্বাৎ ॥৩।২।১৪॥

আলোচ্য পরব্রহ্ম নিশ্চয়ই অরূপবৎ, কোনপ্রকার রূপ বা আকারাদি বিশেষধর্ম্ম তাঁহার নাই; তিনি সর্ব্বতোভাবে নীরূপ—

---

(১) এখানে ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"নিঃসজ্ঞত্বাৎ সম্পন্নঃ, ইতরস্মাচ্চ বৈলক্ষণ্যাৎ অসম্পন্নঃ ইতি" অর্থাৎ সুষুপ্তি-অবস্থায় যেমন সংজ্ঞা থাকে না, তেমনি মূর্চ্ছাকালেও সংজ্ঞা থাকে না; এই কারণে সুষুপ্তের ন্যায় মূর্চ্ছাপ্রস্তকেও সম্পন্ন বলা যাইতে পারে। আবার মুখের মালিন্য ও বিকৃতি প্রভৃতি বৈলক্ষণ্য থাকায় অসম্পন্নও বলা যাইতে পারে।

নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। ব্রহ্মের এবংবিধ স্বরূপ নির্দ্দেশ করাই—“অস্থূলম্ অনণু, অহ্রস্বমদীর্ঘম্” “দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের একমাত্র লক্ষ্য, তদ্ভিন্ন আর যে সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষভাব উপদিষ্ট আছে, সে সকল বাক্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে উপাসনাবিধির বিষয়-প্রদর্শন। কোনপ্রকার গুণ বা রূপ-সম্বন্ধ ব্যতীত নিরাকারের উপাসনা সম্ভবপর হয় না; এই কারণে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেও গুণরূপাদি বিশেষভাব সমারোপপূর্ব্বক ঐ সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মের সবিশেষভাব প্রতিপাদন করাই উহাদের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং সে সকল শ্রুতিবাক্যদ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষভাব প্রমাণিত হয় না।

যাহারা বলেন, শ্রুতিতে যখন সগুণ নির্গুণ উভয়ভাবই বর্ণিত আছে, তখন ব্রহ্মের উভয়ভাবই সত্য—তিনি সগুণও বটে, নির্গুণও বটে। বস্তুতঃ তাহাদের এ কথা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। কারণ, এক বস্তু কখনও দুই রকম হয় না, এক রকমই হয়। যাহার যাহা স্বতঃসিদ্ধ ভাব, তাহার সেভাব কখনই পরিবর্ত্তিত হয় না, বা হইতে পারে না। অগ্নি কখনও উষ্ণ-অনুষ্ণ দুই রকম হয় না, ব্রহ্মসম্বন্ধেও সেই কথা। ব্রহ্ম যদি সবিশেষই হন, তাহা হইলে কখনই নির্ব্বিশেষ নহে, আর যদি নির্ব্বিশেষই হন, তাহা হইলেও সবিশেষ হইতে পারেন না। যাহা হয়, একরূপই হইতে হইবে। এমত অবস্থায় প্রধানতঃ ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ যখন ব্রহ্মকে নির্গুণ—নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন, তখন

ব্রহ্মপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্যবিহীন উপাসনাকাণ্ডীয় শ্রুতির অনুরোধে ব্রহ্মের সবিশেষভাব বা উভয়স্বভাব স্বীকার করিতে পারা যায় না। তবে, একই প্রকাশ (সূর্য্যাদির আলোক) যেমন নানাবিধ বস্তু-সংযোগে নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়, কিন্তু তাহার প্রকৃত স্বরূপ নষ্ট হয় না, অক্ষুণ্ণই থাকে, তেমনি বিবিধ উপাধি-সংযোগের ফলে নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নানাবিধ আকারে প্রকটিত হইলেও তাঁহার স্বাভাবিক রূপ (নির্গুণ নির্ব্বিশেষভাব) অব্যাহতই থাকে। শ্রুতি নিজেও 'সৈন্ধব-ঘন' প্রভৃতি দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মের একরূপতাই (চৈতন্যরূপতাই) জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং "নেতি নেতি" (তিনি ইহা নহেন,—ইহা নহেন) ইত্যাদি বাক্যে তৎসম্বন্ধে যতপ্রকার বিশেষভাবের প্রাপ্তি-সম্ভাবনা ছিল, সে সমস্ত প্রতিষেধ করিয়া ব্রহ্মের নিরুপাধিক—নির্ব্বিশেষ চৈতন্যরূপতাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব প্রবল শ্রুতিপ্রমাণ ও তদনুকূল যুক্তিদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য পরব্রহ্ম স্বভাবতই নিরাকার—নির্ব্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপ।

যাহারা বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধনা-বিহীন অনির্ম্মলমতি, তাহাদের নিকট তিনি অব্যক্ত—'নৈব বাচা ন মনসা দ্রষ্টুং শক্যং ন চক্ষুষা", কিন্তু যাহারা তাঁহার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তাহাদের নিকট তিনি সুব্যক্ত—"বুদ্ধি-গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্"—অতীন্দ্রিয় হইয়াও বুদ্ধিগম্য হন। তাঁহাকে বুদ্ধিগম্য করিতে হইলে যেরূপ যোগ্যতা বা অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়, তাহা উপাসনা-সাপেক্ষ; সেইজন্য জনহিতৈষিণী শ্রুতি তাঁহার

সগুণভাব, 'পাদ'ভেদ ও অংশাংশিভাব বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত-পক্ষে তিনি অখণ্ড, অনন্ত, নিত্য চৈতন্যস্বরূপ ॥৩।২।১১—৩৭॥

[সগুণোপাসনার ফল]

কর্ম্মী পুরুষেরা যেরূপ, দেহত্যাগের পর চন্দ্রলোকে গমন করেন, সগুণ-ব্রহ্মোপাসকগণও সেইরূপ দেহত্যাগের পর 'দেবযান'-পথে (১) ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ইহা সমস্ত উপাসনার সাধারণ ফল। আত্মদর্শনবিহীন মনুষ্যমাত্রই পাপ-পুণ্যের আশ্রয়; সম্পূর্ণরূপে পাপ-পুণ্যরহিত মানুষ অত্যন্ত দুর্লভ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, উপাসকগণের পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ-পুণ্যরাশির গতি কি হয়? তাঁহারা কি দেহত্যাগের সময়ই স্বীয় পাপ-পুণ্যরাশি বিদূরিত করেন, কিংবা মধ্যপথে করেন, অথবা ব্রহ্মলোকে যাইয়া ত্যাগ করেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ, তথাহ্যন্যে ॥৩।৩।২৭॥

ব্রহ্মলোকযাত্রী উপাসকের সঞ্চিত পাপ-পুণ্যরাশি সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মলোকে যাইবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। সেখানে পাপ-পুণ্যের ফলভোগ হয় না; মধ্যপথেও পাপ-পুণ্য-দ্বারা করণীয় এমন কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, যাহার জন্য উপাসককে পাপ-পুণ্যরাশি সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে; কাজেই

(১) দেবযানপথের পরিচয় এইরূপ—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥"

বলিতে হইবে যে, তাহারা পূর্ব্বসঞ্চিত পাপপুণ্যরাশি এখানেই—দেহত্যাগের পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়া যান। শ্রুতি বলিতেছেন—"তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" অর্থাৎ 'উপাসক দেহত্যাগ করিবার সময়ে তাহার পুত্রগণ ধনসম্পদ্ গ্রহণ করে, এবং বন্ধুবর্গ ও শত্রুপক্ষ যথাক্রমে পুণ্য ও পাপের অংশ গ্রহণ করে। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, উপাসকগণ দেহত্যাগের পূর্ব্বেই পাপ-পুণ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক 'দেবযান'-পথ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন ।৩৩২৭—৩১॥

[বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত উপাসকদিগের অবস্থিতিকাল]

উপাসকদিগের মধ্যে যাহারা উপাসনাকার্য্যে সমধিক সমুৎকর্ষলাভ করেন, এখানেই সমস্ত পুণ্য-পাপ ক্ষয় করিতে সমর্থ হন, তাহারা দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং সেখানেই জ্ঞানানুশীলন করিয়া থাকেন, আর যাহারা ততটা উৎকর্ষলাভ করিতে পারে না, এবং সঞ্চিত কর্ম্মরাশিও দগ্ধপ্রায় করিতে পারে না, তাহারা মৃত্যুর পর কর্ম্মানুযায়ী বিভিন্নপ্রকার অধিকার প্রাপ্ত হন, তাহাদিগকে 'আধিকারিক' পুরুষ বলে। যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি। তন্মধ্যে যাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না; পরন্তু যাঁহারা স্বীয় কর্ম্মানুসারে অধিকারবিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও সহসা সংসারে ফিরিতে হয় না; বরং—

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ।৩৩৩২ ॥

আধিকারিক পুরুষদিগের স্বকৃত কর্ম্মানুসারে লব্ধ অধিকারের ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতি হইয়া থাকে। কর্ম্মের ফল সর্ব্বত্রই দেশ-কালাদি-পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং আধিকারিক পুরুষদিগের লব্ধ অধিকারও নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ—নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কল্পিত, চির-দিনের জন্য নহে। যতকাল সেই নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হয়, তত-কালই তাহাদের লব্ধ অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইলেই সে অধিকার আর থাকে না; সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন আপনাদের অধিকার ও ঐশ্বর্য্যের অনিত্যতাদর্শনে সহজেই তাঁহাদের হৃদয়ে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয়, এবং ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানের অভ্যুদয় হইতে থাকে। সেই জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধপ্রায় অজ্ঞান ও সঞ্চিত কর্ম্মরাশি তাঁহাদিগকে আর জন্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে না।

"বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥"

অগ্নিদগ্ধ শস্যবীজ যেমন পুনরায় অঙ্কুর-সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না, তেমনি অবিদ্যাদি ক্লেশ ও ক্লেশমূলক (১) কর্ম্মরাশি জ্ঞান-দগ্ধ হইলে সে সকলের দ্বারাও আত্মা সংস্পৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ

---

(১) অবিদ্যাস্মিতা-রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ॥

(পাতঞ্জলসূত্র ২।৩)।

অর্থাৎ ক্লেশ পাঁচ প্রকার। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা অস্মিতাপ্রভৃতির বিশেষ পরিচয় পাতঞ্জলে দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মাধীন হইয়া জন্মাদি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন না (১)। অতএব অধিকার সমাপ্তির পরেই আধিকারিক পুরুষেরা পরমপদ-লাভে বিমুক্ত হন; আর সংসারে ফিরেন না ॥ ৩।৩।৩২ ॥

[উপাসনা ও কর্ম্ম]

বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে সগুণ উপাসনা-সম্বন্ধে বহু কথা আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন প্রকারে প্রদর্শিত ব্রহ্মোপাসনার সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের প্রণালী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে অল্পকথায় সে সমস্ত বিষয় বোধগম্য করান সম্পূর্ণ অসম্ভব; এইজন্য এখানে সে সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ বা আলোচনা পরিত্যাগ করা হইল। অতঃপর চতুর্থ পাদে বর্ণিত উপাসনার প্রাধান্যসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

ব্রহ্মোপাসনা কর্ম্মসাপেক্ষ কি না, অর্থাৎ উপাসনার সহিত বিধিবোধিত কর্ম্মের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না, অথবা কর্ম্মের সহায়তা ব্যতিরেকেও উপাসনার ফল হইতে পারে কি না, এ

---

(১) বস্তুতঃ কর্ম্ম ও অবিদ্যাদি ক্লেশ জ্ঞানদ্বারা দগ্ধ হয় না,—দগ্ধপ্রায়—দগ্ধের মত হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—"কর্ম্মণাং দাহশ্চ সহকার্য্যুচ্ছেদেন নৈষ্ফল্যম্" (সাংখ্যসার) শাস্ত্রে যে, 'জ্ঞানাগ্নিতে কর্ম্ম-দগ্ধ হয়' কথা আছে, তাহার অর্থ—ভস্মীভূত হওয়া নহে, পরন্তু যে অবিদ্যাদি ক্লেশের সহায়তায় কর্ম্মসমূহ ফলপ্রসূ হয়, সেই সহকারীর বিনাশে কর্ম্মের ফলপ্রসবে অসমর্থতা। তণ্ডুল যেমন তুষরহিত হইয়া অঙ্কুর জন্মায় না, কর্ম্মও তেমন অবিদ্যাদিরহিত হইয়া ফল প্রদান করে না।

বিষয়ে বিভিন্নপ্রকার বহুতর মতবাদ আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্ব-মীমাংসা-প্রণেতা আচার্য্য জৈমিনি বলেন—

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥৩।৪।২॥

যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, কর্ম্মকর্ত্তা হয় সেই কর্ম্মের শেষ (অঙ্গ)। সেই কর্ত্তার করণীয় যদি কোনও জ্ঞান বা উপাসনা বিহিত থাকে, তাহা বস্তুতঃ সেই প্রধানভূত কর্ম্মের সহিতই সংশ্লিষ্ট—কর্ম্মেরই অঙ্গ বা অধীন, স্বতন্ত্র নহে; সুতরাং সেই সকল উপাসনাতে যে, পৃথক্ পৃথক্ ফলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাও—অন্যান্য কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধে উল্লিখিত ফলের ন্যায় কেবল অর্থবাদমাত্র, অর্থাৎ পুরুষের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ কল্পিত স্তুতিবাদমাত্র—বাস্তব নহে। অতএব উপাসনামাত্রই কর্ম্মসাপেক্ষ হওয়া উচিত, অর্থাৎ উপাসকগণকেও উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। 'ব্রহ্মবিদ্' বলিয়া প্রসিদ্ধ জনকপ্রভৃতির আচারদর্শনেও এ কথা প্রমাণিত হয়। তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াও কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিরত ছিলেন না, এতত্ত্ব শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও জানিতে পারা যায়। এইরূপ আরও বহু কারণ আছে, যাহাদ্বারা জ্ঞানীর পক্ষেও কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা প্রমাণিত হইতে পারে। এতদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, না—

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ ॥ ৩।৪।১ ॥

পুরুষের পরমার্থলাভের (মুক্তিলাভের) উপায়ভূত যে, জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই কর্ম্ম-সাপেক্ষ নহে। কর্ম্মের কোনপ্রকার সহায়তা না লইয়াই জ্ঞান পুরুষার্থসাধনে সমর্থ হয়। জ্ঞান-সহযোগে

কর্ম্মেরই উৎকর্ষ সিদ্ধ হয়, কিন্তু কর্ম্মসহযোগে জ্ঞানের সমুৎকর্ষ হয় না ; অধিকন্তু উপাসনা ব্যতিরেকেও যেমন কর্ম্ম হইতে পারে, তেমনি কর্ম্ম ব্যতিরেকেও জ্ঞান ও জ্ঞানফল নিষ্পন্ন হইতে পারে। তবে যে, স্থানে স্থানে জ্ঞান ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানের উপদেশ আছে, তাহা কেবল জ্ঞানমার্গের প্রশংসাজ্ঞাপকমাত্র। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্তের বিশুদ্ধতা সম্পন্ন হয়। বিশুদ্ধ চিত্তে স্বতই আত্মজ্ঞান প্রসারিত হয় ; এইজন্য জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত প্রথমে নিত্য নৈমিত্তিক বা নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হয় সত্য, কিন্তু জ্ঞানোদয় হইলে—আত্মা নিত্য নির্ব্বিকার, সুখ-দুঃখের অতীত অকর্ত্তা-ইত্যাকার বোধ সমুৎপন্ন হইলে পর কর্ম্মের অনুষ্ঠান দূরে থাকুক,—

উপমর্দ্দঞ্চ ॥৩।৪।১৬॥

কর্ম্ম ও কর্ম্ম-প্রবৃত্তি আপনা হইতেই বাধিত হইয়া যায়। তখন কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগিতা মনোমধ্যে স্থানই পায় না ; তখন আত্মার স্বরূপ-সাক্ষাৎকারের প্রবৃত্তিই বলবতী হইয়া উঠে, এবং তদনুকূল সাধন-সংগ্রহেই সমধিক আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সেইজন্য সূত্রকার জ্ঞানানুকূল উপায়-নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতেছেন—

শম-দমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ, তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া
তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥৩।৪।২৭॥

যদিও জ্ঞান আপনার ফলসম্পাদনের জন্য অপর কাহারো অপেক্ষা করে না সত্য, তথাপি আত্মজিজ্ঞাসু পুরুষ অবশ্যই শম-দমাদি সাধনসম্পন্ন হইবেন ; কারণ, "তস্মাৎ শান্তো দান্ত

উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ”, ‘অতএব আত্মজিজ্ঞাসু পুরুষ শান্ত, দান্ত, উপরত (ভোগ-বিরত বা সন্ন্যাসী), তিতিক্ষু ও সমাধিসম্পন্ন হইয়া আপনাতে আপনাকে (আত্মাকে) দর্শন করিবেন’ ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্ম-জ্ঞানলাভের অঙ্গরূপে শমদমাদি সাধনসমূহের অবশ্যানুষ্ঠেয়তা বিহিত হইয়াছে (১)। অতএব আত্মজ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিকে উক্ত শম-দমাদি সাধনগুলি অবশ্যই গ্রহণ করিতে হয়। যোগ্যতানুসারে সন্ন্যাসগ্রহণেরও বিধান আছে। সন্ন্যাসীর পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি না থাকিলেও ভিক্ষাচর্য্যাদি নিয়ম-নিষ্ঠা প্রতিপালনের কঠোর আদেশ রহিয়াছে; সুতরাং সন্ন্যাসীও সর্ব্বতোভাবে নিয়মের অতীত হইতে পারেন না; তাঁহাকেও পালনীয় নিয়ম লঙ্ঘন করিলে প্রত্যবায়ী ও সংঘচ্যুত হইতে হয় (২)। সূত্রকার বলেন— “তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবঃ” (৩।৪।৪০)

---

(১) শান্ত অর্থ—অন্তরিন্দ্রিয়সংযমী। দান্ত অর্থ— বহিরিন্দ্রিয়সংযমী, উপরত অর্থ—একবার বশীকৃত ইন্দ্রিয়গণকে পুনরায় বিষয়ে যাইতে না দেওয়া। কেহ কেহ বলেন, উপরত অর্থ—সন্ন্যাসী। তিতিক্ষু অর্থ—শীত-গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু। সমাহিত অর্থ—একাগ্রচিত্ত।

(২) ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ এই যে,—

“আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা।”

অর্থাৎ একবার নৈষ্ঠিক ধর্ম্মে আরোহণ করিয়া যে লোক তাহা হইতে চ্যুত হয়, তাহার পক্ষে এমন কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না, যাহা দ্বারা সেই আত্মঘাতী বিশুদ্ধ হইতে পারে।

অর্থাৎ যে লোক একবার উন্নত পদে আরোহণ করিয়াছে, তাহার আর সে পদ হইতে ফিরিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ সন্ন্যাসী বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহার নিস্তার নাই—

বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥৩।৪।৪৩॥

তাহার সেই পাপ উপপাতকই হউক, আর মহাপাতকই হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিতেই হইবে, ইহাই স্মৃতিশাস্ত্রের আদেশ এবং সাধুসম্প্রদায়ের চিরন্তন ব্যবহার। এই কারণে সন্ন্যাসীকেও নিয়ম-নিষ্ঠার অধীন হইয়া চলিতে হয়, নচেৎ তাহার পতন অনিবার্য্য। অতএব আত্মজিজ্ঞাসুমাত্রই সেই সমুদয় পতনীয় কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া এবং শমদমাদি-সাধনসম্পন্ন হইয়া উপাসনায় মনোনিবেশ করিবেন ॥৩।৪।—৪৩॥

[উপাসনার প্রভেদ ও চিন্তার ক্রম]

শাস্ত্রোক্ত উপাসনা বহুশাখায় বিস্তৃত হইলেও প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—সম্পদ্-উপাসনা, প্রতীকোপাসনা ও অহংগ্রহোপাসনা। তন্মধ্যে—কোন এক ক্ষুদ্র বা অপকৃষ্ট বস্তুর অপকৃষ্টভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহাকে যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তুরূপে উপাসনা, তাহার নাম সম্পদ্-উপাসনা। যেমন পার্থিব মূর্ত্তিবিশেষে পরমেশ্বরের উপাসনা। কোন একটী অংশবিশেষকে যে, অংশিরূপে বা পূর্ণ-বুদ্ধিতে উপাসনা, তাহা প্রতীকোপাসনা। যেমন ব্রহ্মের অংশভূত মনে ও আদিত্যে

ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা। আর উপাস্য বিষয়ের সহিত উপাসকের যে, অভেদ-বুদ্ধিতে (অহংভাবে) উপাসনা, তাহার নাম অহং-গ্রহোপাসনা। যেমন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমি ব্রহ্ম-ইত্যাকারে উপাসনা। এই তিনপ্রকার উপাসনাই সাধারণতঃ প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ আছে।

[জীবাত্মায় ব্রহ্মদৃষ্টি]

অহং-গ্রহোপাসনাস্থলে আত্মাতে ও ব্রহ্মেতে অভেদচিন্তার উপদেশ আছে। এখন সংশয় হইতেছে এই যে, 'অহম্'এ (আত্মাতে) ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে হইবে? না ব্রহ্মেতে অহং-বুদ্ধি করিতে হইবে? (১)। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ ॥৪ ১।৩॥

যদিও আত্মা ও ব্রহ্ম মূলতঃ এক—অভিন্ন পদার্থ, তথাপি অহং-পদবাচ্য আত্মাতেই ব্রহ্ম-দৃষ্টি করিতে হইবে, অর্থাৎ আত্মাকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্মেতে আত্ম-দৃষ্টি করিতে হইবে না; কারণ, "অহং ব্রহ্মাস্মি" (আমিই ব্রহ্ম) ইত্যাদি

(১) সংশয়ের কারণ এই যে,—অহং-পদবাচ্য আত্মা রাগদ্বেষাদি-দোষে দূষিত, আর পরমাত্মা ব্রহ্ম নিত্য নির্দ্দোষ—পরম পবিত্র। এমত অবস্থায় অহংপদবাচ্য আত্মাকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না, এবং পরম পবিত্র পরমাত্মাকেও 'অহং'রূপে চিন্তা করা যায় না; কারণ, তাহাতে ব্রহ্মের পবিত্রতার হানি করা হয়। এই কারণে আপাত-দর্শনে ঐরূপ সংশয় হইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, তত্ত্বদৃষ্টিতে এরূপ সংশয় আসিতেই পারে না; কারণ, জীবাত্মাও প্রকৃতপক্ষে রাগদ্বেষাদি দোষযুক্ত নহে, পরন্তু নিত্যমুক্ত ও বিশুদ্ধ।

স্থলে ঐরূপেই ব্রহ্মচিন্তার উপদেশ রহিয়াছে, এবং "তত্ত্বম্ অসি" (তুমি সেই ব্রহ্ম) ইত্যাদি শ্রুতিও জীবকেই ব্রহ্মরূপে প্রতিবোধিত করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও ব্রহ্মে জীবভাব আরোপিত করেন নাই। এইজাতীয় আরও বহু শ্রুতিবাক্য আছে, সে সকল বাক্য পর্য্যালোচনা করিলেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, জীবেই ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্মেতে জীবদৃষ্টি নহে। যুক্তির অনুসরণ করিলেও বুঝা যায় যে,—

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥৪।১।৫॥

অপকৃষ্ট বস্তুকে উৎকৃষ্ট বস্তুরূপে চিন্তা করিলেই বস্তুতঃ অপকৃষ্ট বস্তুর গৌরব বা প্রশংসা সূচিত হয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট বস্তুকে অপকৃষ্ট বস্তুরূপে চিন্তা করিলে, তাহা তাহার প্রশংসার কারণ না হইয়া, বরং সমধিক নিন্দারই কারণ হইয়া থাকে; এই কারণেই 'মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত' মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে, "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ" আদিত্যকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে, ইত্যাদি স্থলে যেরূপ অপকৃষ্ট মনে ও আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে হয়, সেইরূপ অপকৃষ্ট (অজ্ঞানবশে সুখদুঃখময় সংসারে পতিত) জীবাত্মাতেই ব্রহ্ম-দৃষ্টি করা শোভন ও যুক্তিসঙ্গত হয়। অতএব উপাসক অভেদোপাসনাকালে আপনাকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিবেন, কিন্তু ব্রহ্মে 'অহংভাব' আরোপ করিবেন না। এবং—

ন প্রতীকে, নহি সঃ ॥ ৪।১।৪ ॥

অহং-গ্রহোপাসনাস্থলে অহং-বুদ্ধিতে ব্রহ্মচিন্তা করিতে হয়

বলিয়া যে, "মনো ব্রহ্ম (মনই ব্রহ্ম) ইত্যাদি প্রতীকোপাসনাস্থলেও মনপ্রভৃতিতে অহং-দৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা নহে; কারণ, বিভিন্নপ্রকার প্রতীক পদার্থ মন ও আকাশ প্রভৃতি কখনই সেই উপাসকের আত্ম-স্বরূপ নহে, এবং তিনি সেরূপ দর্শনও করেন না, ভেদবুদ্ধিই তাহার বাধক থাকে। অতএব কোন উপাসকই মনপ্রভৃতি কোন প্রতীক বস্তুকে আত্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবেন না; কেবল ঐ দুই পদার্থের (মনঃ ও ব্রহ্মের) অভেদ-চিন্তামাত্র করিবেন। সম্পদ্-উপাসনা ও কর্ম্মাঙ্গ-উপাসনার স্থলেও এই নিয়ম মান্য করিয়া চলিতে হইবে।

[উপাসনার বারংবার কর্ত্তব্যতা]

যাগাদি ক্রিয়া একবারমাত্র অনুষ্ঠান করিলেই যেরূপ সম্পূর্ণ ক্রিয়া-ফল পাওয়া যায়, তাহার জন্য আর বারংবার অনুষ্ঠান করিতে হয় না, উপাসনা সেরূপ করিলে হয় না; কারণ, উপাসনার বিধি স্বতন্ত্র—

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ।৪।১।১॥

সাধারণতঃ উপাসনা বা আত্মচিন্তা ও তদনুকূল সাধনানুষ্ঠান মাত্র একবার করিলে হয় না, অর্থাৎ একবারমাত্র শ্রবণ, একবারমাত্র মনন, এবং একবারমাত্র নিদিধ্যাসন করিয়াই শাস্ত্রের আদেশ পালন করা হইল, মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না; কারণ, তাহাতে কোন ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যে কার্য্যের ফল অদৃষ্ট—অপ্রত্যক্ষ—দেখিবার উপায় নাই, সেখানে একবারমাত্র অনুষ্ঠানেই শাস্ত্রের আদেশ রক্ষিত হয়, এবং ভবিষ্যৎ ফললাভেরও

আশা করা সঙ্গত হয়, কিন্তু যাহার ফল সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ-গম্য—কর্ত্তা নিজেই অনুভব করিতে সমর্থ, সে কার্য্যের সম্বন্ধে কেবল শাস্ত্রের আদেশ প্রতিপালন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে ভুল করা হয়। সেখানে ফলোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিতে হয়। ক্ষুধানিবৃত্তির উদ্দেশ্যে লোক ভোজনে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু সেখানে একবার এক গ্রাসমাত্র ভোজন করিয়া নিয়ম রক্ষা করিলে ত ফলোদয় (ক্ষুধানিবৃত্তি) হয় না, এবং কতবার কতগ্রাস ভোজন করিলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে, তাহাও নির্দ্ধারণ করিয়া বলা যায় না; পরন্তু যতবার যতগ্রাস ভোজন করিলে ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, তাহা তিনি (ভোজনকর্ত্তা) নিজেই বুঝিতে পারেন, এবং তদনুসারে তিনি পুনঃ পুনঃ খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিয়া থাকেন; তেমনি উপাসনাকার্য্যের অনুষ্ঠানও কতবার ক[illegible]লে যে, ফল-নিষ্পত্তি হইবে, তাহা অপরে নির্দ্দেশ করিতে পারে না: তাহা তিনি (উপাসক) নিজেই উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন, তদনুসারে তিনি ফলোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বারংবার সাধনানুষ্ঠান করিয়া থাকেন—পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করেন, একবার-মাত্র করিয়াই নিবৃত্ত হন না ও হইবেন না। ইহাই সাধনশাস্ত্রের আদেশ ও অভিপ্রায়। এসম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, যে সকল উপাসনার ফল বর্ত্তমান জন্মে উপভোগ্য নহে, কেবল পরলোকভোগ্য, সে সকল উপাসনা অবলম্বন করিয়া মধ্যস্থলে—সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে ত্যাগ করিবে না, পরন্তু—

আপ্রায়ণাৎ, তত্রাপি হি দৃষ্টম্॥ ৪।১।১২॥

সেরূপ উপাসনা জীবনের শেষসীমা—মৃত্যুকালপর্য্যন্ত চালাইতে হয়; কারণ, শাস্ত্রে দেখা যায়, প্রয়াণকালেও সাধু চিন্তার বিধান আছে, এবং তদনুসারে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ফলপ্রাপ্তিরও উল্লেখ রহিয়াছে।—যথা—"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্" ইত্যাদি ॥৪।১।১—২,১২॥

[উপাসনায় আসনবিধি]

কার্য্যমাত্রেই স্থান ও আসনাদির বিধিব্যবস্থা দৃষ্ট হয়; সুতরাং উপাসনাসম্বন্ধেও স্থান ও আসনাদির নিয়ম-ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে কর্ম্মাঙ্গ-আশ্রিত উপাসনা যখন কর্ম্মবিধিরই অধীন, তখন কর্ম্মকাণ্ডোক্ত স্থান ও আসনাদির নিয়মই সেখানে গ্রহণীয়; সুতরাং এখানে সে সম্বন্ধে চিন্তা করা অনাবশ্যক। আত্মজ্ঞানের সম্বন্ধেও সেই কথা। আত্মজ্ঞান যখন বস্তুতন্ত্র অর্থাৎ জ্ঞানে যখন বিজ্ঞেয় বস্তুরই সর্ব্বতোভাবে প্রাধান্য, তখন তাহাতেও স্থানাসনাদির অপেক্ষা থাকিতে পারে না। ফলে, একমাত্র সগুণ-উপাসনার জন্যই স্থান ও আসনাদি-চিন্তা আবশ্যক হইতেছে। তন্মধ্যে স্থানসম্বন্ধে বহুপ্রকার বিধিনিষেধসত্ত্বেও সূত্রকার সংক্ষেপতঃ বলিয়াছেন—

যত্রৈকাগ্রতা, তত্রাবিশেষাৎ ॥৪।১।১১ ॥

যেখানে বসিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়, সংসারের সর্ব্ববিধ আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া ধ্যেয় বিষয়ে একাগ্র হয়, সেইরূপ স্থানই (সাধারণভাবে নিষিদ্ধ হইলেও) উপাসনার পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান।

উপাসক তাদৃশ উত্তম স্থান নির্ব্বাচন করিয়া, তথায় উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন; এবং—

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৪।১।৭ ॥

আসনবদ্ধ হইয়া—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসনপ্রভৃতি যে কোন একটী আসন অবলম্বন করিয়া উপাসনায় বসিবেন। কারণ, ঐ ভাবে আসনবদ্ধ হইয়া ধ্যান বা উপাসনা করিলেই ধ্যেয় বিষয়ে একাগ্রতা লাভ করা সম্ভবপর হয়, নচেৎ গমনাদিসময়ে ধ্যান করিতে বসিলে চিত্তের বিক্ষেপ উপস্থিত হইতে পারে, এবং শয়ান অবস্থায় ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেও সহজেই নিদ্রাকর্ষণ হইতে পারে, অথচ আসীন হইয়া—অক্লেশকর ও অচঞ্চল আসন অবলম্বন করিয়া উপাসনায় বসিলে সহজেই উপাস্যবিষয়ে মনোনিবেশ সুসম্পন্ন হইতে পারে; অতএব আসনবদ্ধ হইয়াই উপাসনা করিবে, এবং তাহাই ফলসিদ্ধির প্রধান উপায় ॥ ৪।১।৭—৯ ॥

[সগুণোপাসকের মৃত্যুকালীন অবস্থা]

কর্ম্মী পুরুষেরা চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন, একথা সাধারণভাবে বলা হইয়াছে, এবং মুক্ত পুরুষদিগের যে, লোকান্তর-গতি নাই, সে কথাও পরে বলা হইবে। এখন সগুণোপাসনায় রত পুরুষদিগের দেহত্যাগকালীন অবস্থা বলা যাইতেছে। তাঁহাদের যখন অন্তিম সময় সন্নিহিত হয়, তখন—

বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে, দর্শনাৎ শব্দাচ্চ ॥ ৪।২।১ ॥
অতএব সর্ব্বাণ্যনু ॥ ৪।২।২ ॥
তন্মনঃ প্রাণে ॥ ৪।২।৩ ॥

তাঁহাদের দেহ অসার হইয়া পড়ে; ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য হইতে

বিরত হইতে আরম্ভ করে। প্রথমে বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিরত হয়, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তি মনেতে বিলীন হয়, তৎকালে বাক্‌শক্তি নিরুদ্ধ হইলেও মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে ; মন তখনও অভ্যাসজ সংস্কারানুসারে শুভাশুভ চিন্তাদ্বারা হর্ষ-বিষাদ অনুভব করিতে থাকে। তখন বাগিন্দ্রিয়ের ন্যায় চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণেরও বৃত্তি বা ক্রিয়াশক্তি মনেতে বিলীন হয়, অর্থাৎ চক্ষু কর্ণপ্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তি নিরুদ্ধ হইয়া মনোবৃত্তির অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়। একথা যেমন—"বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রমাণিত হয়, তেমনই প্রত্যক্ষ-দর্শন দ্বারাও সমর্থিত হয়। কারণ, মুমূর্ষু ব্যক্তির বাক্‌শক্তি নিরুদ্ধ হইলেও, মুখের অবস্থা দেখিয়া তাহার মানসিক চিন্তাবৃত্তির অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। অনন্তর মনের ক্রিয়াশক্তিও নিরুদ্ধ হইয়া যায়, মনোবৃত্তি প্রাণের অধীন হয়, অর্থাৎ তখন মনের চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হয়, কেবল প্রাণের ক্রিয়াশক্তি—পরিস্পন্দনমাত্র বিদ্যমান থাকে। ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন যে, যে সময় দেহের সমস্ত ক্রিয়া থামিয়া যায়, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও নিরুদ্ধ হইয়া যায় ; জীবিত কি মৃত, ইহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে, সে সময়েও লোকে মুমূর্ষুর বক্ষঃস্থল ও নাভিদেশ পরীক্ষা করিয়া দেখে। যদি সেস্থানে অতি অল্পমাত্রও স্পন্দন উপলব্ধি করে, তবে জীবিত বলিয়া অবধারণ করে, নচেৎ মৃত নিশ্চয় করিয়া অনন্তরকরণীয় কার্য্য করিয়া থাকে, ইহাই লোক-ব্যবহার। অতএব মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ

হইবার পরেও যে, প্রাণবৃত্তি বিদ্যমান থাকে, ইহাতে আর সংশয় করিবার কারণ নাই। এই প্রাণ আবার কোথায় লয় পায়? এতদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

সোঽধ্যক্ষে, তদুপগমাদিভ্যঃ ॥ ৪।২।৪ ॥

সেই প্রাণ দেহাধ্যক্ষ আত্মাতে লয় পায়, অর্থাৎ প্রাণ তখন সম্পূর্ণভাবে আত্মার সহিত সম্মিলিত হয়; কাজেই তৎকালে প্রাণের কোনপ্রকার ক্রিয়া—পরিস্পন্দন দেহমধ্যে প্রকাশ পায় না। এবিষয়ে উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"এবমেব ইমমাত্মানম্ অন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি" অর্থাৎ অন্তিম সময়ে এই প্রকারেই সমস্ত প্রাণ এই জীবাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। এই উপনিষদ্বাক্য হইতেই দেহাধ্যক্ষ আত্মাতে প্রাণের সম্মিলন প্রমাণিত হইতেছে। প্রাণ দেহাধ্যক্ষ আত্মাতে মিলিত হইলে পর—

ভূতেষুতঃ শ্রুতেঃ ॥ ৪।১।৫ ॥

সেই প্রাণসম্বলিত অধ্যক্ষও আবার তেজঃপ্রভৃতি ভূত-বর্গের মধ্যে প্রবেশ করে। অভিপ্রায় এই যে, যেই মুহূর্ত্তে প্রাণ যাইয়া আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, আত্মাও সেই মুহূর্ত্তেই এই দেহের সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া পরলোকে দেহ-রচনার উপযোগী তেজঃপ্রভৃতি সূক্ষ্ম ভূতবর্গের সহিত মিলিত হইয়া প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হয়, (১) এবং বহির্গমনের

---

(১) লয়সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্," অর্থাৎ প্রাণ লয় পায় তেজে, তেজ আবার লয় পায় পরা-দেবতাতে (আত্মাতে)। এখানে যদিও তেজেতেই প্রাণ-লয়ের কথা আছে, অধ্যক্ষে লয়ের কথা নাই সত্য; তথাপি সূত্রকারের কথার অপ্রামাণ্য

পথ অন্বেষণ করিতে থাকে। তাহাকে গমনোপযোগী পথ দেখাইবার জন্যই যেন তখন "তদোকোঽগ্রজ্বলনম্" (৪।১।১৭)—তাহারই বাসভূমি (ওকঃ) হৃদয়ের অগ্রভাগ উজ্জ্বল আলোকময় হইয়া উঠে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি—চক্ষুষ্টোবা মূর্ধ্নো বা, অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ", সেই মুমূর্ষু জীবের হৃদয়াগ্রভাগ প্রদীপ্ত হয়; সেই আলোকের সাহায্যে জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ করে। তাহার নির্গমনের পথ যথাসম্ভব চক্ষু, মূর্ধা (ব্রহ্মরন্ধ্র), কিংবা অন্যান্য দেহাবয়বও হইতে পারে (১)। এ পর্য্যন্ত সকল

শঙ্কা করা উচিত নহে। ভাষ্যকার এস্থলে বলিয়াছেন—"যো হি স্রুঘ্নাৎ মথুরাং গত্বা, মথুরায়াঃ পাটলিপুত্রং ব্রজতি, সোঽপি—স্রুঘ্নাৎ পাটলিপুত্রং যাতি-ইতি শক্যং বদিতুম্। তস্মাৎ প্রাণসংযুক্তাধ্যক্ষস্যৈব এতৎ তেজঃ-সহচরিতেষু ভূতেষু অবস্থানম্ ইতি।" তাৎপর্য্য এই যে, যে লোক স্রুঘ্নদেশ হইতে যাত্রা করিয়া মথুরা হইয়া পাটনায় যায়, তাহাকেও স্রুঘ্নদেশ হইতে পাটনায় যাইতেছে বলিতে পারা যায়, এইরূপ, প্রাণ যদি অধ্যক্ষের সহিত মিলিত হইয়াও তেজেতে মিলিত হয়, তাহা হইলেও "প্রাণঃ তেজসি"—প্রাণ তেজে লয় পায়, একথা বলিতে পারা যায়।

(১) দেহের কোন অংশের ভিতর দিয়া কোন জীব যায়, অন্য শ্রুতিতে তাহার বিবরণ আছে—

"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং চোর্দ্ধমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥"

অর্থাৎ মনুষ্যহৃদয়ে একশত একটা নাড়ী আছে, তাহাদের একটী নাড়ী উর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেই নাড়ীপথে যাহারা নিষ্ক্রান্ত হন, তাহারা মুক্তিলাভ করেন, অন্যান্য স্থানে যাইবার জন্য অপরাপর নাড়ীপথ অবলম্বন করেন।

জীবের অবস্থাই প্রায় সমান। এখানে অজ্ঞ-বিজ্ঞে প্রভেদ নাই, যোগী-ভোগীতে পার্থক্য নাই; এ পর্য্যন্ত গতি সকলের পক্ষেই তুল্য। বিশেষ এই যে, অবিদ্বান্ ও উপাসক যথোক্তপ্রকারে ভূতসূক্ষ্ম আশ্রয় করিয়া যথাযোগ্য পথে প্রস্থান করেন, আর জ্ঞানী পুরুষ মোক্ষের জন্য কেবল নাড়ীপথমাত্র অবলম্বন করেন ॥ ৪।২।৪—৭ ॥

[সূক্ষ্ম শরীরের পরিমাণ ও স্থিতিকাল]

লয়প্রকরণে পঠিত—"বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" এই শ্রুতিনির্দ্দেশ ও "সোঽধ্যক্ষে" এই সূত্রনির্দ্দেশ অনুসারে বলা হইয়াছে যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির অন্তিম সময় সন্নিহিত হইলে, বাক্‌শক্তি মনের অধীন হয়, মনোবৃত্তি প্রাণের অধীন হয়, প্রাণ অধ্যক্ষ-আত্মাতে বিলীন হয়, প্রাণাদিসংবলিত অধ্যক্ষ সূক্ষ্ম তেজের অধীন হয়, সেই তেজঃ আবার প্রাণ, মন, অধ্যক্ষ, ইন্দ্রিয়বর্গ ও অপরাপর সূক্ষ্ম ভূতের সহিত একযোগে পরা-দেবতা পরমাত্মায় বিলীন হয়। এখানে বলা আবশ্যক যে, সূক্ষ্ম শরীরের সহযোগিতা ব্যতীত দেহাধ্যক্ষ জীবের কোনপ্রকার কার্য্য করাই সম্ভবপর হয় না; সুতরাং 'অধ্যক্ষের লয়' অর্থে সূক্ষ্ম শরীরেরই লয় বুঝিতে হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পরা-দেবতা পরমাত্মা সকলেরই মূল কারণ। কার্য্য বা উৎপন্ন বস্ত্বান্তরই স্ব স্ব মূল কারণে লয়প্রাপ্ত হয়—মূল কারণের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়, তাহার আর ফিরিয়া আসা সম্ভবপর হয় না; বরফ্ জলে পড়িলে

জল হইয়া যায়, তাহার আর পুনরাবির্ভাব হয় না বা হইতে পারে না। মৃত্যুকালে জীব যদি সূক্ষ্ম শরীর ও তেজঃপ্রভৃতি সূক্ষ্ম ভূতের সহিত পরমাত্মায় বিলীন হয়, তাহা হইলে ত উহারা সকলেই পরমাত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাইবে, কেহই আর পৃথক্ বা বিভক্ত থাকিবে না, উহাদের পুনরুত্থানও সম্ভবপর হইবে না; তৎকালেই মুক্তি নিষ্পন্ন হইতে পারে; সুতরাং উহা-দের আর লোকান্তর-গমন বা অন্যপ্রকার কর্ম্মফলভোগের অবসর কোথায়? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

তদ্ আপীতেঃ সংসার-ব্যপদেশাৎ ॥ ৪।২।৮ ॥

'অপীতি' অর্থ—আত্মজ্ঞানোদয়ে সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ের পর ব্রহ্মেতে লয়। তাদৃশ অপীতি (লয়) আর মুক্তি একই কথা। যতদিন পর্য্যন্ত জীবের তাদৃশ 'অপীতি' বা ব্রহ্মসম্পত্তি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম শরীর বিধ্বস্ত বা বিনষ্ট হয় না। জীব সেই সূক্ষ্ম শরীর আশ্রয় করিয়া এবং তেজঃপ্রভৃতি সূক্ষ্মভূতে বেষ্টিত হইয়া স্বর্গ নরকাদি স্থানে গমনপূর্ব্বক সংসার (জন্ম-মরণপরম্পরা) ভোগ করিয়া থাকে।

উক্ত সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ অবয়বে রচিত (১), পরিমাণে অতি সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম বলিয়াই পার্শ্বস্থ লোকেরা ইহার নির্গমন

---

(১) সূক্ষ্ম শরীরের সপ্তদশ অবয়ব এই—

'পঞ্চ প্রাণ-মনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"

পঞ্চ প্রাণ—(প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান), মন, বুদ্ধি এবং

দেখিতে পায় না। স্থূল শরীরের বিকারে ইহার বিকার হয় না, বিনাশেও বিনাশ হয় না, এবং প্রলয়কালেও উচ্ছেদ হয় না। ইহা অনাদিকাল হইতে আছে, এবং অনন্তকাল থাকিবে—যতদিন জীবের পরামুক্তি সিদ্ধ না হয়। ৪।২।৮—১২।

এই সূক্ষ্ম শরীরের সাহায্যেই জীবগণ পরাপর-ব্রহ্মবিদ্যা অর্জনে সমর্থ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যাহারা অপর ব্রহ্মবিদ্যা অর্জন করেন, তাহারা এই সূক্ষ্ম শরীরের সাহায্যে উৎক্রমণ করেন, (তাহাদের উৎক্রমণের প্রণালী পরে বলা হইবে); আর যাঁহারা পরব্রহ্মবিদ্যা অধিগত হইয়া অবিদ্যা-বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের আর উৎক্রমণ করিতে হয় না, এখানেই সূক্ষ্ম শরীর ও তৎসহচর সূক্ষ্মভূত সকল বিলয় প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে সূত্রকার বলিয়াছেন—

তানি পরে, তথাহাহ। ৪।২।১৫।

যে সূক্ষ্ম শরীর ও ভূতবর্গ অপরাবিদ্যাসেবীদিগের উৎক্রমণে সহায় হয়, সেই সূক্ষ্ম শরীর ও ভূতবর্গই আবার পরাবিদ্যার উপাসকদিগের উপকারসাধনে সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ হয়; এবং আপনাদের করণীয় কিছু না থাকায় পরাদেবতা পরমাত্মায় যাইয়া এমনভাবে বিলয়প্রাপ্ত হয় যে, আর কখনও তাহাদের বিভাগ বা পুনরুত্থান সম্ভবপর হয় না। এ বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন—

কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ ও জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, এই সপ্তদশ অবয়বসমন্বিত সূক্ষ্মশরীর, ইহার অপর নাম লিঙ্গ শরীর। সাংখ্যমতে অহঙ্কারও একটী অবয়ব, সুতরাং সেইমতে অবয়বসংখ্যা অষ্টাদশ হয়।

"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ইহৈব সমবলীয়ন্তে" অর্থাৎ 'সেই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের প্রাণসকল (ইন্দ্রিয়প্রভৃতি) উৎক্রমণ করে না, এখানেই বিলীন হইয়া যায়' ইত্যাদি। আরও বহু শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যদ্বারা এ কথা সমর্থিত হইয়াছে; সে সব কথা পরে আলোচিত হইবে, এখন উপাসকদিগের উৎক্রমণের প্রণালী আলোচনা করা যাইতেছে ॥ ৪।২।১৩—১৬ ॥

[উপাসকদিগের উৎক্রমণ-প্রণালী]

অপরাবিদ্যাসেবী উপাসকগণের উৎক্রমণচিন্তাপ্রসঙ্গে মৃত্যু-কালীন অবস্থা, এবং সূক্ষ্ম শরীরের স্বরূপ ও স্থিতিকালপ্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করা হইয়াছে; এবং সেখানে একথাও বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মী ও উপাসকগণ এই সূক্ষ্ম শরীরের সাহায্যেই স্থূল দেহ হইতে বিভিন্ন পথে বহির্গত হয়, আর জীব-মুক্ত পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর এখানেই বিলীন হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহার আর পরলোকগতি বা উৎক্রমণ সম্ভবপর হয় না। কর্ম্মী-দিগের গতিপ্রণালী পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, এখন কেবল উপাসক-গণের উৎক্রমণ প্রণালী বলা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উপাসক মৃত্যুকালে হৃদয়দেশ হইতে অগ্রসর হইয়া মূর্দ্ধন্য নাড়ীপথে নিক্রান্ত হন, কিন্তু তাহার নিক্রমণে কোনপ্রকার অবলম্বন থাকে কি না, সে কথা বলা হয় নাই; এখন বলা হইতেছে—

রশ্ম্যনুসারী ॥ ৪।২।১৮ ॥

উপাসকগণ দেহ হইতে বহির্গমনের সময় হৃদয়নিঃসৃত

মূর্ধন্য নাড়ী-পথে সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া বহির্গত হন। ঐ নাড়ীটী সকল সময়েই সূর্য্যরশ্মিদ্বারা উদ্ভাসিত থাকে; কোন সময়ই রশ্মির অভাব হয় না; এমন কি, রাত্রিকালেও সেই রশ্মি-সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না। উপনিষদে আছে—"অথ যত্রৈতদস্মাৎ শরীরাদ্ উৎক্রামতি, অথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে" অর্থাৎ উপাসক যৎকালে এইভাবে বর্ত্তমান দেহ হইতে উৎক্রমণ করে, তৎকালে এই সকল সূর্য্যরশ্মিযোগেই উৎক্রমণ করে। আরও আছে—"অমুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে, তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ, আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে, তে অমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ" অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি ঐ সকল নাড়ী হইতে নির্গত হইয়া সূর্য্যে সংলগ্ন হয়, আবার সূর্য্য হইতে নির্গত হইয়া নাড়ীসমূহে মিলিত হয়। রাত্রিতেও যে, রশ্মি-সম্বন্ধের অভাব হয় না, তাহা—উপনিষদের "অহরেবৈতদ্ রাত্রৌ দধাতি" 'সূর্য্যদেব রাত্রিতেও এইভাবে দিন সম্পাদন করিয়া থাকেন।' এই উক্তি হইতে জানিতে পারা যায়। রাত্রিতে যদি সূর্য্যরশ্মির কোন সম্বন্ধই না থাকে, তাহা হইলে 'রাত্রিতে দিনবিধান করা' উক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। তাহার পর, গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে অন্ধকারের অল্পতা-দর্শনেও অনুমান করা যাইতে পারে যে, তৎকালেও সূর্য্যালোক ক্ষীণতর-ভাবে বিদ্যমান থাকে, নচেৎ অন্ধকারের ঘন-বিরলভাব সংঘটিত হইতে পারে না। এই সকল কারণে স্বীকার করিতে হয় যে, রাত্রিকালেও প্রত্যেক প্রাণিদেহের সহিত সূর্য্যরশ্মির সূক্ষ্মতর সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণই থাকে, কেবল মূর্ধন্য-নাড়ীতে তাহার সমধিক বিকাশ

ঘটিয়া থাকে মাত্র। বিশেষতঃ মৃত্যুর কাল যখন অনিশ্চিত, দিবা রাত্রি যে কোন সময়ে মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে, তখন রাত্রি-মৃত্যুর অপরাধেই যদি উপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পথ নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে উপাসনার ফল পাক্ষিক বা অনিশ্চিত (হইতেও পারে, না হইতেও পারে, এইরূপ) হইয়া পড়ে; তাহা হইলে ক্লেশকর উপাসনায় কোন লোকেরই আগ্রহ থাকিতে পারে না। তাহার পর, রাত্রিতে মৃত্যু হইলে যে, উৎক্রমণের জন্ত দিবার অপেক্ষা করিবে, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, "স যাবৎ ক্ষিপেৎ, মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি" এই শ্রুতি দেহ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই রশ্মিপ্রাপ্তির কথা বলিয়াছে। এই সকল কারণে বলিতে হইবে যে, উপাসক দিবাতেই দেহত্যাগ করুন, আর রাত্রিতেই করুন, কোন সময়েই তিনি নাড়ীপথে সূর্য্যরশ্মি পাইতে বঞ্চিত হন না। কেবল তাহাই নহে—

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥ ৪।২।২৯ ॥

উপাসক যদি দক্ষিণায়নেও দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলেও তিনি বিদ্যার উপযুক্ত ফল পাইতে বঞ্চিত থাকেন না। বিদ্যাফল দেশকালাদি নিমিত্ত-সাপেক্ষ নহে; এবং পাক্ষিক বা অনিশ্চিতও নহে। বিদ্যা দেশকালনির্বিশেষে আপনার ফল প্রদান করিয়া থাকে, অপর কাহারও সাহায্য অপেক্ষা করে না। তবে যে, শাস্ত্রেতে দিবামৃত্যু ও উত্তরায়ণে মৃত্যুর প্রশংসা আছে, তাহা কেবল উপা-সনারহিত অজ্ঞ লোকদিগের পক্ষে। ভীষ্মদেব যে, দক্ষিণায়নে শরশয্যাগত হইয়াও উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা

কেবল লোকশিক্ষার অনুরোধে শিষ্টাচারে আদর প্রদর্শনের জন্য, এবং পিতৃপ্রসাদের মহিমাখ্যাপনার্থ, (কারণ, তিনি পিতার নিকট হইতে 'ইচ্ছামৃত্যু' বর লাভ করিয়াছিলেন,) কিন্তু নিজের মুক্তিলাভের সুবিধার জন্য নহে। তবে যে, ভগবান্ ভগবদ্গীতায়

"যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥" (গীতা ৮।২৩)

এই বাক্যে উত্তরায়ণে মৃত যোগিদিগের অপুনরাবৃত্তি (ক্রমমুক্তি) ও দক্ষিণায়নে মৃত যোগিদিগের পুনরাবৃত্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা কেবল—

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে, স্মার্ত্তে চৈতে॥ ৪।২।২১॥

কর্ম্মযোগিদিগের জন্য বলিয়াছেন। যাহারা গীতোক্ত প্রণালী-ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই ঐপ্রকার উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়নের বিধিব্যবস্থা, কিন্তু বেদোক্ত 'দহরবিদ্যা' প্রভৃতি উপাসনায় সিদ্ধ পুরুষগণের জন্য নহে। বিশেষতঃ উক্ত পথ দুইটীও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত, বেদোক্ত নহে। বেদোক্ত পথে যে, 'অর্চ্চিঃ'প্রভৃতি কথা আছে, সে সকল কথার অর্থ স্থান বা কালবিশেষ নহে, পরন্তু আতিবাহিক; সে কথা পরে (৪।৩।৪) সূত্রে বিবৃত করা হইবে। অতএব এখানে এই সিদ্ধান্তই স্থির হইল যে, বেদোক্ত উপাসনায় সিদ্ধ পুরুষদিগের উৎক্রমণে দেশকালাদির অপেক্ষা নাই; এবং দেশকালাদিবিশেষে মৃত্যুতেও ফলের কোন তারতম্য ঘটে না; সুতরাং তাঁহারা

রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিলেও যথানির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিতে সমর্থ হন, কোনই ব্যাঘাত ঘটে না ॥ ৪।২।২১ ॥

[ক্রম-মুক্তি]

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অপরাবিদ্যার উপাসক মৃত্যু সময়ে সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনপূর্ব্বক মূর্ধন্য নাড়ী-পথে (যে নাড়ীটী হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রে যাইয়া মিলিয়াছে,) দেহ হইতে বহির্গত হইয়া আপনার গন্তব্য পথে গমন করেন, কিন্তু তিনি কোন পথে কিরূপে কোন গন্তব্য স্থানে গমন করেন, তাহা আদৌ বলা হয় নাই, অথচ উপনিষদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নপ্রকার পথের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং গন্তব্য স্থানসম্বন্ধেও পরস্পর-বিরোধী কথা শুনিতে পাওয়া যায় ; কাজেই এ বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করা সহজ হয় না ; এই কারণে সূত্রকার নিজেই এ বিষয়ের তত্ত্ব-নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

অর্চ্চিরাদিনা, তৎপ্রথিতেঃ ॥ ৪।৩।১ ॥

যদিও বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্নপ্রকার কথায়—ভিন্ন ভিন্ন পথের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হউক, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, উপাসকগণ শ্রুত্যুক্ত অর্চ্চিরাদিনামক একই পথে গমন করেন, ভিন্ন পথে নহে। প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ননামীয় ঐ সকল পথ 'দেবযান' হইতে স্বতন্ত্র নহে। পূর্ব্বোক্ত অর্চ্চিঃ অহঃপ্রভৃতিও সেই পথের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। একই দেবযান-পথ বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন নামে উপদিষ্ট হইয়াছে মাত্র। কোথাও বা আবশ্যকমতে ঐ পথেরই অংশবিশেষমাত্র উক্ত হইয়াছে, তদ্দর্শনে

আপাতজ্ঞানে পথভেদের ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকেমাত্র, বস্তুতঃ সমস্ত পথ একই পথ বা একই পথের অংশবিশেষমাত্র। অতএব উপাসক দেবযান-পথেই ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং প্রথমে ঐ পথের 'অর্চ্চিঃ' ভূমিতেই উপস্থিত হন, ইহাই সূত্রের সিদ্ধান্ত।

[দেবযান-পথের পরিচয়]

উপাসক দেবযান-পথ অবলম্বনে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং প্রথমে 'অর্চ্চিঃ' ভূমিতে উপস্থিত হন, এ পর্য্যন্ত অবধারিত হইলেও সংশয়ের অবসান হইতেছে না। উপাসক পর-পর কোন কোন ভূমি অতিক্রম করিয়া যে, ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন, তাহা নিশ্চয় করা যাইতেছে না; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদের মধ্যে দেবযান-পথের পরিচয়সম্বন্ধে বিভিন্নপ্রকার মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপতঃ এস্থলে দুইটীমাত্র উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তাহা হইতেই বিরোধের পরিচয় পাওয়া যাইবে। ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ডে কথিত আছে—

"তেঽর্চ্চিসমেবাভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঽহঃ, অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষং, আপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙেঙ্তি মাসান্, তান্, মাসেভ্যঃ সংবৎসরং, সংবৎসরাদাদিত্যং, আদিত্যাৎ চন্দ্রমসং, চন্দ্রমসো বিদ্যুতং, তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি।"

ইহার অর্থ এই যে, উপাসকগণ দেহত্যাগের পর প্রথমেই অর্চ্চিতে (অগ্নিলোকে) গমন করেন, সেখান হইতে ক্রমে অহঃ, শুক্লপক্ষ, ষন্মাসাত্মক উত্তরায়ণে ও সংবৎসরে গমন করেন;

সংবৎসরের পর আদিত্যলোকে, আদিত্যলোক হইতে চন্দ্রলোকে এবং সেখান হইতে বিদ্যুৎ-লোকে উপস্থিত হন। সেখানে উপস্থিত হইলেই একজন অমানব (মানুষের মত চেহারা নয়, এমন) পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়।— ছান্দোগ্যোপনিষদে দেবযান-পথের এইপ্রকার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু কৌষিতকী উপনিষদ্ আবার অন্যপ্রকার পরিচয় দিয়াছেন। কৌষীতকী উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"স এতং দেবযানপন্থানমাপদ্য অগ্নিলোকমাগচ্ছতি, স বায়ুলোকং, স বরুণলোকং, স ইন্দ্রলোকং, স প্রজাপতিলোকং, স ব্রহ্মলোকম্" ইতি।

অর্থাৎ উপাসক মৃত্যুর পর দেবযান-পথে উপস্থিত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করেন, বায়ুলোকে গমন করেন, এবং ইন্দ্র-লোকে ও প্রজাপতিলোকে যাইয়া শেষে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন।

উল্লিখিত উভয় শ্রুতিতেই ব্রহ্মলোকে যাইবার জন্য যে, দেব-যান-পথ অবলম্বন করিতে হয়, এবং সে পথে যে, প্রথমেই অগ্নি-লোকে উপস্থিত হইতে হয়, এ কথা ঠিক একরূপই উক্ত আছে, কিন্তু অগ্নিলোকের পরে ও ব্রহ্মলোকের পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থানের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, সে সমস্ত স্থানসম্বন্ধে উভয় উপনিষদে সম্পূর্ণ ভিন্নমত দৃষ্ট হয়; ঐ অংশে উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ঐক্য নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আবার উত্তরায়ণ ছয় মাসের পরে ও আদিত্যের পূর্ব্বে 'দেবলোক' নামে আর একটা স্থানের উল্লেখ আছে—"মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যম্"।

পরস্পর-বিরোধী এইসকল বাক্যার্থ আলোচনা করিলে সহজেই তত্ত্বনির্ণয়ের পথ বিষম সংকটময় হইয়া পড়ে। তত্ত্বনির্ণয়ের পরিপন্থী এই অসামঞ্জস্য অপনয়নপূর্ব্বক দেবযান-পথের প্রকৃত স্বরূপ প্রজ্ঞাপনের অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিতেছেন—

বায়ুমব্দাদবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্ ॥৪।৩।২॥
তড়িতোঽধিবরুণঃ ॥৪।৩।৩॥

কৌষীতকী উপনিষদে যে, দেবযান-পথে বরুণলোক ও বায়ুলোক প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তাহা কেবল গন্তব্যস্থানের নির্দ্দেশমাত্র, বস্তুতঃ তাহা ঐ পথের পারম্পর্য্যক্রম-জ্ঞাপক নহে। সেই পথে যাইতে হইলে যে সমস্ত লোকের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, ঐ বাক্যে কেবল তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু কোন স্থানের পর কোন স্থানে যাইতে হয়, তাহার নির্দ্দেশ নহে; কারণ, সেখানে পারম্পর্য্যবোধক কোন শব্দ নাই; ছান্দোগ্যবাক্যে কিন্তু তাহা আছে—পারম্পর্য্যবোধক পঞ্চমী বিভক্তিদ্বারা, যাহার পর যেখানে যাইতে হইবে, তাহার ক্রমই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং কৌষীতকীর বাক্য অপেক্ষা ছান্দোগ্যের বাক্য এবিষয়ে বলবান্। দুর্ব্বল চিরকালই বলবানের অধীন হইয়া চলে, ইহাই চিরন্তন নিয়ম। অতএব কৌষীতকীর বাক্যকে ছান্দোগ্য-বাক্যের অনুগামী করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহা হইলেই অসামঞ্জস্য দূর হইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিয়াছেন, অর্চ্চিঃ হইতে সংবৎসর পর্য্যন্ত পথের পারম্পর্য্য-ক্রম যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সেইরূপই থাকিবে, কেবল সংবৎসরের পর 'দেবলোক' ও

'বায়ুলোক' এই দুইটী লোকের সন্নিবেশ করিতে হইবে; এবং বিদ্যুৎলোকের পরে বরুণলোক, ইন্দ্রলোক ও প্রজাপতিলোকের অবস্থিতি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই দেবযান-পথের একটা নির্দ্দিষ্টভাবের অবয়ব-সন্নিবেশ সুস্থির হইতে পারে, এবং উপনিষদ্-বাক্যের উপর আপাততঃ যে, বিরোধের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা-রও পরিহার হইতে পারে। বিশেষতঃ কৌষীতকী উপনিষদে যখন কেবল স্থানগুলির উল্লেখমাত্র আছে, ক্রমের কোন কথাই নাই—কোন স্থান যে, কোন স্থানের পর, ইহার কোনই উল্লেখ নাই, অথচ ছান্দোগ্যোপনিষদে বিশেষভাবে ক্রমনির্দ্দেশ রহিয়াছে, তখন উক্ত প্রকার সন্নিবেশ-কল্পনা করা কখনই দোষাবহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ সংবৎসরের পরে এবং আদিত্যের পূর্ব্বে যে, বায়ুর সন্নি-বেশ বা অবস্থিতি, তাহা বৃহদারণ্যকের উক্তি হইতেও প্রমাণিত হইতেছে। সেখানে কথিত আছে যে, "স বায়ুমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে,—যথা রথচক্রস্য খং, তেন স উর্দ্ধ আক্রমতে; স আদিত্যমাগচ্ছতি।" অর্থাৎ 'উপাসক পুরুষ অর্চ্চিরাদিক্রমে বায়ু-সমীপে উপস্থিত হন; বায়ু তাঁহার জন্য আপনার মধ্যে একটী ছিদ্র উৎপাদন করে, যেমন রথচক্রের ছিদ্র। উপাসক সেই ছিদ্রপথে উর্দ্ধে গমন করেন, এবং আদিত্যসমীপে উপস্থিত হন'। এখানে বায়ুর পরে আদিত্যপ্রাপ্তির কথা আছে। সংবৎসরের পরে এবং আদিত্যের পূর্ব্বে যদি বায়ুর স্থান না হয়, তাহা হইলে উপরি উদ্ধৃত বাক্যের অর্থই বাধিত হয়। কাজেই আদিত্যের পূর্ব্বে ও সংবৎ-সরের পরে বায়ুর সন্নিবেশ স্বীকার করা আবশ্যক হয় ॥৪।৩।২—৩।

[অর্চ্চিঃ প্রভৃতির অর্থ—আতিবাহিক]

এই যে, দেবযান-পথের অংশ 'অর্চ্চিঃ' 'অহঃ' প্রভৃতির কথা বলা হইল, এসমস্ত কি কোনপ্রকার স্থান ?—যাহার ভিতর দিয়া উপাসকগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন ? কিংবা পথের পরিচায়ক চিহ্নবিশেষ ? অথবা অন্য কিছু ? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥৪।৩।৪॥

এই যে, অর্চ্চিঃ ও অহঃপ্রভৃতি শব্দ, এসকলের অর্থ—পথের পরিচায়ক চিহ্নমাত্র নহে, অথবা শুদ্ধ স্থানবিশেষও নহে ; পরন্তু সেই সেই স্থানের অধিপতি—আতিবাহিক পুরুষ। ইহাদের কার্য্য হইতেছে—অর্চ্চিঃপ্রভৃতি লোকে আগত অতিথিস্বরূপ উপাসকগণকে পথি-প্রদর্শনপূর্ব্বক পরবর্ত্তী স্থানে লইয়া যাওয়া। ইহারা উপাসকগণকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যান বলিয়া 'আতিবাহিক' নামে অভিহিত হন। এখানে একথাও বলা আবশ্যক যে, মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকগামী জীবের ইন্দ্রিয়বর্গ সমস্তই বিকল বা নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহার উপর অর্চ্চিরাদিও যদি অচেতন জড় পদার্থমাত্র হয়, তাহা হইলে, নেতার অভাবে উপাসকগণের ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

[ব্রহ্মলোকে যাইবার পথক্রম]

উপাসকগণের যখন মৃত্যুসময় উপস্থিত হয়—যখন বাগিন্দ্রিয় মনে, মন—প্রাণে, প্রাণ—দেহাধ্যক্ষ জীবে বিলীন হয়, এবং জীবও যখন বাগাদিসহকারে তেজঃপ্রভৃতি ভূতসূক্ষ্মে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, তখন হৃদয়ের অগ্রভাগ উজ্জ্বল আলোকময় হয়, সেই

আলোকের সাহায্যে জীব মূর্দ্ধন্য-নাড়ীপথে সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনপূর্ব্বক নির্গত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়—প্রথমে প্রকাশময় অর্চ্চিঃস্থানে উপস্থিত হয়; তখন ঐস্থানের অধিপতি অর্চ্চির দেবতা (১) তাহাকে লইয়া অহঃ-স্থানে যান, এবং সেখানে তাহাকে অহঃ-দেবতার নিকট সমর্পণ করিয়া নিবৃত্ত হন। অহর্দ্দেবতা আবার উপাসককে লইয়া শুক্লপক্ষের অধিপতির হস্তে সমর্পণ করিয়া ফিরিয়া আইসেন। শুক্লপক্ষাধিপতিও তাহাকে উত্তরায়ণের অধিপতির নিকট লইয়া যান, এবং তাঁহার নিকট দিয়া নিবৃত্ত হন। উত্তরায়ণাধিপতি আবার সংবৎসরাধিপতির নিকট তাহাকে সমর্পণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। এইভাবে সংবৎসরপতি আবার তাহাকে লইয়া দেবলোকপতির নিকট উপস্থিত হন, তিনিও আবার তাহাকে বায়ুলোকাধিপতির হস্তে সমর্পণ করিয়া নিরস্ত হন। বায়ুলোক ভেদ করিয়া গমন করা কাহারো পক্ষে সম্ভবপর হয় না; এইজন্য বায়ু নিজেই আপনার মণ্ডল-মধ্যে রথচক্রের ছিদ্রের ন্যায় একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র প্রস্তুত করেন, এবং সেই ছিদ্রপথে লইয়া যাইয়া উপাসককে আদিত্যলোকাধিপতির নিকট সমর্পণ করেন। আদিত্য আবার তাহাকে চন্দ্রলোকাধিপতির নিকট লইয়া যান; চন্দ্র আবার তাহাকে

---

(১) যিনি যেস্থানের অধিপতি, তিনি সেই স্থানের নামে পরিচিত হন। যেমন বিদেহাধিপতি বিদেহ নামে এবং কুরুদেশের অধিপতি কুরুনামে পরিচিত, তেমনি অর্চ্চিঃ-স্থানের অধিপতিও অর্চ্চিনামে অভিহিত হইয়াছেন।

বিদ্যুৎ-সমীপে সমর্পণ করেন। এখানেই ঐসকল আতিবাহিকের সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া যায়; বিদ্যুতের (১) অধিপতি আর তাহাকে লইয়া অন্যস্থানে যাইতে পারেন না। এইজন্য ব্রহ্মলোক হইতে একজন অমানব জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং "তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" তিনিই উপাসকগণকে সঙ্গে লইয়া বরুণলোক, ইন্দ্রলোক ও প্রজাপতিলোকের মধ্য দিয়া ক্রমে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মলোকে পৌঁছাইয়া দেন। পথের মধ্যবর্ত্তী বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি আর আতিবাহিকের কার্য্য করেন না, তাহারা পথিমধ্যে আবশ্যকমতে গমনের সাহায্যমাত্র করেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে এক্ষেত্রে আতিবাহিক না বলিলেও চলে। উক্ত অমানব বৈদ্যুত পুরুষ উপাসকগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান সত্য, কিন্তু তিনি সকল উপাসককেই লইয়া যান না। এ বিষয়ে আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন—

অ-প্রতীকালম্বনান্ নয়তীতি বাদরায়ণঃ, উভয়থাঽদোষাৎ,

তৎক্রতুশ্চ ॥ ৪।৩।১৫ ॥

যাহারা প্রতীকের উপাসনা না করিয়া, অন্যপ্রকারে অপরব্রহ্মের

---

(১) বিদ্যুৎলোকের পর যে, অপর আতিবাহিকের গতি সম্ভব হয় না, একমাত্র অমানব বৈদ্যুত পুরুষেরই সম্ভব হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন—"বৈদ্যুতেনৈব ততঃ, তচ্ছ্রুতেঃ।" (৪।৩।৬) "স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" এই শ্রুতি অনুসারে বুঝিতে হয় যে, বিদ্যুৎলোকে গমনের পর, অমানব বৈদ্যুত পুরুষই একমাত্র আতিবাহিকের কার্য্য করেন।

উপাসনা করেন, উক্ত অমানবপুরুষ কেবল তাঁহাদিগকেই পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান; কিন্তু যাহারা কেবল প্রতীকের বা সম্পদের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে লইয়া যান না। কারণ, যিনি যে বিষয়ের উপাসনা বা ধ্যান করেন, পরিণামে তিনি সেই বিষয়ই প্রাপ্ত হন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তং যথা যথোপাসতে, তথা ভবন্তি" 'ব্রহ্মকে যে, যেভাবে উপাসনা করেন, উপাসক সেই সেইভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন'। প্রতীকের উপাসকগণ প্রধানতঃ প্রতীক-বস্তুকেই ধ্যেয়রূপে অবলম্বন করেন, সুতরাং ধ্যেয়রূপে প্রতীকই সেখানে প্রধান, ব্রহ্ম সেখানে গৌণ বা অপ্রধানরূপে চিন্তার বিষয় হন মাত্র, কিন্তু ধ্যেয়রূপে নহে; কাজেই প্রতীক বা সম্পদ্-উপাসকদিগের পক্ষে ব্রহ্মলাভ সম্ভবপর হয় না; এইজন্যই অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান না। পক্ষান্তরে যাঁহারা প্রধানতঃ—পরই হউক, আর অপরই হউক,—ব্রহ্মোপাসনায় বা ব্রহ্মচিন্তায় রত থাকেন, তাঁহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী বলিয়াই ব্রহ্মলোকে যাইতে পারেন, ইহাই আচার্য্য বাদরায়ণের মত ॥ ৪।৩।১৫ ॥

[গন্তব্য ব্রহ্ম—পরব্রহ্ম নহে]

পূর্ব্বপ্রদর্শিত উপনিষদের উপদেশ হইতে এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, উপাসকেরা বিদ্যুতের নিকট উপস্থিত হইলে পর, অমানব বৈদ্যুত পুরুষ আসিয়া সেখান হইতে তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম-সমীপে লইয়া যান, ("স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি"), কিন্তু সেই ব্রহ্ম কি পরব্রহ্ম? অথবা অপর ব্রহ্ম?—যিনি চতুর্ম্মুখ, হিরণ্যগর্ভ ও

কার্য্যব্রহ্ম নামে পরিচিত, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কারণ, ব্রহ্মশব্দ ঐ উভয়বিধ অর্থেই প্রসিদ্ধ। উপাসকের প্রাপ্য ব্রহ্ম যদি পরব্রহ্ম হন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার কৈবল্যলাভ হওয়া উচিত, ক্ষণকালও পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করা সম্ভব হইতে পারে না। অথচ উপনিষদ্ তাঁহাদের দীর্ঘকালব্যাপী ব্রহ্মলোক-বাসের কথা বলিতেছেন—"ব্রহ্মলোকান্ গময়তি, তে তেষু ব্রহ্ম-লোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি।" অর্থাৎ উপাসকগণ ব্রহ্মলোকে নীত হইয়া সেখানে বহু সংবৎসর বাস করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সেখানে গেলে পর, তাহাদের সদ্য সদ্যই মুক্তি হয় না, মুক্তির জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয়। ইহা কিন্তু পরব্রহ্ম-প্রাপ্তির পক্ষে সম্ভবপর হয় না। বিশেষতঃ পরব্রহ্ম এক অখণ্ড বস্তু, তাহাতে 'লোক'-শব্দের প্রয়োগ এবং বহুবচন প্রয়োগ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না; অধিকন্তু ব্রহ্মলোকগামী পুরুষদিগের ভোগশ্রুতিও পরব্রহ্ম পক্ষে উপপন্ন হয় না। এই সকল কারণে, সূত্রকার আচার্য্য বাদরির সিদ্ধান্তকে স্বসিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন—

কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥ ৪।৩।৭ ॥

বাদরিনামক আচার্য্য বলেন—উপাসকগণ আতিবাহিক পুরুষের সাহায্যে যে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, তাঁহা পরব্রহ্ম নহে, পরন্তু অপর ব্রহ্ম—কার্য্যব্রহ্ম; যিনি লোকাধিপতি চতুর্মুখ 'ব্রহ্মা'-নামে প্রসিদ্ধ। কারণ, যাহা দেশবিশেষে অবস্থিত ও কালাদি দ্বারা পরি-চ্ছিন্ন, তাহার নিকটেই গমন করা সম্ভবপর হয়, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন

ও সর্ব্বগত পরব্রহ্মের নিকটে বা তাঁহার লোকে কাহারও কখনও গতি সম্ভবপর হয় না, বা হইতে পারে না। এবং ব্রহ্মেতে লোক-শব্দের, তাহার উপর বহুবচনের যোগ, এবং সেই লোকে দীর্ঘকাল বাস ও মহিমানুভব, ইত্যাদি বিষয়গুলিও পরব্রহ্মের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব হইয়া পড়ে; এইজন্য উপাসক-গণের গন্তব্য ব্রহ্ম কার্য্যব্রহ্মই বটে, পরব্রহ্ম নহে। অপর ব্রহ্মও পরব্রহ্মের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প; এই কারণে, এবং অপর ব্রহ্মপ্রাপ্ত উপাসকগণের পক্ষেও পরব্রহ্মপ্রাপ্তি অতিশয় ধ্রুব, এই কারণে অপর ব্রহ্মেও (কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভেও) ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ দোষাবহ হয় না, বুঝিতে হইবে॥ ৪।৩।৭—৯॥

উপরে যে সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইল, তাহা কেবল আচার্য্য বাদরির অভিমত নহে, সূত্রকার বেদব্যাসেরও অভিমত। বেদ-ব্যাস আপনার অভিমত সিদ্ধান্তই বাদরির মুখে প্রকাশ করিয়া উহার দৃঢ়তাসাধন করিয়াছেন মাত্র; প্রকৃতপক্ষে উহা বেদ-ব্যাসেরই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত বাদরি ও বেদব্যাসের অভিমত হইলেও পূর্ব্বমীমাংসাকর্ত্তা জৈমিনি মুনি ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই; সেইজন্য সূত্রকার জৈমিনির মত উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—

পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥৪।৩।১২॥

আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন, "স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" এই বাক্যস্থ ব্রহ্ম অপর ব্রহ্ম নহে, পরন্তু পরব্রহ্মই। কেন না,

ব্রহ্ম-শব্দ পরব্রহ্মেই মুখ্য, অর্থাৎ পরব্রহ্মই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ, অন্য অর্থসকল গৌণ। মুখ্যার্থের সম্ভবসত্ত্বে গৌণার্থ গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ "তয়োর্দ্ধমায়ন্ অমৃতত্বমেতি" এই শ্রুতিবচনে ব্রহ্মপ্রাপ্ত পুরুষের অমৃতত্ব (মুক্তি) ফলপ্রাপ্তি দৃষ্ট হয়। পরব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্যতিরেকে যে, অমৃতত্বফল পাইতে পারা যায় না, এ বিষয়ে কাহারো মতভেদ নাই; এই কারণে, এবং এই ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে যে সমস্ত ফল-বিশেষের উল্লেখ আছে, পরব্রহ্ম-ব্যতিরেকে অন্যত্র সে সকল ফলের দুর্লভত্ব হেতুতেও এ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ নহে। এ সিদ্ধান্ত জৈমিনির অভিমত হইলেও, সূত্রকারের সিদ্ধান্ত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা প্রথমেই দেখান হইয়াছে। এইজন্য ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য নানাবিধ যুক্তিতর্কের সাহায্যে জৈমিনি-মতের অপকর্ষ প্রদর্শন করিয়া সূত্রকারের অভিমত অপরব্রহ্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এখানে সে সকল কথার আলোচনা করা হইল না; জিজ্ঞাসু পাঠক ভাষ্য দেখিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন ॥৪।৩।১২—১৪॥

[ব্রহ্মলোকে শরীরেন্দ্রিয়সদ্ভাব]

অপরা বিদ্যার উপাসকগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন; এবং সেখানে যাইয়া তাঁহারা নানাবিধ বিদ্যাফল উপভোগ করেন; ইহা—"স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি", তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সংকল্পমাত্রে (ইচ্ছামাত্রে) পিতৃগণ আসিয়া উপস্থিত হন, এবং "তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি"

সর্ব্বত্র তাঁহাদের কামচার হয়, অর্থাৎ কোন বিষয়েই তাঁহাদের কামনা ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না, ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ হইতে জানিতে পারা যায়। ভোগমাত্রই মনঃ ও শরীরেন্দ্রিয়সাপেক্ষ, শরীরাদির অভাবে ভোগ নিষ্পন্ন হয় না ও হইতে পারে না; পক্ষান্তরে শরীরের সঙ্গে দুঃখসম্বন্ধ যখন অপরিহার্য্য, তখন দুঃখভোগও তাহাদের সম্ভাবিত হইতে পারে? এ কথার উত্তরে আচার্য্য বাদরি বলেন—

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥৪।৪।১০॥

ব্রহ্মলোকগত উপাসকদিগের শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না, কেবল মনঃমাত্র থাকে। উপাসকগণ সেই মনের সাহায্যেই সর্ব্বপ্রকার ভোগ নির্ব্বাহ করেন। স্থূল ভোগেই স্থূল শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকা আবশ্যক হয়, সূক্ষ্ম ভোগে নহে। তাঁহাদের ভোগ স্বপ্নকালীন ভোগের ন্যায় সূক্ষ্ম—মানস ভোগ, তাহা কেবল মনের দ্বারাই সম্পাদিত হয়, "মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে" ইত্যাদি শ্রুতিও কেবল মনের সাহায্যেই ভোগ নিষ্পত্তির কথা বলিয়াছেন; অতএব ব্রহ্মলোকগত উপাসকগণের শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না, ইহাই বাদরি আচার্য্যের মত। কিন্তু আচার্য্য জৈমিনি এ কথা স্বীকার করেন না। এইজন্য সূত্রকার জৈমিনির নাম করিয়া বলিতেছেন—

ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পামননাৎ ॥৪।৪।১১॥

আচার্য্য জৈমিনি বলেন—ব্রহ্মলোকগত উপাসকদিগের যেমন মন থাকে, তেমনি শরীর ইন্দ্রিয়ও থাকে। কারণ, "স একধা

ভবতি, ত্রিধা ভবতি” ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মলোকগামীদের একধা (এক প্রকার) ও ত্রিধাভাবের (অনেক প্রকার হওয়ার) কথা আছে, তাহা ত শরীরভেদ ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় না। আত্মা স্বরূপতঃ এক অখণ্ড ও নির্ব্বিশেষ; শরীরাদি না থাকিলে তাহার একধা বা অনেকধাভাব কি প্রকারে সম্ভব হয়? বিশেষতঃ শরীর না থাকিলে মনই বা থাকিবে কিরূপে? অতএব ব্রহ্মলোকগত উপাসকগণেরও শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন সমস্তই আছে। একই প্রদীপ হইতে যেমন অনেক প্রদীপ সৃষ্ট হয়, এবং সমস্ত প্রদীপই যেরূপ মূল প্রদীপের প্রকাশ লইয়া প্রকাশমান হয়, এস্থলেও (ত্রিধা-নবধাপ্রভৃতি স্থলেও) সেইরূপ এক আত্মাদ্বারাই পরস্পর সমস্ত শরীর উদ্ভাসিত বা পরিচালিত হয় বুঝিতে হইবে। সূত্রকারও এবিষয়ে জৈমিনির মতকেই স্বসিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে।

[ব্রহ্মলোকগামীদিগের ক্ষমতা ও ভোগসাম্য]

পূর্ব্ব-উদাহৃত “ সংকল্পাদেবাস্য ” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে, এবং “ আপ্নোতি স্বারাজ্যম্ ” তিনি স্বারাজ্য লাভ করেন, এবং “সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” সর্ব্বলোকে তাহার কামনা পূর্ণ হয়, অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন; এই সকল শ্রুতিপ্রমাণ হইতে জানা যায় যে, উপাসকগণ ব্রহ্ম-লোকে যাইয়া অসীম শক্তিশালী হন,—যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন। এখন জানিতে ইচ্ছা হয় যে, তাঁহারা ঈশ্বরের

সৃষ্টি ব্যবস্থারও বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারেন কি না? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্, প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥৪।৪।১৭॥

ব্রহ্মলোকগত উপাসকগণ অসীম শক্তিলাভ করিলেও ঈশ্বর-প্রবর্ত্তিত জাগতিক বিধিব্যবস্থার বিপর্য্যয় বা অন্যথা করিতে পারেন না; ইচ্ছা করিলেও দিনকে রাত্রিতে পরিণত করিতে পারেন না, অথবা চন্দ্রসূর্য্যের গতিক্রম পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন না। এ সকল বিষয়ে একমাত্র নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরেরই নির্ব্যূঢ় ক্ষমতা, অপরের নহে। উপাসকগণ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, এবং তাহাদ্বারা যতটা সম্ভব, করিতে পারেন ও করেন; তদধিক বিষয়ে তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ—

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥৪।৪।২১॥

ব্রহ্মলোকগত ব্যক্তিরা যে, সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের সমকক্ষ হইয়া সমান শক্তিলাভ করেন, তাহা নহে। সেখানে যাইয়া তাঁহারা কেবল ঈশ্বরের সঙ্গে ভোগ-সাম্যমাত্র লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে নহে। শ্রুতিতে ঈশ্বর ব্রহ্মলোকবাসী লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"তমাহ—আপো বৈ খলু মীয়ন্তে, লোকোঽসৌ" অর্থাৎ আমি এই অমৃতময় জল ভোগ করিয়া থাকি, তোমাদের লোকও এই অমৃতে পূর্ণ হউক। অন্যত্র আছে—"স যথৈতাং দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি, এবং হৈবং-বিদম্" অর্থাৎ সমস্ত ভূত এই দেবতাকে (ঈশ্বরকে) যেরূপ রক্ষা করে, এবংবিধ উপাসককেও সেইরূপই রক্ষা করে, ইত্যাদি

বহু স্থলে কেবল ভোগগত সাম্যের কথাই আছে, অন্য বিষয়ে সমতার কোন উল্লেখই নাই। অতএব "জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জং" কথা অশাস্ত্রীয় বা অসঙ্গত নহে ॥ ৪।৪।২১ ॥

এ পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, উপাসকগণ ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, এবং ভোগবিষয়ে ঈশ্বরের সমকক্ষ হন,—সংসারে আর ফিরিয়া আসেন না ইত্যাদি। কিন্তু ব্রহ্মলোক যখন একটী পরিমিত স্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন নিশ্চয়ই তাহা নিত্য বা চিরস্থায়ী নহে; তাহাকেও সময়ে ধ্বংসের কবলে পড়িতে হইবে, এবং ব্রহ্মার কার্য্য-ভারও যখন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ন্যস্ত, তখন সেই কার্য্যকাল পূর্ণ হইলে ব্রহ্মাকেও নিশ্চয়ই প্রস্থান করিতে হইবে। এমত অবস্থায় ব্রহ্মলোকবাসীদিগেরই বা পরিণাম কিরূপ হইবে? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃপরমভিধানাৎ ॥৪।৩।১০॥

অপর ব্রহ্মের কার্য্যকাল শেষ হইলে যখন ব্রহ্মলোক লয়োন্মুখ হয়, তখন সেই লোকাধিপতি ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁহারাও পরব্রহ্মে বিলয় প্রাপ্ত হন। অভিপ্রায় এই যে, দীর্ঘকাল অপর ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনের ফলে যাহাদের হৃদয় সর্ব্ববিধ দোষমুক্ত ও বিশুদ্ধ স্ফটিকের মত উজ্জ্বল হয়। সেই সকল উপাসকই ব্রহ্মলোকে যাইতে সমর্থ হন। তাঁহারা সেখানে গেলে পর চিত্ত-মালিন্যের আর কোনই কারণ থাকে না; সুতরাং আত্মজ্ঞান লাভেও কোনপ্রকার বাধা ঘটে না; এইজন্য কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ যখন কার্য্যভার সমাপ্ত করিয়া পরব্রহ্মে বিলীন হন, তখন ব্রহ্মলোকবাসী

উপাসকেরাও (যাহারা সেখানে যাইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহারাও) সঙ্গে সঙ্গে পরব্রহ্মে বিলীন হন।

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥"

প্রতিসঞ্চর অর্থ প্রলয়কাল। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মার সঙ্গে জ্ঞান-প্রাপ্ত উপাসকগণও পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদ্ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ॥ ৪।৪।২২॥

"ন স পুনরাবর্ত্ততে—" ইত্যাদি শব্দই এ বিষয়ে প্রমাণ। ঐ সকল শ্রুতি প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, পরব্রহ্মে লীন ব্যক্তি আর সংসারমণ্ডলে আবর্ত্তিত হন না, ফিরিয়া আইসেন না। তাঁহাদের সংসার-সম্বন্ধ সেখানেই চিরকালের জন্য শেষ হইয়া যায়। অপর ব্রহ্মবিদ্যার সেবক উপাসকগণের এবংবিধ মুক্তিকে 'ক্রমমুক্তি' বলে, আর জীবন্মুক্তের মুক্তিকে 'বিদেহমুক্তি' বলে। ক্রমমুক্তির কথা এখানেই শেষ করা হইল। অতঃপর বিদেহ-মুক্তির কথা বলা যাইতেছে।

[জীবন্মুক্ত ও তাহার পুণ্য-পাপ]

যাঁহারা শম-দম-বিবেক-বৈরাগ্যপ্রভৃতি সাধনসমন্বিত হইয়া প্রজ্ঞাবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হন—দেহ-সত্ত্বেই আপনার ব্রহ্ম-ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহারা জীবন্মুক্ত নামে অভিহিত হন। ব্রহ্মবিদ্ জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহপাতের পর আর উৎক্রমণ (ব্রহ্মলোকগতি) বা পরলোকগতি হয় না, এখানেই তাঁহার

সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া যায়, এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে. কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য ও পাপের গতি কি হয়, তাহা বলা হয় নাই। যদি তৎকালেও তাহার পুণ্য ও পাপ অক্ষত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তির পরেও সেই সকল পুণ্য-পাপের ফল-ভোগার্থ তাহাকে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইবে, অথবা সেই সকল কর্ম্মফল ভোগের জন্য তাহাকেও বাধ্য হইয়া স্বর্গাদিলোকে যাইতে হইবে। তাহা হইলে জীবন্মুক্তের মুক্তিতে আর কর্ম্মীর কর্ম্মফল-প্রাপ্তিতে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

তদধিগম উত্তর-পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ, তদ্ব্যপদেশাৎ ॥ ৪।১।১৩ ॥

জিজ্ঞাসু পুরুষ দীর্ঘকাল অনুধ্যানের পর যখন ব্রহ্মের চিদানন্দঘন স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, বিমল ব্রহ্মজ্যোতিতে যখন তাঁহার হৃদয়দেশ নিয়ত উদ্ভাসিত হইতে থাকে, এবং সংসারের সর্ব্ববিধ আকর্ষণ যখন ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তখন তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য ও পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং জ্ঞানোদয়ের পরে উৎপন্ন কোনপ্রকার পুণ্য বা পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না (১)। কারণ, ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে এইরূপই উপদেশ আছে—

---

(১) এই সূত্রেমাত্র 'অঘ' শব্দের উল্লেখ থাকায় কেবল পাপের সম্বন্ধেই এই নিয়ম মনে হইতে পারে সত্য, কিন্তু, ইহার পরেই "ইতরস্যাপ্যেবম-সংশ্লেষঃ, পাতে তু" (৪।১।১৪) সূত্রে পুণ্যের সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মের অতিদেশ করা হইয়াছে, এইজন্য আমরা এখানে পাপপুণ্য উভয়েরই উল্লেখ করিলাম।

"যথা পুষ্করপলাশে আপো ন সংশ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে ইতি", পদ্মপত্রে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, তেমনি এবংপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেতেও (ব্রহ্মজ্ঞেও) পাপ লিপ্ত হয় না, এবং "তদ্যথা ইষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" অর্থাৎ ইষীকার তূলা যেরূপ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ এই ব্রহ্মবিদ্ব্যক্তিরও সমস্ত সঞ্চিত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়। তাহার পর, "সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি * * * য এবং বেদ" যিনি এই প্রকারে জ্ঞানলাভ করেন, তিনি সমস্ত পাপ অতিক্রম করেন ইত্যাদি। উদ্ধৃত শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটী দ্বারা জ্ঞানোত্তরকালে যে সকল পাপ-পুণ্যকর্ম্মের সংশ্লেষ সম্ভাবিত ছিল, তাহা নিবারিত হইয়াছে, আর দ্বিতীয় বাক্যে জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বকালীন পাপ-পুণ্যের ক্ষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর যে, পাপপুণ্য—উভয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে আরও স্পষ্টভাষায় বর্ণিত হইয়াছে,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাৎপরে॥"

অর্থাৎ সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিলে পর, সাধকের হৃদয়গ্রন্থি (অহঙ্কার) ভাঙ্গিয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম—পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য ও পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই যে, পাপপুণ্যক্ষয়ের বিধি প্রদর্শিত হইল,

ইহা কিন্তু সমস্ত কর্ম্মসম্বন্ধেই প্রযোজ্য নহে; এইজন্য সূত্রকার বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে,—

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে, তদবধেঃ ॥ ৪।১।১৫ ॥

অর্থাৎ এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে পাপপুণ্যক্ষয়ের বিধি, তাহা কেবল অনারব্ধকার্য্যসঞ্চিত কর্ম্মের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের সম্বন্ধে নহে।

অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্ম সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ। তন্মধ্যে, যে সকল কর্ম্ম সাহায্যকারীর অভাবে এখনও ফলপ্রদানের সুযোগ লাভ করে নাই, সহকারী দেশ, কাল ও নিমিত্তাদির অপেক্ষায় বসিয়া আছে, সেই সকল কর্ম্ম 'সঞ্চিত' নামে অভিহিত। যে সকল কর্ম্ম নিজেদের ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত বর্ত্তমান দেহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম 'প্রারব্ধ' নামে পরিচিত। আর যে সকল কর্ম্ম জ্ঞানোদয়ের পর অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল কর্ম্ম 'ক্রিয়মাণ' বলিয়া কথিত হয়। এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে কেবল প্রথমোক্ত সঞ্চিত কর্ম্মরাশিই জ্ঞানোদয়ের পর ভস্মীভূত হয়, আর ক্রিয়মাণ কর্ম্মরাশি বিফল হইয়া যায়, অর্থাৎ সে সকল কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানীর পাপ পুণ্য কিছুই হয় না, কিন্তু 'প্রারব্ধ' কর্ম্মসম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না; প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল জ্ঞানীকেও ভোগ করিতে হয়।

"না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥"

প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল শতকোটী কল্পেও ভোগ ব্যতিরেকে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল শুভই হউক, আর অশুভই হউক, কর্ত্তাকে তাহা ভোগ করিতেই হইবে। সে ভোগ ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক বা পরেচ্ছায় হউক, হইবেই হইবে, অন্যথা করিবার উপায় নাই (১), এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিতেছেন—

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে ॥ ৪।১।১৯ ॥

জ্ঞানীরাও প্রারব্ধফলক পুণ্য ও পাপের ফল উপভোগ করেন। উপভোগে প্রারব্ধ কর্ম্মের শুভাশুভ ফল নিঃশেষ করিয়া— সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মপাশ-বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মসম্পন্ন হন, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন। তখন তিনি—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" 'ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হন' এই বেদবাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়া চিরদিনের জন্য সংসার-সম্বন্ধরহিত হন।

অভিপ্রায় এই যে, সংসারী জীব যে দুরপনেয় অজ্ঞানের প্রভাবে বিমোহিত হইয়া আপনাকে ভুলিয়া যায়, নিজের নিত্য-নির্ম্মুক্ত ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত হারায়, এবং জন্ম-জরা-মরণাদি সংসারধর্ম্ম আপনাতে আরোপ করিয়া নিরন্তর

---

(১) জ্ঞানীর ইচ্ছাকৃত প্রারব্ধ ভোগ—ভিক্ষাচর্য্যা প্রভৃতি।
অনিচ্ছাকৃত ভোগ—বিষয়-সংযোগাদি।
পরেচ্ছাকৃত ভোগ—ভক্তের উপহারগ্রহণাদি।

বিহিত প্রায়শ্চিত্ত বা উৎকট তপস্যাদ্বারা কোন কোন প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল মৃদুতাপ্রাপ্ত বা খণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু সকল ফল নহে।

যাতনা পায়, সেই সর্ব্বানর্থের মূলকারণ অজ্ঞান নিরসন করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে—জ্ঞান। আলোক ব্যতীত যেমন অন্ধকার নিরস্ত হয় না, তেমনি জ্ঞানব্যতিরেকেও অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না। একমাত্র আত্মজ্ঞানই আত্মবিষয়ক অজ্ঞান-নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়।

যতদিন সেই আত্মজ্ঞানের উদয় না হয়, ততদিনই বুদ্ধিকৃত কর্ম্মে আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব আরোপ করিয়া জীবমাত্রই কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে আসক্তি ও অনুরাগ পোষণ করিয়া থাকে। সেই অনুরাগের ফলেই জীবকে কর্ম্মানুযায়ী দেহ ধারণ করিয়া সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। দীর্ঘকাল এইপ্রকার যাতায়াতের মধ্যে দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে করিতে প্রাক্তন পুণ্যকর্ম্মের ফলে যদি কাহারো হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে শম-দমাদি সাধন-সম্পন্ন হইয়া যদি ধৈর্য্যসহকারে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, তবেই তাঁহার ভাগ্যে আত্ম-জ্ঞানলাভের সুযোগ-সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, এবং উজ্জ্বল জ্ঞানসূর্য্যোদয়ে পূর্ব্বতন অজ্ঞান-তিমিররাশি অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন তিনি আপনার ব্রহ্মভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আপনার আনন্দে আপনি পরিতৃপ্ত থাকেন। তখন অনাত্মবিষয়ক কামনা বা বাসনা এবং তন্মূলক 'সঞ্চিত' কর্ম্মরাশি ভস্মীভূত হইয়া থাকে, 'ক্রিয়মাণ' কর্ম্মরাশিও তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া থাকে, তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। তখন তাঁহাকে কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের জন্য বাধ্য থাকিতে হয়, এবং তাঁহার ইচ্ছা না

থাকিলেও কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের অনুরোধেই বাঁচিয়া থাকা—দেহ ধারণ করা আবশ্যক হয়। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ নিঃশেষ হইলেই দেহের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়; তখন দেহের পতনকাল উপস্থিত হয়। উপনিষদ্ বলিতেছেন—"তস্য তাবদেব চিরং, যাবৎ ন বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্যে"। এবং "বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" অর্থাৎ আত্মজ্ঞ পুরুষের সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত দেহ তাঁহাকে ছাড়িয়া না দেয়; দেহপাতের সঙ্গেসঙ্গেই তাঁহার বিমুক্তি—ব্রহ্মেতে বিলয় হয়। তিনি জীবদবস্থায়ই অজ্ঞান-বন্ধন হইতে বিমুক্ত ছিলেন, এখন কেবল দেহ-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলেন মাত্র। তখন—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽ-
স্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ,
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥"

নানাদিগ্দেশীয় নদনদীসকল যেরূপ নিজেদের নাম (গঙ্গা যমুনা ইত্যাদি) ও রূপ (আকৃতি) পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে অস্তমিত হয়,—সমুদ্রের সঙ্গে মিলিয়া এক হয়, নামরূপাদি-বিভাগ বিলুপ্ত করিয়া সমুদ্ররূপে পরিচিত হয়, বিদ্বান্—ব্রহ্মবিদ্ পুরুষও সেইরূপ আপনার নাম ও রূপ অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক যতপ্রকার বিভাগ বিদ্যমান ছিল, সে সমস্ত বিভাগ বিসর্জ্জন দিয়া সেই পরাৎপর পরম পুরুষ পরমাত্মার সহিত মিলাইয়া যান, তাঁহাতে আর ব্রহ্মেতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য থাকে না, উভয়ে

এক হইয়া যান—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। ইহাই জীবের বিদেহ মুক্তি বা নির্ব্বাণ। ইহারই অপর নাম কৈবল্য, ইহাই জীবের পরমানন্দময় চিরবিশ্রামভূমি। এখানেই জীবের জীব-ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়। এস্থানে যাইয়া কেহই আর ফিরিয়া আসে না, ইহাই শেষ বা চরম অবস্থা, "ন স পুনরাবর্ত্ততে, ন স পুনরাবর্ত্ততে"—

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।"

[উপসংহার]

প্রবন্ধের শেষভাগে জন্মান্তর-চিন্তাপ্রসঙ্গে অজ্ঞ-বিজ্ঞনির্ব্বিশেষে মনুষ্যমাত্রেরই মৃত্যুকালীন অবস্থা, পুণ্যাত্মা লোকদিগের চন্দ্রাদিলোকে গতি, গতিক্রম, প্রত্যাবর্ত্তনের পদ্ধতি, পাপীলোকদিগের নরকে গতি ও ভোগশেষে পুনরায় স্থাবরাদি জন্মপ্রাপ্তি, এবং অত্যন্ত অধম লোকদিগের ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্ম-মরণ প্রভৃতি বিষয় বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে, এখানে সে সকল বিষয়ের পুনরুক্তি অনাবশ্যক। তাহার পর, অপরা বিদ্যার উপাসকগণের উৎক্রমণ-প্রণালী, ব্রহ্মলোকে গতি ও পথের পরিচয়াদিসম্বন্ধেও যাহা বলা হইয়াছে, এবং পরাবিদ্যার সেবক—জীবন্মুক্তদিগেরও মুক্তিলাভের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, এবং সে সম্বন্ধে মতভেদও অতি অল্পই আছে; সুতরাং সে সমুদয় বিষয়ের পুনরায় আলোচনা অনাবশ্যক মনে হইতেছে; কিন্তু মুক্তির স্বরূপসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে; বিশেষতঃ এ পর্য্যন্ত মুক্তিসম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সে

সমস্তই প্রধানতঃ বেদান্তের—বিশেষতঃ আচার্য্য শঙ্করের অভিমত কথা মাত্র, কিন্তু সে কথায় সকলে সম্মতি জ্ঞাপন করেন না, বরং কেহ কেহ সে কথার বিরোধী মতবাদও প্রচার করিয়াছেন। এই কারণে মুক্তিসম্বন্ধে পুনরায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বলা আবশ্যক যে, এই আলোচনার সমাপ্তিতেই আমরা এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব।

ভারতীয় আস্তিক সমাজে মুক্তিবাদ স্বীকার করেন না, এরূপ লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ মুক্তি অস্বীকার করা নাস্তিকের পক্ষেও সম্ভবপর হয় কি না, সন্দেহের বিষয় (১)। মুক্তিবাদ সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও উহার উপায় ও অবস্থাসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ (২), বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

---

(১) নাস্তিক সম্প্রদায়ও দুঃখের আত্যন্তিক অভাব ও পরমানন্দ-ভোগ, ইহাই জীবনের সারসর্ব্বস্ব—পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, সুতরাং তাহাদের পক্ষেও উক্ত প্রকার মুক্তি অস্বীকার্য্য না হইতে পারে।

(২) দ্বৈতবাদ. প্রধানতঃ ন্যায়, বৈশেষিক ও জৈমিনির সম্মত। অদ্বৈতবাদ অর্থে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ বুঝিতে হইবে, তাহা আচার্য্য শঙ্করের অভিমত, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ভল্লভাচার্য্যের অনুমোদিত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আচার্য্য রামানুজের, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ নিম্বার্কসম্প্রদায়ের এবং অচিন্ত্যভেদা-ভেদবাদ গৌড়ীয় বলদেবপ্রভৃতির অভিমত।

আচার্য্য শঙ্করের অভিমত অদ্বৈতবাদ বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদনামে পরিচিত, কিন্তু আমরা স্থানে স্থানে কেবল 'অদ্বৈতবাদ' বা 'শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ' বলিয়াছি, তাহা যেন কেহ ভল্লভাচার্য্যের 'মত' বলিয়া গ্রহণ না করেন।

ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বাদবাহুল্যই মুক্তিবাদে এত বিবাদ ঘটাইয়াছে। এখানে সে সকল মতবাদের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর না হইলেও, সংক্ষেপতঃ যতটা সম্ভব, আমরা কেবল তাহাই বলিয়া নিবৃত্ত হইব, অভিজ্ঞ পাঠক, নিজেই সে সকলের ভাল মন্দ বিচার করিয়া পরিতুষ্ট হইবেন।

মুক্তিসম্বন্ধে নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ বলেন—অজ্ঞান বা ভ্রান্তি-জ্ঞানই জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখের কারণ,—অনাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মভ্রম হয় বলিয়াই লোকে দেহাদির অনিষ্ট-সম্ভাবনায় দুঃখের ভীষণ-চ্ছবি হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। উক্ত অজ্ঞানের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত এ দুঃখধারা অবিচ্ছেদে চলিতে থাকে; একমাত্র জ্ঞানোদয়ে উহার অবসান ঘটে। লোক যখন আত্মা ও অনাত্মার প্রকৃত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়, তখনই ভ্রান্তি-মূলক এই দুঃখধারার সম্পূর্ণ বিনাশ বা বিচ্ছেদ হয়, এবং তখনই জীব আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তির শান্তিময় ক্রোড়ে চির-বিশ্রামলাভ করিতে সমর্থ হয়।

মুক্তিদশায় জীবাত্মার কোন ইন্দ্রিয় থাকে না, মনও থাকে না; সুতরাং তদবস্থায় জ্ঞান, ইচ্ছা বা সুখদুঃখাদিবোধ কিছুই থাকে না; এবং পরমাত্মা পরমেশ্বরের সহিত মিলিয়াও এক হয় না। আত্মা তখন অচেতন কাষ্ঠ-পাষাণাদির ন্যায় আপনার ভাবে আপনি অবস্থান করেন।

বৈশেষিক মতাবলম্বী পণ্ডিতগণও মুক্তিসম্বন্ধে প্রায় সর্ব্বাংশেই নৈয়ায়িকমতের প্রতিধ্বনি করেন। তাহারাও পরমাত্মা হইতে

জীবাত্মার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন, এবং মুক্তিদশায় তাহার কোনপ্রকার বিশেষ গুণ বা সুখদুঃখাদির অনুভূতি থাকে না, এ কথা স্বীকার করেন। অধিকন্তু নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুশীলনই মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী পণ্ডিতগণ বলেন—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অত্যন্ত ভেদও নাই, অত্যন্ত অভেদও নাই; পরমার্থতঃ অভেদ থাকিলেও ব্যবহারতঃ উভয়ের ভেদ আছে, এবং সেই ভেদ চিরকাল আছে ও চিরকাল থাকিবে; সুতরাং জীব কখনও পরমাত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাইবে না। ভগবানের সালোক্য-সাযুজ্যাদি অবস্থাপ্রাপ্তিই জীবের মুক্তি। ভগবৎসন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার সেবা-রসাস্বাদই মুক্তির চরম ফল। ভক্তিসহকারে ভগবদারাধনাই ঐরূপ মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় ইত্যাদি।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ আবার এ কথায়ও সন্তুষ্ট হন না। তাঁহারা বলেন—"ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ-ত্রিতয়ং হরিঃ" ঈশ্বর, চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড় পদার্থ), এই তিন পদার্থই ভগবান্ শ্রীহরির রূপ, অর্থাৎ এক শ্রীহরিই ঈশ্বররূপে, চেতন জীবরূপে এবং অচেতন জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়া লীলা করিতেছেন।

বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি অংশগুলি পরস্পর বিভিন্ন হইলেও, ঐ সমস্ত অংশবিশিষ্ট বৃক্ষ যেমন এক, তেমনি জীব ও জড়বর্গ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও, তদ্বিশিষ্ট ভগবান্ শ্রীহরি মূলতঃ এক। চেতন ও অচেতনবর্গ হইতেছে বিশেষণ, আর ভগবান্

শ্রীহরি বা বাসুদেব হইতেছেন ঐ সকলের বিশেষ্য। বিশেষণগুলি পরস্পর ভিন্ন হইলেও বিশিষ্ট বস্তুটা ভিন্ন হয় না—এক অদ্বিতীয়ই থাকে ; এইজন্য উক্ত সিদ্ধান্তকে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' বলা হয়। এমতে ঈশ্বর যেমন সত্য, জীবও তেমনই সত্য, এবং উহাদের বিভাগও সত্য, কোনকালে বা কোন অবস্থায়ই মূল পদার্থ শ্রীহরির সঙ্গে উহারা এক হইয়া যাইবে না, মুক্ত অবস্থায়ও হইবে না। তদবস্থায় জীব ভগবৎ-ধামে যাইয়া তাঁহার পরমানন্দ-বিভব পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে থাকেন, এবং পূর্ণমাত্রায় তাঁহার সেবাধিকার লাভ করিয়া থাকেন, ইহারই নাম মুক্তি। জীব কখনও আপনাকে 'ভগবান্'—"অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিয়া চিন্তা করিবে না ; করিলে অপরাধী হইবে। ভক্তিই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। ধ্রুবাস্মৃতি (নিরন্তর স্মরণ করা) ও উপাসনা-প্রভৃতি শব্দ ভক্তিরই নামান্তর মাত্র। জীবদবস্থায় কেহই মুক্ত হইতে পারে না ; সুতরাং জগতে জীবন্মুক্ত বলিয়া কেহ ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। শাস্ত্রে যে, জীবন্মুক্তের কথা আছে, তাহা কেবল প্রশংসাবাদমাত্র, বাস্তবিক সত্য নহে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বেদান্তদর্শনের উপরে একটী ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তিনি এক নূতন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে জীবমাত্রই ব্রহ্মের অংশ, এবং সংখ্যায় অনন্ত। প্রত্যেক জীবই বিভু—সর্ব্বব্যাপী, নিত্য চৈতন্যস্বরূপ এবং সমানস্বভাব ও অবিভক্তভাবে

অবস্থিত ; এই কারণে শাস্ত্রে জীবকে এক (অবিভাগলক্ষণ একত্ববিশিষ্ট) বলা হইয়াছে। কোন জীবই ব্রহ্মকে আপনার সঙ্গে অভিন্নভাবে চিন্তা করিবে না। আত্মাকে জানিলেই আত্ম-বিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন আত্মার স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে, ইহাই জীবের মুক্তি, কিন্তু জীব কখনও ব্রহ্মের সঙ্গে এক হইয়া যায় না ইত্যাদি। ইহা ছাড়া আরও বহু আচার্য্য আছেন, যাহারা বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য্য-প্রকাশচ্ছলে আপনাদের বিভিন্নপ্রকার মতবাদ প্রকাশ করিয়া-ছেন, এবং কোন কোন অংশে মুক্তিসম্বন্ধেও স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন ; এখানে আর সে সকল মতের পৃথক্ আলোচনা আবশ্যক মনে হইতেছে না। যেকয়টি মতবাদ বর্ণিত হইল, তাহাদ্বারাই অপরাপর মতেরও অধিকাংশ তত্ত্ব বলা হইল বুঝিতে হইবে। অতঃপর আচার্য্য শঙ্করের অভিমত বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের দুই একটামাত্র কথা বলিয়াই বক্তব্য শেষ করিতেছি।

আচার্য্য শঙ্করের অভিমত অদ্বৈতবাদে প্রধান আলোচ্য বিষয় তিনটী—জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম। তন্মধ্যে ব্রহ্মই এক-মাত্র পরমার্থ সত্য, জীব ও জগৎ তাঁহাতে কল্পিত মাত্র। এই কল্পনার মূল হইতেছে—মায়া। ব্রহ্মেতে যে একটী শক্তি আছে, যাহা সৎ ও অসৎরূপে, কিংবা সদসৎ—উভয়াত্মক রূপে অনির্ব্বচনীয়, তাহাই মায়া অবিদ্যা ও অজ্ঞানপ্রভৃতি নামে পরিচিত। সেই অনির্ব্বচনীয় মায়ার প্রভাবেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে দ্বৈতভাব (জীব ও জগৎভেদ) আরোপিত হইয়া থাকে।

এই আরোপ যে, কোন শুভ মুহূর্ত্তে কল্পিত হইয়াছে, অথবা কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা মানব-বুদ্ধির অসাধ্য। অসাধ্য বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত কেহ ইহার আদি অন্ত অবধারণ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন আচার্য্য ও ঋষিগণের মধ্যে অনেকে এ বিষয়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন, আর যাহারা নিতান্ত তর্কপ্রিয়, তর্কের অধিকার অসীম বলিয়া গর্ব্বানুভব করেন, তাহারাও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পরই তর্কের পথ অবরুদ্ধ দেখিয়া সবিস্ময়ে নিবৃত্ত হইয়াছেন; তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যারণ্যস্বামী বলিয়াছেন—

"নিরূপয়িতুমারব্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ।
অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ"॥ (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ জগতের নিখিল পণ্ডিতমণ্ডলী একত্রিত হইয়াও যদি এই দুরূহ সৃষ্টিতত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পরেই তাহাদের সম্মুখে নিবিড় অন্ধকারপূর্ণ এমন সমস্ত তর্কের বিষয় উপস্থিত হয়, যেখানে তাহাদের ক্ষীণ জ্ঞানালোক কিছুই করিতে পারে না। ইহা বুঝিয়াই আচার্য্যগণ তারস্বরে সৃষ্টি-প্রবাহের অনাদিভাব ঘোষণা করিয়াছেন—

"জীব ঈশো বিশুদ্ধা চিৎ, বিভাগশ্চ তয়োর্দ্বয়োঃ।
অবিদ্যা তচ্চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ"॥ (সংক্ষেপ শারীরক)

অর্থাৎ জীব, ঈশ্বর (মায়োপহিত ব্রহ্ম), বিশুদ্ধা চিৎ (পর-ব্রহ্ম), জীবেশ্বর-বিভাগ, অবিদ্যা ও অবিদ্যার সহিত ব্রহ্মের

যোগ, এই ছয়টী পদার্থ আমাদের (বৈদান্তিকগণের) মতে অনাদি, অর্থাৎ উক্ত ছয়টী বিষয়ের আদি নাই; ইহা আমাদের স্বীকৃত বিষয়, এ সকল বিষয়ে আর তর্কের অবসর নাই। উক্ত ছয়টী পদার্থের মধ্যে বিশুদ্ধা চিৎ (পরব্রহ্ম) ছাড়া আর সমস্তই অনিত্য বা ধ্বংসের অধীন। এমন দিন আসিতে পারে, যে দিন, জীবের জীবভাব, ঈশ্বরের ঈশ্বরভাব ও মায়ার স্বরূপ ও সদ্ভাব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; সুতরাং তখন জগৎ, জীব ও মায়া বলিয়া কোন পদার্থ থাকিবে না। তবে, সেরূপ দিন যে, কবে আসিবে, অথবা মোটেই আসিবে না, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

জীবভাব ও ঈশ্বরভাব অনিত্য বা বিনাশশীল হইলেও জীব-চৈতন্য ও ঈশ্বর-চৈতন্য অনিত্য নহে, উহা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ পদার্থ নহে, পরন্তু ব্রহ্ম-চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্ম-চৈতন্যই মায়া ও অন্তঃকরণরূপ উপাধিযোগে জীবেশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কাজেই উহাদের স্বরূপোচ্ছেদ হওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না, কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে সেকথা বলা চলে না; কারণ, উহা স্বরূপতই অসত্য—রজ্জুতে ভ্রম-কল্পিত সর্পের ন্যায় বস্তুতই উহা মিথ্যা; কাজেই উহার স্বরূপোচ্ছেদ হইতে পারে। এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, জগৎ মিথ্যা বা অসত্য হইলেও 'অশ্বডিম্ব' বা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অত্যন্ত অসৎ পদার্থ নহে, উহারও একটা সত্তা আছে, কিন্তু সে সত্তা উহার নিজস্ব নহে। রজ্জুতে কল্পিত সর্প যেমন রজ্জুর সত্তায় সত্তাবান্ হয়, তেমনি ব্রহ্মেতে মায়া-কল্পিত জগৎও ব্রহ্ম-সত্তায় সত্তাযুক্ত হয়;

সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে মায়ার অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত জীব ও জগৎ অক্ষত দেহে অবস্থান করিবেই করিবে, পক্ষান্তরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর জ্ঞানীর দৃষ্টিতে আর জীব ও জগতের স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, কেবল ব্রহ্মসত্তাই সর্ব্বত্র প্রতিভাত হইতে থাকে।

কিন্তু ঐরূপ সাক্ষাৎকারলাভ সকলের ভাগ্যে সম্ভবপর হয় না; এইজন্য, যাহারা মন্দাধিকারী, তাহারা চিত্ত-শুদ্ধি সম্পাদনের জন্য নিষ্কাম কর্ম্মপথ অবলম্বন করিবেন। যাহারা মধ্যমাধিকারী, তাহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় মনোনিবেশ করিবেন। আর যাঁহারা উত্তমাধিকারী, তাঁহারাই কেবল পরাবিদ্যার অনুশীলনে রত হইবেন। শম-দমাদি সাধন-সম্পত্তি ও বিবেক-বৈরাগ্যাদি সদ্‌-গুণাবলীই জীবকে উত্তমাধিকার প্রদান করে। সে সকল সাধন-সামগ্রী ও সদ্‌গুণাবলী ঐহিকই হউক বা পারলৌকিকই হউক, তাহাতে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ফলকথা, ঐ সমুদয় সাধন-সম্পন্ন ব্যক্তিই উত্তমাধিকারী; এবং তাঁহার পক্ষেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সার্থক বা সফল হইয়া থাকে; অপরের পক্ষে নহে। দীর্ঘকাল পুনঃপুনঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফলে উত্তমাধিকারী পুরুষের হৃদয়ে আত্মজ্ঞান অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। আলোক ব্যতীত যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয় না, তেমনি আত্মজ্ঞান ব্যতীতও আত্মবিষয়ক অজ্ঞান অপনীত হয় না; ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত চিরন্তন নিয়ম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আচার্য্য শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ। অবিদ্যা বা অন্তঃকরণরূপ উপাধিদ্বারা উভয়ের

বিভাগ কল্পিত হয়; তাহাতেই অনাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি উপস্থিত হয়। এই অজ্ঞানই—ভ্রান্তিজ্ঞানই জীবের প্রকৃত বন্ধন—সুখদুঃখাদিময় সংসারের কারণ। জীব-ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানে সেই অজ্ঞান ও তন্মূলক বন্ধের নিবৃত্তি হয়। বন্ধনিবৃত্তি আর মুক্তি একই কথা। জীব চিরদিনই মুক্ত, কেবল অজ্ঞানে যে, বন্ধন-বুদ্ধি উৎপাদন করিয়াছিল, এখন আত্মজ্ঞানপ্রভাবে সেই অজ্ঞান অপনীত হওয়ায় জীবের স্বাভাবিক ব্রহ্মভাব আপনা হইতেই প্রকাশ পাইল মাত্র। জ্ঞানোদয়ের পর জীবের পূর্ব্ব-সঞ্চিত পুণ্য-পাপ বিনষ্ট হয়, ক্রিয়মাণ কর্ম্মরাশিও নষ্টপ্রায় হয়, কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ চলিতে থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত হইলেই স্থূল দেহের অবসান হয়; মনঃ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়প্রভৃতি সমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন জীব আপনার নামরূপাদি-বিভাগবর্জ্জিত হইয়া পরব্রহ্মে মিলিয়া এক হইয়া যায়। সে আর ফিরিয়া আইসে না—

"ন স পুনরাবর্ত্ততে, ন স পুনরাবর্ত্ততে।"
"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

ইতি।